হৃদয়ের টান মদীনার পানে

মূল

আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলায়হি

অনুবাদ

হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার রাহমতুল্লাহি আলায়হি

হাজী প্রকাশনী

www.sahihaqeedah.com

হৃদয়ের টানে মদীনার পানে

মূল

আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী

অনুবাদ

হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

Click here

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

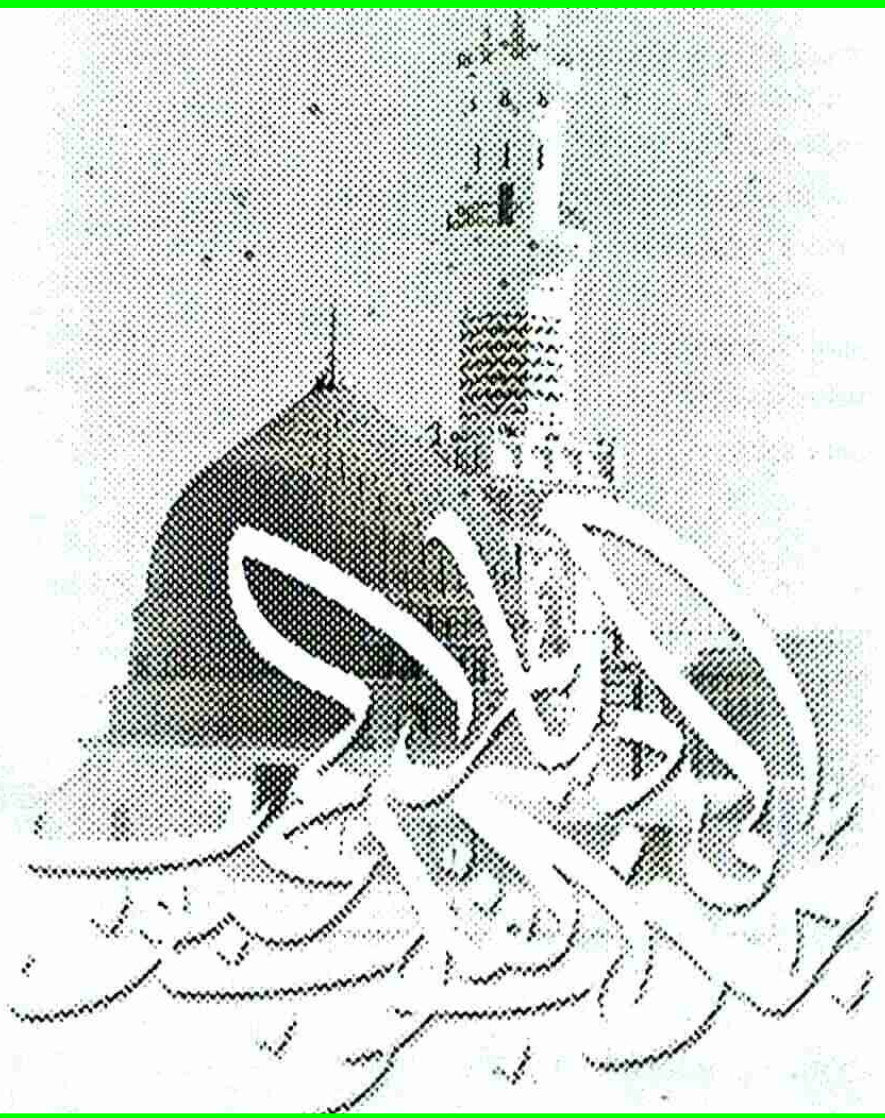

PDF by Masum Billah Sunny

গাজী প্রকাশনী

হৃদয়ের টানে
মদীনার পানে

মূল
আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অনুবাদ
হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল ঃ
ডিসেম্বর ২০১৪

গাজী প্রকাশনী
প্রকাশনায়
গাজী প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৯১৫৭

৩৮৬, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৪৯৭

কম্পোজ
গাজী কম্পিউটার
৩৮৬ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুদ্রণ
গাজী প্রকাশনী এন্ড প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ২৬০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91163-3-2

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ০৭
অনুবাদকের কথা ১০

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়ঃ পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার নাম ও উপাধিসমূহ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে মদীনা শরীফের ফযীলত ২৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মদীনার প্রাচীন বাসিন্দা ৭১
ইহুদিদের ওপর আনসারদের আক্রমণ ৯৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনা আগমনের কারণ ৮০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ-এর মদীনা হিজরত ৮৬
হিজরতের প্রথমবর্ষ ১০০ হিজরতের দ্বিতীয়বর্ষ ১০১
হিজরতের তৃতীয়বর্ষ ১০৪ হিজরতের চতুর্থবর্ষ ১০৬
হিজরতের পঞ্চমবর্ষ ১০৭ হিজরতের ষষ্ঠবর্ষ ১০৮
হিজরতের সপ্তমবর্ষ ১০৯ হিজরতের অষ্টমবর্ষ ১১০
হিজরতের নবমবর্ষ ১১৩ হিজরতের দশমবর্ষ ১১৫
হিজরতের একাদশবর্ষ ১১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ মসজিদে নববী নির্মাণের কৈফিয়ত এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহ ১২২
মসজিদে নববীর থাম (স্তম্ভ)সমূহের বর্ণনা ১২৭
সুফফা এবং আহলে সুফফার বর্ণনা ১৩১

সপ্তম অধ্যায়ঃ বিভিন্ন বাদশাহের আমলে মসজিদে নববীর যে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৪২
প্রথম দফা সংস্কার ১৪২ দ্বিতীয় দফা সংস্কার ১৪৫
তৃতীয় দফা সংস্কার ১৪৭ চতুর্থ দফা সংস্কার ১৫০
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরা শরীফ ১৫০
হুযূর পাক ﷺ-এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনাবলি ১৫৩
- প্রথম ঘটনা: পবিত্র রওযা মুবারক খোদাইয়ের ঘটনা ১৫২
- দ্বিতীয় ঘটনা ১৫৫ - তৃতীয় ঘটনা ১৫৬

অষ্টম অধ্যায়: মসজিদে নববী, রওযা পাক ও মিম্বর শরীফের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ১৫৭

রওযা মুবারক এবং মিম্বর শরীফের ফযীলত ১৬২

নবম অধ্যায়: মসজিদে কুবার নির্মাণ এবং সেই সমুদয় মসজিদসমূহ, যেখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ঝলক বিদ্যমান ১৬৯

মসজিদে জুমা ১৭৫
মসজিদে কুবাইযা ১৭৭
মসজিদে মাশরুবা উম্মে ইবরাহীম ১৮০
মসজিদুল ইযাবত ১৮২
মসজিদে বকী ১৮৫
মসজিদে আবু বকর সিদ্দীক ১৮৬
মসজিদে ফতহ ১৮৮
মসজিদে কিবলতাইন ১৯৪
মসজিদে কসহ ১৯৬
মসজিদুল ওয়াদী ১৯৭
মসজিদে ফযীখ ১৭৬
বনী কুরাইযা অবরোধ ১৭৮
মসজিদে বনী যুফুর ১৮১
মসজিদে আবু যর গিফারী ১৮৪
মুসল্লায়ে ঈদ ১৮৬
মসজিদে আলী ১৮৬
মসজিদে নবী হারাম ১৯৩
মসজিদে যুবাব ১৯৫
মসজিদে আইনাইন ১৯৭
মসজিদুস সুকয়া ১৯৭

দশম অধ্যায়: সেই সমুদয় কূপসমূহের বর্ণনা যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পদচারণে ধন্য করেছেন ১৯৯

১. বিরে আরীস ১৯৯
২. বিরে গরস ২০২
৩. বিরে রুমা ২০৪
৪. বিরে বুযা'আ ২০৬
৫. বিরে কুলসা ২০৮
৬. বিরে হাআ ২০৯
৭. বীরে ইহন ২১০
৮. ওয়াদিয়ে আকীক ২১০

একাদশ অধ্যায়: মক্কা এবং মদীনার রাস্তায় বিদ্যমান কয়েকটি বিশেষ মসজিদ ২১৩

মসজিদে যুল-হুলাইফা ২১৩
মসজিদে শাজারা রওহা ২১৪
মসজিদে কবর ২১৬
মসজিদে সরফ ২১৭
মসজিদে বী-তুওয়া ২১৭
মসজিদে মুআররস ২১৩
মসজিদে গযালা ২১৫
মসজিদে খুলায়স ২১৭
মসজিদে তানয়ীম ২১৭

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়: জান্নাতুল বকী'র ফযীলত এবং বিখ্যাত কবরসমূহ ২১৮

জান্নাতুল বকী'র বিশিষ্ট কয়েকটি কবরের বর্ণনা ২২৩

হযরত উসমান ইবনে মাযউন ﷺ-এর কবর ২২৩

হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ২২৫
হযরত রুকাইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ২২৬
হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ ﷺ-এর কবর ২২৭
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ-এর কবর ২৩১
হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ-এর কবর ২৩১
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ-এর কবর ২৩২
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী ﷺ-এর কবর ২৩২
হযরত সাদ ইবনে যুরারা ﷺ-এর কবর ২৩২
হযরত ফাতিমাতুয যুহরা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ২৩৩
হযরত হাসান ইবনে আলী ﷺ-এর কবর ২৩৮
হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ﷺ-এর কবর ২৩৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু হযরত সফিয়া ﷺ-এর কবর ২৩৯
আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস আবদুল মুত্তালিব ﷺ-এর কবর ২৪০
রাসূলে করীম ﷺ-এর সম্মানিত বিবিগণের কবর ২৪১
আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান ﷺ-এর কবর ২৪১
হযরত সাদ ইবনে মুআয আল-আশহালী ﷺ-এর কবর ২৪৩
হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী ﷺ-এর কবর ২৪৪

জান্নাতুল বকী' ও মদীনা নগরীর আশে-পাশের গুম্বজসমূহ ২৪৫
মদীনা নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গুম্বজসমূহের বর্ণনা ২৪৬
বকী'র বাইরের কবরস্থানসমূহ ২৪৭

১. হুযূর আকরম ﷺ-এর চাচা এবং তাঁর দুধ ভাই, শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কবর ২৪৭
২. আবু সায়ীদ খুদরী ﷺ-এর পিতা মালিক ইবনে সিনান ﷺ-এর কবর ২৪৮
৩. হযরত নকসে বাকিয়া ﷺ-এর কবর ২৪৮

আহলে বকী'র যিয়ারতের তরীকায়ে সুন্নাত ২৪৯
বকী'তে সর্বপ্রথম কার যিয়ারত করা উচিত? ২৫০
আহলে বায়তের যিয়ারত প্রসঙ্গ ২৫২

ত্রয়োদশ অধ্যায়: উহুদ পর্বতের ফযীলত ২৫৩

চতুর্দশ অধ্যায়: হযরত সাইয়িদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারতের ফযীলত এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهم السلام-এর জীবিত থাকার প্রমাণ ২৬৩

হযরতে আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام-এর জীবিত থাকার বর্ণনা ২৬৮
হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهم السلام জীবিত থাকার ব্যাপারে আলোচনা ২৮৫

পঞ্চদশ অধ্যায়: সাইয়িদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূরে আকরম ﷺ-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারত এবং তাঁর ওয়াসীলা ২৯০

গ্রহণ করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা
কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য ২৯৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলারদরবারে ওয়াসীলা ও সুপারিশকারী ৩০৫
হিসাবে পেশ করার বর্ণনা
১. প্রথম স্থানের বর্ণনা ৩০৫
২. দ্বিতীয় স্থানের বর্ণনা ৩০৬
৩. তৃতীয় স্থানের বর্ণনা ৩০৮
৪. চতুর্থ স্থানের বর্ণনা ৩১১
পরিশিষ্ট ৩১৫

ষোড়শ অধ্যায়: রাসূলে পাক ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারতের ৩১৭
আদব ও মদীনা শরীফে অবস্থান এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
রওযায়ে পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম ৩৩২
মদীনা শরীফে অবস্থানকালের আদব ৩৩৫

সপ্তদশ অধ্যায়: দরূদ শরীফের ফযীলত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ৩৪৯
জুমাবার দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলতের বর্ণনা ৩৬৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন লাভের বিবরণ ৩৭২

গ্রন্থপঞ্জি ৩৯৮

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মানব জাতির ইহকাল-পরকালের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের সকল দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁর খাস বান্দা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তেমনি তাদের অবর্তমানে উলামা, আওলিয়া, সুফিয়ায়ে কিরামকেও প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা নবীদের ওপর অর্পিত তাবলীগে দীনের গুরু দায়িত্ব পালন করে মানুষকে আল্লাহর তা'আলার নৈকট্য লাভের সন্ধান দিতে পারেন।

বিশ্ববরেণ্য আলিমে রব্বানী অলিকুল শিরোমণি, হযরত রাসূলে মকবুল ﷺ-এর একনিষ্ঠ আশিক, মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এমনই একজন সত্যিকার নায়েবে রাসূল।

তিনি ৯৫৮ হিজরীতে বাদশাহ ইসলাম শাহ সৌরীর রাজত্বকালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ আগা মুহাম্মদ তুর্ক সর্বপ্রথম ১২৯৬ খ্রি. অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর আমলে দিল্লিতে আগমন করেন। সুলতান তাঁকে খুবই সমাদর করেন এবং আমির-ওমারাদের সাথে গুজরাট বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। গুজরাট বিজিত হওয়ার পর তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু হঠাৎ যখন কোন এক দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়ে তার ১০১ জন পুত্রসন্তানের মধ্যে ১০০ জনই শাহাদাত বরণ করেন, তখন তিনি দিল্লিতে এসে শায়খ সালাউদ্দীন সোহরাওয়ারদির খানকায় অবস্থান করতে থাকেন। ৯৩৯ হিজরীর ১৭ রবিউস সানী তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর একমাত্র ছেলে মালিক মইযুদ্দীন থেকেই তাঁর বংশ-বিস্তার ঘটে। মইযুদ্দীনের পুত্র মালিক, মূসা এবং তাঁর পুত্র শায়খ ফিরোজ উভয়ই জ্ঞান-গরীমা এবং বুযুর্গীতে খুবই খ্যাতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। ৯৬০ হিজরীতে বাহরাইসের যুদ্ধে শায়খ ফিরোজ যখন শহীদ হন, তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। এই গর্ভেই শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর দাদা শায়খ সা'দুল্লাহর জন্ম হয়। শায়খ রিযকুল্লাহ এবং শায়খ সায়ফুদ্দীন নামক তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। যখন ৯২৮ হিজরীর ২২ রবিউল আওয়াল শায়খ সা'দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন, তখন শায়খ সাইফুদ্দীনের বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। ইনিই দিল্লীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর সম্মানিত আব্বাজান।

শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর সুযোগ্য পিতা তাঁকে যাহিরী ইলম শিক্ষাদানের সাথে সাথে তাঁর বাতিনী এবং রূহানী তা'লীম-তরবিয়াতেরও বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর অন্তরে এমন এক 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলেন; যা তাঁর অন্তরকে [illegible] ও [illegible]। এ কারণে তিনি

ইবাদত, রিয়াযত-মুজাহাদার সাথে সাথে সমকালীন আওলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দীনেরও সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সাধারণ লোকের সাথে মেলামেশা থেকে তিনি সর্বদা বিরত থাকতেন।

এ সময় ছিল দিল্লির বিখ্যাত প্রতাপশালী মুঘল সম্রাট বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল। মূর্খ আকবর তার স্বার্থান্বেষী আমির-উমরা ও দীনবিরোধী উপদেষ্টাদের দ্বারা বিপথগামী হয়ে 'দীনে ইলাহী'-নামক এক নতুন ধর্মপ্রবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করেন। এ দৃশ্যপটে আকবরী আমলাদের দ্বারা ইসলামী শরীয়ত বিশেষভাবে পদদলিত ও লাঞ্ছিত হয়। এমনকি মুসলমানদের দাড়ি রাখার ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। আকবর এবং তার দরবারি লোকেরা শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀-কে তাদের দলভুক্ত করার ব্যর্থসাধ্য চেষ্টা-সাধনা চালায়। কিন্তু মহান রব্বুল আলামীন যে অমর ব্যক্তিত্বকে তার দীন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন, তিনি এসব স্বার্থান্বেষী দুষ্ট লোকদের খপ্পরে পড়বেন কেন?

দীন ইসলামের এ যুগ-সন্ধিক্ষণে এবং মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে হযরত শায়খ দেহলভী ﵀ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও মনক্ষুণ্ন হয়ে ৯৯৬ হিজরীতে ৩৮ বছর বয়সে পবিত্র হিজাযে চলে যান। সেখানে তিনি তিন বছর অতিবাহিত করেন। এসময়ে তিনি সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যায়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ছাড়াও সেখানকার বিশিষ্ট শায়খে কামিল আবদুল ওহাব মুত্তাকী ﵀-এর সান্নিধ্যে এসে জাহিরী ও বাতিনী ইলমের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি তাঁর সাথে পবিত্র হজ আদায় করেন এবং শায়খ মুত্তাকী ﵀-এর নির্দেশ মোতাবেক হারাম শরীফের নির্জন কামরায় ইবাদত ও যিয়ারতে মশগুল হন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সাথে তাঁর বিশেষ আসক্তি ও মুহাব্বত ছিল। হিজাযে অবস্থানকালে তিনি ৪ বার রওযায়ে পাক গমন করেন, তখনই তিনি সেখানে পায়ের জুতা খুলে খালি পায়ে পথচারণ করতেন।

হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকী ﵀ শায়খ দেহলভী ﵀-কে ইলম ও আমালের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা বিধানের পর তাঁকে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানার নির্দেশ দেন। কিন্তু দেশের দীনী পরিস্থিতি অতীব শোচনীয় হওয়ার কারণে তাঁর মন এদিকে ধাবিত না হলেও শায়খ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ায় তাঁর জন্য কোন উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি বাগদাদ হয়ে হযরত গাউসে পাক ﵁-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করে ভারতে ফিরে আসার জন্য তাঁর শায়খের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু হযরত শায়খ এতে রাজি হলেন না। অগত্যা তিনি ১০১৭ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগ্নহৃদয় নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀ দেশে ফিরে এসে দেখতে পান যে, দেশে সর্বত্র আকবরের মনগড়া দীন ইলাহীর দৌরাত্ম্য এবং দীন ইসলাম বিপর্যস্ত। অতএব তিনি পণ করেন যে, যেকোন কিছুর বিনিময়ে তিনি নির্ভয়ে আকবরের বাতিল ধর্মের চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরবেন এবং ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা তাঁদের কাছে পেশ করবেন। আকবরের মতো প্রতাপশালী বাদশাহর মোকাবিলা করা যদিও সহজ ছিল না, কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ ক্ষেত্রে পিছপা এবং সন্ত্রস্ত হতে পারে কি? সুতরাং তিনি মৌখিক ও কলমী জিহাদ আরম্ভ করে একদিকে দিল্লিতে দীনী ইলমের কেন্দ্র 'দারুল উলূম' প্রতিষ্ঠা করে কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরেন, অপর দিকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অতিজরুরি মূল্যবান পুস্তকাদি রচনা করে ইসলামের সত্যতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাবের সংখ্যা ৬০টি। যদি ছোট ছোট পুস্তক ও রচনাবলিকে সংযুক্ত করা হয়, তবে সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৬টি।

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৯
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব ফারসি ভাষায় লিখিত বিশ্ববরেণ্য আলিমে রব্বানী শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رحمة الله عليه-এর অপূর্ব অমর অবদান এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য একখানা অনন্য উপাদেয় দীনী পুস্তক। পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার প্রামাণ্য ইতিহাস, রাসূলপাক ﷺ-এর মাদানী জিন্দেগির অনেক তথ্যবহুল ঘটনাবলি, গযওয়া তথা নবী করীম ﷺ-এর জিহাদসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ফযীলতপূর্ণ পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা, বিভিন্ন মূল্যবান ব্যাখ্যা, হায়াতুন্নবী ﷺ, রওযায় পাকের শান ও মর্যাদা এবং নবুল শরীফের ফযীলতসহ ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক অমূল্য তথ্যাবলি এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিতাবখানি যতই পাঠ করা হয় ততই ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বতের জোয়ার আসে।

এ কারণে কিতাবখানি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ মুসলিম উম্মাহর নিকট এটি বিশেষভাবে সমাদৃত। আর এ কারণেই আরবী ও উর্দূ প্রভৃতি ভাষায় কিতাবখানার অনুবাদ করা হয়েছে। অতএব বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজের জন্যও যে কিতাবখানার অনুবাদ অতীব প্রয়োজন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মুসলিম সমাজের এ দীনী প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে এ নগন্য বান্দাহ কিতাবখানার বাংলা অনুবাদের প্রতি ব্রতী হই। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে কিতাবখানা মুসলিম সমাজের হাতে তুলে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

গ্রন্থখানি নির্ভুল, সুষ্ঠু সুন্দর ও মার্জিত করার জন্য আমার স্নেহধন্য মাওলানা আবুল হাসান মুহাম্মদ তারেক যে শ্রম দিয়েছেন এর জন্য তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক দু'আ। আল্লাহপাক তাঁকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়র দান করুন।

অনুবাদ একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার। তাই ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। যদি কোন সুহৃদ ব্যক্তির নজরে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব। কিতাবখানা মুসলিম সমাজের হিদায়াতের প্রবল বাসনা নিয়ে প্রকাশিত। যদি এদিকে তাঁদের সুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তবে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

আলহাজ্ব জনাব সোবহান সাহেব এই বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং মুদ্রণের জন্য (প্রথম সংস্করণ) আর্থিক

সহযোগিতা করেছেন, এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করুন এবং তাঁর পিতা-মাতা ও মুরুব্বীদের রূহের মাগফিরাত ও নাজাতের ওয়াসীলা করুন।

আল্লাহপাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর দ্বারা আমাদের মাতা-পিতা ও পীর-মুরশিদের রূহের মাগফিরাত ও আখিরাতের কামিয়াবি নসিব করুন। আমীন।

আরজগুজার
(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার নাম ও উপাধিসমূহের বর্ণনা

কোন বস্তুর নামের আধিক্য এর উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বেরই প্রমাণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার নামের আধিক্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপাধিসমূহের আধিক্য উভয় সত্তার মহান মর্যাদা ও মহত্বের প্রমাণ। বিশেষ করে সেসব নাম ও উপাধি যদি এমন শব্দ থেকে নির্গত হয়, যার মধ্যে মহত্ব ও মর্যাদার অর্থ বিদ্যমান থাকে।

পৃথিবীতে মদীনা তাইয়িবা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই, যার এত অধিক নাম রয়েছে। কোন কোন আলিম এসব বের করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কেউ কেউ আনুমানিক ১০০ বা এর কিছু কম-বেশি নাম বের করেছেন। এ পুস্তকে শুধু সেই নামগুলোই বর্ণিত হবে, যা মদীনা শরীফের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক।

মহান আল্লাহর নাম নিয়ে মদীনার পবিত্র নামসমূহ বর্ণনা করছি,

১. طَابَةُ (তাবা),

২. طَيْبَةُ (তায়বা),

৩. طَيِّبَةُ (তাইয়্যিবা) ও

৪. طَابِيَةُ (তায়িবা)।

এ ছাড়া যেসব শব্দ মূল শব্দ থেকে নির্গত হয় সেসব হযরত ﷺ থেকে বর্ণিত। কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষে সেসব অতিরিক্ত ও সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। পবিত্র মদীনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত নামসমূহ ব্যবহারের কারণ হচ্ছে,

১. মদীনা মুনাওয়ারা শিরকের অপবিত্রতা থেকে পূত-পবিত্র।

২. সেখানকার আবহাওয়া মানুষের প্রকৃতিতে স্বভাবে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মনমুগ্ধকর।

৩. মদীনা তাইয়িবার আবহাওয়া পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত। শুধু তাই নয়, সেখানকার প্রত্যেক জিনিসই পবিত্র ও সুবাসযুক্ত।

৪. জনসাধারণের ভাষ্য যে, মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীগণ রাসূলে মকবুল ﷺ এ পবিত্র রওযা মুবারক, এমন কি এর দরজা, জানালা এবং দেয়াল থেকে পর্যন্ত এমন এক সুগন্ধি লাভ করেন, যা অপর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না। কোন কোন নবীপ্রেমিক এ সুগন্ধির স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ আত্তার ﷺ বলেন,

بِطِيْبِ رَسُوْلِ اللهِ طَابَ نَسِيْمُنَا

فَمَا الْمِسْكُ وَالْكَافُوْرُ وَالصَّنْدَلُ الرُّطْبُ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুগন্ধি লাভ করে সেখানকার বাতাস সুগন্ধময় হয়েছে। এটি এমন এক সুগন্ধি, যা মিশক, কাপুর এবং চন্দনের খুশবুকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।'

হযরত শিবলী ﷺ [যিনি (মুহাব্বতের জোশ বিশেষ)-এর মধ্যে সবিশেষ খ্যাত ছিলেন।] বলেন, মদীনা শরীফের মাটিতে এমন এক সুগন্ধি বিদ্যমান রয়েছে, যা মিশক আম্বরেও পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের কথা এই যে, (প্রকৃত পক্ষে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই) যে স্থান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব হুযুরে আকরম ﷺ-এর শ্বাস-প্রশ্বাসের সুগন্ধি লাভ করেছে। সে সুগন্ধির তুলনায় মিশক আম্বরের সুগন্ধি মূল্যহীন।

دران زمین کہ نسیمے وزد طرہ دوست

چہ جائی دم زدن نافہائے تاتاریست

'বন্ধুর যুলফ (রাসূল ﷺ-এর মাথা মুবারকের চুল বিশেষ)-এর সংস্পর্শ লাভ করে যে স্থানের বাতাস প্রবাহিত হয় সে স্থানের বাতাসের খুশবুর মোকাবিলায় তাতারী মৃগনাভির খুশবুর কি মর্যাদা থাকতে পারে?

মদীনা শরীফে যতগুলো সুগন্ধিযুক্ত বস্তু (যেমন- ফুল) রয়েছে তার সুগন্ধি এতই উৎকৃষ্ট যে, অপরাপর স্থানের কোন ফুলের মধ্যে এমন সুগন্ধি নেই। বিশেষ করে গোলাপ ফুল হযরত ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত বলে বিখ্যাত।

زنسیم جان فزایت تن مردہ زندہ گردد

زکدام باغی ای گل کہ چنین خوش ست بویت

'আপনার সংস্পর্শে আসা জীবনী শক্তিবর্ধক বাতাস মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করে তোলে। হে অপরূপ পুষ্প। তুমি কোন বাগানের ফুল যে, তোমার খুশবু এতই চিত্তাকর্ষক।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُسَمِّيَ الْمَدِيْنَةَ طَابَةً».

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন মদীনা শরীফের নাম 'তাবা' রাখি।'[১]

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত কিতাবের মধ্যে মদীনা শরীফের নাম طَابَةٌ (তাবা), طَيْبَةٌ (তাইয়্যিবা) ও طَيْبَةٌ (তায়বা) বলে বর্ণিত আছে।[২]

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাব মতে, যে ব্যক্তি মদীনা শরীফের মাটিকে খুশবুবিহীন ধারণা করে অথবা সেখানকার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বলে মনে করে, তাকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রদান ও বন্দি করে রাখা ওয়াজিব। তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

নুবুওয়াত পূর্বকালে মদীনা শরীফের يَثْرِبُ (ইয়াসরিব) ও أَثْرَبُ (আসরিব) বলা হত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক রাসূলে খোদা ﷺ মদীনা শরীফের নাম طَابَةٌ (তাবা) ও طَيْبَةٌ (তায়বা) রাখেন। কোন কোন আলিম বলেন, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-এর আওলাদের মধ্যে ইয়াসরিব নামক একজন লোক ছিল। বংশের লোকজন বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- ইয়াসরিব কী মদীনা শরীফের নাম, না উহুদ পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম, যেখানে ঝর্ণা এবং খেজুরের গাছ খুব বেশি, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলিমগণ শেষোক্ত মতের প্রতিই রায় দিয়েছেন। يَثْرِبُ-এর বহু বচন أَثَارِبُ-এর ব্যবহার উল্লিখিত উক্তিটিকেই সমর্থন করে। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর শাগরিদ এবং মদীনার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে যুবালাসহ কোন কোন আলিম বলেছেন যে, তোমরা মদীনাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করো না। *তারিখে বুখারী*তে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

'যে ব্যক্তি একবার ইয়াসরিব বলবে, তার এ অবৈধ উক্তির জন্য ১০ বার মদীনা বলা উচিত।'[৩]

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৩৬, হাদীস: ১৯৮৭; হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত

[২] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯০;
عَنْ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: «إِنَّ اِسْمَهَا فِيْ كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي التَّوْرَاةَ- طَيْبَةٌ وَطَابَةٌ»، وَنُقِلَ عَنِ التَّوْرَاةِ أَيْضًا تَسْمِيَتُهَا بِالطَّيْبَةِ.

[৩] আল-বুখারী, *আত-তারীখুল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ২১৭, হাদীস: ২২১১; হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে রা. কর্ণিত: «مَنْ قَالَ يَثْرِبُ مَرَّةً فَلْيَقُلِ الْمَدِيْنَةَ عَشْرًا»

ইমাম আহমদ থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন যে,

'যে ব্যক্তি ইয়াসরিব বলবে তার ইস্তিগফার করা উচিত।'[১]

কেননা মদীনার নাম طَابَةٌ (তাবা)। এ ধরনের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। يَثْرِبُ (ইয়াসরিব) নামটি অপছন্দ হওয়ার কারণ এই যে, এটি ثَرْبٌ (সরবুন) থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে ফাসাদ অথবা ثَرِيْبٌ (সরীবুন) থেকে নির্গত, এর অর্থ হচ্ছে অভিযুক্ত করা অথবা ধমক দেওয়া অথবা মূলত এটা এখানে কাফিরের নাম। সুতরাং এ ধরনের শব্দ দ্বারা এমন পবিত্র স্থানের নামকরণ আদৌ সংগত নয়। তবে কুরআন মাজীদের আয়াত[২],

يَاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ ۝

এতে যে ইয়াসরিব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা মুনাফিকদের উক্তি। তারা তাদের মুনাফিকির কারণে এই শব্দটি ব্যবহার করত। কোন কোন হাদীসে যে ইয়াসরিব শব্দটির উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন যে, এটি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের কথা।

৫. এ পবিত্র নগরীর নামসমূহের মধ্যে أَرْضُ اللهِ (আরদুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর জমিনও একটি নাম।

৬. أَرْضُ الْهِجْرَةِ (আরদুল হিজরা) অর্থাৎ হিজরতের স্থানও অন্যতম নাম। যেমন- কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে,

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۝[৩]

'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পার'?[৩]

এ আয়াত শরীফের দ্বারা উক্ত নাম দু'টির সমর্থন পাওয়া যায়, আর উভয় নামের দ্বারা এ নগরীর সম্মান প্রকাশ পায়।

৭. মদীনা শরীফের নামসমূহের মধ্যে اَكَالَةُ الْبُلْدَانِ (আকালাতুল বুলদান) অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ শহর।

৮. اَكَالَةُ الْقُرَىٰ (আকালাতুল কুরা)ও প্রসিদ্ধ। সমস্ত শহর এবং গ্রামের মধ্যে প্রাধান্য লাভের ফলে এ দু'নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে কোন কোন

[১] আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ১৬৮৮; হযরত বারা ইবনে আযিব থেকে রা. কর্ণিত: «مَنْ قَالَ لِلْمَدِيْنَةِ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ»

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:১৩

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৯৭

আলিম উল্লেখ করেছেন। যেমন- মূল নগরী হওয়ার কারণে মক্কা মুয়ায্যামাকে أُمُّ الْقُرَىٰ (উম্মুল কুরা) অর্থাৎ শহরসমূহের মা বলা হয়। আলিমগণ বলেছেন, উম্মুল কুরা থেকে এ শব্দ দু'টির মধ্যে পূর্ণতা অধিক। কেননা 'মা' হওয়ার দ্বারা অন্যান্য শহরের নিশ্চিহ্ন করা বুঝায় না। কিন্তু আকাল শব্দের দ্বারা অপরাপর শহরকে নিশ্চিহ্ন করে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করাকেই বোঝায়।

৯. اَلْاِيْمَانُ (আল-ঈমান) মদীনার আর একটি নাম। কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে,

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ ۚ

'যাঁরা মদীনায় বসতি স্থাপন করেছেন এবং ঈমানকে আঁকড়িয়ে ধরেছেন।'[১]

মদীনা শরীফকে এ নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, এ আয়াতটি মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসায় নাযিল হয়েছে। এ ছাড়াও এ পবিত্র শহর ঈমানের উৎস এবং কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই মদীনা শরীফকে এ নামে অভিহিত করা যুক্তিসংগত। কেননা এখান থেকেই ঈমান বের হয়েছে এবং এ দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'ঈমানের ফিরেশতা যিনি ঈমানদার ও বিশ্বাসীদের অন্তরে ভালো কথা ঢেলে দেন এবং লজ্জার ফেরেশতা উভয়েই অঙ্গীকার করেছেন যে, তাঁরা মদীনা শরীফেই অবস্থান করবেন এবং কখনও মদীনার বাইরে থাকবেন না।' এ গুণদু'টি মদীনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১০. اَلْبَرَّةُ (আল-বররা),

১১. اَلْبَارَّةُ (আল-বার্‌রা),

১২. اَلْبَرَّاءُ (আল-বর্‌রা),

১৩. اَلْبَرَّةُ (আল-বারা) এসব শব্দও মদীনার নাম। এ নামসমূহের বরকত এবং কল্যাণের অর্থ বিদ্যমান। আর মদীনা যে বরকত এবং কল্যাণের কেন্দ্রভূমি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৪. اَلْبَلَدُ (বলদ) যেমন- কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে,

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

'এ শহরের শপথ করে বলছি।'[১]

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বালাদ*, ৯০:১

কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ মদীনা তাইয়িবা বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা রাসূলে মকবুল ﷺ এখানে আগমন করে এ শহরকে ধন্য করেছেন। এ ছাড়া তাঁর জীবন-মরণের সাথে এ শহর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ আলিম এর অর্থ মক্কা মুআয্যমা বলে ধরে নিয়েছেন।

উল্লিখিত সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ায় তা দ্বিতীয় মতটিই সমর্থন করে।

১৫. بَيْتُ رَسُوْلِ اللهِ (বায়তু রাসূলিল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের ঘর। মদীনা শরীফকে এ নামে অভিহিত করার যুক্তি এই যে, যেমনিভাবে মক্কা শরীফকে (আল্লাহর ঘর) বলে থাকি, অনুরূপভাবে মদীনা শরীফকে (রাসূল ﷺ-এর ঘর বলাই সমীচীন)।

زہے سعادت آن بندۂ کہ کرد نزول
گہی بہ بیت خدا و گہی بیت رسول

'সেই বান্দা কতই ভাগ্যবান, যিনি কখনও আল্লাহর ঘরে এবং কখনো রাসূলের ঘরে মেহমান হন।'

১৬. اَلْجَابِرَةُ (আল-জাবিরা),

১৭. اَلْجَبَّارَةُ (আল-জব্বারা),

১৮. اَلْجَبَّارَةُ (আল-জব্বারা)। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«لِلْمَدِيْنَةِ عَشَرَةُ أَسْمَاءٍ».

'মদীনার দশটি নাম আছে।'[২]

মদীনাকে এ নামে অভিহিত করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যদি যবর শব্দকে 'পূর্ণ করে দেয়ার' অর্থে নেওয়া যায় তবে এটা স্পষ্ট যে, পবিত্র মদীনা শরীফে ফকীর, গরীব ও ভগ্ন হৃদয়ের লোকদের সব ধরনের অভাব মোচন হয় এবং চাহিদা পূরণ হয়। আর যদি 'প্রভাব এবং প্রাধান্য'-এর অর্থে নেয়া যায়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ এখানে অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা ইসলামের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। এ রিওয়ায়তসহ আরো কয়েকটি রিওয়ায়তে প্রথমোক্ত নাম দু'টির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর জব্বারা অর্থাৎ তাশদীদ যুক্ত উচ্চারণের রিওয়ায়তটি *কিতাবুন নাওয়াহীর* প্রণেতা তাওরাত থেকে উদ্বৃদ্ধ করেছেন।

[২] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯০

১৯. اَلْمَجْبُوْرَةُ (মজবূরা)ও মদীনার অপর নাম। এ নামে অভিহিত হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক রাসূলে খোদা ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এ শহরের অবস্থান করেন।

২০. جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ (জাযীরাতুল আরব) কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে এটাও মদীনার একটি নাম। সম্ভবত

«أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ»

'জাযীরতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।'[১]

এ হাদীসে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আলিমগণ বলেছেন, হাদীসে জাযীরতুল আরবের দ্বারা সমগ্র হিজাযকেই বোঝায়।

২১. اَلْمُحِبَّةُ (আল-মুহিব্বা),

২২. اَلْحَبِيْبَةُ (আল-হাবীবা),

২৩. اَلْمَحْبُوْبَةُ (আল-মাহবূবা)। এ প্রিয় নামগুলোও মদীনার নাম। হাদীসে উল্লেখ আছে,

«اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ».

'আমরা মক্কা মুয়ায্যামাকে যেমন ভালোবাসি তদ্রূপ মদীনার ভালোবাসাও আমাদের অন্তরের মধ্যে ঢেল দিন।'[২]

এ হাদীসটি এ নামগুলোর সমর্থক।

২৪. اَلْحَرَمُ (আল-হারাম),

২৫. حَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ (হারামু রাসূলিল্লাহ)। মুসলিম শরীফের হাদীস বর্ণিত আছে,

«اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ».

'মদীনা শরীফ হারাম।'[৩]

তাবারানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে,

«حَرَمُ إِبْرَاهِيْمَ مَكَّةُ وَحَرَمِي الْمَدِيْنَةُ».

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদীস: ৩১৬৮; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ১৯৮৯; হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৯৯, হাদীস: ৪৬৯ (১৩৭১); হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

'হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর হারাম মক্কা শরীফ এবং আমার হারাম মদীনা শরীফ।'[১]

মদীনা শরীফের হারামের সীমানা নির্ধারণ এবং এর মর্যাদা সম্পর্কিত আহকামের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতাক্যে রয়েছে। এর বর্ণনা পরে দেওয়া হবে।

২৬. اَلْحَسْنَاءُ (আল-হাসনা)। অধিক সংখ্যক বাগান, পানির ঝর্ণা, প্রশস্ত মাঠ, বহু সংখ্যক গম্বুজ, দালান এবং উঁচু উঁচু পাহাড় মদীনা তাইয়িবাকে অপরূপ শোভায় সুশোভিত করায় এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া মদীনার সমুদয় সর্বোপরি পয়গম্বরের সরদার হুযূর আকরম ﷺ; যিনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মাহবুব এবং সমস্ত নেককার ও বুযুর্গানে দীনের মকসুদ, তিনি এখানেই অবস্থানরত আছেন, আর বুযুর্গি এবং বরকত বিশিষ্ট তাঁর আওলাদ, আসহাব এবং অনুসারীবৃন্দের এখানে অবস্থানের কারণেও এ নামে অভিহিত করা যথাযথ হয়েছে। বর্ণিত আছে,

«عَرَفَ مَنْ ذَاقَ، وَوَجَدَ مَنْ عَرَفَ».

'যে ব্যক্তি মুহাব্বতের স্বাদ গ্রহণ করেছে সে বন্ধুর পরিচয় লাভ করেছে। আর যে পরিচয় পেয়েছে, সে কৃতকার্য হয়েছে।'

وَمِنْ مَذْهَبِيْ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا
وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ

'যতক্ষণ তুমি মুহাব্বতের শরাবের স্বাদ গ্রহণ করবে না, ততক্ষণ তুমি এ শরাবের তৃপ্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবে ন।'

আল্লাহর শপথ রূহানি আনন্দ এবং খুশি যা মুহাব্বতের দ্বারা লাভ করা যায়, তা বাদ দিলেও প্রকৃত সৌন্দর্য ও শোভা যা এ নগরীতে দৃষ্টিগোচর হয় তা অপর কোন নগরীতে দৃষ্টিগোচর হয় না বা শুনাও যায়নি। অবশ্য কোন কোন স্থানে যে কিছু কিছু এ নূরের ঝলক পাওয়া যায়, তাও এ নগরীরই বরকত। যেমন, দিল্লী ইত্যাদি। কেননা এ মহান দরবারের বিশিষ্ট খাদিম ও গোলামগণ সেখানে শায়িত আছেন।

بر کجا نوریست تابان کمال ظاہر است
اصل آں از افتاب این جمال افتادہ است

[১] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৬৬০৭; (খ) আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৮৮

'যে কোন স্থানে কোন নুরের ঝলক দীপ্তিমান, তা নুরে মুহাম্মদী ﷺ-এর সৌন্দর্যের সূর্য থেকেই বিচ্ছুরিত।'

২৭. اَلْخَيْرَةُ (আল-খাইয়ারা) তশদীদের সাথে,

২৮. اَلْخَيْرَةُ (আল-খায়রা) যবরের সাথে। এ নামে অভিহিত হওয়ার কারণ এই যে, মদীনা শরীফ দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ কেন্দ্র। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

«اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ».

'মদীনায় অবস্থান তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা একথাটি বুঝতে পারত।'[১]

এ হাদীসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ জয় করবেন এবং হয়তো এখানকার লোকেরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য সেসব দেশে চলে যাবেন। এজন্যই তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মদীনায় অবস্থানই তাদের জন্য বেশি কল্যাণকর।

২৯. دَارُ الْاَبْرَارِ (দারুল আবরার),

৩০. دَارُ الْاَخْيَارِ (দারুল আখয়ার),

৩১. دَارُ الْاِيْمَانِ (দারুল ঈমান),

৩২. دَارُ السُّنَّةِ (দারুস সুন্নাহ),

৩৩. دَارُ السَّلَامِ (দারুস সালাম),

৩৪. دَارُ الْفَتْحِ (দারুল ফাতহা),

৩৫. دَارُ الْهِجْرَةِ (দারুল হিজরত),

৩৬. قُبَّةُ الْاِسْلَامِ (কুব্বাতুল ইসলাম); উল্লিখিত নামগুলোও মদীনা শরীফের বিশেষ উপাধি। আল্লাহ তা'আলা এ নগরীর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করুক।

৩৭. اَلشَّافِيَةُ (আশ-শাফিয়া)। এটিও এ মহানগরীর একটি উপাধি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

'মদীনার মাটি সর্বরোগের জন্য শিফা।'[২]

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৯২, হাদীস: ৪৫৯ (১৩৬৩); হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত

[২] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৮৯

فُرَابُهَا شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

এমনকি এখানকার ফলমূল ভক্ষণের দ্বারা কুষ্ঠ ও শ্বেত কুষ্ঠের মতো দূরারোগ্য রোগ পর্যন্ত সেরে যায় বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

আসমাউল মদীনা নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন যুগের কোন আলিম বলেছেন যে, মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ ফলদায়ক। যে কোন লোক যদি মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়, তবে তার আভ্যন্তরীণ রোগ এবং গুনাহ বিদূরিত হয়।

৩৮. اَلْعَاصِمَةُ (আল-আসিমা)। মদীনার শহরের এটি আরেকটি নাম। কেননা মুহাজিরগণ এখানে আগমনের ফলে মুশফিকদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। বরং যে সব ব্যক্তিবর্গ এখানে অবস্থান করেন অথবা এখানে আগমনের ইচ্ছা করেন, ওইসব লোক সমুদয় আপদ-বিপদ থেকে রেহাই পায়।

৩৯. اَلْمَعْصُوْمَةُ (আল-মা'সূমা) নামেও মদীনাকে অভিহিত করা যায়। কেননা প্রাচীনকালে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সৈন্যগণ অহংকারী এবং জালিমদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। আর হুযূর ﷺ-এর বদৌলতে এ নগরী দাজ্জাল এবং মহামারী রোগ থেকে হিফাযতে রয়েছে এবং থাকবে। اَلْعَاصِمَةُ (আল-আসিমা) অর্থাৎ নিরাপত্তা দানকারী শব্দটিকে اَلْمَعْصُوْمَةُ (আল-মা'সূমা) অর্থাৎ নিরাপদ অর্থেও নেয়া যেতে পারে।

৪০. اَلْغَلَبَةُ (আল-গলবা) এটিও একটি প্রাচীন নাম। জাহেলী যুগেও এ নাম প্রসিদ্ধ ছিল, যেমন– ছিল ইয়াসরিব। কেননা যে কেউ এখানে আগমন করেছে, সে প্রভাবশালী এবং বিখ্যাত হয়ে ওঠেছে। যেমন– ইহুদিগণ আমালিকা নামক বিখ্যাত জাতির ওপর; আওস, খযরজ ও আনসার গোত্র ইহুদিদের ওপর; মুহাজিরগণ আওস ও খযরজ গোত্রের ওপর এবং আজমীগণ মুহাজিরদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

৪১. اَلْفَاضِحَةُ (ফাযিহা), কেননা যে কোন অসৎ প্রকৃতির লোক এখানে আসে তা গোপন থাকেনা। তার আসল স্বভাব ও প্রকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে সে লাঞ্ছিত ও বেইজ্জত হয়।

৪২. اَلْمُؤْمِنَةُ (আল-মুমিনা), এ নগরীর অপর একটি নাম। এ নামে অভিহিত হওয়ার হেতু এই যে, এখানে ঈমানদারগণ শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেছেন। আর এখান থেকেই ঈমান, ইসলামের আহকাম জারি হয়েছে অথবা এই অর্থে যে, বরকত, পারস্পরিক মায়া-মমতা ও ফকিরের মতো জীবন-যাপন যা মুমিনের নিদর্শন, এ মদীনাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

আর বাস্তব ক্ষেত্রে মদীনা মুমিন হওয়ার অর্থেও নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মদীনা শরীফ হযরত ﷺ-এর ওপর ঈমান এনেছে। এ জন্যেই মদীনার অপর নাম মুমিনা। যেমন পাথর খণ্ড তাঁর হাতে তসবীহ পাঠ করেছে, পাথর কথা বলেছে, উহুদ পাহাড় তাঁকে মহব্বত করছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّ تُرْبَتَهَا لَمُؤْمِنَةٌ».

'যে মহান সত্তার কুদরতের হস্তে আমার প্রাণ, তাঁরই শপথ, নিশ্চয় মদীনার মাটি মুমিন।'[১]

অপর এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,
'তাওরাতের মধ্যে মদীনার নাম মুমিনা।'[২]

৪৩. اَلْمُبَارَكَةُ (আল-মুবারাকাবা)। সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা এবং সেখানকার সব বস্তু এমনকি (সা) ও (মুদ দ্বারা মাপ এবং ওজন দেওয়া হয়)-এর জন্যও বরকতের দু'আ করেছেন এবং বলেছেন, 'হে খোদা! আপনি মক্কা মুয়াযযামায় যত বরকত দান করেছেন, এর চেয়ে অধিক বরকত মদীনায় দান করুন।'[৩]

তাঁর এ দু'আর বরকত সুস্পষ্ট। যে স্বচক্ষে তা দেখতে চান, সেখানে গমন করে দেখতে পারেন।

৪৪. اَلْمَحْبُوْرَةُ (আল-মাহবূরা), এটি حِبْرٌ (হিব্রুন) থেকে নির্গত। যার অর্থ খুশি, অথবা حِبْرَةٌ (হিব্রা) থেকে নির্গত, যার অর্থ নিয়ামত। مِحْبَارٌ (মিহবার) সেই জমিনকে বলা হয়, যাতে উর্বর শক্তি খুব বেশি এবং সব কিছু দ্রুত গজিয়ে ওঠে। মদীনা শরীফের মধ্যে এসবই বিদ্যমান। সুতরাং এ নাম যুক্তিসংগত।

৪৫. اَلْمَحْرُوْسَةُ (আল-মাহরূসা),

---

[১] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯১

[২] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯১

«إِنَّهَا لَمَكْتُوْبَةٌ فِي التَّوْرَاةِ مُؤْمِنَةٌ».

[৩] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৭১৮, হাদীস: ৩৯১৪; হযরত আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«اللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ دَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَيْ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ».

৪৬. اَلْمَحْفُوْظَةُ (আল-মাহফূযা),

৪৭. اَلْمَحْفُوْفَةُ (আল-মাহফূফা)। উল্লিখিত কোন নামের বর্ণানা থেকে এ নামসমূহের কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

'মদীনা শরীফের প্রত্যেক দুই গলির মাঝখানে এক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা এ নগরীকে হিফাজত করেন।'[১]

৪৮. اَلْمَرْحُوْمَةُ (আল-মরহূমা),

৪৯. اَلْمَرْزُوْقَةُ (আল-মরযূকা), মদীনা শরীফকে এ দু'নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, এখানে রহমাতুল্লিল আলামীন আগমন করেছেন এবং অবস্থানরত আছেন। এটি আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিলের স্থান। আর এ নগরীর বদৌলতে সারা বিশ্ব যাহিরী এবং বাতিনী রিযক লাভ করে থাকে।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযক দেবেন।'[২]

৫০. اَلْمِسْكِيْنَةُ (আল-মিসকীনা), মুমিনা শব্দের বর্ণনায় এ নামে অভিহিত হওয়ার হেতু বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলা رضي الله عنه বলেছেন,

«يَا طَيْبَةُ! يَا طَابَةُ! يَا مِسْكِيْنَةُ! لَا تَقْبَلِي الْكُنُوْزَ».

'হে তাইয়িবা! হে তাবা! হে মিসকীনা! তুমি ধন-সম্পদকে গ্রহণ করো না।'[৩]

বরং সর্বদা নিজের দরিদ্রতার ওপর কায়েম থেক। বস্তুত এ সম্বোধন মদীনাবাসীদেরকে করা হয়েছে, যাতে তারা সর্বদা দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করেন এবং বিত্তবান দুনিয়াদার লোকদের প্রতি ঝুঁকে না পড়েন।

«اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ
أَغْنِنِيْ فِيْ أَهْلِ بَلَدَةِ حَبِيْبِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

---

[১] আল-মুফাযযল আল-জুনদী, *ফাযায়িলুল মদীনা*, পৃ. ২৩, হাদীস: ১৩; হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه ও হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«اَلْمَدِيْنَةُ مُشَبَّكَةٌ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكٌ يَحْرُسُهَا».

[২] আল-কুরআন, *সূরা আত-তালাক*, ৬৫:৩

[৩] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩; হযরত কা'বুল আহবার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন রূপে জীবিত রাখুন এবং মিসকীন রূপে মৃত্যুদান করুন। আর মিসকীনদের সাথে আমার হাশর করুন। অর্থাৎ আপনার হাবীবের শহরে বসবাসকারীদের সাথে আমার হাশর করুন। আমীন।'[১]

৫১. اَلْمُسْلِمَةُ (আল-মুসলিমা), এটি মুমিনার মতোই। কেননা ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঈমানের ক্ষেত্রে আন্তরিক বিশ্বাসের গুরুত্ব সর্বাধিক, আর ইসলামের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি এবং আমালের গুরুত্ব সর্বাধিক। এছাড়া মুমিনা ও মুসলিমা শব্দ দুটি আমান এবং সালামাত থেকে নির্গত হওয়ার কারণে এ নামে অভিহিত হওয়া যুক্তিসংগত হয়েছে।

৫২. اَلْمُطْيَبَةُ (আল-মুতাইয়্যাবা),

৫৩. اَلْمُقَدَّسَةُ (আল-মুকাদ্দাসা) বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে মদীনা শরীফ পাক আর পবিত্র বিধায় এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫৪. اَلْمُقَرُّ (আল-মুকার্‌রু); হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا، وَّرِزْقًا حَسَنًا».

'হে আল্লাহ! আমাদের শান্তি দান করুন, যাতে (আমরা এখানে সুখে বসবাস করতে পারি এবং ভালো রিযক দান করুন।'[২]

৫৫. اَلْمَكِيْنَةُ (আল-মাকনীয়া), আল্লাহ তা'আলার নিকট মদীনা শরীফ সম্মানিত ও মর্যাদশীল হওয়ার কারণে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫৬. اَلنَّاجِيَةُ (আন-নাজিয়া), হয়তো এটি نَجَاةٌ (নাজাত) থেকে নির্গত অর্থাৎ মুক্তিদাতা অথবা نَاجَاةٌ (নাজাহ) অর্থাৎ সন্তুষ্ট করা থেকে বর্ণিত অথবা نَجْوَةٌ (নাজূহন) অর্থাৎ উচ্চ স্থান থেকে নির্গত। এসব নামে অভিহিত করার কারণ সুস্পষ্ট।

৫৭. اَلْمَدِيْنَةُ (আল-মদীনা); এ পবিত্র নগরীর নামসমূহের মধ্যে এ নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। মদীনার আভিধানিক অর্থ হল, কতগুলো একত্রিত ঘর। ঘন বসতি। দালানের আধিক্য হেতু এটি (গ্রাম) অতিক্রম করে নগরের পর্যায়ে পৌছে যাওয়ায় একে মদীনা বলা হয়। লোক বসতির মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্তর হল (গ্রাম), আর সবচেয়ে উঁচু স্তর হল (মিসর)। আর قَرْيَةٌ

[১] আত-তিরমিযী, *জাল-জামি'উস কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৫৭৭, হাদীস: ২৩৫২; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

[২] আল-মাহামিলী, *জাদ-দু'জা*, পৃ. ১২২-১২৩, হাদীস: ৮৮; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

(কারইয়া) এবং مِصْرٌ (মিসর)-এর মাঝখানের স্তর হল মদীনা এবং بَلَدٌ (বালাদ)। আবার কেউ কেউ মদীনা এবং মিসর একই পর্যায়ভূক্ত বলে মন্তব্য করেছেন। এটা আভিধানিক বর্ণনা। কিন্তু এখন মদীনা বলতে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরকেই বোঝায়, যদিও শুধু মদীনা বললে যে কোন শহরই হতে পারে। আরবদের ব্যবহার অনুসারে একেই আলিফ লামের সাথে আল-মদীনা বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কোন নগরীর দিকে সম্পর্কিত করা হয়, তবে বলা হয় مَدِيْنِيٌّ (মাদীনী-শহরে) আর যদি মদীনাতুর রাসূলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়, তবে বলা হয় মাদানী। এ পবিত্র শব্দটিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। তাওরাত কিতাবেও এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫৮. سَيِّدُ الْبُلْدَانِ (সাইয়িদুল বুলদান), হযরত উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

«يَا طَيْبَةُ! يَا سَيِّدَ الْبُلْدَانِ!».

'ইয়া তাইয়িবা ইয়া সাইয়িদাল বুলদান।'

মদীনা শরীফের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে এ নামের ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ) সমস্ত মুসলিমদের কাছে গ্রহনযোগ্য মুহাদ্দিস। তার মুখের কথাই আমাদের জন্য দলিল কারন তার জ্ঞান কুরআন ও হাদিস বহির্ভূত নয়ঃ-

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে মদীনা শরীফের ফযীলতের বর্ণনা

উল্লেখ্য যে, সব উলামায়ে কিরাম ও উম্মতে মুহাম্মদিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এ বিষয়ে একমত যে, মক্কা মুয়াযযমা এবং মদীনা মুনাওয়ারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং শহর থেকে অধিকতর সম্মানিত এবং মর্যাদাশীল। অবশ্য এ দু'টির মধ্যে কোনটি বেশি ফযীলত বিশিষ্ট এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মাটির যে অংশটুকু হুযূর আকরম ﷺ-এর দেহ মুবারকের সাথে সংশ্লিষ্ট তা জমিনের সমগ্র অংশ থেকে উত্তম মর্যাদাশীল। এমনকি কাবা শরীফ থেকেও।

কোন কোন আলিম বলেন, মাটির উক্ত অংশটুকু সমস্ত আসমান থেকে বরং আরশ আযীম থেকেও শ্রেষ্ঠ। যদিও আলেমদের লিখিত কিতাবসমূহে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা মিলে না। কিন্তু কারো কাছে যদি একথা বর্ণনা করা যায়, তবে এটি অস্বীকার করারও কোন কারণ নেই। কেননা সমস্ত আসমান-জমিন, হযরত ﷺ-এর পদধূলিতে ধন্য হয়েছে, বরং যদি এ কারণে সমস্ত ভূখণ্ডকে আসমানের ওপর মর্যাদা দেওয়া হয় যে, এ জমিনে তাঁর কবর শরীফ বিদ্যমান, তবে অত্যুক্তি হবে না। এ কারণে আলিমদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে যে, আসমানের মর্যাদা অধিক, না পৃথিবীর। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, অধিকাংশ আলিমগণ জমিনের ওপর আসমানকে ফযীলত দেন অর্থাৎ তাদের মতে, আসমানের ফযীলত জমিন থেকে বেশি।

আবার কেউ কেউ, জমিন-আসমান থেকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা এ জমিনেই আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম বসবাস করেছেন এবং এখানেই দাফন হয়েছেন। আলিমগণ এর উত্তরে বলেন, জমিন যদি তাঁদের বসবাস ও দাফনের স্থান হয়ে থাকে, তবে আসমান তাঁদের পবিত্র রূহ মুবারক অবস্থানের স্থান। কিন্তু পয়গম্বরগণ কবরে জীবিত থাকার প্রমাণ সাপেক্ষে তাঁদের এ যুক্তি খাটে না। কেননা এ অবস্থায় জমিনে যেমন তাঁদের দেহ রক্ষিত থাকবে, তেমনি তাঁদের রূহ মুবারকও সেখানে রক্ষিত থাকবে।

সারকথা এই যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর দেহ মুবারকের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ড আসমান-জমিনের সব স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হওয়ার পর শুধু মতভেদ এতেই থেকে যায় যে, কবর শরীফকে বাদ দিয়ে কি মদীনা থেকে মক্কার ফযীলত অধিক, না মক্কা থেকে মদীনার ফযীলত অধিক?

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মদীনার অধিকাংশ

আলিমদের মতে, মদীনা শরীফের মর্যাদা মক্কা শরীফ থেকে অধিক, তবে মদীনার আলিমগণ যদিও তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন, কিন্তু তারা বলেন যে, তবে এটি কাবা শরীফ ব্যতীত। সারকথা এই যে, হযরত ﷺ-এর কবর শরীফের সমুদয় স্থান, এমনকি মক্কা শরীফ ও কাবা শরীফ থেকেও অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আর কাবা শরীফ মদীনা নগরী থেকে শ্রেষ্ঠ। বাকী অবশিষ্ট মক্কা অবশিষ্ট মদীনা থেকে শ্রেষ্ঠ, না অবশিষ্ট মদীনা অবশিষ্ট মক্কা থেকে শ্রেষ্ঠ? অবশ্য এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে মদীনা শরীফের ফযীলত ও মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এ থেকে মদীনার শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়।

উল্লেখ্য যে, মদীনা শরীফের ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এই যে, সাইয়িদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ মদীনা মুনাওয়ারাকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবেসেছেন। আর তিনি এখানেই অবস্থান করেছেন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত সমুদয় বিজয় এখানে অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকৃত সমস্ত (কামালাত) বুযুর্গি ও উচ্চ মর্যাদা তিনি এখানেই লাভ করেছেন। এখানেই ইসলাম শক্তিশালী এবং দীনের ভিত রচিত হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ববিধ নেকি এবং কল্যাণ এখান থেকেই নির্গত হয়েছে। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমুদয় বুযুর্গির এটি প্রাণ কেন্দ্র।

মদীনা শরীফের ফযীলতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফযীলত হলো, ১৮ হাজার মাখলুকাতের সার, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র কবর শরীফ এ নগরীতেই অবস্থিত। এটি এমন এক ফযীলত যার সাথে অপর কোন ফযীলতের তুলনা হয় না। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের কোন নিয়ামতই এ মহান নিয়ামতের সমকক্ষ হতে পারে না। কেননা ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অপর কোন আমলই এ মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহামানবের পবিত্র কবর শরীফ যিয়ারতের চেয়ে অধিক কল্যাণকর নয়। বিভিন্ন সনদে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'প্রত্যেক মানুষ সেই মাটি দ্বারাই সৃষ্ট, যে মাটিতে তাকে দাফন করা হয়।'[১]

এই হাদীসের দ্বারা নিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় যে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে মদীনা শরীফের মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবে তাঁর অধিকাংশ আওলাদ, আসহাব এবং তাবিয়ীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম-

[১] আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫১৫, হাদীস: ৬৫৩১

عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا»

কে এখানেই দাফন করা হয়েছে, তারাও এখানকার মাটির দ্বারা সৃষ্টি। এটা কি কম ফযীলতের কথা! মদীনা শরীফের ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট।

মক্কা মুয়াযযামার ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে এক রাকা'আত নামায আদায় করলে অন্য স্থানের ১ লাখ রাকা'আত নামাযের সওয়াব হাসিল হয়, আর মদীনা শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তাঁরা এর উত্তরে বলেন যে, কোন এক স্থানে ইবাদতের দ্বারা বেশি সওয়াব অর্জিত হলে, তা সর্বাধিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা হতে পারে যে, এটি সেই স্থানের একটি বিশেষত্ব। সুতরাং বলা যায়, এটি যেমন মক্কা শরীফের বিশেষত্ব, তেমনি ইসলামের তরক্কী, উন্নতি, জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন এবং বিভিন্ন ধরনের বুযুর্গি, বরকত আর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুদান লাভ মদীনার বিশেষত্ব। একথার সমর্থনে তাঁরা বলেন, হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে এবং কুরবানীর দিন মিনাতে যে যুহরের নামায আদায় করা হয়, তা মসজিদে হারামের নামায থেকে উত্তম।

তা সত্ত্বেও উক্ত স্থানদ্বয় হারাম শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয় না। নবী ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণের বরকতেই এ স্থানসমূহ এত অধিক সওয়াব হাসিলের কারণ। তা ছাড়া একথাও হতে পারে যে, কোন আমালের সংখ্যা এবং পরিমাণের দিক দিয়ে কম হলেও কিন্তু বরকত এবং মূল্যবান হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক হতে পারে। এতে সকলেই একমত যে, কাবা শরীফের অন্দর বাইরের হারাম শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ।

যদি সওয়াব বেশি হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হতো; তবে কাবা শরীফের ভেতরে নামায পড়লে অধিক সওয়াব লাভ হতো। অথচ অধিক সওয়াব লাভ হওয়া তো দূরের কথা, সেখানে নামায পড়া জায়েয কিনা এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। হযরত ইমাম মালিক رحمه الله-এর মতে এখানে নামায পড়াও জায়েয নেই। এতেই বোঝা যায়, অধিক সওয়াব হওয়াটা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। তবে এটা হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমল কবুল হওয়ার এটি একটি লক্ষণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, রাসূলে মকবুল ﷺ-এর কবর শরীফ রহমত ও বরকতের স্থানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং এ স্থানের বরকতের আমল এভাবে কবুল হতে পারে, যা অনেক আমলের দ্বারা লাভ করা যায় না। তা ছাড়া এখানে একথাও বেশি প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ﷺ যখন সশরীরে এ স্থানে জীবিত এবং আল্লাহর বন্দেগিতে নিয়োজিত রয়েছেন এবং এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সমগ্র লোকদের থেকে তাঁর আমলই উৎকৃষ্ট, আর তিনি উম্মতের জন্য শাফাআত এবং মাগফিরাত কামনা করেন, তখন মক্কায় অধিক সওয়াব লাভ করার ফায়দা থেকে মদীনা শরীফের প্রতিবেশী হয়ে থাকাতে তাদের ফায়দা বেশি হবে।

মক্কার শ্রেষ্ঠত্ব ঃ-

দ্বিতীয় দলীল: মক্কা শরীফের ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ একথাও বলা হয় যে, মক্কা শরীফ হজ্জ ও উমরা আদায়ের স্থান। আর হজ্জ ও উমরার ফযীলত এবং সওয়াব সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান।

এ দলীলের উত্তর এই যে, বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মদীনায় গমনকারীদের জন্য এমন এক নিয়ামত রেখে দিয়েছেন, যা দ্বারা হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ করা যেতে পারে। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে,

'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে দু'রাকা'আত নামায আদায়ের জন্য মসজিদে কুবার ইরাদা করবেন, তিনি উমরা আদায়ের সওয়াব পাবেন।'

ভেবে দেখার বিষয় যে, দিন-রাতে মদীনা শরীফে কত নামাযই পড়তে পারা যায়, আর মক্কা শরীফে তো বছর পূর্ণ না হলে হজ্জ করতে পারা যায় না।

তৃতীয় দলীল: মক্কা শরীফের ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এ দলীলও পেশ করা যায় যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«مَكَّةُ خَيْرُ بِلَادِ اللهِ».

'মক্কা শরীফ আল্লাহর শহরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[১]

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

«أَحَبُّ أَرْضِ اللهِ».

'মক্কা আল্লাহর জমিনের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় স্থান।'[২]

তা ছাড়া রাসূলে খোদা ﷺ এ মক্কা ভূমিতেই জন্ম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কার জাহূন নামক স্থানে দাঁড়িয়ে মক্কা শরীফকে সম্বোধন করে বলেছেন,

'হে সম্মানিত মক্কা! আমার নিকট তুমি সমুদয় শহর অপেক্ষা প্রিয়। যদি তোমার বাসিন্দাগণ আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, তবে আমি এখান থেকে বের হয়ে যেতাম না।'

এসব বর্ণনা থেকে মক্কা শরীফের ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়. এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মক্কাই অধিকতর প্রিয় বলে বোঝা যায় বটে কিন্তু উল্লিখিত দলীলের উত্তরে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মদীনার ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে একথা বলেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় গমন করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (এমন কি ইন্তিকালের পরও) সেখানে তিনি অবস্থান করেন, আর সেখানেই দীনের প্রচার ও প্রসার ঘটে, বিভিন্ন প্রকারের বরকত হাসিল হয় এবং ইসলামের বিজয় লাভ ও

---

[১] আল-কাসতাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৩, পৃ. ৬১৩

[২] আল-কাসতাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৩, পৃ. ৬১৩

কল্যাণসমূহ প্রকাশ পায়, তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মদীনা মুনাওয়ারাই সমস্ত শহর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদার অধিকারী। এ কারণে নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফ থেকে মদীনার অধিকতর বরকত এবং এর অধিকতর মুহাব্বত প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। এসব হাদীসে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে এখন আমরা সেসব বর্ণনার প্রয়াস পাচ্ছি,

১. বুখারী শরীফে এসেছে,

«اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ».

'হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে মদীনার ভালোবাসা দান করুন, যেমন আমরা মক্কাকে ভালোবাসি এবং তার চাইতেও বেশি।'[১]

২. তাবারানী *মু'জমে কবীরে* হযরত রাফি ইবনে খদীজ رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি,

«اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مَّكَّةَ».

'মদীনা মক্কা থেকে শ্রেষ্ঠ।'[২]

৩. হযরত ইমাম মালিক رحمه الله *মুআত্তায়* রিওয়ায়ত করেছেন যে,

হযরত উমর رضي الله عنه হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আইয়্যাশ আল-মখযুমী رحمه الله-কে বললেন, তুমি কি মক্কাকে মদীনা থেকে উত্তম মনে কর? তিনি উত্তর দিলেন, মক্কা শরীফ আল্লাহ তা'আলার হারাম এবং নিরাপত্তার স্থান এবং সেখানে আল্লাহর ঘর বিদ্যমান। হযরত উমর رضي الله عنه বললেন, আমি আল্লাহর হারাম এবং ঘর সম্পর্কে কিছু বলছি না। অতঃপর তিনি পুনর্বার বললেন, তুমি কি মক্কাকে মদীনা থেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর? তিনি পুনর্বার বললেন, মক্কা শরীফে আল্লাহর হারাম ও তাঁর ঘর বিদ্যমান। হযরত উমর رضي الله عنه বললেন, আমি আল্লাহর হারাম এবং তাঁর ঘর সম্পর্কে কোন কথা বলছি না। কয়েক দফা একথা বলার পর তিনি চলে গেলেন।[৩]

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ১৯৮৯; হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[২] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ২৮৮, হাদীস: ৪৪৫০

[৩] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ২, পৃ. ৬৪, হাদীস: ১৮৬৬

فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ»؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ»، قَالَ فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلَا فِي بَيْتِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ انْصَرَفَ.

মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রায় প্রদান :-

হযরত উমর رضي الله عنه-এর একথা থেকে সুস্পষ্ট যে, মদীনা মক্কা থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে কাবা শরীফ ব্যতীত। হাকিম তাঁর মুসতদরক নামক কিতাব রিওয়ায়ত করেছেন যে,

«اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِيْ مِنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ، فَأَسْكِنِّيْ فِيْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ».

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় স্থান থেকে বাইরে নিয়ে এসেছেন, অতএব আপনি আমাকে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় স্থানে বসবাস করান।'[১]

হযরত ﷺ-এর এ দু'আ কবুল হওয়ার ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মদীনা শরীফই সবচেয়ে প্রিয়তম স্থানে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর তিনি সেখানে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাননি, বরং মদীনাতেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যদি কেউ বলে যে, মদীনায় তাঁর বসবাস, আল্লাহর নির্দেশে হিজরত ফরয হওয়ার কারণে হয়েছে, মদীনার ফযীলতের কারণে নয়। একথার উত্তর এই যে, মদীনায় হযরত ﷺ-এর বসবাসের ভিত্তিতেই এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এর থেকে বোঝা যায় যে, মদীনা শরীফ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তম স্থান।

إِذَا الْحَبِيْبُ لَا يَخْتَارُ لِنَبِيِّهِ إِلَّا مَا هُوَ أَحَبُّ وَأَكْرَمُ عِنْدَهُ.

'কেননা বন্ধু তাঁর বন্ধুর জন্য কেবল সেই স্থানকেই নির্বাচিত করে, যা তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম ও সম্মানিত।'

[এখন এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رحمه الله তাঁর মূল্যবান নসীহত এবং উপদেশ দান করেন], মক্কা ও মদীনার ফযীলতের ব্যাপারে আলিমদের উল্লিখিত বিতর্ক ও আলোচনার প্রতি লক্ষ রেখ এবং আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বতের তরীকার ওপর স্থিতিশীল হয়ে থেক। আর একথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর যে, মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ জাল্লা শানহুর পরে সব দিক দিয়ে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর বিশ্বনবী সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরই স্থান এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ব্যতীত আর যা কিছু আছে মক্কা শরীফ হোক বা মদীনা শরীফ হোক অথবা অপর কিছু হোক এগুলোর মধ্যে ফযীলত সমান নয়। তবে ফযীলত কম বেশি

[১] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪, হাদীস: ৪২৬১; হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, «اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِيْ مِنْ أَحَبِّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، فَأَسْكِنِّيْ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ»

হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত ﷺ-এর সাথে সম্পর্কই হবে সব কিছুর মাপকাঠি। তাঁর সাথে যার যত বেশি সম্পর্ক স্থাপিত হবে, তার তত বেশি ফযীলত বাড়বে মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর যৌবনকাল সেখানে অতিবাহিত করেছেন এবং সেখানে তিনি নবুয়ত লাভ করেছেন। আর হিজরতের পরে তিনি মদীনা শরীফে অবস্থান করেছেন। সেখানে তিনি দীন-ইসলাম জারী করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসাকে অন্তরে স্থান দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়। মক্কা শরীফের মধ্যে তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে জালালী অবলোকন কর এবং মদীনা শরীফে তাঁর ইসলামের বরকত এবং মাহাত্ম্য আর প্রচার এবং প্রসারের মুজিযা দেখ। প্রত্যেক স্থানেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের মুশাহাদা এবং নূরে মুহাম্মদী ﷺ-এর ঝলক অন্তর দৃষ্টিতে অবলোকন কর।

حیف ست جامی چون تو نگای چشم من

در دل نشین کہ منزل خاص از برای است

'হে মুসলমান! কান লাগিয়ে শ্রবণ কর, এখন আমি আল্লাহর প্রিয় হাবীব ﷺ এবং তাঁর প্রিয়দেশ মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত এবং প্রশংসার উল্লেখ করছি।' (6)

ے در ہیچ ذرہ نیست کہ نور محمدیؐ ☆ از طلعت وجود اضافے نہ طالع است

'সৃষ্টি জগতের এমন কোন কণা নেই? যার মধ্যে নূরে মুহাম্মদী ﷺ-এর ঝলক পড়েনি।' (1)

ے دریائے فیض جود الٰہی وجود اوست ☆ انہار کائنات بوے جملہ راجع است

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি এবং বখশিসের সাগর। সৃষ্টি জগতের সমস্ত নদ-নদি এ সাগরের দিকেই প্রবাহিত।' (1·1)

ے نہ سپہر طاہر از انفاس فیض اوست ☆ این نکتہ پیش اہل نظر امر واقع ست

'তাঁর নিঃশ্বাসের ফয়েযের বরকতেই নয় আসমান পবিত্র হয়েছে। দার্শনিকদের নিকটও এ রহস্য বাস্তব।' (1·2)

ے فرد الوائے حمد بدست محمدؐ ست ☆ متبع اوست وجملہ جہانش تابع ست

'কাল হাশরের ময়দানে (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা পতাকা) মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতেই থাকবে। তিনি অনুসরণীয় আদর্শ মানব, আর সমস্ত বিশ্বজগত তাঁর অনুসারী।' (1·3)

ے بیاتا در مدینہ نور احمدؐ ☆ بہ بینی از در دیوار لامع

'এসো যাতে তুমি মদীনার অলিতে-গলিতে এবং প্রাচীরে আহমদে মুজতবা ﷺ-এর নূর দেখতে পাও।' (2)

ے جمال مصطفےٰ بی پردہ بینی ☆ چو خورشیدی کہ بی ابر ست طالع

'এখানে তুমি আড়াল ছাড়াই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যেমন মেঘবিহীন সূর্য উদিত হয়েছে।' (3)

ے بیا ای کور چشم تیر باطن ☆ بہ بین ہر گوشہ صد برہان ساطع

'ওহে দৃষ্টি শক্তিহীন ও অন্তরান্ধ! অবলোকন কর, এখানে শত শত অকাট্য প্রমাণ যে উজ্জ্বল।' (4)

ے بر دق شبہ سوز انجا لواتح ☆ بدور دین فروز آنجا سواطع

'সন্দেহ নিরসনকারী বিদ্যুত এখানে চমকিত, আর দীনকে আলো দানকারী চন্দ্র এখানে উদীয়মান।' (5)

ے نجوم اہتدا آنجا فروزان ☆ شموس اصطفا آنجا طوالع

'এখানে হিদায়তের নক্ষত্রসমূহ ঝলমল করে এং আল্লাহ তা'আলার মকবুল এবং নির্বাচিত বান্দাগণ সূর্যের মতো এখানে উদ্ভাসিত।' (6)

ے چو از ناری کجا نور بینی ☆ بود ہر کس باصل خویش راجع

'তোমার প্রকৃতিতে যখন আগুন, তুমি নূর কোথায় দেখতে পাবে? কেননা প্রত্যেক মানুষ তার আসল ফিতরাতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।' (7)

ے چرا باخویش دشمن کشتہ تو ☆ چہ خودرا می زنی بر سیف قاطع

'হে অন্ধ! কেন তুমি নিজের শত্রু হলে? কেন তুমি নিজেকে ধারাল তরবারীর ওপর নিক্ষেপ করলে'? (8)

ے ولیکن کئی توانی دید این نور ☆ چہ نور فطرت گردید ضائع

'কিন্তু তুমি সেই নূর কিরূপে দেখতে পাবে? খোদা প্রদত্ত তোমার আসল নূর তো নষ্ট হয়ে গেছে।' (9)

ـ نصیحت کرد مت دیگر تو دانی ☆ فَإِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ وَاقِعٌ

'আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করলাম, বাকী তোমার ইচ্ছা! কেননা দীন তো আল্লাহর নিকটে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়তম দেশের কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ কর। আলেমদের মতামতও জেনে নাও এবং প্রেমিকদের তরীকাও হাতছাড়া কর না।' (10)

ع جانب عشق عزیز است مگزارش۔

'মুহাব্বতের তরীকা খুবই প্রিয়, এ তরীকা ছেড়ে দিয়ো না।' (11)

وَمِنْ مَذْهَبِيْ حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا

وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ

'বন্ধুর যে কোন কথাই বলা হোক না কেন, তা মধুর।' (12)

ع از برچہ میرود سخن دوست خوشترست۔

অনুচ্ছেদ-১

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খোদাওন্দ করীম আঁ হযরত ﷺ-কে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা তাইয়্যিবায় হিজরত করায় সেখানে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আলাহ তা'আলা স্বীয় জাহিরী-বাতিনী কমালাত এবং বুযুর্গি যা আপন হাবীবকে প্রদান করার ছিল, সেসব এ পুণ্যভূমিতেই প্রকাশ করেছেন। আর মদীনা শরীফকেই সকল বিজয় এবং বরকতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। আর আলাহ তা'আলা মদীনা পাকের পূত-পবিত্র মাটিকে স্বীয় হাবীব ﷺ-এর পবিত্র দেহ মুবারকের জন্য সদফ তথা খোলস বানিয়েছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত এ পবিত্র ভূমি হুযূর পাক ﷺ-এর সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করে সমগ্র পৃথিবীতে কল্যাণ পৌছায়ে দিতে পারে।

'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها বর্ণনা করেন, যখন হুযূর পাক ﷺ-এর রূহ পাক কবজ করা হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁকে দাফন করার স্থান নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। তখন হযরত আলী رضي الله عنه ইরশাদ করলেন, 'যে স্থানে হযরত ﷺ-এর রূহ মুবারক কবজ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট সে স্থান থেকে অধিকতর সম্মানজনক আর কোন স্থান হতে পারে না।' হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه ও তাঁর

সাথে একমত পোষণ করেন এবং এ সম্পর্কে তিনি হযরত ﷺ-এর একটি হাদীস পেশ করেন। অতঃপর সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এতে একমত হন যে, তাকে তাঁর রূহ পাক কবজ হওয়ার স্থানেই দাফন করা হবে।'[১]

মদীনা শরীফের ফযীলতসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম ফযীলত যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ এ পবিত্র শহরকে একান্ত ভালোবাসতেন। যেমন- বর্ণিত আছে যে,

'যখন হুযূর ﷺ সফর থেকে প্রর্তাবর্তনের সময় মদীনার কাছাকাছি পৌছে যেতেন তখন তাড়াতাড়ি মদীনায় পৌছে যাওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনায় সওয়ারিকে জোরে চালিয়ে দিতেন এবং চাদর মুবারককে স্বীয় গর্দান থেকে সরিয়ে নিয়ে ফরমাতেন,

«هَذِهِ أَرْوَاحٌ طَيِّبَةٌ».

'এটি খুবই চিত্তাকর্ষক বাতাস।'[২]

ـ ای نفس خورم باد صبا ☆ از بر یار آمدہ مرحبا

'হে আমার শ্বাস গ্রহণের স্নিগ্ধ পূরবী বাতাস! তোমাকে স্বাগত জানাই।'

শুধু তাই নয়, মদীনায়ে তাইয়্যিবার যে সব ধূলি-বালি তাঁর চেহারা মুবারকে লাগত তা তিনি পরিস্কার করতেন না। এমনকি যদি কোন সাহাবাকে দেখতেন যে, তিনি ধূলি-বালি থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মাথা এবং মুখমণ্ডলকে আবৃত করেছেন, তখন তিনি নিষেধ করতেন এবং ইরশাদ করতেন, 'মদীনার মাটি শিফা।'

এ কারণেই মদীনার আর এক নাম শাফিয়া (আরোগ্যকারী) আখ্যায়িত করা হয়েছে। মদীনা শরীফের আরেকটি ফযীলত এই যে, হযরত আলী رضي الله عنه হযরত ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ১০১৮

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ»، ادْفِنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

[২] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ২৯৭;

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرِ الْمَدِيْنَةِ طَرَحَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، وَقَالَ:...

'মদীনাবাসী যে শয়তানের পূজা করবে এ থেকে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে, তবে মানুষকে ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত করার ক্ষমতা রয়েছে।'

হযরত আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুলাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ উপদ্বীপকে' অপর রিওয়ায়ত মতে, 'এ জনপদকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেছেন যদি লোকেরা নক্ষত্রের দ্বারা পথভ্রষ্ট না হয়।' লোকেরা আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নক্ষত্র কিভাবে লোকদের পথভ্রষ্ট করে? তিনি ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবানি দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কিন্তু লোকেরা বলে- চন্দ্র অমুক কক্ষপথে আসার ফলে বৃষ্টি হয়েছে।'[১]

মদীনা শরীফের অন্যতম আরেকটি ফযীলত এই যে, রাসূলুলাহ ﷺ স্বয়ং উম্মতকে মদীনায় বসবাস ও অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সেখানকার দুঃখ কষ্টের ওপর সবর এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন, আর সেখানে মৃত্যুবরণের হিদায়াত এবং তাগিদ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَّشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট সহকারে ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তাঁর সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।'[২]

আলেমগণ বলেন, যাঁরা তাঁর আনুগত্য করেন তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষী দেবেন এবং গুনাহগারদের জন্যে সুপারিশ করবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হবো।'[৩]

[১] আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ৭০, হাদীস: ৬৭০৯ ও খ. ১২, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৭১৪

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَ هَذِهِ الْجَزِيْرَةَ مِنَ الشِّرْكِ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تُضِلَّهُمُ النُّجُوْمُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ تُضِلُّهُمُ النُّجُوْمُ؟ قَالَ: «بِنَزُوْلِ الْغَيْثِ فَيَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا».

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ طَهَّرَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ إِنْ لَمْ تُضِلَّهُمُ النُّجُوْمُ».

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৩, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৭৮৬৫; হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত

[৩] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিক্ব*, খ. ২৬, পৃ. ৩৮৭, হাদীস: ৩১১০; হযরত সামীমা ﵂ থেকে বর্ণিত

আলেমগণ বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম মদীনাবাসীদের জন্যে এর পরে মক্কাবাসীদের জন্য এরপর তায়িফবাসীদের জন্য সুপারিশ করবেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ، فَمَنْ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَّشَهِيْدًا».

'যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে মদীনাতেই তার মৃত্যুবরণ করা উচিত, কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবো, এবং সুপারিশকারী হবো।'[১]

মদীনার ফযীলতসমূহের মধ্যে আরেকটি ফযীলত এই যে, সাইয়িদুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন যে,

'আমার মৃত্যু যেন মদীনাতেই হয়।'

এইভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী বুযুর্গানে দীনও মদীনায় মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন এবং দু'আ করেছেন। হুযূর আকরম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِمَكَّةَ».

'হে আল্লাহ আপনি মক্কার ভূমিতে আমাদের মৃত্যু দেবেন না।'[২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন,

'পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই, যেখানে আমি আমার কবরের জন্য পছন্দ করি, একমাত্র মদীনা ব্যতীত।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ﵁ প্রায়ই এ দু'আ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ».

'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদাত নসীব করুন এবং আপনার রাসূলের শহরের মধ্যে মওত নসীব করুন।'[৩]

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মালেক ﵀ একবার ব্যতীত আর হজ্জ করেননি। মদীনা ছাড়া অন্য স্থানে মৃত্যু হওয়ার ভয়ে ফরজ হজ্জ আদায় করার

[১] আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৬২-৬৩, হাদীস: ৩৮৮৪; হযরত সুমাইয়া ﵂ থেকে বর্ণিত

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯৬, হাদীস: ৪৭৭৮ ও খ. ১০, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৬০৭৬; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩-২৪, হাদীস: ১৮৯০; হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত

পর তিনি আর কখনও মক্কায় গমন করেননি। সারা জীবন মদীনাতেই অতিবাহিত করেন এবং মদীনা শরীফেই তাঁকে দাফন করা হয়। মদীনার ফযীলতসমূহের মধ্যে আর একটি ফযীলত এই যে, বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«اَلْـمَدِيْنَةُ، تَنْفِيْ خَبَثَ الرِّجَالُ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْـحَدِيْدِ».

'মদীনা মানুষের ময়লাকে এভাবে দূরীভূত করে যেভাবে কামারের ভাতি লোহার মরিচাকে দূরীভূত করে।'[1]

সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوْبَ، كَمَا تَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

'মদীনা শরীফ পূত-পবিত্র। গুনাহসমূহের ময়লাকে তা এমনিভাবে বিদূরিত করে যেমনিভাবে কামারের ভাতি রৌপ্যের মরিচাকে বিদূরিত করে।'[2]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মদীনা শরীফ অর্থাৎ ফিৎসা-ফাসাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের এখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এটি মদীনা শরীফের একটি বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ আলেম একমত যে, মদীনা শরীফের এ বৈশিষ্ট্য সর্বদা বিদ্যমান। একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একথার ওপর বায়আত গ্রহণ করল যে, সে মদীনাতেই অবস্থান করবে। দ্বিতীয় দিবস ঘটনাচক্রে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরাক্রান্ত হয়। অতঃপর সে হযরত ﷺ-এর নিকটে এসে বায়আত ভঙ্গের এবং স্বদেশ চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত আছে যে,

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসার সময় আপন বন্ধু-বান্ধবদেরকে সম্বোধন করে বলতেন,

نَخْشَىٰ أَنْ نَكُوْنَ مِمَّنْ نَفَتْهُ الْـمَدِيْنَةُ.

'মদীনা যাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেছে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি।'[3]

এ পবিত্র নগরীর পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য সেই দিনই পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে, যখন

---

[1] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২০–২১, হাদীস: ১৮৭১: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত

[2] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৯৬, হাদীস ৩০৫০: হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত

[3] মোল্লা আলী [illegible], *শরহুশ শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল [illegible]*, খ. ২, পৃ. ১৬৬

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْـمَدِيْنَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا وَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ: ...

মালাউন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং মদীনা শরীফে প্রবেশে সক্ষম হবে না। আর সকল সন্ত্রাসকারী দাজ্জালের অনুসরণে এ শহরের বাইরে চলে যাবে। সেদিন দুষ্ট লোক থেকে মদীনা শরীফ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে,

'সে সময় ইসলাম বিরোধী এবং মুশরিকদেরও অপবিত্র থেকে মদীনার স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।'

তবে যেসব লোক পাপী এবং অপবিত্র হয়ে মদীনায় মৃত্যুবরণ করে সম্ভবত তাদের থেকে মদীনাকে পবিত্র করার সময় তাদের মৃত্যুর পরেই হবে। এইভাবে যে, ফেরেশতাগণ তাদের মরদেহকে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে নিক্ষেপ করে দেবেন।

সারকথা এই যে, হযরত ﷺ-এর সুপারিশের দাবিদার কখনও পাপাচারে লিপ্ত এবং অপবিত্র হয়ে এ শহরে বসবাসের অধিকারী হতে পারে না। তাদেরকে মৃত্যুর পর এখান থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলিম বলেছেন, এ হাদীসের অর্থ এই যে, মদীনা শরীফ তার বাসিন্দাদেরকে নফস আম্মারা কর্তৃক পরিচালিত এবং ভোগ বিলাস থেকে পবিত্র রাখেন। মদীনা শরীফে অবস্থান এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করার ফলে নফস আম্মারা দুর্বল হয় এবং দমিয়ে যায়, আর ভোগ-বিলাসের স্পৃহা রহিত এবং তাদের মন পাপ-পঙ্কিল মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়ে যায়। এভাবে কিয়ামতের ময়দানে তাঁদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

قلب رزاندوده نستاند در بازار حشر ☆ خالصی باید که از آتش برون آید سلیم

'হাশরের ময়দানে ভেজাল ও মিশ্রিত অন্তরের কোন মূল্য হবে না। আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য খালেস নির্ভেজাল এবং পবিত্র অন্তর হওয়া চাই।'

এতে সন্দেহ নেই যে, হাদীসে বর্ণিত تَنْفِي الذُّنُوْبَ (তানফীউয যুনূব) কথাটি এ অর্থেরই সমর্থন করে। কেননা হযরত ﷺ-এর পাশাপাশি অবস্থানের বরকতে গুনাহ-আবর্জনা বিদ্যমান থাকে না। নেকী গুনাহকে মোচন করে দেয়। সার কথা এই যে, এ পবিত্র নগরীর জন্য যাহিরী, বাতিনী সব ধরনের পবিত্রতা অপরিহার্য।

মদীনা শরীফের ফযীলত সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ প্রায় সময় মদীনা শরীফের খায়র ও বরকতের জন্য দু'আ করতেন এবং ইরশাদ করতেন,

«اَللّٰهُمَّ فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا مُدِّنَا، اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ

عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ».

'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আমাদের মদীনাকে বরকত দান করুন। আমাদের 'সাআ'তে বরকত দিন এবং আমাদের 'মুদ'-এর মধ্যে বরকত দিন। ('সাআ' এবং 'মুদ' যদ্বারা মাপ এবং ওজন দেওয়া হয়)। হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার বান্দা, বন্ধু এবং নবী। আর আমি আপনার বান্দা এবং নবী। তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছেন। আমি আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি। যেমনিভাবে তিনি মক্কার জন্য দু'আ করেছেন।'[১]

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা শহরের বাইরে আসি। যখন আমরা হাররা নামক স্থানে পৌঁছি, সেখানে হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বসবাস করতেন। তখন হুযূর আকরম ﷺ পানি তলব করলেন এবং অযু করে কিবলামুখী হয়ে ইরশাদ করছেন, 'হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার বান্দা ও বন্ধু। তিনি আপনার নিকট মক্কাবাসীদের জন্য খায়র ও বরকতের দু'আ করেছেন। আমি আপনার বান্দা ও রাসূল, আমি আপনার কাছে মদীনাবাসীদের জন্য খায়র ও বরকতের দু'আ করছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের 'মুদ' ও 'সাআ'-এর মধ্যে বরকত দিন। যেভাবে মক্কাবাসীদেরকে বরকত দিয়েছেন। মক্কাবাসীদের তুলনায় মদীনাবাসীদের দ্বিগুণ বরকত দিন।'[২]

অপরাপর হাদীসেও অনুরূপ দু'আ বর্ণিত আছে।

হাদীসে যেখানে 'মুদ' ও 'সাআ' শব্দদ্বয় বর্ণিত আছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার কল্যাণ ও বরকত। আর যেখানে মদীনার জন্য শুধু বরকতের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে পার্থিব এবং আখিরাত উভয় জাহানের বরকত উদ্দেশ্য। মদীনা

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫০৬, হাদীস: ৩৪৫৪; হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৭১৮, হাদীস: ৩৯১৪

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ السُّقْيَا الَّتِيْ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ائْتُوْنِيْ بِوَضُوْءٍ»، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيْلَكَ وَدَعَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَيْ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ».

শরীফে জাহিরী ও বাতিনী খায়রও বরকতের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট।

মদীনা শরীফের আরেকটি ফযীলত এই যে, নবী করীম ﷺ দু'আ করেছেন,

'হে আল্লাহ! জ্বর ও অপরাপর রোগ মদীনা থেকে বের করে দিয়ে জুহফা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিন।'[১]

এ স্থানে মুশরিক এবং বিদ্রোহীদের আড্ডা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আর পূর্বে মদীনা শরীফে জ্বর এবং অপরাপর রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল।

যে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে আগমন করেন, তখন তাঁর সাহাবীরা জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর দু'জন গোলাম বিলাল ও আমর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে তাঁদের খবর নিতে আসেন। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর আব্বাজান জ্বরাক্রান্ত হয়ে ছটফট করছেন, আর এ কবিতাটি আবৃত্তি করছেন।

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ	*	وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

'প্রত্যেক লোক নিজ পরিবারের মধ্যে সকাল করে। অথচ মউত তার জুতার ফিতার থেকেও তার বেশি নিকটবর্তী।'[২]

ঘরের অপর কোণায় বিলাল ও আমরকে দেখতে পান। উভয়ে কুরাইশ কাফিরদের ওপর অভিশাপ দিচ্ছেন। হুযূর ﷺ দু'আ করলেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি জ্বর এবং অপরাপর মহামারী মদীনা থেকে জুহফায় পাঠিয়ে দিন।'[৩]

অবশেষে অবস্থা তেমনই দাঁড়াল। এটি তাঁর মহান মুজিযা। বর্ণিত আছে যে,

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৮০, হাদীস: ৬৩৭২; হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত

«اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ».

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ১৮৮৯; হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ: ...

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস: ১৮৮৯; হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ: ... اَللّٰهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُوْنَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَفِيْ مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ».

জাহিলিয়াতের যুগে যদি কোন লোক মদীনায় আগমনের ইচ্ছা এবং মদীনার মহামারী থেকে বাঁচার আশা করত তবে সে সানিয়্যাতুল ওয়াদা নামক স্থানে পৌঁছে ১০বার গাধার আওয়াজের মতো চিৎকার করত। কেননা তাদের ধারণা ছিল যে এভাবে গাধার মতো চিৎকার না করলে জীবন এখানেই শেষ এবং সে যেন স্বীয় জীবনকে ধ্বংস করে দিল। বলা হয়ে থাকে যে, এ কারণে সেই স্থানকে সানিয়্যাতুল ওয়াদা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত ﷺ-এর সময়ে আরবের বিখ্যাত কবি উরওয়াহ ইবনুল ওয়ারদ মদীনা আগমনের প্রাক্কালে যখন এ স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি এ কুকাজটি করল না এবং কবিতাটি আবৃত্তি করল,

لَعَمْرِيْ لَئِنْ عَشَّرْتُ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَىٰ

نُهَاقَ الْحَمِيْرِ إِنَّنِيْ لَجَزُوْعُ

'আমার জীবনের শপথ, যদি আমি মৃত্যুর ভয়ে গাধার মতো আওয়াজ করি, তবে আমি নিতান্তই অধৈর্যশীল।'[১]

দেখা গেল কবির ওপর কোন বিপদ আসল না। তখন থেকে এ কুপ্রথা রহিত হয়।[২]

বিভিন্ন হাদীসে যে, ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ (সানিয়্যাতুল ওয়াদা)-এর উল্লেখ রয়েছে, লোকদের উল্লিখিত স্বভাব ছুটে যাওয়া এবং দূরিভূত হওয়ার কারণে এ স্থানকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে মদীনাবাসীগণ মুসাফিরদের এবং বিদেশ গমনকারীদেরকে এ স্থান পর্যন্ত এসে বিদায় দিতেন বলেই এ স্থানকে সানিয়্যাতুল ওয়াদা বলা হয়, এ নামেই খ্যাত।

মদীনা শরীফের অপর একটি ফযীলত এই যে, এ পবিত্র নগর দাজ্জালের দাপট থেকে নিরাপদে থাকবে। *সহীহ আল-বুখারী* এবং *মুসলিম শরীফের* হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩; হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ أَحَدٌ إِلَّا عَنْ طَرِيْقٍ وَّاحِدٍ مِّنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِنْ لَمْ يُعَشِّرْ بِهَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَّخْرُجَ مِنْهَا، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الثَّنِيَّةِ، قِيْلَ: قَدْ وَدَّعَ، فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، حَتَّىٰ قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ الْوَرْدِ الْعَبْسِيُّ، فَقِيْلَ لَهُ: عَشِّرْ بِهَا، فَلَمْ يُعَشِّرْ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ: ...

[২] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩; হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ! مَا لَكُمْ وَلِلتَّعْشِيْرِ؟ قَالُوْا: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مِّنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، فَلَمْ يُعَشِّرْ بِهَا إِلَّا مَاتَ، وَلَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ مِّنْ غَيْرِ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا قَتَلَهُ الْهُزَالُ. فَلَمَّا تَرَكَ عُرْوَةُ التَّعْشِيْرَ تَرَكَهُ النَّاسُ.

'আখেরী যমানায় যখন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তখন মদীনা মুনাওয়ারার হিফাযতের জন্য প্রত্যেক সড়কের মাথায় মাথায় ফেরেশতাদের এক একটি দল দণ্ডায়মান রাখা হবে। তাঁরা দাজ্জালকে মদীনা শরীফে প্রবেশ করা থেকে বাঁধা প্রদান করবেন।'[১]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'একমাত্র মক্কা এবং মদীনা ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোন শহর বাকি থাকবে না, যেখানে দাজ্জালের আনাগোনা হবে না।'[২]

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'দাজ্জাল পূর্ব দিক থেকে বের হবে। অতঃপর মদীনা শরীফের দিকে অগ্রসর হয়ে উহুদ পর্বতের পশ্চাতে অবতরণ করবে। তখন ফেরেশতাগণ তার মুখ সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেবেন। আর সিরিয়ায়ই সে নিপাত হয়ে যাবে।'[৩]

সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'মদীনা শরীফের শ্রেষ্ঠ লোকদের থেকে একজন লোক দাজ্জালের দিকে বের হয়ে তাকে বলবে তুমি সেই দাজ্জাল, যার সংবাদ আমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ দিয়ে গেছেন।'[৪]

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمه الله কথাটি সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন,

'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইওমুল খালাস (মুক্তির দিন) কথাটির উল্লেখ করেন এবং পুনঃপুনঃ উল্লেখ করতে থাকেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন,

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২২, হাদীস: ১৮৮০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০০৫, হাদীস: ৪৮৫ (১৩৭৯) হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত

«عَلَىٰ أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَّا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ، وَلَا الدَّجَّالُ».

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২২, হাদীস: ১৮৮১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২৬৫, হাদীস: ১২৩ (২৯৪৩) হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

«لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ».

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০০৫, হাদীস: ৪৮৬ (১৩৮০) হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত

«يَأْتِي الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةُ، حَتَّىٰ يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ».

[৪] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ২২, হাদীস: ১৮৮২; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২৫৬, হাদীস: ১১৬ (২৯৩৮) হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত

«فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ، الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَدِيْثَهُ».

হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! মুক্তির দিন কি? ইরশাদ করলেন, 'এটি সে দিন যখন দাজ্জাল উহুদ পর্বতের ওপর আরোহণ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার লোকদদের বলবে, তোমরা কি জান? এই যে, সাদা দালান দেখা যায়, তা কি? তা আহমদ ﷺ-এর মসজিদ। এরপরে সে যখন মদীনায় প্রবেশের ইচ্ছা করবে, তখন সে মদীনার প্রত্যেক সড়কের মাথায় এক একজন হিফাজতকারী ফেরেশতা দেখতে পাবে। এরপর বৃষ্টির পানি একত্রিত হওয়ার স্থানে সে তাবু স্থাপন করবে। সে সময় মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হবে; কাফির, ফাসিক ও মুনাফিকগণ মদীনা থেকে বেরিয়ে এসে দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। তখন মদীনা মুনাওয়ারা প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। সেই দিনই হচ্ছে ইওমুল খালাস (মুক্তির দিন)।''[১]

মদীনা শরীফের ফযীলতসমূহের মধ্যে এটি আরেকটি ফযীলত যে, আল্লাহ তা'আলা মদীনা শরীফের মাটি এবং ফসলের মধ্যে শিফা এবং আরোগ্যের গুণ রেখেছেন। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'মদীনার ধূলাবালিতে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে।'[২]

কোন কোন হাদীসে কুষ্ট ও সাদা রোগের ওষুধ বলেও উল্লেখ আছে।[৩] কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে,

'মদীনার মাটিতে রোগের ওষুধ রয়েছে।'[৪]

তা صُعَيْبٌ (সু'আইব) নামক বিশেষ স্থানের মাটি যাকে وَادِيْ بُطْحَانَ

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩১, পৃ. ৩১১–৩১২, হাদীস: ১৮৯৭৫

عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ، يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ» ثَلَاثًا، فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ قَالَ: «يَجِيءُ الدَّجَّالُ، فَيَصْعَدُ أُحُدًا، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَيَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِيْنَةَ، فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَكًا مُصْلِتًا، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْحَرْفِ، فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، وَلَا فَاسِقٌ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ».

[২] আল-মুনযিরী, *আত্তরগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৪৯; হযরত সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ فِيْ غُبَارِهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ».

[৩] আল-মুনযিরী, *আত্তরগীব ওয়াত তারহীব*, খ. ২, পৃ. ১৪৯; হযরত সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«وَمِن الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ».

[৪] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ৫৮৪৫ ও ৫৮৪৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭২৪, হাদীস: ৫৪ (২১৯৪); হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

«بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيْمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

(ওয়াদীয়ে বুতান) বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ কোন কোন সাহাবীকে জ্বরের ওষুধ হিসেবে মাটি নিয়ে যেতে নিষেধ করেন, তারা বলেন, এই নিষেধ এ মাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অনেক আলিম সমাজ এ মাটি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন যেমন– হযরত শায়খ মুজাদ্দিদুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেন, এ মাটি সম্পর্কে আমি নিজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমার একজন গোলাম পূর্ণ এক বছর যাবৎ জ্বরাক্রান্ত ছিল। আমি নিজেই সেই মাটি পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করানোর ফলে সে ওই দিনই আরোগ্য লাভ করে।

[এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رحمه الله বলেন,] আমি নিজেই এ মাটির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। একসময় আমি মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানরত অবস্থায় কোন কারণবশত আমার পা ফুলে গিয়েছিল। চিকিৎসকগণ এটি দূরারোগ্য ব্যাধি বলে অভিমত দেন। যখন তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল, আমি সেই পবিত্র মাটির ব্যবহার আরম্ভ করে দিলাম। এতে অতিঅল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে অতিসহজেই আরোগ্য দান করেন।

এখন মদীনা শরীফের ফলের বর্ণনা শোনা যাক। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে,

'যে ব্যক্তি মদীনা শরীফের আজওয়া নামক ৭টি খোরমা দিয়ে নাস্তা করবে, কোন প্রকারের বিষ ও যাদু তার ওপর প্রবাব বিস্তার করতে পারবে না।'[১]

উম্মুল মুমিমীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها দাওয়ার নামক দূরারোগ্য রোগে (যেমন– মাথা ঘোরা) আজওয়া খোরমা খাওয়ার পরামর্শ দিতেন।

আজওয়া মদীনার এক প্রকার উৎকৃষ্ট খেজুর। মদীনাবাসীরা এ প্রকারের খেজুর সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, এ খেজুরের মূল বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হস্তে রোপন করেছিলেন। মদীনায় এত অধিক রকমের খেজুর ছিল সেসবের সংখ্যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হযরত সাইয়িদ رحمه الله *তারীখে কবীর* নামক কিতাবের মধ্যে ১১৯ প্রকার খেজুরের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রকারের খেজুরের মধ্যে الصَّيْحَانِيُّ (আস-সায়হানী) নামক খেজুরও অন্যতম।

---

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৩৭, হাদীস: ৫৭৬৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৬১৮, হাদীস: ১৫৫ (২০৪৭); হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

«مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».

হযরত জাবির ﵁ রিওয়ায়ত করেন যে, একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী ﵁-এর হাত ধরে মদীনা শরীফের কোন বাগানের দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি খেজুর গাছ থেকে আওয়াজ শোনা গেল যে,

هَذَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَذَا عَلِيٌّ سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ أَبُو الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِيْنَ.

'ইনি পয়গাম্বরদের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর ইনি আল্লাহর অলীদের সরদার এবং পবিত্র ইমামদের পিতা হযরত আলী ﵁।'[১]

যখন তারা অপর একটি গাছ অতিক্রম করেছিলেন তখন শব্দ হল:

هَذَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهَذَا عَلِيٌّ سَيْفُ اللهِ.

'ইনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর ইনি হযরত আলী ﵁ আল্লাহর তলোওয়ার।'

এ কারণেই সেই খেজুর বৃক্ষের নাম রাখা হয় সায়হানী। কেননা আরবী অভিধানে صَيْحٌ (সায়হুন) শব্দের অর্থ আওয়াজ।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَانَ أَحَبُّ التَّمْرِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعَجْوَةَ.

'নবী করীম ﷺ-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় খেজুর ছিল আজওয়া।'[৩]

উল্লেখ্য যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর মুহাব্বত করার কারণেই আজওয়া উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হয়েছে। ইমাম নববী ﵀ বলেন, অনেক প্রকারের খেজুরের বর্ণনা দিয়েছেন, এর রহস্য শরীয়ত প্রবর্তনকারী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অপর কোন লোক জ্ঞাত নন। এ বিষয়ে আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, খেজুরের মধ্যে উল্লিখিত যে গুণ এসেছে তা হয়ত সেখানকার মাটির বিশেষত্বের অথবা বাতাসের বিশেষত্বের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত হযরত ﷺ-এর পাক যবানের বরকতে হয়েছে অথবা ঘটনাচক্রে এরূপ হয়েছে অথবা কোন বৃক্ষ বিশেষ এরূপ হয়েছে। যার অস্তিত্ব এখন নেই

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৬৩

عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَيَدُ عَلِيٍّ فِي يَدِهِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِنَخْلٍ، فَصَاحَ النَّخْلُ: ...

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৬৩

... فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ! اسْمُهُ الصَّيْحَانِيُّ»، فَسُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الصَّيْحَانِيَّ.

[৩] আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী, *আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু*, খ. ৩, পৃ. ২৭৯, হাদীস: ৬৩৬

ইত্যাদি। তাদের এসব মন্তব্য অপরিপক্ষ এবং স্বল্প জ্ঞানেরই পরিচায়ক। আমি সেই ব্যক্তির ঈমানদারির ওপর আর্শ্চান্বিত, যে ব্যক্তি একথা শ্রবণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রকারের খেজুর বিশেষ ভালোবাসতেন এবং আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করতেন। এরপরও সে ব্যক্তি ওই খেজুর বিশেষের মধ্যে যে শিফা বিদ্যমান, এতে তার সন্দেহ হয় এবং বিভিন্ন রকমের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা দান করে। আফসোস এটি তাঁর সাথে এ ব্যক্তির সম্পর্কহীনতার পরিচয় বহন করে।

چو لب بکوزہ نہی کوزہ نبات شود ☆ زکوزہ قطرہ چکد چشمہ حیات شود

'যদি তিনি তার ওষ্ঠদ্বয় কোন পাত্রে রাখেন, তা মিশ্রির পাত্রে পরিণত হয়, আর সে পাত্র থেকে কোন ফোটা নির্গত হতো তবে তা হায়াতের নহরে পরিণত হত।'

মদীনা তাইয়্যিবার আরেকটি ফযীলত এই যে,

'যে পবিত্র নগরীতে মসজিদের মিম্বরের মাঝখানে বেহেশতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান রয়েছে।'[১]

মসজিদে নববীতে এককানা মিম্বর আছে, যার মূল বেহেশতের সাথে সম্পৃক্ত। এ পাক জমিনে বেহেশতের একটি পাহাড় আছে, যাকে জবলে উহুদ বলা হয়। রাসূল ﷺ এ পাহাড়কে ভালোবেসেছেন এবং সেই পাহাড়ও তাঁকে ভালোবেসেছে।

জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থান এখানে অবস্থিত। সেখানে অনেক সাহাবায়ে কিরাম এবং আওলাদে রাসূলের কবর রয়েছে।

শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ﵁-এর কবর শরীফ এ পাক ভূমিতে অবস্থিত। এ ছাড়াও মদীনা শরীফে আরও অনেক পবিত্র স্থান বিদ্যমান। যেসবের ফযীলত এবং মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। পরে যথাস্থানে এ সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মদীনা তাইয়িবার এটিও একটি ফযীলত যে, সব দেশ তরবারীর দ্বারা বিজিত হয়েছে, কিন্তু মদীনা পবিত্র কুরআনের বরকতে বিজয় হয়েছে। হিজরতের অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারার আরেকটি ফযীলত এই যে, ধর্মীয় প্রয়োজন ব্যতীত এ পবিত্র স্থান ছেড়ে বাইরে গমন করা গুনাহ এবং এর ওপর শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামগণ ﵃ হজ্জের আহকাম সম্পন্ন করে

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৫; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০১০, হাদীস: ৫০০ (১৩৯০); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-মাযনী ﵁ থেকে বর্ণিত

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ».

তাড়াতাড়ি মদীনা শরীফে ফিরে আসতেন এবং প্রয়োজন অতিরিক্ত সময় মক্কা শরীফে অবস্থান করতেন না। এখনও মদীনাবাসীদের এ রীতি চালু রয়েছে মদীনা শরীফের আকর্ষণে মুগ্ধ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা যায়,

صبر از درت بود اہل شوق را ☆ وزر آنکہ در بہشت برین رفتہ جاکنند

'আপনার দরবার ছেড়ে প্রেমিকদের ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব। যদিও বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করার সুযোগ লাভ হয়।

মদীনা শরীফের আরেকটি ফযীলত এই যে, মক্কা শরীফের মতো মদীনা তাইয়্যিবারও হারাম নির্ধারিত হয়েছে। অনেক হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে। শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে হারামের সীমানা এবং আহকাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে মদীনা মুনাওয়ারাকে হারাম করার উদ্দেশ্য এর যথাবিহিত সম্মান ও ইজ্জত করা। সুতরাং মক্কা শরীফের হারামের মতো শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি এখানে নিষিদ্ধ হবে না।

ইমাম শাফিয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, সম্মান এবং আহকাম উভয় ক্ষেত্রে দুটাই সমান। এতে কোন পার্থক্য নেই।

ফিকহের কিতাবসমূহেও এ মাসআলার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সাইয়িদ সামহূদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন করেছেন এবং মক্কা শরীফ থেকেও মদীনা শরীফের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন।

মদীনা তাইয়্যিবার ফযীলতসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম যে, হুযুরে পাক ﷺ মদীনা শরীফের অধিবাসীদের বিশেষভাবে তাযীম ও সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন করা থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«اَلْمَدِيْنَةُ مُهَاجَرَتِيْ».

'মদীনা আমার হিজরতের স্থান।'

«وَفِيْهَا مُضْجَعِيْ».

'সেখানে আমার শয়ন কক্ষ।'

এ বাক্যে কবর শরীফ মদীনাতে হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

«وَفِيْهَا مَبْعَثِيْ».

'এখান থেকেই আমি কিয়ামতের মাঠে ওঠব।'

'দিবা-রাত্র ৭০ হাজার রহমতের ফেরেশতা সেখানে হাজির থাকেন।'

«حَقِيْقٌ عَلَىٰ أُمَّتِيْ حِفْظُ جِيْرَانِيْ».

'আমার প্রতিবেশীদের হিফাযত করা আমার উম্মতের কর্তব্য।'

'যদি আমার প্রতিবেশী থেকে কোন অন্যায় প্রকাশ পায়, তবে তাঁকে পাকড়াও করো না। বরং যতদূর সম্ভব ক্ষমা করে দেবে। যতক্ষণ তারা কবীরা গুনাহে জড়িয়ে না পড়ে। যদি তাঁরা এরূপ অপরাধে লিপ্ত হয় তবে আল্লাহর হক অথবা বান্দার হকের ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধান চালু করা হবে।'

«مَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَّشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি আমার প্রতিবেশীকে হিফাযত করে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব এবং তার জন্য সুপারিশ করব।'

«وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُمْ سُقِيَ مِنْ طِيْنَةِ الْخِبَالِ».

'আর যে ব্যক্তি আমার প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ রাখবে না, তাকে (তীনাতুল খিবাল) থেকে পান করানো হবে।'

'তীনাতুল খিবাল দোযখের একটি হাওযের নাম, যেখানে দোযখবাসীদের পুঁজ ও রক্ত জমা করে রাখা হয়।'[১]

মদীনা শরীফের আরেকটি ফযীলত এই যে, *সহীহ মুসলিম শরীফের* হাদীসে বর্ণিত আছে,

«وَلَا يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ كَمَا ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».

'যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের প্রতি কোন খারাবি (যেমন– যুদ্ধ) করার ইচ্ছা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে আগুনে বিগলিত করবেন যেভাবে শিখা আগুনে বিগলিত হয় অথবা লবণ পানিতে গলে যায়।'[২]

লোকেরা এ হাদীসের উদ্দেশ্য আখিরাতের আযাব বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর অর্থ পরিপন্থী বলে মনে হয়। কেননা তাদের জন্য

---

[১] মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ৪৭

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْمَدِيْنَةُ مُهَاجَرِيْ، فِيْهَا مُضْجَعِيْ وَفِيْهَا مَبْعَثِيْ، حَقِيْقٌ عَلَىٰ أُمَّتِيْ حِفْظُ جِيْرَانِيْ مَا اجْتَنَبُوْا الْكَبَائِرَ، مَنْ حَفِظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا أَوْشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُمْ سُقِيَ مِنْ طِيْنَةِ الْخِبَالِ». قِيْلَ لِلْمُزَنِيِّ: مَا طِيْنَةُ الْخِبَالِ؟ قَالَ: عَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৯২, হাদীস: ৪৬০ (১৩৬৩); হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

আখিরাতের আযাব সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের ভাগ্যে এও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াসী হবে, অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্যোগ নেবে সে অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। এটিই তকদীরে ইলাহী।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ﵁ থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম ﷺ মদীনা মুনাওয়ারার কাছে পৌঁছে দু'হাত তুলে দু'আ করেন যে,

«اَللّٰهُمَّ مَنْ أَرَادَنِيْ وَأَهْلَ بَلَدِيْ بِسُوْءٍ، فَعَجِّلْ هَلَاكَهُ».

'হে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার অথবা শহরবাসীদের প্রতি খারাপ আচরণের ইচ্ছা করবে, তুমি তাকে সত্বর ধ্বংস করে দাও।'[১]

ইয়াযীদের আমলের কয়েকটি ঘটনাবিশেষ এ হাদীসের সত্যতার প্রমাণ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করেন, হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের কোন একজন নেতা মদীনায় আসে। হযরত জাবির ﵁ সে সময় মদীনায় ছিলেন। বার্ধক্য হেতু তাঁর চোখের জ্যোতি কমে গিয়েছিল। লোকেরা তাঁকে পরামর্শ দিল যে, সময়ের তাগিদে আপনি কিছুদিন এ জালিম থেকে দূরে সরে থাকলে ভালো হয়। নিজেকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা দরকার। তিনি নিজের দুই ছেলের স্কন্ধের ওপর হাত রেখে মদীনার বাইরে চলে গেলেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার কারণে তিনি যখন এক স্থানে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তখন বললেন, সেই লোক ধ্বংস হোক, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভীতি প্রদর্শন করেছে। একজন পুত্র বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে পারবে তিনি তো এ জগৎ ছেড়ে পর জগতে চলে গেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে,[২]

«مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

[১] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৩, পৃ. ৩১২

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ...

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৩, পৃ. ১২১, হাদীস: ১৪৮১৮

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ، فَقِيْلَ لِجَابِرٍ: لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ، فَخَرَجَ يَمْشِيْ بَيْنَ ابْنَيْهِ فَنَكَبَ، فَقَالَ: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ ابْنَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا -: يَا أَبَتِ! وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَقَدْ مَاتَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ».

'যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে অন্যায়ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে। আর তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতা এবং জনগণের লা'নত বর্ষিত হবে।'[১]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'তার কোন আমল ফরয হোক বা নফল হোক কবুল হবে না।'[২]

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। হযরত সাইয়িদ ﵀ বলেন যে, বাহ্যত বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি হযরত জাবির ﵁-কে ভীতি প্রদর্শন করেছে, তার নাম: বশর ইবনে আরতাত। কেননা ইমাম কুরতুবী ইবনে আবদুল বর থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে,

'শালিসী ঘটনার পর হযরত আমিরে মুআবিয়া ﵁ অনেক সৈন্য-সহকারে বশর ইবনে আরতাতকে তাঁর খিলাফতের বায়আত গ্রহণের নিমিত্ত মদীনায় প্রেরণ করেন। তৎকালীন সময়ে হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী ﵁ হযরত আলীর পক্ষে মদীনার শাসক ছিলেন। তিনি ভীত হয়ে মদীনা ছেড়ে হযরত আলী ﵁-এর নিকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বশর মদীনায় প্রবেশ করে বলল, যদি আমিরুল মুমিনীনের [হযরত মুআবিয়া ﵁-এর] নির্দেশের পরিপন্থী না হত, তবে আমি এ শহরের একজন লোককেও জীবিত রাখতাম না। সবাইকে তরবারীর নিচে দ্বিখণ্ডিত করতাম। অতঃপর সমগ্র মদীনাবাসীকে ডেকে হযরত মুআবিয়া ﵁-এর বায়আত গ্রহণের নির্দেশ দেয়। আর বনি সালমার নিকট দূত প্রেরণ করে তাদেরকে জানিয়ে দিল যে, যদি তোমরা আমার নিকট হযরত যুবাইর ﵁-কে উপস্থিত না কর, তবে তোমরা আমার নিকট থেকে নিরাপত্তা পাবে না। হযরত জাবির ﵁ একথা শ্রবণ করে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা ﵂-এর নিকট উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতির ওপর আলোকপত করলেন। তিনি তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন এবং বললেন, আমি এ বায়আতকে অন্যায় মনে করি, এতে কোন কল্যাণ দেখছি না। আর যদি বায়আত না করি, তবে নিরাপত্তা নেই। এখন উপায় কী? অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে হযরত উম্মে সালামা ﵂ তাঁকে বাধ্য হয়ে বায়আত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। অধিকাংশ মদীনাবাসী ভয়ে পলায়ন করে হাররায়ে বনি

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৯১, হাদীস: ১৬৫৫৬ (২); হযরত সায়িব ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৯১, হাদীস: ১৬৫৫৬ (২); হযরত সায়িব ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, «لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا».

সুলাইমের মধ্যে আত্মগোপন করেন।'[১]

উল্লেখ্য যে, আলিমগণ বলেছেন, এই হাদীসে মদীনায় ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীর ওপর যে, লা'নতের কথা বলা হয়েছে, তা কাফির এবং মুশরিকের ওপর যে লা'নত (অভিশাপ) দেওয়া হয়েছে এর অনুরূপ নয়। কেননা এ লা'নতের ফলে আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হতে হয়, আর বেহেশতে প্রবেশের যোগ্যতা হারিয়ে যায়। কিন্তু মদীনায় ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীর ওপর যে লা'নত করা হয়েছে তার অর্থ হল, আল্লাহর বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া, যার ফলে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরদের সাথে বেহেশতে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে যায়। উল্লিখিত হাদীসে মদীনার অবমাননাকারীদের পরিণাম ফল বর্ণিত হয়েছে। আর তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন, মদীনা মুনাওয়ারায় সগীরা গুনাহ অন্য স্থানের কবীরা গুনাহের সমান। যেমন– কোন কোন আলিম বলেছেন, মক্কার একটি গুনাহ অন্য স্থানের ১ লাখ গুনাহের সমান।

অনুচ্ছেদ–২

'হার্‌রাহ' এলাকার ঘটনার বর্ণনা, ইয়াযীদের আমলে কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন ﵁-এর শাহাদাতের পরে মদীনায় যে অতীব লোমহর্ষক ও মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় তা-ই 'হার্‌রাহ'র ঘটনা নামে অভিহিত। এ স্থানটি মদীনা নগরী থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনা তাইয়িবাতে সেসব হত্যাকাণ্ড-সংঘর্ষ এ পবিত্র স্থানের অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। যদিও-বা এ ঘটনাসমূহের বর্ণনার দ্বারা পবিত্র অন্তর বিশিষ্ট লোকদের অন্তর কলুষিত হয়, কিন্তু হুযূর আকরম ﷺ এ সমুদয় অঘটনের ভবিষৎ-বাণী করে গেছেন তাই এ সম্পর্কে এখানে এর কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া দরকার। যেমন– তিনি ইরশাদ করেছেন,

[১] আল-কুরতুবী, *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, পৃ. ১১২৫–১১২৬, عن عوانة قال: أرسل معاوية بعد تحكيم الحكمين بشر بن أرطأة في جيش، فساروا من الشام حتىٰ قدموا المدينة وعامل المدينة يومئذ لعلي ﷺ أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ، ففر أبو أيوب ولحق بعلي ﷺ، ودخل بشر المدينة فصعد منبرها، فقال: أين شيخي الذي عهدته هنا بالأمس يعني عثمان بن عفان، ثم قال: يا أهل المدينة! والله لولا ما عهدته إلىٰ معاوية ما تركت فيها محتلمًا إلا قتلته، ثم أمر أهل المدينة بالبيعة لمعاوية، وأرسل إلىٰ بني سلمة، فقال: ما لكم عند أمان ولا مبايعة حتىٰ تأتوني بجابر بن عبد الله، فأخبر جابر، فانطلق حتىٰ جاء الشام، فأتىٰ أم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال لها: ماذا ترين؟ فإني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة، فقالت: أرى أن تبايع وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن يبايع، فأتىٰ جابر بشرًا، فبايعه لمعاوية، وهدم بشر دورًا بالمدينة.

'যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদেরকে কষ্ট দেবে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করবে; সে দুনিয়া এবং আখিরাতের আযাবে গ্রেপ্তার হবে।'[১]

হার্‌রাহ এলাকায় যে অঘটন ঘটেছে হাদীসের দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। কোন কোন আলিম বলেছেন, হার্‌রাহর ঘটনা এ হাদীসের দ্বারাও সত্যায়িত করা হয়। তিনি ইরশাদ করেছেন,

'মদীনা শরীফ আবাদ হওয়ার পর আবার বিরান হয়ে যাবে, মানুষ এ স্থান ছেড়ে চলে যাবে এবং মরু এলাকায় পশু-পক্ষী এসে বসবাস করবে।'[২]

কিন্তু বাস্তব এই যে, মদীনার এ অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দেখা দেবে। ইমাম নববী ﵀ একই কথা বলেছেন।[৩] কেননা কোন কোন হাদীসে যে সমুদয় বর্ণনা পাওয়া যায়, এতে বোঝা যায় যে, 'হাররাহ'র ঘটনায় এটি পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন– ইমাম ইবনে আবু শায়বা ﵀ উল্লেখ করেছেন যে,

'এ পবিত্র নগরী ৪০ বছর যাবৎ বিরান হয়ে পড়ে থাকবে। সেখানে হিংস্র জন্তু এবং পশু পাখিরা বসবাস করবে। অতঃপর مُزَيْنَةٌ (মুজাইনা) গোত্রের দু'জন রাখাল এখানে এসে অবাক হয়ে পরস্পরকে বলবে এখানকার জনপদ কোথায় গেল? তারা সেখানে বন্য জীব-জন্তু ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাবে না।'[৪]

এতে বোঝা যায় যে, এটি কিয়ামত পূর্বকালীন সময়ের ঘটনা হবে। হার্‌রার মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অনেক সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, মদীনার ওপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যে, মদীনার বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বের করে

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৩, পৃ. ৬৫৫, হাদীস: ১৪৫৮২; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ آذَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ آذَاهُ اللهُ، وعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

খ. ৭, পৃ. ১৪৩, হাদীস: ৬৬৩১; হযরত খালিদ ইবনে খাল্লাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০১০, হাদীস: ৪৯৯ (১৩৮৯); হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

«يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ -».

[৩] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৮৫

[৪] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ২৮১; হযরত আওফ ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, «أَمَا وَاللهِ لَتَدَعُنَّهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي، أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ».

দেওয়া হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, কে তাদেরকে বের করে দেবে? ইরশাদ করলেন, 'উমরাউস সূ' দুষ্ট আমিরগণ।[1]

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

'কুরাইশ গোত্রীয় লোকের হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে।'[2] সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তখন আমাদের জন্য কি নির্দেশ? ইরশাদ করলেন, 'তখন তোমাদের একাকীভাবে জীবনযাপন করা উচিত।'[3]

অপর এক হাদীসেও হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন,

'যে মহান সত্তার কুদরতের হাতে আমার জীবন, তাঁরই শপথ করে বলছি, মদীনায় এমন এক যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যার ফলে দীন এখান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যে, যেমন মাথা মুণ্ডনের ফলে চুল মাথা থেকে বের হয়ে যায়। সে দিন তোমরা মদীনার বাইরে চলে যেও, এক মনযিলের ব্যবধানে হলেও।'[4]

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি এভাবে দু'আ করতেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে ৬০ হিজরীর অঘটন এবং ছেলেদের রাজত্ব থেকে রক্ষা করুন। সে আসার পূর্বেই আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিন।'[5]

এতে ইয়াযীদের হুকুমতের প্রতিই ইঙ্গত রয়েছে। কেননা সে ষাট

[1] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা,* খ. ১, পৃ. ২৭৭-২৭৮

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: لَيَخْرُجَنَّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ خَيْرَ مَا كَانَتْ، نِصْفًا زَهْوًا، وَنِصْفًا رُطَبًا. قِيْلَ: مَنْ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ السُّوْءِ.

[2] আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩৬০৫, হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

«هَلَاكُ أُمَّتِيْ عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ».

[3] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৩৬০৪; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ,* খ. ৪, পৃ. ২২৩৬, হাদীস: ৭৪ (২৯১৭): قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ».

[4] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা,* খ. ১, পৃ. ২৮০

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَيَكُوْنَنَّ بِالْمَدِيْنَةِ مَلْحَمَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ حَالِقَةَ الشَّعَرِ وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ، فَاخْرُجُوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَلَوْ عَلَىٰ [illegible] بَرِيْدٍ.

[5] আহমদ ইব[illegible], *[illegible]-মুসনদ,* খ. ১৪, পৃ. ৬৮, হাদীস: [illegible]২০ ও খ. ১৫, পৃ. ৪৮৫, হাদীস: ৯৭৮২:

«تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنَ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ».

হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেছে এবং 'হাররাহ'র ঘটনা তারই রাজত্বকালে সংঘটিত হয়েছে।

ওয়াকিদী 'হার্‌রাহ' নামক কিতাবে আইয়ুব ইবনে বশর থেকে বর্ণনা করেছেন,

রাসূল ﷺ একদিন সফর করে হার্‌রাহ নামক স্থানে পৌছেন, তখন দাঁড়িয়ে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন পড়েন। এতে সাহাবাগণ মনে করলেন যে, হয়তো সফরের পরিণতি শুভ হবে না; তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হল। হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি ভেবে পড়লেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। ইরশাদ করলেন, 'হার্‌রাহর এই মরুপ্রান্তরে আমার সাহাবাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হবে।'[1]

অপর এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

তিনি তাঁর হস্ত মুবারক দ্বারা ইশারা করে বললেন যে, এই 'হার্‌রাহ' মরুপ্রান্তরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হবে।[2]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হযরত কা'ব আহবার থেকে বর্ণনা করেন যে,

হযরত কা'ব বলতেন, 'তাওরাত' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিকের মরুপ্রান্তরে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার এমন কতেক লোক শাহাদাত বরণ করবেন, যাঁদের চেহারা ১৪ তারিখের চন্দ্রের আলো থেকে উজ্জ্বল।[3]

ইবনে যুবলা থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের আমলে খুব বৃষ্টিপাত হয়। তিনি তার বন্ধু-বান্ধবসহ মদীনার

[1] (ক) আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা,* খ. ১, পৃ. ২৯৮; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত,* খ. ৬, পৃ. ৪৭৩:

عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بُشَيْرٍ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِيْ سَفَرٍ مِّنْ أَسْفَارِهِ، فَلَمَّا مَرَّ بِحَرَّةِ زُهْرَةَ وَقَفَ، فَاسْتَرْجَعَ، فَسَاءَ ذَلِكَ مَنْ مَعَهُ وَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ سَفَرِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الَّذِيْ رَأَيْتَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ سَفَرِكُمْ هَذَا»، قَالُوا: فَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «يُقْتَلُ بِهَذِهِ الْحَرَّةِ خِيَارُ أُمَّتِيْ بَعْدَ أَصْحَابِيْ».

[2] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা,* খ. ১, পৃ. ২৯৮:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَشْرَفَ عَلَىٰ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «يُقْتَلُ بِهَذِهِ الْحَرَّةِ خِيَارُ أُمَّتِيْ».

[3] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা,* খ. ১, পৃ. ২৯৯:

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ فِيْ حَرَّةِ شَرْقِي الْمَدِيْنَةِ مَقْتَلَةً تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَحًى.

বাইরে তখন ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। যখন 'হার্‌রাহ' নামক স্থানে পৌঁছেন এবং দেখতে পান যে, চতুর্দিকে পানির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁর সাথী হযরত কা'ব আহবার ﵁ শপথ গ্রহণ করে বললেন, এখানে যেভাবে পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, এমনিভাবে এখানে স্রোত প্রবাহিত হবে। হযরত আবদুলাহ ইবনে যুবাইর ﵁ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন সময়ে হবে? তিনি উত্তর দিলেন, হে যুবাইরের পুত্র! তুমি এর থেকে সতর্ক থাক, যেন তোমার হস্ত পদের দ্বারা এটি সংঘটিত না হয়।[১]

সীরাত লেখক এবং ইতিহাসবিদরা সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার বর্ণা দিয়েছেন। তাদের উদ্ধৃতিসমূহ হুবহু পেশ করা হল। যাতে আসল ঘটনা অস্পষ্ট না থাকে।

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, মদীনাবাসীদের মদীনা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার কারণ এই হাররারই মর্মান্তিক ঘটনা। যেমন– কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে, যে সময় মদীনা শরীফ অবশিষ্ট সাহাবা, তাবেয়ীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ও লোক বসতিতে ভরপুর এবং তার চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য বিদ্যমান তখন মদীনাবাসীদের ওপর একের পর এক বিপর্যয় এবং অঘটন নেমে আসে, ফলে তারা মদীনা ছেড়ে বাইর চলে যায়। দুষ্ট ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে ওকবার নেতৃত্বে সিরীয় এক বিশাল সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। সৈন্য বাহিনীর বদবখত লোকেরা এই 'হার্‌রাহ' নামক স্থানে নিতান্ত নির্মমতা এবং অবমাননার সাথে এই মহাত্মাদেরকে শহীদ করেন। তারা তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীর সম্মান হানিকর কাজে লিপ্ত থাকে। এ কারণেই একে 'হার্‌রাহ' ঘটনা বলা হয়। এটি শহর থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত।[২]

এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রাক্কলে ইয়াযীদের কুচক্রী দল শিশু এবং মেয়ে লোক ব্যতীত ১২,৪৯৭ জন লোককে হত্যা করে।

শহীদানের তফসীল			
১.	মুহাজির, আনসার, তাবেয়ীন, উলামা	১,৭০০	এক হাজার সাতশ
২.	সাধারণ লোক	১০,০০০	দশ হাজার
৩.	হাফিজে কুরআন	৭০০	সাতশ
৪.	কুরাইশ	৯৭	সাতন্নব্বই
	সর্বমোট	১২,৪৯৭	জন

'হার্‌রাহ'-এর এ লোমহর্ষক ঘটনা ছাড়াও ইয়াযীদের সৈন্য নানা প্রকার অত্যাচার অনাচার ও ধৃষ্টতাপূর্ণ অপকর্মে লিপ্ত হয়, যিনার মতো ঘৃণ্য অপরাধে

[১] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৫৯২
[২] (ক) আল-কুরতুবী, *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, পৃ. ১১৮৬; (খ) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৫৯২

জড়িয়ে পড়ে। বর্ণিত আছে যে, এ ঘটনার পর এক হাজার মেয়ে লোক অবৈধ সন্তান প্রসব করে। এসব দুষ্ট লোকেরা মসজিদে নববীর অমার্জনীয় অবমাননা করে। এ পবিত্র স্থানকে তারা ঘোড়ার আস্তাবলখানায় পরিণত করে। হুযুরে আকরম ﷺ-এর রওযায়ে পাক এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে (যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এখানে বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান আছে) ঘোড়ার পেশাব-পায়খানায় কলুষিত করে। আর লোকদের থেকে ইয়াযীদের জন্য এভাবে বায়আত নেওয়া হয় যে, ইয়াযীদ যদি ইচ্ছা করে, তোমাদেরকে বিক্রয় করতে পারবে, তোমাদেরকে স্বাধীনভাবেও রাখতে পারবে, সে যদি ইচ্ছা করে আল্লাহর বন্দেগিতেও রাখতে পারবে। আর যদি ইচ্ছা করে নাফরমানি করারও নির্দেশ দিতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যমআ ﵁ নামক এক ব্যক্তি যখন ইয়াযীদকে বললেন যে, বায়আত তো অন্ততপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের ওপর গ্রহণ করা চাই। তখনই ইয়াযীদ তাঁকে শহীদ করে দেয়।[১]

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, ইতিহাসবিদরা লিখেছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারা তখনকার দিনে জনপদ শূন্য হয়ে যায়। তখন মরুর পশু-পাখিরা সেখানকার ফল-ফুল উপভোগ করত। মসজিদে নববী কুকুরের আড্ডায় পরিণত হয়। হুযূর ﷺ-এর ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।[২]

তাবারানী ﵀ হযরত ওরওয়া ﵁ ইবনে যুবাইর ﵁ থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত মুআবিয়া ﵁-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁ ইয়াযীদের বায়আত এবং আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং তার নিন্দাবাদ করতে থাকেন। ইয়াযীদ এই কথা শুনে শপথ নিয়ে বলল, খোদার কসম আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁-এর গলায় বেড়ি পরাব। অতঃপর সে একজন দূতের মারফত তাঁকে ডেকে পাঠান। দূত এসে তাঁকে বলল, আপনি রৌপ্যের একটি ফাঁদ তৈরি করুন এবং ইয়াযীদের শপথ পূরণকল্পে গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দেন, আর এর ওপর স্বীয় কাপড় পরিধান করেন, তবে আশা করি আপনি রক্ষা পাবেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কখনো তার শপথকে বাস্তবায়িত করবেন না। আমি অন্যায়ের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করবো না। যতক্ষণ শক্ত পাথর দাঁতের নিচে নরম হবে না। অতঃপর আদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁ জনগণকে তাঁর বায়আত গ্রহণের এবং আনুগত্য স্বীকারের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এ দিকে পাপিষ্ট ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে ইকবার নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী সিরিয়া থেকে মদীনা অভিমুখে প্রেরণ

[১] (ক) আল-কুরতুবী, *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, পৃ. ১১৮৭; (খ) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০
[২] (ক) আল-কুরতুবী, *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, পৃ. ১১৮৭; (খ) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০

করে। তাদেরকে সে এ নির্দেশ দিয়েছিল যে, মদীনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরে মক্কা চলে যাবে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে হত্যা করবে। মুসলিম ইবনে ওকবা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম মদীনা শরীফের বাইরে চলে গেলেন। মুসলিম ইবনে ওকবা অবশিষ্ট লোকদের হত্যা করার পর মক্কা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করল। পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর সময় সে হুসাইন ইবনে নুমাইর কিন্দীকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-কে অবরোধ করার জন্য কামান নিক্ষেপ এবং অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দেয়। হুসাইন পথিমধ্যে থাকা কালেই ইয়াযীদের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। হুসাইন পালিয়ে গেল এবং সে তার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারল না।[১]

ইবনে জওযী (রহঃ) বলেন, ৬২ হিজরীতে ইয়াযীদ তার চাচাত ভাই উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে তার বায়আত গ্রহণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। উসমান মদীনাবাসীদের একটি দল ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যখন তারা ইয়াযীদের কাছ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন তারা ইয়াযীদকে গালি-গালাজ করতে লাগলেন, আর বলেন যে, সে ধর্মদ্রোহী, মদখোর, ফাসিক। সে কুকুর পালন করে। একথা বলে তাঁরা তার বায়আত বর্জন করল। ইয়াযীদের নিকট গমনকারী লোকদের মধ্যে হযরত মুনযির (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়াযীদ আমার বড় উপকার করেছে। সে আমাকে এক লক্ষ দিরহাম অনুদান দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে আমি সত্যকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। সে মদ্যপায়ী এবং বেনামাযী। তাঁর মুখ থেকে একথা শোনার সাথে সাথেই লোকজন তাঁর বায়আত প্রত্যাখান করল এবং আবদুল্লাহ ইবনে হানযলার হাতে বায়আত গ্রহণ করল। আর উসমানকে মদীনা থেকে বের করে দিল।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলতেন, যদি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণের আশঙ্কা না করতাম, তবে ইয়াযীদের বায়আত প্রত্যাখান করতাম না এবং তার মুকাবিলা করার ঝুঁকি গ্রহণ করতাম না।[৩]

ইবনে জওযী (রহঃ) আবুল হাসান আল-মাদায়িনী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদের পাপাচার এবং কুকর্মসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর মদীনাবাসীগণ মিম্বরের ওপর আরোহণ করে তার বায়আত প্রত্যাখ্যান করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আমার ইবনে হাফস আল-মাখযুমী (রাঃ) মাথা থেকে পাগড়ি নিক্ষেপ করে

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৩, পৃ. ৯২-৯৩, হাদীস: ২৩০

[২] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৬, পৃ. ৭; (খ) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১

[৩] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৬, পৃ. ১৯; (খ) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১

বললেন, ইয়াযীদ আমার বড় উপকার করেছে এবং আমাকে বিশেষ অনুদানে সম্মানিত করেছে কিন্তু সে একজন আল্লাহর শত্রু এবং মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি; আমি তার বায়আত এভাবে প্রত্যাখান করলাম, যেভাবে এ পাগড়িকে নিক্ষেপ করেছি। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জুতা নিক্ষেপ করে তার বায়আত প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে পাগড়ি এবং জুতাতে মজলিস বরে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মুতী'কে কুরাইশের এবং আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাকে আনসারের প্রশাসক নিযুক্ত করা হল। উমাইয়া বংশীয় লোকদেরকে মারওয়ানের গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ করা হল উমাইয়াগণ তাদের এ দুরাবস্থার সংবাদ ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে সৈন্য সাহায্যের আবেদন জানায়। ইয়াযীদ তাদের সাহায্যার্থে মুসলিম ইবনে ওকবাকে মদীনায় প্রেরণ করে। এ হতভাগা যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু মদীনাবাসীদের রক্ত স্রোত প্রবাহিত করার ঝুঁকি গ্রহণ করে। অতঃপর ইয়াযীদ একথাও ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি হিজাযে গমন করবে তাকে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র এবং সফরের যাবতীয় আসবাবপত্র ছাড়াও প্রত্যেককে একশ দীনার বখশিশ দেওয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে ১২ হাজার লোক হিজায গমনে রাজি হেয় গেল। এসব লোককে সেখানে প্রেরণ করে ইবনে মারজানাকে নির্দেশ দিল যে, তুমি সেখানে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধ কর। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ একজন ফাসিকের সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমি পয়গম্বর (সাঃ)-এর একজন আওলাদের হত্যা এবং হারাম শরীফে আল্লাহর ঘরের মধ্যে লড়াইয়ের ঝুঁকি নিতে পারি না। এরপর সে মুসলিম ইবনে ওকবাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। সে তাকে নির্দেশ দেয় যে, যদি কোন অঘটনা ঘটে তবে হুসাইন ইবনে নুমাইর আস-সাকুনীকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে। সে আরও নির্দেশ দিল যে, যার বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে তাকে তিনবার দাওয়াত দেবে, যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তবে তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর যদি দাওয়াত কবুল না করে, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিজয় লাভ করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। ইয়াযীদ আরও নির্দেশ দিল যে, মদীনার হারামে তিনদিন পর্যন্ত লুটপাঠ ইত্যাদি অনুমতি দেওয়া হল।

সেখানে সম্পদ, অস্ত্র এবং খাদ্য ইত্যাদি যা কিছু পাও তা সৈন্যদের জন্য হালাল করে দাও। তিন দিনের পর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। কেননা তিনি সেই পার্টিকে সমর্থন করেন না। যখন মদীনাবাসীদের নিকট এ খবর পৌঁছে তখন মদীনাবাসীগণ সমবেতভাবে ইয়াযীদের সৈন্যদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন বনী উমাইয়ার যে দলটি মারওয়ানের গৃহে অবরুদ্ধ ছিল, তাদের নিকট গিয়ে বললেন, তোমরা একথার প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা ধোঁকাবাজি, প্রতারণা এবং গোয়েন্দাগিরি করবে না এবং আমাদের শত্রুদের কোন প্রকার সাহায্য-

সহযোগিতা করবে না। তবে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি। অন্যথায় আমরা তোমাদের হত্যা করব। বনু উমাইয়ার সেই সব লোকজন মুনাফিকী করে মদীনাবাসীদের সাথে শামিল হয়ে মুসলিম ইবনে ওকবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসে। মারওয়ান ইবনে হাকাম গোপনে স্বীয় পুত্রকে মুসলিম ইবনে ওকবার নিকট প্রেরন করে একথা বলেন যে, মদীনায় তিনদিন যেন যুদ্ধ মওকুফ রাখেন। তিনদিন পর মারওয়ান মদীনাবাসীদের সাথে পরামর্শ করল এবং তাদেরকে বলল যে, তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ? তাঁরা বললেন, যুদ্ধ ব্যতীত গতি নেই। মারওয়ান বলল যুদ্ধ করা উচিত হবে না। এতে ফাসাদ বেড়ে যাবে। ইয়াযীদের হাতে বায়আত করাই আমি সমীচীন বলে মনে করি। কিন্তু মদীনাবাসীগণ ইহা পছন্দ করল না এবং ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য মদীনার বাইরে চলে গেলেন।

একদিকে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ﵁ যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপর দিকে মুসলিম বিনে ওকবা বার্ধক্য জনিত কারণে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে স্বীয় সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুতী' তাঁর সাত পুত্র সহকারে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করে শাহাদত বরণ করেন। মুসলিম ইবনে ওকবা তাঁর মস্তক মুবারক দ্বিখ-িত করে ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দেন। অবশেষে ইয়াযীদ বাহিনী বিজয় লাভ করে। ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী তাঁর নির্দেশ মোতাবেক মদীনা মুনওয়ারায় তিনদিন পর্যন্ত অত্যাচার অবিচার ব্যভিচার চালায়। সম্পদ লুটপাট করে এবং যিনার মতো জঘন্য কুকর্মে লিপ্ত হয়।[১]

ওয়াকেদী বলেন, যখন ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনীর মদীনার নিকট পৌঁছে তখন মদীনাবাসী পরস্পরের পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো মদীনার চতুর্দিকে দীর্ঘ পনের দিন অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পরিখা খনন করেন। মদীনার চতুর্দিকে তাঁরা কাঁটার বেড়া লাগিয়ে দেন এবং দুশমনের পথ অবরোধ করে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন, যার ফলে শত্রু বাহিনী মদীনায় প্রবেশ করতে বিশেষভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে মুসলিম ইবনে ওকবা ভীত হয়ে 'হার্‌রাহ'-এর এক কোণায় অবস্থান করে এবং মারওয়ানের নিকট এই মর্মে লোক প্রেরণ করে যে, যুদ্ধে জয় লাভ করার কোন একটা সুরাহা বের করতে, যাতে সফলকাম হওয়া যায়। মারওয়ান বনি হারিসার নিকট গমন করে তাদেরকে লোভ-লালসায় আকৃষ্ট করে মদীনার এক দিকে রাস্তা খুলে দিল। ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনী সে পথ দিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে এবং মদীনাবাসীগণ অপর দিক থেকে গুটিয়ে এসে শুধু সে

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৬, পৃ. ১২-১৫

দিকে এসেই যুদ্ধে লিপ্ত হন।[১]

ইবনে আবু খায়সামা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনার বৃদ্ধ লোকজন বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআবিয়া ﵁ তাঁর মৃত্যুকালে ইয়াযীদকে ডেকে বলেছিলেন, আমার মনে হয় মদীনাবাসীদের সাথে একদিন তোমাকে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। সে সময় তুমি মুসলিম ইবনে ওকবার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে নিও। কেননা এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আর কেউ নেই। পিতার মৃত্যুর পর যখন ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহণ করে তখন মদীনাবাসীদের সাথে তার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। সে পিতার নির্দেশ মতো এ সমস্যার সমাধান করে।[২]

কথিত আছে যে, একজন বুড়ো মেয়েলোক মুসলিম ইবনে ওকবার নিকট এসে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করল যে, আমার পুত্র বন্দি হয়েছে, আপনি তাকে মুক্তি দিন। সে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিল যে, তার ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে তার গর্দান দু'টুকরা করে যেন মায়ের হাতে তুলে দিতে। নির্দেশ মতো আমল করা হল এবং বৃদ্ধার হাতে তাঁর পুত্রের মস্তক সোপর্দ করে তাকে বলে দেওয়া হল, তুমি যে নিজের জীবনের মঙ্গল না চেয়ে পুত্রকে রেহাই দানের সুপারিশ করাতেই এ পরিণতি।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ﵁ যিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন; তাঁকে মুসলিম ইবনে ওকবার নিকট হাজির করা হয়। সে তাঁকে বলল, ইয়াযীদের বায়আত গ্রহণ কর। তিনি বললেন আমি আবু বকর ﵁ ও উমর ﵁-এর নীতি মোতাবেক বায়আত করেছি। এ সময় একজন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, এ একজন পাগল। একথা বলার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুসলিম ইবনে ওকবা হত্যাকাণ্ড এবং ফিতনা-ফাসাদে অতিশয় সীমালঙ্ঘনকারী ছিল বিধায় সে মুসরিফ (সীমালঙ্ঘনকারী) নামে অভিহিত হয়।[৩]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তাঁর *কিতাবুল হার্‌রাহ* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন ইয়াযীদ (তার) মুসরিফের নিকট এসে দেখতে পায় যে, সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত, সে তাকে লক্ষ্য করে বলল, যদি তুমি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হতে তবে আমি তোমাকে মদীনা অভিযানে প্রেরণ করতাম। কেননা আমি তোমার থেকে অধিক আর কাউকে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত বলে মনে করি না। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ﵁ আমাকে তাঁর মুমূর্ষ অবস্থায় অসিয়ত করেছেন যে, যদি হিজাযবাসীদের সাথে তোমার কোন অঘটন ঘটে তবে তুমি মুসলিম ইবনে ওকবার নিকট তোমার সমস্যার সমাধান চেয়ে

[১] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯১
[২] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯০-২৯৪
[৩] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৯৬-২৯৭

নেবে। একথা শোনামাত্র মুসলিম ইবনে ওকবা ওঠে দাঁড়ায় এবং বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি, এ কাজ আমি ব্যতীত আর কারও ওপর ন্যস্ত করবেন না। কেননা আমার থেকে মদীনাবাসীদের আর কেউ বড় শত্রু নেই। এ সম্পর্কে আমি একটি স্বপ্নও দেখেছি যে, জান্নাতুল বাকীর একটি বৃক্ষ এর শাখা-প্রশাখাসহ হযরত উসমান -এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার ফরিয়াদ করছে। আমি বৃক্ষটির যখন নিকটে যাই তখন বলতে শুনলাম, এ কাজ মুসলিম ইবনে ওকবার দ্বারাই সম্পন্ন হবে। সে দিন থেকে আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমিই মদীনাবাসীদের হত্যা করব এবং এ আশায় মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই বলে আমিই হযরত উসমান -এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করব। যদি মদীনায় প্রবেশে বাধা প্রাপ্ত হও এবং বায়আত গ্রহণে ও আনুগত্য স্বীকারে মদীনাবাসীগণ রাজি না হয়, তবে তুমি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করবে। তিনদিন পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে। কাউকে বাদ দেবে না। আর তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করে নেবে। অবশ্য যদি তারা বায়আত গ্রহণ ও আনুগত্য স্বীকার করে তবে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। সেখান থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর -এর কাছে চলে যাবে এবং তার কাজ সম্পন্ন করবে।

বর্ণিত আছে যে, মদীনার হারামের শহীদগণকে দর্শন করে সে বলত, আমি এ সব লোকদেরকে হত্যা করার পরও যদি দোযখে যাই, তবে আমার থেকে হতভাগা আর কেউ নেই।

মারওয়ানের গোলাম যকওয়ান বলে, একদিন মুসলিম ইবনে ওকবা রোগের ওষুধ সেবন করার পর খাবার তালাশ করল। অথচ ডাক্তারগণ তাকে নিষেধ করেছিল যে, ওষুধ সেবনের পর খাদ্য গ্রহণ করলে অন্য আর ওষুধ ক্রিয়াশীল হবে না। সে বলল, এখন আমি জীবিত থাকার আর কেন আশা করব? আমি তো হযরত উসমান -এর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে এখন স্বস্তি বোধ করছি। আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। মৃত্যু ব্যতীত এখন আমার কাছে আর কোন কিছু প্রিয় না। এখন মৃত্যুই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমার বিশ্বাস এ সব নাপাকদেরকে হত্যা করার ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[১]

সাইয়িদ সামহূদী বলেন, তার গুনাহ মার্জনার ধারণা নিতান্ত মূর্খতা, অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক কেননা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত এমন একদল বেকসুর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামকে হত্যা করা এমন এক অপরাধ ও পাপের কাজ, যা ক্ষমা করা দূরের কথা এর অশুভ পরিণতি থেকে তার রেহাই পাওয়াও

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৬, পৃ. ১৬

অসম্ভব; এ তার দুঃস্বপ্ন সাধমাত্র।

যেসব সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় জোরপূর্বক অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ফেরেশতা কর্তৃক গোসল প্রাপ্ত হযরত হানযালার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ, তিনি তাঁর সাত পুত্রসহ শহীদ হন। আর রাসূল -এর ওযুর বর্ণনা প্রদানকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাইদ, হযরত মাকল ইবনে সিনান, যিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের পতাকা যার হাতে ছিল।

বর্ণিত আছে যে, পাপিষ্ট মুসলিম ইবনে ওকবা ও মারওয়ান ইবনুল হাকিম 'হারামে মদীনার' শহীদগণের লাশের চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে কৌতুক তামাশায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা -এর ওপর নিপতিত হলে সে দেখতে পায় যে, তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুল আসমানের দিকে উত্তোলন করে রেখেছেন। এ দৃশ্য দেখে মারওয়ান বলল, যেমনি তুমি মৃত্যুর পরে তোমার আঙ্গুল আসমানের দিকে উত্তোলন করেছ, তেমনি আমরাও কি তোমার জীবদ্দশায় তোমারই হাতে নিপীড়ত হয়ে কতবার আমাদের আঙ্গুল আসমানের দিকে উত্তোলন করিনি? আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ এবং দু'আ মুনাজাত করিনি? একথা শোনা এক ব্যক্তি বলে ওঠল, এদের অবস্থা যদি তোমার কথা মতো হয়, তবে আমাদের সকলের দু'আ এ সব জান্নাতবাসীর পক্ষে ছিল। মারওয়ান বলল, এরা ধর্মবিরোধী এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল। এ ঘটনার পর মারওয়ান ইয়াযীদের কাছে চলে যায়। ইয়াযীদ তার বিশেষ শুকরিয়া আদায় করে এবং তাকে তার একান্ত আপন জন হিসেবে গ্রহণ করে।

ইবনুল জওযী সনদের সূত্র ধরে সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'হাররাহ'র অঘটনের সময়ে রাতে আমি একজন ব্যতীত আর কেউ মসজিদে নববীতে উপস্থিত হত না। শাম দেশীয় লোকজন আমাকে মসজিদে দেখে বলত এ পাগল বুড়ো এখানে কি করছে? প্রত্যেক নামাযের সময় হুজরা শরীফ থেকে আযান-ইকামাতের আওয়াজ শুনে আমি নামায পড়তাম।[১]

'হাররাহ'র এই হৃদয় বিদারক ঘটনার প্রাক্কালে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী সর্বশেষ লাঞ্ছিত হন। বর্ণিত আছে যে, এ গুণ্ডা বাহিনী তাঁর দাড়ি মুবারক গোড়া থেকে উচ্ছেদ করে ফেলে। লোকেরা তাঁর দাড়ির এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি দাড়ি নিয়ে খেলেছেন এবং দাড়ি উচ্ছেদ করে ফেলেছেন? তিনি উত্তর দিতেন, না। বরং শাম দেশের লোকজন আমার ওপর এ অত্যাচার করেছে। সিরীয় একদল লোক আমার ঘরে প্রবেশ করে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে যায়। তারপর আরেকদল প্রবেশ

[১] ইবনুল জওযী, *মুসীরুল আযমি আস-সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন*, পৃ. ৪৯০, ক্র. ৪৭৬

করে ঘরের মধ্যে কোন আসবাবপত্র না পেয়ে তারা আমার দাড়ি নিয়ে খেলা করে উচ্ছেদ করে ফেলে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। এ সবদুষ্ট লোকেরা এভাবে আরো কত যে অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বর্ণিত আছে যে, যখন দুষ্ট মুসলিম ইবনে ওকবা মদীনাবাসীদের থেকে জোরপূর্বক ইয়াযীদের জন্য বায়আত নিচ্ছিল, তখন অধিকাংশ লোক ভয়ে বায়আত গ্রহণ করে আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়। এ সময়ে কুরাইশ বংশীয় একজন লোক বলে, আমি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর বায়আত করেছি গুনাহের ওপর নয়। একথা বলায় মুসলিম তার বায়আত কবুল না করে তাকে কতল করার নির্দেশ দেয়। তিনি যখন শহীদ হয়ে যান তখন তাঁর মাতা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দান করেন, তবে আমি এ পাপিষ্ট মুসলিমকে মৃত অথবা জীবিত জ্বালিয়ে ফেলব।

উল্লেখ্য যে, হতভাগ্য মুসলিম মদীনা মুনাওয়ারার লুটপাট এবং হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। তখন পূর্ব থেকে সে যে রোগে আক্রান্ত ছিলো তিন দিন পর সে উক্ত রোগেই মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে পৌঁছে যায়। এ সময় সেই স্ত্রীলোকটি তার শপথ মুতাবেক তিনজন গোলামকে সাথে নিয়ে মুসলিমের কবরে উপস্থিত হয়। যখন কবর খনন করা হয় তখন দেখা গেল যে, এক বিরাট সর্প তার গর্দান বেষ্টন করে নাকের হাঁড় চুষে খাচ্ছে। লোকেরা এ অবস্থা দর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারা সকলে ওই স্ত্রীলোকটিকে বলল, আল্লাহ তা'আলা তার অপকর্মের শাস্তি প্রদান করেছেন এবং তোমার তরফ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তাই এ শাস্তিই যথেষ্ট। ওই স্ত্রীলোকটি বলল না, এটা হবে না। খোদার শপথ গ্রহণ করে আমি যে পণ করেছি তা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পূর্ণ করব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করব না। অতঃপর স্ত্রীলোকটি বলল, তাকে তার পায়ের দিক থেকে বের কর। কিন্তু দেখা গেল তার পায়েও অপর একটি সাপ বেষ্টন করে আছে। এরপর স্ত্রীলোকটি ওযু করে দু'রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করল যে, খোদাওন্দ করীম। আপনি জানেন, মুসলিম ইবনে ওকবার ওপর আমার রাগ একমাত্র আপনারই সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং আপনি আমাকে সুযোগ দিন যাতে আমি তাকে কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে দিতে পারি। এরপর একখণ্ড গাছের টুকরা নিয়ে সাপটির লেজে আঘাত করায় সাপটি চলে যায়। অতঃপর লাশটি কবর থেকে বের করে জ্বালিয়ে দেয়।

ওয়াকেদী বলেন, আমার যাচাই মতে, উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিল ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যমআ'র মাতা। যখন মুসলিম ইবনে ওকবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে মদীনা

থেকে মক্কায় যাচ্ছিল তখন এ স্ত্রী লোকটিও তার পিছনে ধাওয়া করে। যখন তার মৃত্যু সংবাদ তার কাছে এসে পৌঁছে তখন সত্বর সে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মুসলিম ইবনে ওকবাকে কবর থেকে বের করে তাকে শূলিবিদ্ধ করে।

যাহ্হাক বলেন, যে সব লোক মুসলিম ইবনে ওকবাকে শূলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছে তারাই আমার কাছে এসে বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা তার ওপর পাথরও নিক্ষেপ করেছে। এ রিওয়ায়তের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয়ার কথা নেই। হতে পারে শূলিবিদ্ধ করার দু'তিন দিন পরে জ্বালিয়ে দেয়ার আগে তাকে শূলিতে দেখেছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন, মুসলিম ইবনে ওকবা হাররাহ'র তিনদিন পর মারা যায়। মদীনা মুনাওয়ারার পথিমধ্যে রক্ত এবং পুঁজে তার পেট পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নিতান্ত খারাপ অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে সে বেহায়া অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার সাথে বলে, 'হে আল্লাহ! কালিমায়ে শাহাদাতের পরে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় নেক আমল, যা আপনার দরবারে গ্রহণযোগ্য বলে আমার ধারণা। মদীনাবাসীদের হত্যা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন যদি আমার এমন নেক আমল সত্ত্বেও আপনি আমাকে দোযখে নিয়ে যান তবে আমার মত হতভাগা আর কেউ হতে পারে না।

এরপর মুসলিম ইবনে ওকবা হুসাইন ইবনে নুমাইরকে ডেকে এনে বলল, আমিরুল মুমিনীন (ইয়াযীদ) আমার পরে তোমাকেই প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। তুমি অতি সত্বর মক্কায় পৌঁছে আবদুলাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর কাজ সম্পন্ন কর। তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করবে না। কামানের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি তিনি কাবা গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে এতেও কোন পরোয়া করোনা, কামান দাগিয়ে যাও। এ বদবখতের নির্দেশ মত হুসাইন ইবনে নুমাইর চব্বিশ দিন (অপর এক রিওয়ায়ত মতে চৌষট্টি দিন) যাবৎ মক্কা শরীফকে ঘেরাও করে রাখে এবং ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আর কা'বা শরীফের দিকে কামানের গুলি ছোঁড়ে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বর্শার মাথায় আগুন লাগিয়ে দেয়। হঠাৎ 'দমকা হাওয়া' প্রবাহিত হওয়ায় কা'বা গৃহে আগুন ধরে যায়। ইতিমধ্যে ইয়াযীদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সে মলউন প্রেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণের পর সিরিয়া দেশীয় এবং বনি উমাইয়ার লোকজন চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর সবাই অপমানের বোঝা নিয়ে পরাজয় বরণ করে পলায়ন করে।

উল্লেখ্য যে, 'হাররাহ'র ঘটনা তেষট্টি হিজরীর যিলহজ্জ মাসের সাতাশ অথবা আটাশ তারিখ বুধবারে সংঘটিত হয়। মুসলিম ইবনে ওকবা চৌষট্টি

হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম তারিখে মারা যায়। মক্কার সংঘর্ষ এবং কামানের দ্বারা বায়তুল্লাহ শরীফে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, চৌষট্টি হিজরীর তেসরা রবিউসসানী শনিবারে। 'হাররাহ' ঘটনার পর রবিউস সানীর প্রথম তারিখে ইয়াযীদের মৃত্যু হয়। সামহূদী *কিতাবুল ওয়াফা* নামক গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ–৩

রাসূলে খোদা ﷺ এ পবিত্র নগরীর অভূতপূর্ব ঘটনাবলি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন এবং তাঁর ইরশাদ মোতাবেক এ শহরে সেগুলো সংঘটিতও হয়েছে এর মধ্যে (হিজাযের আগুন) অন্যতম। এ পবিত্র নগরী যা 'রহমত' এবং 'শাফাআত'(সুপারিশ)-এর স্থান এখানে এমন ঘটনা সংঘটনের রহস্য ও হিকমত হচ্ছে, পাপী লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যায়। এ অভূতপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে হযরত ﷺ-এর রহমতের সাগর গজবের এ আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, ৬৫৪ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসের পহেলা তারিখ থেকে জমাদিউল আখিরের ৩রা তারিখ পর্যন্ত মদীনা শরীফে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এ সময়ে মেঘের গর্জনের মতো ভয়ঙ্কর গর্জন হতে থাকে এবং ঘর-বাড়ি গাছ-পালা সব কিছু দুলতে থাকে এমনকি একই রজনীতে ১৪ অথবা ১৮ দফা পর্যন্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। জমাদিউল আখির মাসের তৃতীয় দিবস ইশার নামাযের পর হিজাযের দিক থেকে আগুনের একটি শহর প্রজ্বলিত হয়। মনে হচ্ছিল, যেন একটি কিল্লা অথবা বড় শহরজুড়ে এ অগ্নিশিখা জ্বলছে। আরও মনে হচ্ছিল যেন এক বিরাট জনগোষ্ঠী এক অনল শিখাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনল শিখা যে পাহাড়ের ওপর দিয়ে যেত ওকে ছাই ভস্ম করে দিত আর তামার ন্যায় গলিয়ে ফেলত। মেঘের ন্যায় গর্জন এবং সাগরের ঢেউয়ের মতো তরঙ্গ উত্থিত হত। আগুনের মধ্যে লাল এবং নীল বর্ণের লহর পরিলক্ষিত হত। যখন অগ্নিশিখা মদীনার দিকে এগিয়ে আসে তখন শীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়।[১]

সে যুগের বিখ্যাত আলিম কাস্তাল্লানী রহ. বলেন, সে আগুনের অনল শিখা পাহাড় পর্যন্ত হারামে নববী এবং মদীনা শরীফের সমুদয় স্থানকে সূর্যের আলোকের মতো আলোকিত করেছিল। রাতের বেলা লোকেরা সে আগুনের আলোতে কাজ-কর্ম করত। সে সময় চন্দ্র-সূর্যের আলো যেন বেকার হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লেগেছে। বর্ণিত আছে যে, ইয়েমেন ও বসরা থেকে লোকেরা মদীনার অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করেছে।[২] হুযূর আকরম ﷺ-

[১] আল-কুরতুবী, *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, পৃ. ১২৩৬
[২] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩০৫

এর একটি হাদীসের দ্বারা এর যথাযথ সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'হিজাযে এমন এক আগুন বের হবে যার আলোতে বসরা শহরের উটের গর্দান প্রত্যক্ষ করা যাবে।'[১]

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, এ অনল শিখার দৈর্ঘ্য এক ফার্লং, প্রস্থ চার ফার্লং গভীরতা চার হাত পরিমাণ ছিল। এটি বন্যার মতো প্রবাহমান এবং সাগরের ঢেউয়ের মত উচ্ছাসিত ছিল। এর প্রখরতা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, এতে পাথরসমূহ বিগলিত হয়ে পথিমধ্যে এভাবে স্তূপকৃত হয়ে পড়েছিল যে, অনেকদিন যাবত মানুষ এবং পশুদের রাস্তা পারাপার বন্ধ ছিল। এতে এ রহস্য নিহিত ছিল যে, মদীনা আক্রমণকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অধিকাংশ লোকজন এ সড়ক দিয়েই যাতায়াত করত। এখন পাথরের পথ অবরোধ হওয়ায় তাদের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

تو پیہ ندار کہ در کار خدمت خداوند خطا است

زانکہ او ہر چہ کند عین صلاح است وصواب

'আল্লাহ তা'আলার কাজ গলদ বলে তুমি মনে করোনা, কেননা তিনি যা কিছু করেন তা খুবই কল্যাণকর ও সঠিক।'

মুদ্দা কথা এই যে, এ আগুন কত যে অদ্ভূত ধরনের ছিল তা বর্ণানাতীত। মদীনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ 'জামাল মাতারী' বলেন, এ আগুনের একটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে, তা প্রস্তরকে গ্রাস করত কিন্তু বৃক্ষরাজির ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করত না। মদীনার প্রশাসক আমির ইয্যুদ্দীনের গোলাম বলেন, মদীনার আমির আমাকে এবং অপর এক ব্যক্তিকে সে আগুনের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে প্রেরণ করেন। যখন আমরা আগুনের সন্নিকটে পৌঁছি আগুনের কোন উষ্ণতা আমাদের অনুভব হয়নি। অথচ আমরা দেখলাম যে, আগুন পাহাড়কে গলিয়ে দিচ্ছে। আমি তীর রাখার পাত্র থেকে তীর বের করে ওদিকে তীর নিক্ষেপ করলাম। দেখা গেল, তীরের পাখা জ্বলে গেছে। কিন্তু গাছ জ্বলেনি।[২]

ঐতিহাসিক মাতারী বলেন, এ ঘটনায় আমার এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে আগুন গাছকে জ্বালিয়ে না দেওয়া নবী করীম ﷺ-এর হারাম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই নিদর্শন। কেননা হুযূর আকরম ﷺ সৃষ্টিকুলকে মদীনা মুনাওয়ারার হারামের সম্মান এবং আদব করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৩]

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৯, পৃ. ৫৮, হাদীস: ৭১১৮; হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَىٰ».
[২] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩১২
[৩] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩১৩

কিন্তু আল্লামা কাস্‌তাল্লানী বলেন, যে আগুনের উষ্ণতা এত প্রখর ছিল যে, আগুন থেকে দু'তীর পর্যন্ত নিকটে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগ্নিশিখা তরঙ্গ ভয়ঙ্কর সেনাবাহিনীর মতো মনে হচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, আমি একজন নির্ভরযোগ্য লোকের মুখে শুনেছি যে, মদীনার উপাত্যকার মধ্যে একটি বিরাট পাথর পড়েছিল যার অর্ধেক ছিল হারামের ভেতরে আর বাকি অর্ধেক ছিল হারামের বাইরে। যে অংশ বাইরে ছিল এই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু হারামের ভেতরের অংশের নিকট যখন আগুন পৌঁছে তখন নিভে যায়।[১] 'জামাল মাতারী'ও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত কথার মধ্যে কিছু পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে সাইয়িদ আলাইহির রহমাহ বলেন, আল্লামা কাস্‌তাল্লানীর কথাই সত্য ও গ্রহণযোগ্য। কারণ তিনি সে সময়েরই লোক। তিনি উল্লিখিত আগুন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা দেখে শুনেই বলেছেন। হিজাযের এ অনল শিখা সম্পর্কে তিনি একটি কিতাবও লিখেছেন যাতে তিনি এ আগুনের অবস্থাদি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বাকি পাথরের বাইরের অংশ আগুনের ছোঁয়া না লাগা, এটি আমাদের নবী করীম ﷺ-এর মু'জিযা, যা তার ইন্তিকালের এতদিন পরে প্রকাশিত হলো। এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ আগুন যখন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং হযরত ﷺ-এর মু'জিযার অন্তর্গত সুতরাং এও সম্ভব যে, বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন লোকের নিকট এ আগুন বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কেউ গরম অনুভব করেছে আর কেউ ঠাণ্ডা অনুভব করেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত এবং নবী করীম ﷺ-এর ক্ষেত্রে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তবে হারামে নববীর মধ্যে যে আগুনের প্রভাব বিস্তার ঘটেনি, এতে উভয় লেখকের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত অগ্নিশিখা যখন মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ধাবিত হয়, তখন মদীনার আমির এবং কাজী সমস্ত মদীনাবাসীকে সাথে নিয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে এবং অত্যাচার, অনাচার ও জুলুম পরিহার করে সকলেই আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায়ে সচেষ্ট হয়। এ ছাড়া তারা সকল গোলামকে মুক্তি দেয়। যাতে আল্লাহর মাগফিরাত এবং ক্ষমার সাগরে জোয়ার আসে। জুম'আ এবং শনিবারের সমস্ত মদীনাবাসী স্ত্রী, পুত্র, ছোট বড় সকলেই হারাম শরীফে একত্রিত হয়ে রাতযাপন করে এবং রওযায়ে পাকের চতুর্দিকে উন্মুক্ত মস্তকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-এর বরকতে সে অনল শিখার মুখ উত্তর দিকে ফিরিয়ে দেন এবং এ পবিত্র নগরীর অধিবাসীদেরকে তাঁর রহমতের আশাবাদী করেন। এমন

[১] আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩১৩

কি আগুনের যে লেলিহান শিখা সমস্ত বন-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছিল, উহাও ওদিকে ফিরে যায়।

ঐতিহাসিকগণ এ আগুনের স্থায়িত্বের সময় সীমা তিন মাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা কাস্‌তাল্লানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সর্বপ্রথম এ আগুন ৬ জমাদিউল আখির শুক্রবার দিন দৃষ্টিগোচর হয় এবং ২৭ রজব রবিবার দিন এর সমাপ্তি ঘটে। এ হিসেবে সর্বমোট ৫২ দিন হয়। এ উভয় বর্ণনার মধ্যে মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, কয়েকদিন যাবত এ আগুনের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কখনও তা খুব জোরে জ্বলত, আবার কখনো নিভো নিভো প্রায় হত। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য দেওয়া যেতে পারে যে, আল্লামা কুসতলানী শুধু এসব দিবসসমূহ হিসেবে করেছেন, যে দিনগুলোতে আগুনের প্রভাব বেশি ছিল। আর অপরাপর ঐতিহাসিকগণ সমুদয় কালের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি সেই আগুনের বর্ণনা যে, যা 'দারুল আবরার' মদীনা শরীফে পরিদৃষ্ট হয়েছিল এবং রাসূলে মকবুল ﷺ-এর ওয়াসীলায় এর কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়নি।

আগুনের এ অভূতপূর্ব ঘটনা ব্যতীত এ বছর বিশ্বে আরও অনেক দুর্যোগ নেমে আসে। বাগদাদের দাজলা (ইউফ্রোটিস) নদীতে এত তীব্র গতিতে জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল যে, এতে অনেক অট্টালিকা ঘরবাড়ি জলমগ্ন হয় এবং বহু গৃহাদি ভেঙে পড়ে।

এ আগুনের আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় বছর ইসলামের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে এক মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। মধ্য এশিয়ার তাতারী সৈন্য দল বাগদাদের আব্বাসী বংশীয় খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাগদাদ নগরী অবরোধ করেন এবং খলীফাসহ অপরাপর বহু মুসলমানকে শহীদ করে। একমাসেরও অধিক সময় তাতারী কাফিরদের তলোয়ার মুসলমানদের মাথার ওপর আঘাত হানে। পবিত্র ধর্মীয় কিতাবসমূহ ঘোড়ার পদতলে দলিত হয়। বাগদাদের মাদরাসা মুস্তানসারিয়ার দীনী কিতাবসমূহকে ঘোড়ার আস্তাবলখানার নিচে ইটের স্থলে বিছানায় পরিণত করা হয়। বাগদাদ নগরী সম্পূর্ণ জনপদ শূন্য হয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় বাগদাদ নগরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অধিকাংশ ঘরবাড়ি, দালান-কোটা এবং আব্বাসী ও বারমাকী খান্দানের অট্টালিকাসমূহ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। চতুর্দিকে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় থেকে আব্বাসী খিলাফতের সম্পূর্ণরূপে পতন ঘটে। এ সম্পর্কে শায়খ সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

اسماں راحق بود گر خوں بیارد برزمیں
بزوال ملک مستعصم امیر المومنین

'আমিরুল মুমিনীন খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহর খিলাফতের পতনের ওপর যদি আসমান রক্ত বর্ষণ করে, তবে ইহা তার হক, যা সমীচীন হবে।'

[অনুবাদক]

উল্লিখিত আগুন নিভে যাবার পর হঠাৎ একদিন মসজিদে নববীতে আগুন ধরে যায়। এর তাৎপর্য এই যে, যাতে মানুষ একথা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের রহস্য উদঘাটন করা মানব শক্তি বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই।

ظ کند ہر چہ خواہد بروے حکم نیست۔

'তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তার ওপর কারো আধিপত্য নেই।'

তিনি যা করেন, তার হেতু জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু মানুষ তাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। উল্লেখ্য যে, মসজিদে নববীতে যে আগুন লেগেছিল তা গায়িবী আগুন ছিল, যা স্বাভাবিক কারণের আওতাভুক্ত নয়।

এমন অস্বাভাবিক ঘটনা আল্লাহ তা'আলার কুদরতেই সংঘটিত হয়। যা স্বাভাবিক কারণে প্রকাশ পায়, এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কিন্তু যা অস্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পায় এতে আশ্চার্যন্বিত হওয়া যায়। যেমন যদি কোন ব্যক্তি নবীর নুবুওয়াত অথবা ওলির বেলায়তকে অস্বীকার করে এবং যে ব্যক্তি সে নবীর মু'জিযা অথবা সে ওলির কারামতের দ্বারা জীবিত হয়। এতে নবীর নুবুওয়াত এবং ওলির বেলায়ত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন রূপ আশ্চর্য মনে হয় না। কিন্তু যদি কোন পাথর বা কোন জন্তু নুবুওয়াত বা বেলায়তকে অস্বীকার করে, তবে এতে আশ্চর্যবোধ হয়। কেননা পাথর বা জন্তুর কথা বলা অস্বাভাবিক।

তৃতীয় অধ্যায়
মদীনার প্রাচীন বাসিন্দা

মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীন বাসিন্দাদের সম্পর্কে সীরাত এবং ইতিহাসবিদ আলেমগণ হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, যখন নূহ আলাইহিস সালাম-এর জাহাজ থেকে লোকজন বেরিয়ে আসে, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। এসব লোক দশদিন পর্যন্ত বাবুল (ব্যবলিয়ান) শহরে উপনীত হয় এবং ৩৬ মাইল ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ যখন তাদের বংশধর বেড়ে যায় তখন তারা সকলে ঐকমত্য পোষণ করে 'নমরূদ' ইবনে কেনান ইবনে হামকে তাদের বাদশাহ নিয়োগ করে। পরে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী এবং কুফরী প্রকাশ পায়, তখন তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। এবং সেখান থেকে প্রস্থান করে এক এক দল এক এক দিকে চলে যায়। তখনকার সময়ে পৃথিবীতে ৭২ রকমের ভাষার সৃষ্টি হয়। তাদেরই একদল সাম ইবনে নূহ আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিল। আল্লাহ তা'আলার ইলহামের মা'রিফাত তারা আরবি ভাষা আবিষ্কার করে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় বসতি স্থাপন করেন। সর্বপ্রথম তারাই উল্লিখিত স্থানে চাষাবাদ শুরু করে। তারা সেখানে খেজুর বৃক্ষ লাগায়। এদেরকে 'আমালিকা' বা আমালিক বলা হত। কেননা এরা আমুলক ইবনে আর্‌ফাখ্‌শাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিল। দীর্ঘদিন পরে তারা সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং অনেক দেশ তাদের করতলগত হয়। ক্রমে বাহরাইন, আম্মান, হিজায, সিরিয়া এবং মিসরে তাদের প্রভূত্ব কায়িম হয়। শামের নরপতি এবং মিসরের ফিরাউন এই গোত্রের বংশধর। হিজায অঞ্চলে আরকম ইবনে আবরম তাদের বাদশাহ ছিল। তারা অধিক দীর্ঘজীবী ছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল এবং খুবই আয়েশ-আরামে তারা জীবন যাপন করত।[১]

বর্ণিত আছে যে, চারশ বছরের আগে কোন লোকের জানাযা বের হত না এবং তাদের ক্রন্দনেরও শব্দ শোনা যেত না। আমালিকা বংশের পরে এ পবিত্র ভূমিতে ইহুদিরা আগমন করে বসতি স্থাপন করে। মদীনায় ইহুদিদের আগমন এবং বসতি স্থাপনের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট আলিম মুহাদ্দিস রযীন আবুল মুনযির শরকী থেকে রিওয়ায়ত করেন, মদীনা শরীফের ভিত্তি সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (গসিলুল মালায়িকা রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদীস শুনেছি। এ ছাড়াও

[১] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১, পৃ. ২৪৩; (খ) আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ১, পৃ. ৭৩

আরও একটি হাদীস একজন কুরাইশী লোকের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকেও লাভ করেছি। উভয় হাদীসের বিষয় বস্তুকে একত্রিত করেছি। তা হল এই যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) পবিত্র হজ্জ আদায় উপলক্ষে মক্কায় এসেছিলেন, তাঁর সাথে বনি ইসরাইলেরও অনেক লোকজন এখানে আসেন। পবিত্র হজ্জ সমাপনান্তে যখন তাঁরা স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন তাঁরা পবিত্র মদীনা শরীফের পথেই গমন করেন। বনি ইসরাইলগণ আখিরী যমানার পয়গম্বর (সাঃ)-এর দেশ মদীনা মুনাওয়ারা সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাতের মধ্যে অধ্যয়ন করেছিলেন, এ কারণে তাদের একটি দল হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে এখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা হিজাযের বেদুঈনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে তাদের রীতি-নীতি ও ধর্মের অনুসরণ করেন। এ বর্ণনা মতে ইহুদিরাই এখানকার প্রথম বাসিন্দা বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ প্রথমোক্ত বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে সর্বপ্রথম আমালিকা বংশীয় লোক এসেছে, এরপর ইহুদিরা আগমন করেছে।[১]

ইবনে যুবালা তাঁর মুসনদের মধ্যে ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন আমালিক বংশীয় লোকজন এ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা, মদীনা এবং হিজায অঞ্চল তাদের করতলগত হয় তখন এ অঞ্চলে তাদের দৌরাত্মা বেড়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন পাপাচার, অত্যাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়।

মিসরের বাদশাহ ফিরাউন সদলবলে নীল নদে ডুবে যাবার পর হযরত মূসা (আঃ) সিরিয়া, কেনান ইত্যাদি দেশসমূহ বিজয়ের উদ্দেশ্যে আমালিকা জাতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য এক বিশাল সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, শিশু এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত সকলকেই যেন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তার অপার করুণায় হযরত মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আমালিকাদের বাদশাহ আরকম ইবনে আবুল আরকানসহ সকলকেই হত্যা করা হয়।

আমালিকাদের মধ্যে একজন খুবই সুন্দর, সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক ছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর সৈন্যদল যুবকটিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তাঁরা এ সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ)-এর পুনঃনির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন কিন্তু পুনঃনির্দেশ তলবের পূর্বেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। যখন বনি ইসরাইল এ সুসংবাদ প্রাপ্ত হন যে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রেরিত সৈন্যদল আমালিকার ওপর বিজয় লাভ করেছে তখন তারা তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে তাদেরকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য গমন করে। রণক্ষেত্রের অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যখন তারা

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ২, পৃ. ৩০৩

জানতে পারে যে, তারা তাদের সবাইকে হত্যা করেছে। কিন্তু একজন নওজোওয়ানকে তার অসাধারণ সৌন্দর্য, লাবণ্য ও মনোহারিত্বের কারণে হত্যা করা হয়নি। এ খবর শ্রবণের পর বনি ইসরাইলরা নাখোশ হয়ে যায়। তারা বলল তোমরা পয়গম্বরের নির্দেশ অমান্য করেছ; কেন তোমরা তাকেও হত্যা করলেনা? এখন আমাদের মধ্যে তোমাদের স্থান নেই। একথা শ্রবণের পর উক্ত সৈন্যদল পরস্পরের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই চলে যাবে। অতঃপর তারা হিজাযে চলে যায়। আমালিকা গোত্র ধ্বংস হবার এবং ইহুদিদের হিজাযে আগমনের এটাই কারণ।

ইবনে যুবারা এও বলেছেন যে, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক 'তবরী' যা কিছু বলেছেন তাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, যে সময়ে বাদশাহ বুখতে নসর সিরিয়া দখল করে বায়তুল মুকাদ্দাস বিরান করে দেয়, সে সময়েই ইহুদিগণ হিজাযে আগমন করে। কোন কোন সীরাত লেখক হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, যখন বাদশাহ বুখতে নসর বনি ইসরাইলের ওপর অকথ্য জুলুম অত্যাচার চালায় তখন তারা আরব ভূখণ্ড ব্যতীত চলে যাবার আর কোন স্থান খুঁজে পায়নি। বনি ইসরাইলের আলিম ও মাশায়েখগণ তাদের ধর্ম পুস্তকে একথা অধ্যয়ন করেছিলেন যে, আখিরী যমানার পয়গম্বর প্রশংসনীয় গুণাবলিসহ আরবের যা, তুন্নাখান খেজুর গাছের দেশে আবির্ভূত হবেন। যখন এরা সিরিয়া থেকে বেরিয়ে আরবের দিকে আসে তখন তারা যে কোন স্থানে তাদের কিতাবের বর্ণিত মুহাম্মদী বস্তীর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতঃ সেখানে তারা অবতরণ করতেন। এমনিভাবে চলতে চলতে তারা আরবের ইয়াসরব নামক স্থানে পৌঁছেন এবং এখানে তারা মুহাম্মদী বস্তীর সমস্ত আলামত দেখতে পায়। বনি ইসরাইলের মধ্যে একটি দল হযরত হারুন (আঃ) এর বংশধর ছিলেন। তাঁরা ইয়াসরবে বসতি স্থাপন করেন। অপরাপর বনি ইসরাইলগণ এর আশেপাশে 'খায়বার' ইত্যাদিতে চলে যায়।

ইহুদিদের মৃত্যুকালে তারা তাদের আওলাদ ফরযন্দকে এভাবে ওসিয়তনামা লিখে দিয়ে যেত যে, যদি তাহাদের যমানায় শেষ যুগের পয়গম্বরের আবির্ভাব হয় তবে তাঁরা যেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর বায়আত থেকে বিরত না থাকে। কিন্তু খোদার তকদির অটল। নুবুওয়াতের সূর্য উদিত হবার পর পূর্বাঞ্চলীয় আনসারগণ এ উপদেশ পালনে অগ্রগামী হলেন, যা পরে বর্ণিত হবে। কিন্তু অদূরদর্শী ইহুদিগণ হিংসায় জ্বলে ওঠে। যখন আনসারদের সাথে তাদের ঝগড়া হত তখন ইহুদিগণ বলত যখন কাল শেষ যমানার পয়গম্বরের আবির্ভাব হবে আমরা তাঁর অনুগত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধচারণ করব। কিন্তু হায়রে কপাল। ঘটনা একদম বিপরীত হয়ে গেল, ইহুদিরা পয়গম্বরের অনুগত হওয়ার যে আশাবাদী ছিল তা আনসারদেরই ভাগ্যে জুটে গেল।

سিরিয়া পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে, সমগ্র এলাকা বাগান এবং অট্টালিকায় সুশোভত ছিল। এতদূর বিস্তৃত এলাকা, এমন শস্য-শ্যামলা জনপদ ও ফল মূলে ভরপুর ছিল যে, মুসাফিরদেরকে ঘর থেকে পাথেয় গ্রহণের আদৌ প্রয়োজন হত না বাগান এত অধিক ছিল যে, গরীব লোকেরা তাদের মাথার ওপর ঝুড়ি রেখে গাছ তল দিয়ে চলে যেত এবং হাত দ্বারা রশিসমূহে নাড়া দিলে গাছের ফলে ঝুড়ি ভরে যেত। হস্ত দ্বারা ফল ছিঁড়ে নেয়ার প্রয়োজন হত না। এ ধরনের ভূখণ্ড দৈর্ঘ্য প্রস্থে দুমাসের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মানুষ যখন হতভাগা হয় তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কদর বুঝে না। তেমনিভাবে এ এলাকার লোকজনও এ নিয়ামতের মান-মর্যাদা না বুঝে খোদাবিমুখ হয়ে যায় এবং আল্লাহর দরবারে এভাবে আরজ করে যাতে দেশের জনপদ থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে। কেননা এতেই ছিল তাদের আনন্দ। আল্লাহ তা'আলা তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং তাঁর গজবের লস্কর পাঠিয়ে দিয়ে তাদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মূল করে দিলেন।

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

'আর যদি তোমরা আমার নিয়ামতের নাফরমানী কর তবে জেনে রাখ নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।'[১]

আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড বেগে পানির স্রোত পাঠিয়ে দিয়ে তাদের দেশের 'এরম' নামক বাঁধকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। এ দুর্নিবার স্রোত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এতটা বৃষ্টির সয়লাব ছিল। আবার কারো মতে বরফের সয়লাব ছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, লুকমান আকবর আদী ইয়ামনের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এ বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সবা ইবনে ইয়াশহাব এ বাঁধ নির্মাণ করেন এ বাঁধ বহু মাইলব্যাপী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে প্রস্তর পঞ্চাশ জন লোক উল্টাতে পারত না, এ সয়লাব পলকের মধ্যেই তা উড়িয়ে দিয়েছিল।

কথিত আছে যে, কায়লান ইবনে সবার বংশধরগণ ইয়ামেনের শীর্ষস্থানীয় লোক ছিল, আমর ইবনে আসির তাদের প্রধান নেতা ছিল। তরীকা হিময়রিয়া নামক তার একজন গণিকা স্ত্রী ছিল। সে তার গণনা বিদ্যা দ্বারা উল্লিখিত বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে স্বামীকে অবহিত করায় আমর দেশ ত্যাগ করার ইচ্ছে করেন। কিন্তু কোন কারণ না দর্শিয়া চলে যাওয়াকে দোষ বলে মনে করেন। মনে মনে সে এমন এক ফন্দি আঁটেন যাতে সে দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। একজন এতিম ছেলে, যাকে আমর বহুদিন যাবৎ লালন-পালন করে আসছে, তাকে ডেকে আমর বললেন, যখন আমার গোত্রে শীর্ষস্থানীয় লোকজন সমবেত

[১] আল-কুরআন, *সূরা ইবরাহীম*, ১৪:৭

ع این کار دوست است کنون ناکرا رسد

'এটা আল্লাহরই মহিমা, তিনিই জানেন, এ দৌলত কার ভাগ্যে জুটবে'?

سعادت بہ بخشایش داورست ☆ نہ بر کتف وبازرے زور اورست

'সৌভাগ্য আল্লাহরই দান, কোন শক্তি ধরের শক্তি দ্বারা এটা লাভ করা যায় না।'

ইবনে শায়বা হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম পবিত্র হজ্জ সমাপনান্তে সিরিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন, তখন কতেক অপরিণামদর্শী ইহুদির ভয়ে তাঁদের আসবাবপত্র নিয়ে উহুদ পাহাড়ে গমন করেন। এমন সময় হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনের শেষলগ্নে এসে পৌঁছেন। মূসা আলাইহিস সালাম সে স্থানে একটি কবর খনন করেন এবং ভাইকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এখন তুমি পর জগতের দিকে আত্মনিয়োগ কর। হযরত হারুন আলাইহিস সালাম তাঁর জীবদ্দশায় উক্ত কবরে শুয়ে পড়েন এবং সেখানেই তার রূহ মুবারক কব্জ হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁকে কবরস্থ করে সেখান থেকে চলে যান। অধিকাংশ ইহুদিদের বসতি মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে কুবার আশেপাশেই ছিল। তারা অত্যন্ত সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করত। আল্লাহর অপার মহিমা। আউস এবং খাযরাজ গোত্রীয় আনসারগণ তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নিপাত করে দেন।[১]

অনুচ্ছেদ–১

ইহুদিদের ওপর আনসারদের আক্রমণ

ইয়াসরব ইবনে কাহতানের একগোত্র, যারা অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে সানেখ ইবনে আরফখশদ ইবনে সাম ইবনে নূহ আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিল তারা ইয়ামেন দেশে 'সবা' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। যাকে কুরআন মাজীদে 'বালাদাতুন তাইয়িবাতুন' (পবিত্র নগরী) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তারা অতীব সুখ স্বাচ্ছন্দে সেখানে বসবাস করত। মাআরিব (স্থানের নাম) থেকে

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৫–৮৬:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ مُوسَىٰ وَهَارُونُ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، حَتَّىٰ إِذَا قَدِمَا الْمَدِينَةَ خَافَا الْيَهُودَ، فَنَزَلَا أُحُدًا، وَهَارُونُ مَرِيضٌ، فَحَفَرَ لَهُ مُوسَىٰ قَبْرًا بِأُحُدٍ وَقَالَ: يَا أَخِي ادْخُلْ فِيهِ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. فَدَخَلَ فِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ قَبَضَهُ اللهُ، فَحَثَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ.

হবে তখন তুমি আমার সাথে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত করবে এবং আমার সাথে গাল মন্দ করে কথা বলবে। যাতে এ অজুহাতে আমি দেশ ত্যাগ করতে পারি এবং যাতে বিনা কারণে দেশ ত্যাগের কোন অভিযোগ যেন আমার ওপর না আসে। এবং লোকেরা আমার দেশত্যাগে আশ্চর্যান্বিত না হয়। এরপর একদিন আমর গোত্রের সমুদয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয় এবং তাদের সম্মুখে পরিকল্পন অনুযায়ী এতিমের সাথে এমন কটুক্তি ব্যবহার করলেন যাতে সে বেজায় রাগান্বিত হয়ে তাকেও আরো শক্ত কথা বলল, পরন্তু তাকে চপেটাঘাতও করল। তিনি বললেন, আমার লালিত-পালিত এতিম বাচ্চার এই ব্যবহার! তবে অন্যদের থেকে আমি আর কি আশা করতে পারি? সুতরাং আমি দেশ ত্যাগ করব এই মুহূর্তে এবং সাথে সাথে যেসব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, ওগুলো বিক্রি করে ফেললেন। হিংসার বশীভূত হয়ে স্বগোত্রের অনেক লোক স্বানন্দে তা ক্রয় করে নেয়। অতঃপর আমর তার ১৩জন পুত্র (যারা সবাই তরীকা হিময়বিয়ার গর্ভে জন্মেছিল)সহ এবং কীলান ইবনে সবারও একদল লোকজনকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার গজবের বন্যায় সেখানকার সব লোকই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। কিন্তু আমরের সাথীদল রক্ষা পায়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসারগণ এদেরই বংশধর। তাই এতে কোন সংশয় নেই যে, এদের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার জন্ম নেবেন বিধায় তারা এ খোদায়ী গজব থেকে পরিত্রাণ পেলেন।

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ۝

'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।'[১]

মূলকথা আমর ইবনে আমর তার পুত্রদের নিয়ে ইয়ামন থেকে বেরিয়ে আসার পর পুত্রদের কাছে বিভিন্ন দেশের পরিচিতি প্রদান করেন। প্রত্যেকে যার যার চাহিদানুযায়ী এক এক শহরকে বেছে নেয়। বড় পুত্র সালবা ইবনে আমর যিনি আউস এবং সেখানেই ইহুদিদের সাথে তাদের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা আউস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে এভাবে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন, যার ফলে তাঁরা ইহুদিদের হিংসা-বিদ্বেষের পাত্রে পরিণত হন। বনি কুরাইজা এবং বনি নযির এ উভয় গোত্রের বিরুদ্ধে ইহুদিরা শত্রুতা আরম্ভ করে। তারা নির্বিঘ্নে তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করতে তাকে। এ ক্ষেত্রে তারা চুক্তিপত্রের ওয়াদা ভঙ্গ করতেও কোন পরওয়া করেনি। যখন আউস এবং

[১] আল-কুরআন, *সূরা মুহাম্মদ*, ৪৭:৭

খাযরাজ গোত্রদ্বয় ইহুদিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখন তারা আবু জীলা (যিনি আউস এবং খযরজের গোত্রদ্বয়ের লোক ছিলেন এবং সিরিয়ায় গমন করে তাদের বাদশাহ হয়েছিলেন) কে ইহুদিদের অকথ্য নির্যাতন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ মদীনায় এসে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং আউস ও খাযরাজের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ইহুদিদের অনেক ধন-সম্পদ আনসারদের প্রদান করা হয়।

এরপর গোত্রদ্বয় ইহুদিদের থেকে নিস্কৃতি লাভ করে মদীনার আশে পাশে অর্থাৎ উত্তর এবং দক্ষিণে বসবাস করতে থাকে। অনেক যুগ ধরে উভয় গোত্র পরস্পর মিলেমিশে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করার পর তাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। তাদের এ অনৈক্য এতদূর চরমে উঠে গিয়েছিল যে, ১২০ বছর পর্যন্ত তাদের শত্রুতা দীর্ঘায়িত হয়। এবং কোন কালে মিলনের ক্ষীণ আশাও সৃষ্টি হয়নি। অবশেষে বিশ্বনবী ﷺ-এর মদীনা হিজরতের পর যখন তাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, আল্লাহ তা'আলা তাঁরই বদৌলতে তাদেরকে ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করে দেন। যার ফলে তাঁরা পরস্পর একই গোত্রের অংশ হিসেবে পরিণত হয়। যেমন– কুরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ۝

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করেছেন তা তোমরা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'[১]

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যুগ-যুগান্তর ধরে শত্রুতার পর তাদের মধ্যে অতীব সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। আর তাদের এ মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে ছিল রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর অমূল্য অবদান। মদীনা মুনাওয়ারাতে আনসারদের বসতি স্থাপনের এটাই ইতিহাস বলে বিখ্যাত। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যখন বাদশাহ 'তুববা' পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে এ উপলক্ষে মদীনায় পৌছে। এখানে সে তাঁর এক পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করে ইরাক এবং শামের দিকে গমন করে। মদীনাবাসীগণ দাঙ্গাবাজি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে তাকে হত্যা করে। তুববা এ সংবাদ পেয়ে রাগে জ্বলে ওঠে আবার মদীনায় ফিরে আসে।

ছেলের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে সে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং লুটতরাজ আরম্ব করে দেয়। ঘটনাচক্রে যখন যুদ্ধে তার ঘোড়া মারা যায়, তখন সে শপথ

[১] আল-কুরআন, *সূরা মুহাম্মদ*, ৪৭:৭

গ্রহণ করলেন যে, এ শহরকে ধ্বংস করে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি শহরের বাইরে যাবে না। অবশেষে ইহুদিদের কোন এক পাদ্রী তাঁর নিকটে গিয়ে বলেন এ নগরটি আল্লাহরই হিফাজতে রয়েছে। কোন লোক একে ধ্বংস করতে পারবেনা। আমরা আমাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহের মধ্যে এ শহরের প্রশংসার কথা পাঠ করেছি। এ শহরের আসল নাম তাইয়িবা এটা শেষ যমানার পয়গম্বরের হিজরতের স্থান। তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। সুতরাং আপনি আপনার ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করুন। একথা শ্রবণের পর 'তুববা' তার ধ্যান-ধারণা পাল্টিয়ে সাথীদের নিয়ে ইয়ামেনের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ইহুদিদের আলিমদের মুখে হযরত ﷺ-এর প্রশংসা শুনে অন্তরে তাঁর মুহাব্বত সৃষ্টি হয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, তুববা আখিরী যমানার পয়গম্বর ﷺ-এর বসবাসের নিমিত্তে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। বর্ণিত আছে, চারশ' জন তাওরাত বিশেষজ্ঞ ইহুদি আলিম তাঁর সাথে অবস্থান করতেন। কিন্তু অবশেষে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারা বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এ আশায় যে, যদি আখিরী যমানার পয়গম্বর ﷺ-এর আবির্ভাব হয়, তবে তাঁরা দর্শন লাভে ধন্য হতে পারেন। তুব্বা তাদের প্রত্যেকের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেন এবং দাস-দাসীর ব্যবস্থা করে তাদের জন্য প্রচুর সম্পদও বরাদ্দ করেন। তুব্বা তাদের নিকট একখানা পত্র হস্তান্তর করেন, যার মধ্যে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের মধ্যে এ দুটি কবিতাও ছিল।

شَهِدْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ أَنَّهُ • رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ بَارِي النَّسَمْ

فَلَوْ مُدَّ عُمْرِيْ إِلَىٰ عُمْرِهِ • لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَّهُ وَابْنُ عَمْ

'আমি হযরত আহমদ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মাখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ। যদি তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত আমি জীবিত তাকি তবে আমি তাঁর উজির এবং চাচাত ভাই (খুবই আপনজন) হব।'[১]

উল্লেখিত পত্রখানাকে মোহরযুক্ত করে তিনি ইহুদিদের প্রধান আলিমের কাছে সোপর্দ করেন এবং ওসিয়ত করেন যে, যদি তারা হযরত ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকেন তবে পত্রখানা যেন তাঁর নিকট অর্পণ করেন। আর যদি জীবিত না থাকেন তবে তাঁদের আওলাদ ফরজন্দকে যেন এ সম্পর্কে ওসিয়ত করে যান। এভাবে তারাও তাদের বংশধরকে যেন ওসিয়ত করে যান, যাতে এ পত্র হুযূর আকরম ﷺ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি রাসূলে খোদা ﷺ-

[১] ইবনে কসীর, *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, খ. ১, পৃ. ২৪

এর বসবাসের নিমিত্ত একখানা ঘরও তৈরি করেন। তিনি একজন আলিমকে যার বংশধরের মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মলাভ করেন এ ঘরের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন তাঁরা সবাই এসব আলিমেরই বংশধর ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, উক্ত পত্রখানা বংশানুক্রমে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে পৌঁছে এবং হুযূর ﷺ-এর মদীনা গমনের পর তিনি পত্রখানা তাঁর হাতে সোপর্দ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনা আগমনের কারণ

প্রিয় পয়গম্বর সাইয়িদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যিন ﷺ যখন মক্কা শরীফে কুরাইশদের নির্মম শত্রুতার সম্মুখীন হন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যতদিন খোদাওন্দ করীম অপর কোন জনগোষ্ঠীকে তাঁর সাহায্যার্থে উৎসাহিত করবেন না, ততদিন পর্যন্ত কুরাইশগণ তার অনুগত হবে না। অপরদিকে হজ্জ এবং অপরাপর অনুষ্ঠানাদির মৌসুমে যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সমবেত হত, তিনি তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। এ আশার ওপর নির্ভর করে যে, হয়ত সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন। কিন্তু আরবের গোত্রসমূহ এ ব্যাপারে সন্দেহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। তারা মনে করত তার স্বগোত্রীয় লোকেরাও যখন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং এতে সন্দিহান হয়ে পড়েছে অথচ এরাই তাঁর হাল হাকীকত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি ওয়াকিফহাল, তখন কাজেই অন্য গোত্রের লোকেরা তার অনুগত হবার হেতু কি? ইতোমধ্যে আবদুল আশহাল গোত্রের কতেক লোক কুরাইশের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের নিমিত্ত মদীনা থেকে মক্কায় আসে। রাসূল করীম ﷺ স্বীয় নীতি অনুযায়ী তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময়ে তাদের মধ্যকার জনৈক যুবক আয়াস ইবনে মুআয বললেন "হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা এ ব্যক্তির হাতেই বায়আত গ্রহন কর। কেননা তোমরা যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছ এর চেয়ে ইনিই উত্তম।" এমন সময় তাদের সরদার ওঠে পয়গম্বর ﷺ-এর দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে তাদের নিষেধ করল। ফলে তারা যেমন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল না, তেমনি কুরাইশদের সাথেও কোন সন্ধিপত্র সম্পাদন না করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। আয়াছ ইবনে মুআয এ সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি মুসলমান হয়েই ইন্তিকাল করেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-এর ইচ্ছানুযায়ী মদীনার আউস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় হজের মৌসুমে মক্কায় আগমনের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক তিনি আরবদের সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে দীনের তাবলীগ করতেন এবং আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিতেন। সুতরাং তিনি তাদের নিকটও উপস্থিত হয়ে ইরশাদ করলেন, 'তোমরা কি ইহুদিদের আশেপাশের মদীনার লোক'? তারা বলল হ্যাঁ, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'বসে যাও। আমি তোমাদেরকে কিছু বলতে চাই। তারা বসে গেল এবং

নবী করীম ﷺ তাঁর কথা শুরু করেন, বিশ্বস্রষ্টা খোদাওন্দ করীম আমাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। আর আমার ওপর একখানি কিতাব নাযিল করেছেন। কিন্তু আমার গোত্রীয় লোকেরা আল্লাহর আহকাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার সময় বাঁধা দিচ্ছে, যদি তোমরা ঈমান এনে ইসলামের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আস, তবে তোমরা চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। একথা শুনার পর তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল ইনিই সেই আখিরী যমানার পয়গম্বর, যার কথা বলে ইহুদিগণ আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলতো যে, ইদানিং নুবুওয়াতের সূর্য উদীয়মান হবার পথে, আমরা তাঁর রহমতের ছায়ায় এসে তোমাদেরকে এমন মার দেব যেমনি বাবে 'আদ' জাতি 'এরম' গোত্রকে মার দিয়েছিল। অতএব শিগ্‌গিরই তাঁর ওপর ঈমান নিয়ে এসো। যাতে উভয় জাহানের সৌভাগ্য নসীব হয়। এরপর উভয় গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর তারা মদীনায় চলে যান। তাঁদের এই প্রথম বায়আত মীনা পর্বতের নিম্নে আকাবায় সংঘটিত হয়েছিল বলে একে 'বায়আতে আকাবা' বলা হয়। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে লোকজন এ ঘটনা স্মরণ করে ঈমানের নূর তাজা করে থাকেন এবং তার আলোকে নিজের হৃদয় মন আলোকিত করেন।

সঠিক বর্ণনা মতে প্রথম 'বায়আতে আকাবায়' শুধু ছয়জন লোক ছিলেন। হযরত সাদ ইবনে যুরারহ (রা) এবং হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ছোট দলটি মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করে তাদের স্বস্ব গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ পৌঁছিয়ে দেন। যার ফলে মদীনার ঘরে তাঁর আলোচনা হতে থাকে। এমন কোন মজলিশ হত না, যার মধ্যে তার সম্পর্কে আলোচনা হত না। পর বছর আরও বারজন লোক উক্ত ছয়জনকে সাথে নিয়ে মক্কার উল্লিখিত 'আকাবায়' উপস্থিত হন। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিন (রা) এবং হযরত উওয়াইম ইবনে সায়িদা (রা) উল্লিখিত বার জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা হযরত ﷺ-এর হাতে বায়আতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনকার সময় পর্যন্ত 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) এবং নামায ব্যতীত ইসলামের মধ্যে আর কোন কিছু ফরয হয়নি। এ দলটির অনুরোধে রাসূল করীম ﷺ হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর (রা)-কে কুরআন শরীফ, দীন শিক্ষা এবং জামা'আত কায়েম করার নিমিত্তে তাঁদের সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। হযরত মুসআব (রা) মদীনায় পৌঁছে উল্লিখিত বারজন, কোন কোন রিওয়ায়ত মতে, ৪০ জন লোককে সাথে নিয়ে হযরত সাদ ইবনে যুরারাহ (রা)-এর সহায়তায় নামায কায়েম করেন। মদীনা মুনাওয়ারায় এটাই ছিল সর্বপ্রথম জুমার নামায। অতঃপর হযরত মুসআব (রা) জনগণকে ইসলামের দাওয়াত পেশ এবং শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেওয়ার

কাজে ব্রতী হন। একদিন তিনি বনি আবদুল আশহালের এক বাগানে একদল লোককে কুরআন-হাদীস শোনাচ্ছিলেন এমন সময় হযরত সাদ ইবনে মাআয খবর পেয়ে বর্শা হাতে নিয়ে বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বড়লোকদের অভ্যাস মতো কঠোর ভাষায় ধমক দিয়ে বললেন, এ মুসাফির ব্যক্তিটি এ সব বেকুফদেরকে পথ ভ্রষ্ট বানাচ্ছে? যদি এরপর আর কোন দিন এখানে আসে, তবে তাকে উচিত শাস্তি দেওয়া হবে। একথা বলার পর সমবেত লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরের দিন হযরত মুসআব ﵁ আবার হযরত সাদ ইবনে যুরারা ﵁-কে সাথে নিয়ে উল্লিখিত স্থানের নিকটে ইসলামের দাওয়াত এবং কুরআন পাঠ আরম্ভ করে দেন। সংবাদ শুনে ইবনে মা'আয আবার উপস্থিত হলেন। কিন্তু প্রথম দিনের মতো তবীয়ত অতটুকু গরম ছিল না। হযরত সাদ ইবনে যুরারাও তাকে কিছু নম্র দেখে বলতে লাগলেন, ওহে আমার খালাতো ভাই! প্রথমে শুনে নাও যে, এ লোকটি কি বলছে? যদি তিনি কোন খারাপ কথা বলেন এবং লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন কর। আর যদি ভালো কথা বলেন, তবে তুমি তাকে মন্দ বলোনা এবং তার উপদেশকে মূল্যবান মনে কর। হযরত সা'দ ﵁ বললেন, তিনি কি বলছেন? একথা শুনে হযরত মুসআব ﵁ কুরআনে পাকের এ সূরাটি পাঠ করেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝

'সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমরা কুরআনকে এ জন্য আরবী ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। নিশ্চয় এ কিতাব আমাদের নিকট লওহে মাহফুযের মধ্যে রক্ষিত আছে। এটা খুবই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, বড় মজবুত। আমরা কি তোমাদের নিকট থেকে এ কিতাব ফিরিয়ে নেবো? এ কারণে যে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী হও। আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকটও অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছি। তাদের কোন নবী আসতো না, পরন্তু তারা তাঁদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। অতঃপর আমরা তাদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা দাপটপূর্ণ শক্তিশালী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এ সব লোকদের ধ্বংসের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। (যাতে তোমরা সতর্ক হও)।'[১]

হযরত সা'দ ﵁ কুরআন করীমের এ অমূল্য বাণী শ্রবণ করে অবাক

[১] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুখরুফ*, ৪৩:১-৬

হয়ে গেলেন। তাৎক্ষণিকভাবে তো ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তার হৃদয় ঈমানী নূরে আলোকিত হয়ে গেল। তিনি ওখান থেকে ফিরে এসে তার স্বগোত্র বনি আবদুল আশহালকে ডেকে এনে তাঁদের কাছে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাদেরকেও এ পবিত্র ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, যদি তোমরা এ সত্যদীন সম্পর্কে সন্দিহান হও, তবে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নিয়ে এসো, যাতে আমরা যাচাই করে দেখতে পারি। আল্লাহর শপথ! এমন বস্তু যে, যার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা যায়। অতঃপর তিনি তাঁর গোত্রকে বললেন, আমার মর্যাদা এবং জ্ঞান সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কি? সবাই এক বাক্যে বললেন, আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি তাদেরকে আরো বললেন, 'তোমাদের কোন মেয়ে এবং পুরুষের সাথে আমার কথা বলা হারাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের ওপর ঈমান না নিয়ে আস।' এরপর আল্লাহর মেহেরবানিতে মদীনায় ইসলামের এমন অগ্রগতি সাধিত হয় যে, আনসাদের কোন ঘরই এমন অবশিষ্ট রইল না যেখানে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হয়নি। আনসারদের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং তাঁরা তাদের মূর্তি প্রতিমাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর তাওহীদ একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করলেন।[১]

অনুচ্ছেদ-১

হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর ﵁ মদীনায় আনসারদেরকে শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেওয়ার পর হজের মৌসুমে আনসারদের এক বিরাট কাফেলা সাথে নিয়ে হুযূর আকরম ﷺ-এর হাতে 'বায়আত' গ্রহণ এবং তার সাথে সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। অতঃপর হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারী মুশরিকদের কাফেলার সাথে তিনিও আনসারগনসহ মক্কায় রওয়ানা হয়ে যান এবং হযরত রাসূল মকবুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর সাথে অঙ্গীকার করেন যে, আইয়ামে তশরীকের রাতসমূহের মধ্যে কোন এক রাতে তার সাথে আবার মিলিত হবেন। ওয়াদার রাত এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হবার পর মুশরিকদের চোখের অন্তরালে তিনি ৭৩ জন সাথী নিয়ে 'আকাবায়' উপস্থিত হয়ে রাসূলে খোদা ﷺ-এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। হযরত আব্বাস তখন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। তিনি সমবেত লোকদেরকে বলতে লাগলেন, তোমরা নিশ্চয় জান যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২০, পৃ. ৩৬২-৩৬৩, হাদীস: ৮৪৯; হযরত হাসান ইবনে 'আলী ﵄ থেকে বর্ণিত

মাঝে কতই মান-মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমরা তাঁকে অনেক বাঁধা দিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাদের বাঁধা কর্ণপাত করেননি। তিনি তোমাদেরকে এভাবে একত্রিত করতে বিরত থাকছেন না। এখন আমি তোমাদেরকে বলি যদি অঙ্গীকার পালনে তোমরা দৃঢ়চেতা হও, তবে ভালো কথা। অন্যথায় তোমরা খোলাখুলিভাবে বলে দাও, যাতে পরে তোমাদের কেউ দুঃখিত ও চিন্তিত হতে না হয় এবং আমাদেরকেও শত্রুতে পরিণত না কর। তারা বললেন, হে আব্বাস! আপনি যা বলছেন, তা আমরা শুনেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। একথা বলে তারা হুযূর ﷺ-কে লক্ষ করে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! এখন আপনি যা বলতে চান বলুন এবং আল্লাহ ও নিজের ব্যাপারে আমাদের থেকে কি অঙ্গীকার নিতে চান, নিন, আমরা প্রস্তুত।

রাসূলপাক ﷺ কুরআনে করীমের কয়েকটি আয়াত তাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করে তাদেরকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের প্রতি এ উপদেশ যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর, তার সাথে আর কাউকে অংশীদার করো না।' আর আমার সম্পর্কে এ উপদেশ যে, আল্লাহর আহকাম বুঝে নেয়ার ব্যাপারে তোমরা আমায় সাহায্য করো। আর যারা আল্লাহর দীনের তাবলীগের ব্যাপারে বাঁধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বিরত থেকো না। আনসারগণ আরজ করলেন, আপনি অবগত আছেন যে, পূর্ব পুরুষ থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ করাই আপনদের জন্মগত পেশা। আপনি আরো অবগত আছেন যে, ইহুদিদের সাথে আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার ও চুক্তিপত্র রয়েছে। এখন আমরা তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাতিল করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের এ আশঙ্কাও রয়েছে যে, যদি পরে আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমরা তো একাই থেকে যাবো, সেই সময় আমাদের উপায় কি হবে? একথা শ্রবণে সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ একটু মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন, 'কখনও এমন হবে না। এখন থেকে তোমরা আমরা এক প্রাণ এবং এক দেহে পরিণত। আমার জীবন এবং মৃত্যু তোমাদেরই সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

অতঃপর তারা আরজ করলেন, যদি আমরা আপনার মুহাব্বতে মৃত্যুবরণ করি এবং আমাদের জান-মাল উৎসর্গ করে দিই তবে আমরা এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাবো? তিনি উত্তর দিলেন,

جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۝

'তোমাদের উক্ত আমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে এমন বাগানসমূহ প্রদান করা হবে, যার পাদদেশে ঝর্ণধারা প্রবাহমান।'[১]

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:২৫

তারা বললো তবে তো আমাদের এ বিনিময় সার্থক।

بِسْمِ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِبْسُطْ يَدَكَ، فَقَدْ بَايَعْنَاكَ.

'আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি আপনি আপনার হস্ত সম্প্রসারণ করুন। আমরা আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করছি।'

আনসারদের এ বায়আতকে 'বায়আত কুবরা' বলা হয়। কোন কোন সীরত লেখক একে (বায়আতে সানিয়া) বলেন, কিন্তু সাইয়েদ ﷺ-এর কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি আকাবার তৃতীয় বায়আত।

যখন আনসারদের বৃহৎ দলটি হযরত ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন।'[১]

অতঃপর তিনি উক্ত ৭৩ ব্যক্তিকে বার দলে বিবক্ত করেন এবং প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন দায়িত্বশীল নেতা নিযুক্ত করেন যাতে তারা তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের ইহকালীন-পরকালীন সমস্ত বিষয় যেন ঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এদেরকে বলা হয় 'নকীব' এরা সবাই হচ্ছেন আনসারী। তাদের গুনাবলি এবং অবস্থা সম্পর্কে (আসমাউর রিজাল) এর কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ যদি আপনি ইরশাদ করেন তবে মিনাতে সমবেত মুশরিকদেরকে হত্যা করে দেবো, তাদের কাউকে জীবিত রাখবো না। হুযূর ইরশাদ করলেন,আমাকে একথার নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে আমি এখন তরবারী উত্তোলন করি এবং মুশরিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। একথা বলার পর তাঁরা স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন এবং বিদায় প্রার্থনা করলেন। তারা আরজ করলেন যদি আপনিও আমাদের সাথে চলুন এবং আমাদের দেশকে ধন্য করুন, তবে আমাদের বড় সৌভাগ্য হবে। আমরা আপনারই অনুসরণ করবো যা নির্দেশ দেন তা পালন করবো কোনরূপ গুজব আপত্তি করব না। ইরশাদ করলেন, দেশ ত্যাগের এখনও কোন নির্দেশ আসেনি এবং হিজরতের জন্য কোন স্থানও নির্ধারিত হয়নি। যখন নির্দেশ আসবে তখন চলে যাবো। একথা বলে তিনি তাদেরকে বিদায় দিলেন।

[১] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১১১

পঞ্চম অধ্যায়

সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ-এর মদীনা হিজরতের বর্ণনা

যখন আনসারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রাসূল ﷺ হিজরতের ব্যাপারে খোদওন্দ করীমের শরণাপন্ন হলেন, প্রথমে তাকে একটি স্থান দেখানো হয়, যা দু'তিনটি শহরের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। ১. বাহরাইনের হাযর ২. সিরিয়ার কনসরুন ৩. হিজাযের ইয়াসরব। কিন্তু পরবর্তীতে তা মদীনা শরীফ বলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখনও হিজরতের সময় নির্দিষ্ট হয়নি। রাসূলে খোদা ﷺ অহীর ইঙ্গিতে তার কোন কোন সাহাবীকে মদীনায় হিজরতের জন্য অনুমতি দেন। যেমন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত কোন গণ্যমান্য সাহাবী মক্কায় অবশিষ্ট ছিলেন না। তবে অনেক দুর্বল এবং অসচ্ছল সাহাবী মদীনায় হিজরত করতে সক্ষম হননি। মক্কার মুশরিকগণ তাদের ওপর নির্যাতন চালায়। সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করা পর মক্কার কাফিরগণ বিশ্বনবী ﷺ-এর উচ্চ মান-মর্যাদা দেখে জ্বলতে থাকে এবং বুঝতে পারে যে, অতি নিকটবর্তী সময়ে তিনিও মক্কা ভূমি ত্যাগ করবেন। এ ধারণার বশীভূত হয়ে তাদের শত্রুতা চরমে ওঠে। অবশেষে মলউন আবু জাহিলের সভাপতিত্বে মুশরিকদের এক পরামর্শ সভা হয়। যেখানে ইবলিসও গিয়ে তাদের সাথে শরীক হয়। সভায় কেউ কেউ বলল তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক। কেউ কেউ বলল, বন্দী করা হোক। এ ক্ষেত্রে আবু জাহিল প্রস্তাব করল যে, পাঁচ গোত্রের পাঁচ হাতে তরবারী দেওয়া হোক, যাতে ওরা সবাই একই সাথে এর ওপর আক্রমণ করতে পারে। যদি এ ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তবে একাকী বনি হাশেমের পক্ষে এ সমুদয় গোত্র থেকে হত্যার বদলা নেওয়া সম্ভপর হবে না। বর্ণিত আছে যে, মুশরিকদের পরামর্শ সভা চলাকালীন সময়ে হযরত জিবরাইল আলায়হিস সালাম কুরআনে পাকের একটি আয়াত নিয়ে এসে তাঁকে কাফিরদের পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করেন। আয়াতটি হচ্ছে এই যে,

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾

'কাফিরগণ আপনার সাথে ষড়যন্ত্র করছিল যাতে তারা আপনাকে আটক রাখতে পারে, অথবা মেরে ফেলতে পারে অথবা দেশান্তর করে দিতে পারে। তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে আর আল্লাহ

তা'আলা আপনার নিরাপত্তার জন্য সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। আল্লাহর ব্যবস্থাই সর্বোত্তম।'[১]

পয়গম্বরে খোদা ﷺ কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হবার পর হিজরতের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদের নিম্নে বর্ণিত আয়াতের দ্বারা তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেন।

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

'আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা! যেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া আপনার ইচ্ছা সেখানে আমাকে ইজ্জত সম্মানের সাথে পৌঁছে দিন, আর যেখান থেকে বাইরে নিয়ে আসার ইচ্ছা, সেখান থেকেও সম্মানের সাথে বাইরে নিয়ে আসুন। আপনি আমাকে সাহায্য-মদদ দিয়ে বিজয়ী করুন। যাতে সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় ঘটে।'[২]

অতঃপর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্দেশ দেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়, যাতে মুশরিকগণ সহসা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পারে। আসল ব্যাপার এ ছিল যে, মক্কার লোকজন হযরত ﷺ-কে সত্যবাদী এবং আমানতদার বিশ্বাস কের তাঁর নিকট যে সমুদয় বস্তু আমানত রেখেছিলেন তা স্ব স্ব মালিকের নিকট ফেরত দেয়ার জন্যেই তাকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট যান এবং হিজরতের নির্দেশ সম্পর্কে খুলে বলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ গোলামও সাথী হবার প্রত্যাশী। ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। সেদিন হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট দু'টি উট চিল। যে গুলোকে তিনি চার মাস যাবৎ ঘাস ইত্যাদি খাওয়ায়ে খুবই মোটা ও তাজা করেছিলেন। উট দুটিকে তিনি হুযূর ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। যাতে একটির ওপর তিনি এবং অপরটির ওপর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু আরোহণ করতে পারেন। কিন্তু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তার প্রগাঢ় ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার আরোহীকে বিনামূল্যে গ্রহণ করলেন না। বরং আটশত দিরহামের মূল্য প্রদান করলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে উট ক্রয় করে নেয়ার কারণ এ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে সাহায্য ছাড়া আর কারো সাহায্য গ্রহণ ভালো মনে করেননি। কুরআনপাকের আয়াতে বলা হয়েছে,

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আনফাল*, ৮:৩০
[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৮০

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

'এবং তার প্রভুর ইবাদতের ক্ষেত্রে অপর কাউকে তার সাথে শরীক না করা চাই।'[১]

এটাও উল্লিখিত আয়াতের সারমর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেননা হিজরতও হলো আল্লাহর ইবাদত।

সঠিক তথ্যমতে সেই উটের নাম ছিল 'কাসওয়া'। তবে কেউ কেউ 'জদআ' নামেও অভিহিত করেছেন। (আসলে কিন্তু উভয়ই একই উঠের নাম) এরপর বনি দাইলের একজন লোককে মজুরীর বিনিময়ে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত করেন। এ লোকটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আরীকত। সে রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আর গোপনীয় তথ্যের ব্যাপারে খুবই বিশ্বস্ত ছিল। তাকে নির্দেশ দেওয়া হল তিনদিন পরে তুমি উট দু'টিকে 'গারে সউর'-এর মধ্যে আমাদের নিকট নিয়ে যাবে। এ লোকটি কাফির ছিল। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা নেই।[২]

অতঃপর রাসূলে খোদা ﷺ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ গৃহে প্রবেশ করলেন। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বেই কুরাইশগণ গৃহ অবরোধ করে ফেলে। রাসূল মকবুল ﷺ চাদর মুবারক দিয়ে যখন বের হন, তখন মলউন আবু জাহেল বলল, এইতো মুহাম্মদ ﷺ যিনি বলতেন যদি তোমরা আমার অনুগত হও তবে আরব, আজম তোমাদের পদানত হয়ে যাবে, আর তোমরা বেহেশতের অধিকারী হবে। আর যদি অনুগত না হও তবে দুনিয়াতে আমার হাতে মারা যাবে। এবং আখিরাতেও জাহান্নামবাসী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'আমি এখনও তাই বলি এবং হবেও তাই। আর তুমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।' একথা বলার পর এক মুষ্টি মাটি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সূরা ইয়াসীনের প্রথম থেকে فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ করে তাদের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে উপস্থিত হন। সেখান থেকে জানালার ফটক দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা সওর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানো দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? তারা বলল, আমরা সকাল হবার অপেক্ষায় আছি, যাতে সকাল হবার পর মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যা করতে পারি। লোকটি বলল, সাবাস! তিনিতো তোমাদেরই সম্মুখ দিয়ে চলে গেছেন। একথা শোনার পর আবু জাহিল এবং

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহফ*, ১৮:১১০
[২] আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ২৫
[৩] আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৯

সাথীগণ লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। সকাল হবার পর কাফিরগণ সেখানে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাহেব কোথায়? তিনি বললেন, আল্লাহই তাঁর রাসূল সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের ঘটনা 'বায়আতে আকাব'-এর আড়াই মাস পর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার সংঘটিত হয়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে সোমবার দিনই হিজরতের দিন ছিল, উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যে, বৃহস্পতিবার মক্কা থেকে এবং সোমবার 'সওর' থেকে চলে যান। হাফিয ইবনে হাজর রহমাতুল্লাহি আনহু এটাই বলেছেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পরিবারবর্গ ব্যতীত অপর কেউ তাঁর হিজরত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না।

আল-মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যা হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রত্যহ সওর পর্বতে হযরত ﷺ-এর নিকট খাদ্য সরবরাহ করতেন এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র মুহাম্মদ কাফিরদের বিভিন্ন তথ্য তাঁদেরকে অবহিত করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিখ্যাত রিওয়ায়ত মতে পনের বছর মক্কায় জীবন যাপন করেন।

মক্কা শরীফ থেকে বেরিয়ে আসার পর মদীনায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত অনেক 'মু'জিযা' প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'সওর' পর্বতের মুখে মাকড়সার জাল বুনন, কবুতরের ডিম পাড়া, গুহায় কাফিরদের তালাশ করা সত্ত্বেও হযরত ﷺ-কে খুঁজে না পাওয়া, 'সুরাকা' নামক তল্লাশী অভিযানে নিযুক্ত ব্যক্তির ঘোড়ার পা ধ্বসে যাওয়া, উম্মে মা'বুদ নামক স্ত্রীলোকের নিকট এসে হযরত ﷺ-এর এমন এক দুর্বল ছাগলের স্তন থেকে দুধ দোহন করা, যার দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। আবু কুবাইস পাহাড় থেকে কাফিরদের গায়িবী আওয়াজ শ্রবণ করা ইত্যাদি এর অন্তর্গত। হযরত ﷺ-এর এ সমুদয় মুজিযা তাঁর অক্ষত থাকার এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদারই প্রমাণ। হাদীসের কিতাবে এ সমুদয় কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মদীনার অবস্থা বর্ণা করাই এ কিতাবের মুখ্য উদ্দেশ্য বিধায় হিজরত সম্পর্কীয় বিভিন্ন রিওয়ায়ত ও হাদীসসমূহ এখানে বর্ণিত হলো।

আবু সুলায়মান খাত্তাবী বর্ণনা করেন যে. যখন নবী করীম ﷺ মদীনা শরীফের সন্নিকটে পৌঁছেন তখন কাফিরদের ইঙ্গিতে হযরত ﷺ-কে গ্রেফতার করার মানসে বুরাইদা নামক এক ব্যক্তি ৭০জন সহচর নিয়ে পথে অপেক্ষায় থাকে। কাফিরদের তরফ হতে তাকে একশ'টি উট পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। বুরাইদা সদল বলে হযরত ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হবার পর হযরত তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার নাম কি'? বললেন, বুরাইদা। তিনি এ নামের মূল শব্দ 'বারুদাত' যার অর্থ হচ্ছে ঠাণ্ডা, শান্তি-এর প্রতি লক্ষ রেখে হযরত

আবু বকর ﷺ-কে বললেন, «قَدْ بَرَدَ أَمْرُنَا وَصَلُحَ» অর্থাৎ 'আমাদের ব্যাপার শীতল এবং সঠিক হয়েছে।' এরপর ইরশাদ করলেন, 'তোমার গোত্রের নাম কি'? বললেন, আসলাম। ইরশাদ করলেন, 'আসলাম অর্থ নিরাপদ'! আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আসলাম গোত্রের কোন শাখার লোক'? বললেন, সাতমের বংশধর। ইরশাদ করলেন, 'তুমি ইসলামের অংশ পেয়েছ'? অতঃপর বুরাইদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? ইরশাদ করলেন, 'আমি মুহাম্মদ ﷺ'! এ পবিত্র নাম শ্রবণের সাথে সাথেই বুরাইদা বলে উঠলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

তাঁর সাথে অপরাপর সত্তরজন সহচরও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর বুরাইদা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মদীনায় প্রবেশকালে আপনার সম্মুখে একটি পতাকা থাকা চাই। একথা বলে তিনি মাথা থেকে পাগড়ি তুলে নিয়ে বর্শার অগ্রভাগে ধারণ করে হযরত ﷺ-এর আগে আগে চলতে লাগলেন। বুরায়দা পুনরায় বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মদীনায় পৌঁছে আপনি কোন ভাগ্যবান লোকের গৃহকে ধন্য করবেন? ইরশাদ করলেন, 'এ ব্যাপারে আমার উটনী নির্দেশিত। যেখানে সে বসে যাবে, আমি ওখানেই যাবো।'[১]

ے رشتہ در گردنم افگندہ دوست ☆ می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

'আমার বন্ধু আমার গলায় রজ্জু দিয়ে যেখানেই ইচ্ছে সেখানেই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।'

হুযূর আকরম ﷺ-এর কতেক আসহাব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। ঘটনা চক্রে তাঁরাও সেখানে এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন এবং উভয়কে এক এক জোড়া সাদা কাপড় হাদিয়া উপঢৌকন দেন।

ওদিকে আনসারগণ দিন রাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের অপেক্ষা করছিলেন তারা প্রত্যেক দিন সকালে মদীনা মুনাওয়ারার উঁচু স্থানে গমন করে তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষায় থাকতেন। যখন সূর্য গরম হয়ে যেত তখনই তাঁরা স্ব স্ব গৃহে সবাই ফিরে যেতেন।

একদিন একজন ইহুদি একস্থানে দণ্ডায়মান ছিল, হঠাৎ তার দৃষ্টি রাসূলে মকবুল ﷺ-এর আগমনের প্রতি নিবদ্ধ হল। তাঁকে চিনতে পেরে তার নিকটবর্তী আনসারদেরকে চিৎকার করে ডেকে বলল ওই যে, তোমাদের উদ্দিষ্ট অপেক্ষামান

[১] (ক) আস-বগওয়ী, *আল-আনওয়ার ফী শামায়িলিন নাবীয়িল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ৭০৯, হাদীস: ১১৩২; (খ) আল-খাজাবী, *গরীবুল হাদীস*, খ. ১, পৃ. ৭০৯, হাদীস: ১১৩২

ব্যক্তি এসে গেছেন।

ے اینک آن سرور خرامان می رسد ☆ اینک آن گلبرگ خندان می رسد

'এই যে তিনি তোমাদের মাশুক ঝুকে ঝুকে এসে যাচ্ছেন।
এই যে তিনি সেই অপরাগ ফুল হেসে হেসে এসে যাচ্ছেন।'

ے شاد باش ای خستہ ہجران بلا ☆ کزالیِ دردِ تو درمان می رسد

'ওহে বিরহ বেদনার ব্যথাতুর মন! শুভ সংবাদ শুনে আনন্দিত হও।
তোমার ব্যাথা মোচনের জন্য ওই যে, ওষুধ পৌঁছে যাচ্ছে।'

ے شوق کن ای بلبل گلزار عشق ☆ کان گلِ تو از گلستان می رسد

'হে প্রেম বাগানের বুলবুল! উৎসুক হয়ে লক্ষ কর, ওই যে বাগান থেকে ফুল এসে যাচ্ছে।'

ے دردِ دل افسردہ روحی می دمد ☆ مردہ تن را مژدہ جانِ می رسد

'হে অন্তরের ব্যথায় ব্যথিত আমার আত্মা! জীবনী শক্তি ফুঁকে দেওয়া হবে, মৃতদেহের জন্য সুসংবাদ! ওই যে প্রাণ এসে যাচ্ছে।'

ے تازہ باش ای تشنہ وادی غم ☆ کز برایت آب حیات می رسد

'ওহে দুঃখ প্রান্তরের পিপাসাতুর উপত্যকা। তাজা হয়ে ওঠ! তোমার পিপাসা মেটানোর জন্য ওই যে আবে হায়াত আসছে।

ے دور شد ان ظلمت شام فراق ☆ کافتاب وصل تابان می رسد

'হে বিরহ সন্ধার অন্ধকার! দূরীভূত হয়ে যাও, কেননা বন্ধুর মিলন সূর্য উদীয়মান।'

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনের সংবাদ শুনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে মদীনাবাসীরা ঘরের বাইরে এসে পড়েন। সর্ব প্রথম তিনি প্রথম হিজরীর বারই রবিউল আওয়াল সোমবার দিন মসজিদে কুবার পাশে আমর ইবনে আউফের সন্তানদের বাড়িতে অবতীর্ণ হন।

উল্লেখ্য যে, সোমবার অত্যন্ত শুভ এবং বরকতের দিন। হযরত ﷺ-এর জন্ম। হিজরত, মদীনায় আগমন এবং ইন্তিকাল এই সোমবার দিনই হয়েছিল। যেমন– *'শরফুল মুস্তফা'* নামক কিতাবে ইবনুল জওযী উল্লেখ করেছেন। কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তারিখ লেখার সূচনা হুযূর ﷺ-এর নির্দেশে ওইদিন থেকেই

আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সূত্র মতে তারিখ গননার সূত্রপাত হযরত আলী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যমানায় মুহাররম মাসেই আরম্ভ হয়।

এক বর্ণনা মতে তিনদিন। অপর বর্ণনা মতে চার দিন। আর এক রিওয়ায়ত মতে এরও বেশি সময় সেখানে অবস্থানের পর মাহবুবে খোদা মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে অবস্থানের সময় তিনি মুসলমানদের নামাযের ইমামতি করেন। সে দিনগুলোতে হযরত আলী (রাঃ) মক্কার লোকদের আমানত ফেরত দেয়ার পর মদীনায় এসে তাঁর সাথে মিলিত হন।

সহীহ বর্ণনা মতে মদীনায় আগমনের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) লোকজনের সাথে মুলাকাত (সাক্ষাৎ) করতেন, আর হুযূর পাক (সাঃ) চুপ করে থাকতেন যখন সূর্য মাতার ওপর এসে যেত, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর চাদর মুবারক দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতেন। কোন কোন বর্ণনা মতে প্রথমে লোকজন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) লোকদের সাথে কথা বার্তা বলেছিলেন, আর তিনি চুপ করে রয়েছিলেন। সন্দেহ হবার দ্বিতীয় কারণ এ ছিল যে, উভয়ের পোষাক একই ধরনের ছিল। হযরত আবু বরক সিদ্দীক (রাঃ) একথা টের পেয়ে স্বীয় চাদর দিয়ে হুযূর পাক (সাঃ)-কে ছায়া প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে চাদর দিয়ে ছায়া দিতেন।

অনুচ্ছেদ-১

হুযূর পাক (সাঃ) উল্লিখিত দিন গুলোতে কুবায় অবস্থানের পর জুমাবার সূর্য কিছু ওপরে ওঠার পর মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য রওয়ানা হয়ে যান আনসারের পদাতিক ও আরোহী দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর সাথে গমন করেন। এ অবস্থা দেখে কুবার বাসিন্দা আমর ইবনে আউফের বংশধরগণ ঘাবড়িয়ে গিয়ে তাঁর খিদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! সম্ভবত আপনার খিদমতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। তাই বোধ হয় আপনি অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। ইরশাদ করলেন, 'আমাকে (আকালাতুল কুরা) মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' যখন কুবার পূর্ব প্রান্তে তাঁর উজ্জ্বল চেহারা মুবারক দেখা গেল তখন প্রত্যেক আনসারী আশাবাদী হলেন যে, সরদারে দু'জাহান (সাঃ) তার ঘরেই তাশরীফ রাখবেন এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে আরজ করতে লাগলেন, আপনি আমাদের ঘরকেই উদ্ভাসিত করুন। আমরা আপনার একান্ত খিদমত করব। তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 'এ ব্যাপারে আমার উট আদিষ্ট। যেখানেই উট বসে যাবে সেখানেই হবে আমার অবস্থান।' যখন তিনি কুবার নিকটবর্তী স্থান বতনে ওয়াদীতে পৌছেন যেথায় বনি সালিম গোত্রের লোকজন বসবাস করত, তখন জুমার নামাযের সময় হয়ে যায়। তখন

তিনি সেখানে জুমার নামায আদায় করেন এবং একটি হৃদয়গ্রাহী খুতবা প্রদান করেন। লোকদের এভাবে উৎসাহিত এবং ভীতিপ্রদর্শন করেন, যার দ্বারা তাদের অন্তর ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অদ্যাবধি এ স্থান মসজিদে জুমা নামে অবহিত হতে থাকে। তিনি যে দিক দিয়ে যেতেন সেখানকার আনসারগণ তাঁর উটের লাগাম ধরে তাদের মেহমানদারী কবুল করার অনুরোধ জানাতেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য দু'আ করে অগ্রসর হতে থাকেন। আর অপেক্ষা করতে থাকেন যে, উট কোথায় গিয়ে বসে যায়। অবশেষে যখন হুযূর (সাঃ) তাঁর মিম্বর স্থাপনের স্থানে গিয়ে পৌছেন, তখন হঠাৎ উট বসে যায়, সেখানে তার ওপর অহী নাযিল হবার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পুনরায় সেখান থেকে উট ওঠে যায় এবং কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে পুনরায় বসে যায়। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহাঙ্গনেই উট বসে গিয়েছিল। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) উটের পৃষ্ঠ থেকে আসবাবপত্র নিচে নামিয়ে যখন রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযূর পাক (সাঃ)-এর সম্মুখে যান তখন তিনি ইরশাদ করলেন,

«اَلْمَرْءُ مَعَ رَحْلِهِ».

'মানুষ তার আসবাবপত্রের সাথেই সংশ্লিষ্ট।'[১]

অতঃপর তিনি তার ঘরের শোভা বৃদ্ধি করলেন,

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

'এটা আল্লাহর অবদান, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই প্রদান করেন।'[২]

مبارک منزلی کان خانہ را ماہی چنین باشد

ہمایوں کشوری کان عرصہ راشاہی چنین باشد

'সেই ঘরকে ধন্যবাদ, যে ঘরকে এমন উজ্জ্বল চন্দ্র আলোকিত করে সেই স্থান নিতান্তই সৌভাগ্যস্থান, যার প্রাঙ্গণে এমন বাদশাহ পদার্পণ করেন।'

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আইয়ুব (রাঃ)-এর গৃহটি সেই স্থান, যা বাদশাহ তুববা ইহুদি আলিমদের থেকে আখিরী যমানার পয়গম্বর (সাঃ)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মদীনায় অবস্থানের সংবাদ শুনে তাঁর জন্য নির্মাণ করেছিলেন।

ইবনুল জওযী *'শরফুল মুস্তাফা'* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সওয়ারী উট হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহাঙ্গনে

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ৬৭

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:৫৪, *সূরা আল-হাদীদ*, ৫৭:২১, *সূরা আল-জুমুআ*, ৬২:৪

বসে যায় তখন বনি নজ্জার গোত্রের কিছু সংখ্যক মেয়ে লোক দফ (বাদ্য'যন্ত্র বিশেষ) বাজিয়ে নিচের চরণ দু'টি উচ্চারণ করে তাকে স্বাগত জানাতে থাকে,

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارْ • يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارْ

'আমরা বনি নজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়ে। আজ আমাদের কতই সৌভাগ্য আমাদের কতই আনন্দ যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ আমাদের প্রতিবেশী হতে যাচ্ছেন।[১]

তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে আনসার গোত্রের লোক! তোমরা কি আমায় ভালোবাস'? তাঁরা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। তিনি ইরশাদ করলেন, 'খোদার শপথ। আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি।'[২]

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ রযীন বলেন, রাসূল ﷺ যখন মদীনায় পৌঁছেন, তখন পর্দানশীল (পর্দার অন্তরাল বর্তিনী) মেয়েরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মদীনার অলি-গলিতে এবং বাজারে বেরিয়ে এসে এ শ্লোক পাঠ করতে থাকে:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

"সানীয়াতুল ওয়াদার' (একটি স্থানের নাম) দিক থেকে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। আমাদের ওপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব, যত দিন তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন।'[৩]

আসল কথা স্বাধীন-পরাধীন, ধনী-গরীব, স্ত্রী-পুরুষ এক কথায় সর্বস্তরের লোকই হুযূর পাক ﷺ-এর মদীনা আগমনে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন,

جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَجَاءَ نَبِيَّ اللّٰهِ.

'আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এসেছেন। আমাদের নিকট আল্লাহর নবী এসেছেন।'[৪]

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াকাউল ওয়াকা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২০৪; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ২, পৃ. ৫০৮, হাদীস: ৭৭৫; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াকাউল ওয়াকা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২০৪; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ২, পৃ. ৫০৮, হাদীস: ৭৭৫; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াকাউল ওয়াকা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২০৪; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ২, পৃ. ৩৬৪, হাদীস: ৭৫২

[৪] আস-সামহুদী, *ওয়াকাউল ওয়াকা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২০৪

হাবশীগণ তাদের স্বভাব অনুযায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে তীর আন্দাজী করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস ﷺ বলেন, সে দিন হুযূর পাক ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, সে দিন আমি নয় বছরের বালক ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, তাঁর আলোতে মদীনার অলি-গলি এমন আলোকিত হয়েছে, যেমন সূর্য উদিত হলে আলোকিত হয়। আর যে দিন তিনি ইন্তিকাল করেন, সে দিন মদীনা অন্ধকার হয়ে যায়, যেমন সূর্য ডুবে যাবার পর অন্ধকার হয়।[১]

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত আবু আইয়ুব ﷺ-এর রিওয়ায়ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আমরা ঘরের ওপর তলায় বাস করতাম, আর তিনি বাস বরতেন ঘরের নীচ তলায়। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলূল্লাহ ﷺ! আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আমাদেরকে প্রাসাদের ওপরে অবস্থান করতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। কেননা আপনি নিচে বাস করবেন, আর আমরা ওপরে থাকবো, এটাতো বড়ই বেয়াদবি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রাসাদের ওপরেই অবস্থান করুন। ইরশাদ করলেন, 'ঘরের নিচের ভাগে অবস্থানই আমার জন্য বেশি উপযোগী। কেননা আমার সাথে অনেক লোকজন রয়েছে। তা ছাড়া আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যও বিভিন্ন লোকজন আসে। সুতরাং তুমি এবং তোমার পরিবারবর্গ ওপরে থাকাই সমীচীন।'

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ বলেন, একদিন আমাদের বাসস্থানে পানিতে পরিপূর্ণ একটি কলসী ভেঙে যায়। পানি যাতে নিচে পতিত না হয় এবং রাসূল ﷺ-এর গোলামদের কষ্ট না হয়, আমরা আমাদের গায়ে দেয়ার লেপ দ্বারা সমস্ত পানি শুকিয়ে নিলাম। অথচ ব্যবহারের জন্য আমাদের নিকট আর কোন লেপও ছিল না। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বরাবরই কাকুতি মিনতি করে রাসূল ﷺ-এর নিকট এ আবেদন করতে থাকেন যে, হুযূর ﷺ যেন ওপর তলায় অবস্থান করেন। কিছুদিন পর তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং ওপরে চলে যান। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত করেছিলেন, তখনকার দিনে হযরত সাদ ইবনে ওবাদা ﷺ ইবনে মুআয ﷺ আরও কয়েকজন আনসারী তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। একদিন তাঁদের মধ্যে কোন একজন খুবই উচ্চমানের খাবার তৈরি করে নিয়ে আসলেন। এ খাবারের মধ্যে পিঁয়াজ-রসুনও দেওয়া হয়েছিল। হুযূরপাক ﷺ উক্ত খাবার গ্রহন করলেন না। সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি লক্ষ করে ইরশাদ করলেন, 'তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মতো নই। আমার একজন সাথী রয়েছেন এ খাদ্যের গন্ধে তাঁর কষ্ট হবে। আমি তাঁকে কষ্ট দিতে চাই না।' হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে, একদিন আমি তাঁর জন্য খাবার

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫২২, হাদীস: ১৬৩১; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

তৈরি করি। যার মধ্যে রসুন দেওয়া হয়েছিল। তিনি খাবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! রসুন কি হারাম? তিনি ইরশাদ করলেন, 'আমি আমার এক সাথীর সাথে গোপনে কথাবার্তা বলি এবং মুনাজাত করি। এ কারণে আমি তা ভক্ষণ করি না। তোমরা খেতে পার, কোন অসুবিধে হবে না।' হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه বলেন, এরপর আর আমি কোন দিন রসুন ভক্ষণ করিনি। আমি কেন তা ভক্ষণ করব?[১]

সহীহ রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه-এর গৃহে সাত মাস অবস্থান করেন। তবে কোন কোন রিওয়ায়তে অধিক বা কম সময়েরও উল্লেখ রয়েছে।[২]

যখন সাইয়িদুল মুরসালীন রহমাতুললিল আলামীন ﷺ মদীনায় শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপর আশ্বস্ত হলেন, তখন তিনি হযরত আবু রাফি ও হযরত যাইদ ইবনে হারিসা رضي الله عنه-কে ৫০০ দিরহাম এবং দু'টি উট সহকারে মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়ে হযরত সাইয়িদা ফাতিমা যুহরা رضي الله عنها, হযরত উম্মে কুলসুম رضي الله عنها, উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা, হযরত যায়িদের স্ত্রী হযরত উম্মে আয়মান رضي الله عنها এবং হযরত ওসামা ইবনে যায়িদ رضي الله عنه-কে মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ رضي الله عنه ও তাঁদের সাথী হলেন; যাতে তিনি হযরত আয়িশা رضي الله عنها তাঁদের মাতা হযরত উম্মে রুম্মান رضي الله عنها হযরত আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنها এবং আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর رضي الله عنه-এর পরিবারবর্গকে মদীনায় নিয়ে আসতে পারেন।[৩]

উল্লিখিত তিন ব্যক্তি যখন হযরত ﷺ-এর নির্দেশে তাঁদেরকে মদীনা শরীফে নিয়ে আসলেন, তখন হুযূর পাক ﷺ খোলা অন্তরে দীনের প্রচার এবং রিসালতের গুরু দায়িত্ব পালনের প্রতি সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করেন।

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

'সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে।'[৪]

تا کجا حد است حسنت را ہنوز آغازی بینم۔

'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার সৌন্দর্যের শেষ কোথায়? এখনতো আপনার অপরূপ সৌন্দর্যের শুধু সূচনাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।'

হযরত ﷺ-এর মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর সম্মানিত আনসারদের

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাবাওয়াবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৯৮–৪৯৯
[২] আস-সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৬১৫
[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২০৫
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১২৬

ভাগ্যে ইসলামের নিয়ামত লাভ হয় এবং তাদের গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা হিদায়ত এবং শিষ্টাচারিতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের কপালে এ সৌভাগ্য ঘটেনি। তারা আনসারদের সাথে নিজের শত্রুতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর সাথেও হিংসা-বিদ্বেষে ফেটে পড়ে এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শত্রুতার বহিঃপ্রকাশও ঘটাতে লাগল। হুয়াই ইবনে আখতাব এবং তার ভাই ইয়াসির ইবনে আখতাব হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অধিকতর জ্বলে ওঠে।

হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই رضي الله عنها (যিনি ইহুদিদের প্রবল বাঁধা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।) বর্ণনা করেন, যেদিন বিশ্ব জগতের পয়গম্বর রাসূলে করীম ﷺ মদীনায় পদার্পণ করেন, সেদিন আমার পিতা ও চাচা তাদের দেখতে যায় এবং সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। যখন রাতে তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করে তখন তারা খুবই ক্লান্তি বোধ করছিলেন। অভ্যাস মতো আমি তাদের নিকটে যাই, কিন্তু তারা এত চিন্তায় ভারাক্রান্ত ছিল যে, কোন কথা বলার পর্যন্ত সাহস ও শক্তি পাচ্ছিল না। ইত্যবসরে চাচা আব্বাকে বলল, খোদার শপথ! ইনিই সেই আখিরী যমানার পয়গম্বর। তখন চাচা বলল, আপনি কি আপনার অন্তরে তার ভালোবাসা রাখেন না শত্রুতা? আব্বা বলল, শত্রুতাই খোদার শপথ! যতদিন আমি জীবিত থাকব। ততদিন তার শত্রুতায় লিপ্ত থাকবো।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রাখার ফলে অবশেষে বদবখত খুব শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ইহুদি গোত্রের কোন কোন লোক ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকীকে তাদের জীবনে নীতি ও অর্থ উপার্জনের পন্থা হিসেবে বেছে নেয়। আউস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকও তাদের সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের নিচের তলায় গিয়ে পৌঁছে।

ইহুদি গোত্রের বহু আলিম যাদের ভাগ্যে খোদাওন্দ করীম হিদায়ত নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তারা হুযূর পাক ﷺ-কে দেখামাত্র ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। তারা বিশ্বাস করল যে, যার প্রশংসা তারা তাওরাত কিতাবে অধ্যয়ন করেছে, ইনিই সেই মহাপুরুষ। সেদিনই ইহুদিদের প্রখ্যাত আলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম رضي الله عنه হযরত আবু আইয়ুব رضي الله عنه-এর ঘরে আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আনন্দে আত্মাহারা হয়ে যান।

مدتی بود کہ مشتاق لقایت بودم ☆ لاجرم روئے ترا دیدم واز جار فتم ۔

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাবাওয়াবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৫১৮–৫১৯

'অনেক দিন থেকে আপনার সাক্ষাৎ লাভের বাসনায় উদগ্রীব ছিলাম। এ কারণে আপনার চেহারা মুবারক দেখামাত্র নিজেকে হাসিয়ে ফেলেছি।'

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ হুযূর পাক ﷺ-কে বললেন, ইহুদিগণ আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদপ্রাপ্তির পূর্বে আপনি তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। তাদের কুটিলতা ও মিথ্যাচার সম্পর্কে পরীক্ষা করুন এবং লক্ষ করুন যে, তারা আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করে এবং কি বিশ্বাস পোষণ করে। অতঃপর তিনি তাদের কয়েকজনকে তাঁর নিকটে ডেকে এনে বললেন, 'ওহে ইহুদি সম্প্রদায়! অনেক আক্ষেপের বিষয় যে, তোমরা আমার ওপর ঈমান নিয়ে আসছ না এবং তোমরা নিশ্চিতরূপে জান যে, খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ রাসূল খোদার তরফ থেকেই আমি প্রেরিত হয়েছি।' ইহুদিরা বলল, আমরা আপনাদেরকে জানিও না, চিনিও না। আমাদের কিতাবে আপনার সম্পর্কে কোন উল্লেখও নেই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'তোমরা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? তারা উত্তর দিল,

هُوَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا.

'তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং সর্বাপেক্ষা জ্ঞানীর পুত্র।'

অতঃপর হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ করলেন, 'যদি তিনি ঈমান নিয়ে আসেন এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্য দান করেন, তবে তোমরা তা মেনে নিবে কিনা'? সবাই বলল, এমন কথা কখনও হতে পারে না যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন! নবী করীম ﷺ একথাগুলো তিনবার ইরশাদ করলেন। তিনবারই তারা এভাবে উত্তর দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে বল, তিনি যেন বাইরে চলে আসেন।' অতঃপর তিনি বাইরে চলে আসেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা জান যে, ইনি সত্য পয়গম্বর। তিনি যে খোদা প্রেরিত মহাপুরুষ, তোমরা নিশ্চিতভাবে তা জান। এখন তোমরা অস্বীকার করছ কেন? আর নিজেকে গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করছ কেন? তখন ইহুদিরা বলল, তুমি মিথ্যাবাদী।[১] আমরা কখন জানি যে, তিনি খোদার রাসূল। অতঃপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে বলতে লাগল,

هُوَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا.

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৬২, হাদীস: ৩৯১১; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত

'তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূর্খ এবং মূর্খের পুত্র।'[১]

ইহুদি গোত্রের ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা সম্পর্কে সীরাত এবং তাফসীরের কিতাবসমূহে বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান। অথচ তৎকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইহুদি থেকে কেউ বেশি অবহিত ছিল না। কেননা আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে তারাই সর্বাপেক্ষা বেশি অধ্যায়ন করেছিল। এ জন্যে তারা হযরত ﷺ-এর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল। প্রত্যেক ইহুদি একে অপরকে এ সুসংবাদ দিত এবং এ সৌভাগ্য অর্জনের নসীহত করত। যেমন– কুরআন পাকে ইরশাদ করা হয়েছে,

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ

'তারা তাঁকে এমনিভাবে জানে যে, যেমন তারা নিজ নিজ পুত্রকে জানে ও চিনে।'[২]

পিতা পুত্রকে জানার ব্যাপারে পিতার জ্ঞান সাক্ষ্য স্বরূপ। পয়গম্বর ﷺ সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল। কারণ আসমানী কিতাবসমূহে তাঁর বিশেষ প্রশংসা রয়েছে। তাঁকে বিশেষভাবে জানা ও চিনা সত্ত্বেও ইহুদিগণ পথভ্রষ্ট ও গুমরাহীর অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়।

'আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন জ্ঞান ও ইলম থেকে, যা কল্যাণ বয়ে আনে না এবং এমন অন্তর থেকে, যে অন্তরে খোদা ভীতি থাকে না।'[৩]

ع علمے کہ راہ بہ حق ننماید جہالت است۔

'যে জ্ঞান ও ইলম আল্লাহর রাস্তা দেখায় না তাই মূর্খতাই বটে।'

সীরাত ও ইতিহাস লিখকগণ সর্ব সম্মতিক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় হযরত ﷺ-এর অবস্থানকাল দশ বছর। এ দশ বছরের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা যথা জিহাদসমূহ, বিজয়সমূহ আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ফয়েজ

[১] আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, খ. ১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪৭; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৬; *সূরা আল-আন'আম*, ৬:২০

[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৯২, হাদীস: ২৫০:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ».

বরকতসমূহ, শরীয়তের আহকামসমূহ, হেদায়তের আলো নিগুড় তথ্যসমূহ ইত্যাদির বর্ণনা সীরাতের কিতাবে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এ কিতাবের আসল উদ্দেশ্য মদীনায়ে তাইয়িবার ওপর আলোকপাত করা বিধায় এখানে উল্লিখিত বিষয়সমূহের অবতারণা করা গেল না। তা সত্ত্বেও হিজরতের সময়কালীন বিশেষ কিছু ঘটনাবলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

জেনে রাখা দরকার যে, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ হিজরতের প্রথম বর্ষে 'মসজিদে কুবার' ভিত্তি স্থাপনের পর মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কাফিরদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হন, যাতে পৃথিবী থেকে সব রকমের দুর্নীতি, কুসংস্কৃতি, কুপ্রবৃত্তি, কুকীর্তি ফিতনা-ফাসাদ, কুফরী, মূর্খতা ও অজ্ঞানতা এবং গুমরাহীর অন্ধকার দূরীভূত করে প্রকৃত জ্ঞান, ইলম ও ঈমানের আলোতে এ বিশ্বকে উদ্ভাসিত করা যায়।

হিজরতের প্রথমবর্ষ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা মুনাওয়ারা গমনের এগার মাস পর মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের (যারা মদীনার পথ দিয়ে তিজারতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে সিরিয়ায় গমনাগমন করত) অনুসন্ধানের নিমিত্ত ৬০জন মুসলিম মুজাহিদকে মদীনার নিকটবর্তী স্থান আবওয়াতে প্রেরণ করেন।

মুজাহিদ বাহিনী 'ওয়াদ্দান' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করে কাফিরদের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধেই মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। সে বছরই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সাদা পতাকা প্রদান করে 'সাইফুল হিজরত'-এর দিকে প্রেরণ করেন। তখন ৩০০ আরোহীর সাথে আবু জাহেল মলউনের কাফেলা ওই এলাকার ওপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। আরবের একটি দল উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেয়। সে বছর ওবাইদা ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ইসলামী পতাক প্রদান করত একটি বৃহত্তর জমাতের প্রতি পাঠালেন, যার সরদার ছিল আবু সুফিয়ান। কেউ কেউ বলেন, এই দলের নেতা ছিল আবু জাহিলের পুত্র ইকরামা। কেউ কেউ বলেন এই পতাকাই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম পতাকা। এখানে সংঘর্ষ বাঁধেনি। শুধু এই ঘটনাটি ঘটেছিল যে, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه কাফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এটাই সর্বপ্রথম তীর ছিল, যা আল্লাহর রাস্তায় নিক্ষেপ করা হয়।

এ বছরই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ বছর হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সত্য ধর্মের সন্ধানে এবং আখিরী যমানার পয়গম্বর ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভের

প্রত্যাশায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফিরায় থাকেন। প্রথমে তিনি পারস্য ধর্মের, অতঃপর খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হন। অতঃপর তিনি একজন পাদরির উপদেশ মতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিরাট আগ্রহ নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছেন। তাঁকে দশবারের বেশি ক্রীতদাস হিসেবে বেচাকেনা করা হয়। অবশেষে যখন হযরত ﷺ-এর নুবুওয়াতের আলো ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এ বছরই মদীনার বাইরে একটি নেকড়ে বাঘ কথা বলেছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের সাক্ষ্য এবং খবর দিয়েছিল।

এ বছর পয়গম্বর তনয়া হযরত ফাতিমা رضي الله عنها অপরাপর সাহেবজাদীগণ رضي الله عنهن উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা رضي الله عنها, হযরত আয়িশা رضي الله عنها-কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه-এর পরিবারবর্গসহ মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে আসা হয়।

এ বছরই হিজরতের ৭ মাস পরে হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর সাথে হযরত ﷺ-এর পুনর্মিলন ঘটে। তবে অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, পুনর্মিলনের ঘটনাটি দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম রিওয়ায়তটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

হিজরতের এক মাস পর এ বছরই দেশে অবস্থানকারীদের জন্য চার রাকাআত নামায ফরয হয়। ইতঃপূর্বে দু'রাকাআত নামাযই ফরয ছিল, যেভাবে এখন সফরের মধ্যে পড়া হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিও এ বছর অনুমোদিত হয়।

পবিত্র মুহাররম মাসে আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে রামাযানের রোযা ফরয হবার পর এটা শুধু গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হিসেবেই থেকে যায়।

হযরত ﷺ জীবনের ক্রান্তিলগ্নে ইরশাদ করেছিলেন, যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে আশুরার সাথে ৯ মুহাররমের রোযাও রাখবো।

হিজরতের দ্বিতীয়বর্ষ

এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে আশি জন সাহাবীকে কুরাইশের কাফেলার বিরুদ্ধে (যাদের মধ্যে আসির ইবনে খলফও ছিল) 'বওয়াত' নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। তবে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এভাবে জমাদিউল আওয়াল মাসে কিছু মুজাহিদীনকে 'ওশাইরা' নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। কোন যুদ্ধ ছাড়াই তারা বনি মুদলুজ এবং বনি যমরাহ গোত্রের সাথে চুক্তি করে মদীনায় ফিরে আসেন।

অতঃপর হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ﵁-কে ৮০০ মুহাজিরীনের সাথে প্রেরণ করা হয়। তবে তাঁরা বিনা যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কুরজ ইবনে যাবির ফাহিরী মদীনায় হযরত ﷺ-এর উটের ওপর হামলা চালায়। আখিরী যমানার পয়গম্বর ﷺ 'বদর' পর্যন্ত তার পেছনে ধাওয়া করেন, কিন্তু সে এমনভাবে পালিয়ে যায় যে, তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। একে 'বদরে ওলা' (প্রথম বদর) বলা হয়।

এ বছর জমাদিউস সানী মাসে হযরত ﷺ-এর ফুফাতো ভাই আসাদ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে যাহাসকে আটশ, অপর রিওয়ায়ত মতে বারশ মুজাহিদীনসহ কুরাইশদের কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কাফেলাটি সিরিয়ার বাণিজ্য শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল, মক্কার কাছে রজব মাসের প্রথমে তাঁরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করেন। এ যুদ্ধে সাহাবাগণ গণিমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল লাভ করেন। ইসলামের এটা সর্ব প্রথম গণিমতের মাল যা জিহাদ করে লাভ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সাহাবগণ জিহাদটি করেছিলেন এ ধারণার বশীভূত হয়ে যে, ঐদিন জমাদিউস সানীর শেষ দিন। কিন্তু রাসূল ﷺ এটা রজব মাসে (যা হারাম বা সম্মানিত মাস) সংঘটিত হবার কারণে এ মাল গ্রহণ করেননি। অতঃপর যখন কুরআন মাজীদের এ আয়াত [সূরা আল-বাকারা, ২:২১৭],

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ

অবতীর্ণ হয় তখন তিনি তা গ্রহণ করে বণ্টন করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে যাহাসকে এ যুদ্ধে আমিরুল মুমিনীন বলা হত।

তবে আলিমগণ যে বলেছেন, হযরত উমর ﵁-ই সর্ব প্রথম আমিরুল মুমিনীন' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তার অর্থ হল চার খলীফার মধ্যেই সর্ব প্রথম তিনি এ খেতাব লাভ করেন।

এ বছর সফর বা রজব মাসে হযরত আলী ﵁-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদুরে কন্যা হযরত ফাতিমা ﵂-এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় হযরত ফাতিমা ﵂-এর বয়স সতের বছর। অন্য রিওয়ায়ত মতে আঠার বছর। আর হযরত আলী ﵁-এর বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস।

হিজরতের সতের মাস পর সে বছর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। এ বছর শা'বান মাসে রমযান মাসের রোযা ফরয হয়, সদকায়ে ফিতর নির্ধারিত হয় এবং মদীনার মাঠে ঈদের নামায আদায় করা হয়।

হিজরতের বিশ মাস পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﵁ ভূমিষ্ঠ হন। হিজরতের পর তিনিই সর্ব প্রথম সন্তান। তিনি মুসলমানের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন।

এ বছর সতেরই রমযান প্রখ্যাত বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কাফিরগণ পরাজিত হয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং মুসলমানগণ জয় লাভ করে সম্মানিত হন। এ যুদ্ধে কাফিরগণ ৭০ জন বড় বড় নেতা মৃত্যুবরণ করে এবং অপর সত্তর জন বন্দী হয়। এদের মধ্যে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আকিল ইবনে আবি তালিবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসে আবু লাহাব এক দুরারোগ্য রোগে (আতসাতে) আক্রান্ত হয়ে সাতদিন পর মক্কায় মারা যায়।

মুসলিম মুজাহিদীনদের মধ্যে আটজন আনসার এবং পাঁচজন মুহাজির শহীদ হন। এ যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন। যাঁদের মধ্যে সাতাত্তর জন মুহাজির এবং দু'শ ছত্রিশ জন ছিলেন আনসার। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তরটি উট, দুটি ঘোড়া, আটটি তরবারি, ছয়টি লৌহ নির্মিত জামা ছিল।

এতে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শ; তাদের অশ্ব ছিল একশ'টি। 'জুলফিকার' নামক তরবারি এ যুদ্ধেই মুসলমানদের হস্তগত হয়। একে হযরত ﷺ স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখেন।

বদর যুদ্ধের দিন রোমানগণ পারস্যবাসীদের ওপর বিজয় লাভ করে যার ফলে মুসলমানগণ বিশেষভাবে আনন্দিত হন।

তৎকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা, হযরত উসমান ﵁-এর স্ত্রী হযরত রোকেয়া ﵂ মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত ওসামা ইবনে যায়িদ ﵁ ও হযরত উসমান ﵁ তাঁর দাফন কার্যে ব্যস্ত থাকার প্রাক্কালে মদীনায় এ বিরাট বিজয়ের খবর এসে পৌঁছে।

মদীনা শরীফের মধ্যে শুধু সাতদিন অবস্থানের পর হযরত নবী করীম ﷺ বনি সুলাইমের দিকে যাত্রা করেন। 'কদর' নামক স্থানে তিন দিন অবস্থানের পর বিনা যুদ্ধে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বছর আসমা বিনতে মারওয়ান যে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-কে কষ্ট ও যাতনা দিত, তাকে কতল করা হয়।

এ বছর শাওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবার ইহুদি গোত্রের বনি কায়নুকার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালিত হয়। পনের দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই মুনাফিকের সুপারিশ ক্রমে তাদেরকে কতল করা হয়নি। তবে সর্বসম্মতিক্রমে বিতাড়িত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ বছর সর্বপ্রথম ঈদুল আযহার নামায পড়া হয়। এ বছর জাহিলি যুগের বিখ্যাত কবি ওমাইয়া ইবনুস সলাত মারা যায়। সে আগেকার যমানার কিতবসমূহ অধ্যায়ন করত। সে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সে আহলে

কিতাবের আলিমগণের কাছে আখিরী যমানার পয়গম্বর ﷺ-এর আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে নূর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় দিন গুণছিল। কিন্তু নিজের মধ্যে বিশেষ গুণাবলি প্রত্যক্ষ করে পয়গম্বরী প্রাপ্তির স্পৃহাও তার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। যখন সে হযরত ﷺ-এর নূরে নুবুওয়াত আবির্ভাবের সংবাদ পেল তখন হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সে আখিরাতের শাস্তির উপযোগী হয়। হযরত ﷺ তার কবিতা শুনে ইরশাদ করতেন,

«آمَنَ لِسَانُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ».

'তাঁর যবান বা জিহ্বা ঈমান এনেছে কিন্তু তার অন্তর কাফির রয়ে গেছে।'[১]

অন্য রিওয়ায়তে উল্লেখ করা হয়েছে,

«آمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ».

'তার কবিতা ঈমান এনেছে, অন্তর কাফির রয়ে গেছে।'[২]

হিজরতের তৃতীয়বর্ষ

তৃতীয় হিজরীর যিলহজ্জ মাসের পঞ্চম তারিখে (সভিক) এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণ ছিল, বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর আবু সুফিয়ান শপথ নিল যে, যতদিন বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ নেয়া না হবে ততদিন গায়ে তেল মালিশ করবেনা, যনাবতের গোসল করবেনা। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর দু'শ আরোহীসহ মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়ে মদীনার তিন মাইল দূরে একজন আনসারকে শহীদ করে আর এর আশেপাশের কতেক ঘর-বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। হযরত ﷺ দু'শ আরোহী নিয়ে তার দিকে ধাবিত হলে ভয়ে তার দলের লোকেরা সাতুর থলে ফেলে রেখে পলায়ন করে। সেই কারণে একে 'গযওয়াযে সভিক' বলা হয়। পাঁচ দিন পর হুযূর ﷺ এখান থেকে মদীনা ফিরে যান। যিলহজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায় অবস্থানের পর গযওয়াযে নযদ (নযদ যুদ্ধ) এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফর মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর বিনা যুদ্ধে মদীনায় অতিবাহিত করেন। তারপর কুরাইশের অনুসন্ধানের অভিযানে বুহরানে গমন করেন। রবিউস সানী ও জমাদিউল আওয়াল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এরপরে যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।[৩]

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ১, পৃ. ৪১২
[২] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৯, পৃ. ২৭২
[৩] আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানাহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

অতঃপর শাওয়াল মাসে হযরত যাইদ ইবনে হারেসা رضي الله عنه-কে 'যিরদ' নামক স্থানে পাঠালেন। তিনি কুরাইশের কাফেলার (যার মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল) ওপর আক্রমণ চালিয়ে অনেক রৌপ্য হস্তগত করেন।

এ বছর মুহাম্মদ ইবনে মুসলমা رضي الله عنه অপর চারজন সাথীসহ কাব ইবনে আশরফকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। সে (কাব ইবনে আশরফ) প্রায়ই মুসলমানদের কুৎসা রটনা ও প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত থাকত। আর কেঁদে কেঁদে বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মক্কার মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানী দিত।

এবছর হযরত উসমান رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম رضي الله عنها-কে বিবাহ করেন। শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উমর رضي الله عنه-এর কন্যা হযরত হাফসা رضي الله عنها-কে বিবাহ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি খাইস ইবনে হুযাফার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। রমযান মাসে হযরত ﷺ যাইনব বিনতে খুযাইমা رضي الله عنها-কে বিয়ে করেন। তিনি গরীব-মিসকীনকে বেশি করে খানা দিতেন। এ জন্য হুযূর ﷺ তাঁকে উম্মুল মাসাকীন (মিসকীনদের মা) উপাধিতে ভূষিত করেন। বিবাহের আঠার দিন অন্য বর্ণনা মতে দু'মাস অথবা তিনমাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

এ বছর ইমামুল মুমিনীন (মুমীনদের ইমাম) হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইমামে শহীদ হযরত হুসাইন ইবনে আলী رضي الله عنه চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসের চতুর্থ অথবা পঞ্চম তারিখে জন্ম লাভ করেন।

এ বছর চতুর্থ শাওয়াল তারিখে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দন্দান (দাঁত) মুবারক শহীদ এবং ওষ্ঠ মুবারক জখম (আঘাত প্রাপ্ত) হয়। এতে শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবসহ সত্তর জন মুহাজির ও আনসার শাহাদত বরণ করেন। ২২জন মুশরিক জাহান্নামে পৌঁছে যায়। এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান।

যেসব মুজাহিদ উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে সাথে নিয়ে (উহুদ যুদ্ধ) পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুদেরকে পশ্চাৎ ধাবন করেন। যাতে তারা একথা মনে না করে যে, মুসলমান নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসদ' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করে তথা তিন দিন অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে আসেন।

এ বছর হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه জন্মগ্রহণের পঞ্চাশ দিন পর হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه মাতৃগর্ভে তাশরীফ আনেন।

হিজরতের চতুর্থবর্ষ

এ বছর 'বি'রে মউনা'-এর ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে ৭০ জন নওজোয়ান আনসার (যাদেরকে কুররা বলা হত) শহীদ হন।

রাসূলে খোদা ﷺ তাঁদের হত্যাকারীদের জন্য ৪০ দিন পর্যন্ত ফযরের নামাযে দু'আ কুনুত পড়ে বদ দু'আ করেছেন।

এ বছর রজী'র যুদ্ধ ঘটে। মুশরিকদের একটি দল মদীনা আগমন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং দীন শিক্ষা দেওয়ার টালবাহানা করে পয়গম্বর ﷺ-এর অনুমোদন লাভ করে একদল সাহাবীকে তাদের সাথে নিয়ে যায়। রজী' নামক স্থানে পৌছার পর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে বনী হুযাইলের লোকদের সাথে মিলিত হয়ে কতেক সাহাবীকে শহীদ এবং কিছু সংখ্যক সাহাবীকে গ্রেফতার করে মক্কার কাফিরদের হাতে বিক্রয় করে দেয়। বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এসব শহীদানের মধ্যে হযরত আসিম ইবনে সাবিত رضي الله عنه এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর দু'আ অনুসারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেহের হিফাযত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা একদল ভোমর তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। এরা চতুর্দিকে তাঁর দেহ মুবারককে ঘিরে ফেলে, যাতে কোন কাফির তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। অতঃপর যখন রাত হয়, হঠাৎ পানির ঢল এসে লাশটিকে কোথায় নিয়ে যায়।

এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে বনু নযীরের ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহুদিদের এ গোত্রটিকে ছয় দিন অবরুদ্ধ রাখার পর অবশেষে তারা সিরিয়ায় নির্বাসনে রাজি হয়ে সেখানে চলে যায়।

এ বছর যিলকদ মাসের প্রারম্ভে বদরে সুগরা (ছোট বদর) সংঘটিত হয়। উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু সুফিয়ান ঘোষণা করেছিল, আমরা এবং তোমরা প্রতি বছর বদর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করব। যখন দিন ঘনিয়ে আসল তখন ভীত হয়ে নু'আঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তিকে ২০ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়ার অঙ্গীকার করে আবু সুফিয়ান বলল যে, মুহাম্মদ ﷺ এর লোকজনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দাও, যাতে তারা ভয় পেয়ে যুদ্ধ করতে না আসে। হুযূর ﷺ দেড় হাজার আসহাব সাথে করে বের হন এবং অনেক গনীমতের মাল সহকারে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। কুরআন মজীদের এ আয়াতটি ﴿اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾[১] এ ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়।

এ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত

[১] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৭৩

رضي الله عنه ইহুদিদের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন, যাতে তাদের আভ্যন্তরীণ হাল-হাকীকত জানতে পারা যায়।[১]

এ বছর ইহুদি নর-নারীকে ব্যভিচারের কারণে রজম বা পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। বনি নযীরের অবরোধের প্রাক্কালে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। কেউ কেউ বলেন হিজরতের তৃতীয় সনে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। তবে বাস্তবে একবারেই নিষিদ্ধ করা হয়নি। কয়েক দফায় নিষিদ্ধ করা হয়। সর্বশেষ এ বছর আবার কারো কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে কুরআনে কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে মদ চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয় [সূরা আল-মায়িদা, ৫:৯০]:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ ۝

এ বছর শাওয়াল মাসে হযরত উম্মে সলিমাহ رضي الله عنها-কে হুযূর ﷺ স্বীয় নিকাহ'র মধ্যে নিয়ে আসেন। আবু সলমা তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন।

এ বছর উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা رضي الله عنها এবং সাইয়িদিনা হযরত আলী رضي الله عنه-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসদ ইন্তিকাল করেন।

হিজরতের পঞ্চমবর্ষ

এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে 'দুমতুল যন্দলের' ঘটনা ঘটে। এখানে কোন যুদ্ধ হয়নি।[২] মুহাররম মাসে 'গযওয়ায়ে যাতুর রিকা' সংঘটিত হয়। এতে (ভয়কালীন নামায)-এর হুকুম দেওয়া হয়। এ যুদ্ধকে (যাতুর রিকা') নামে অভিহিত করার অনেক হেতু উল্লেখ করা হয়েছে। তবে *সহীহ বুখারী শরীফে* যা উল্লেখ আছে তা অধিক গ্রহণযোগ্য।

হযরত আবু মূসা আল আশ'আরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে যাবার কারণে তাদের পাগুলো ফেটে যায়। এতে তারা ছেড়া কাপড় ব্যবহর করেছিলেন বিধায় এ যুদ্ধের নাম যাতুর রিকা' রাখা হয়।[৩]

কারো কারো মতে, এটা বৃক্ষের নাম। কেউ কেউ বলেন স্থানের নাম।

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ১, পৃ. ২০২
[২] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ১, পৃ. ৪৬৯
[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১১৩, হাদীস: ৪১২৮:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رضي الله عنه، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا».

আবার কারো কারো ধারণা যে, সেখানকার মাটির রং কতেক সাদা, কতেক কালো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হবার কারণে এ নামে অভিহিত করা হয়।

এ বছরই মুরাইসীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা বনী কুযাইয়ের পানির নাম। এটাকে বনি মুসতলকও বলা হয়।[১] এ যুদ্ধে হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) গ্রেফতার হয়ে হযরত ﷺ-এর নিকট আনীত হন এবং হযরত তাঁকে আযাদ করে শাদি করেন।[২] তাঁর প্রকৃত নাম ছিল (বরবাহ)[৩], যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। এ বছর হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে হযরত ﷺ-এর নিকাহ হয়। এক রিওয়ায়ত মতে এ বছর তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়।

এ বছর যিলকদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী মুরতাযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পয়গম্বর ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। হযরত ﷺ-এর নির্দেশে তিনি মক্কার মুশরিক এবং মদীনার ইহুদীরে মধ্যে বিরোধিতা ও অনৈক্য সৃষ্টির ব্যাপারে কূটনীতি চালান। এ যুদ্ধে ৬জন মুসলমান শহীদ হন। তিনজন কাফির মারা যায়। এ যুদ্ধে কাফিরদের ওপর এমন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় যে, তারা আর মদীনার আশে-পাশে টিকে থাকতে পারেনি। যখন রাসূলে খোদা ﷺ এ যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করে বাড়িতে পৌছেন তখন হযরত জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) বনী কুরাইযার অভিযানের নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশানুযায়ী তিনি তাদের অবরোধ করলেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত এ অবরোধ স্থায়ী ছিল। হযরত সাদ ইবনে মুআজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফয়সালা মতে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যাদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতব ইহুদিও জাহান্নামবাসী হয়।

এ বছর (চন্দ্রগ্রহণের নামায) আদায় করা হয়। এ বছর হুযূর পাক ﷺ ঘোড়া থেকে পিছলিয়ে পড়েন এবং হাঁটুর ওপরিভাগে ব্যাথা পান। যার কারণে পাঁচ দিন যাবৎ তিনি ঘরে বসেই নামায আদায় করেন।

সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য কথানুসারে এ বছর এবং অধিকাংশ আলিমদের মতে ষষ্ঠ বর্ষে আর একদল আলিমের মতে নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

হিজরতের ষষ্ঠবর্ষ

এ বছর বনী লিহয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ রজী' নামক স্থানে সেই সব লোকদের সন্ধানে বের হন, যারা বি'রে মউনার নিকট ৭০ জন (কুররা) কারীকে শহীদ করেছিল। তিনি (গতফান) গোত্রের এলাকায় হযরত

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ১, পৃ. ৪৭০
[২] ইবনে কসীর, *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, খ. ৪, পৃ. ৫৮৫
[৩] আল-বগওয়ী, *আল-আনওয়ার ফী শামায়িলিন নাবীয়িল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ৭১৯, হাদীস: ১১৫১

ﷺ-এর ভয়ে বনী লিহয়ানের লোকও পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে। এ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতার কবরে পৌছে ক্রন্দন করেন এবং তাঁর সাথে সাথে সাহাবাগণও কেঁদে ওঠেন।

এ বছর গাবা (জঙ্গল)-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 'গতফান' গোত্রের লোকেরা হুযূর ﷺ-এর উটগুলোকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। ইস্তিগফার নামায এ বছর পড়া হয়। হুযূর পাক ﷺ-এর দু'আর বরকতে সাতদিন বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ বছর উরাইনা গোত্রের লোক মদীনায় আসে এবং এ বছরই বিখ্যাত 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' স্থাপিত হয়। কেউ কেউ বলেন বনী মুস্তলকের যুদ্ধ, হযরত ওয়াইরাহ বিনতে হারিসের গ্রেফতারী এবং হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে অপবাদ দেওয়ার ঘটনাও এ বছর সংঘটিত হয়।

হুযূর ﷺ-এর আংটি প্রস্তুত করা, পৃথিবীর বিভিন্ন বাদশাহগণের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা দিয়ে বাহক প্রেরণ করা, ইসকান্দরিয়ার বাদশাহ 'মুকউকস' মারিয়া কিবতিয়া, স্বীয় ভগ্নি শিরিন, ইয়া'ফর নামক গাধা এবং দুলদুল নামক খচ্চরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ ইত্যাদি সবই এ বছর ঘটেছিল। রাসূলে খোদা ﷺ মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের জন্য নির্বাচন করেন এবং শিরিনকে হাসসান ইবনে ওয়াহাবের নিকট অর্পণ করেন। বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে ইয়া'ফুর মারা যায়। দুলদুল হযরত মুয়াবিয়ার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

এ বছর সূর্যগ্রহণ হয় এবং (সূর্যগ্রহণের নামায পড়ার হুকুম হয়, 'খউলা' নামক একজন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর (যিহার)-এর অভিযোগ উত্থাপন করে, তখন এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় [সূরা আল-মুজাদিলা, ৫৮:১]:

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا ۝

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ের মাতা উম্মে রুম্মান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ বছরই মারা যান।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বছরই মদীনায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং হযরত ﷺ খাইবারে অবস্থানের খবর পেয়ে সেখানে গমন করে যুদ্ধে শামিল হবার ঘটনাও এ বছরই ঘটে।

হিজরতের সপ্তমবর্ষ

এ বছর খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত থেকে যুদ্ধের ঢাল খসে পড়ে গিয়েছিল। খাইবারের কিল্লার দরজা যা সাত ব্যক্তি, অন্য কারো মতে ৪০জনও সরাতে পারেনি, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একাই তা উপড়িয়ে ফেলেন এবং খাইবার জয় হওয়া পর্যন্ত ঢাল স্বরূপ তিনি

তা ব্যবহার করেন। এ যুদ্ধে ইসলামের গাযীদের মধ্যে এগার জন শাহাদাত বরণ করেন এবং তিরানব্বই জন ইহুদি জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছে এ যুদ্ধে হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই বন্দি হন। তিনি হযরত হারুন আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আযাদ করে তাঁকে বিয়ে করেন। এ যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত ﷺ-এর খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামায আদায়ের লক্ষ্যে সূর্যাস্ত যাবার পর আবার ফিরে আসে। অহী নাযিলের সময় হুযূর ﷺ-এর মস্তক মুবারক তাঁর কোলে বিদ্যমান ছিল বিধায় তিনি নামায সঠিক সময়ে আদায় করতে পারেননি।

এ যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া, হিংস্র জন্তুর গোস্ত খাওয়া, বণ্টনের পূর্বে গণিমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল বিক্রয় করা এবং গর্ভবতী বন্দি স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ যুদ্ধে নিকাহে মুতআ (নির্দিষ্টসময়ের জন্য বিবাহ করা) এ হারাম করা হয়, যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে বৈধ ছিল। এরপর মক্কা বিজয়ের পর 'আওতাস' নামক যুদ্ধে পুনরায় বৈধ (হালাল) করা হয়। তিন দিন পর আবার নিশ্চিত ও অকাট্য রূপে হারাম করে দেওয়া হয়। উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ-এর সমস্ত আলিম এতে একমত। তবে কিছু সংখ্যক রাফিযী (শিয়া) এতে ভিন্নমত পোষণ করে।

এ বছর লাইলাতুত তা'রীসের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হচ্ছে খাইবার থেকে ফেরার পথে একদিন রাতে নবী করীম ﷺ তাঁর আসহাবসহ নিদ্রায় বিভোর থাকায় ফযরের নামায কাযা হয়ে যায়। অতঃপর সূর্য ওঠার পর আযান ইকামত সহকারে জামাতের সাতে এ নামায আদায় করা হয়।

এ বছর আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা তার স্বামীসহ হাবশায় যান। সেখানে স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সেখানকার বাদশাহ নাজাশী তাঁকে বিবাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। কেউ কেউ বলেন ষষ্ঠ হিজরীতে এ নিকাহ সম্পাদিত হয়।

এ বছর দু'হাজার একশ সাহাবীসহ হুযূরপাক ﷺ (উমরাতুল কাযা) আদায় করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে সরফ নামক স্থানে হযরত মাইমুনার ইন্তিকাল হয়। এখনও সেখানে তাঁর সমাধি বিদ্যামন আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণের মধ্যে হযরত মায়মুনাই সর্বশেষ তাঁর নিকাহের মধ্যে আসে এবং সর্বশেষ তাঁরই ইন্তিকাল হয়। অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত সুফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা সকলের পর ইন্তিকাল করেন।

হিজরতের অষ্টমবর্ষ

এ বছর সফর মাসে আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং উসমান ইবনে আবি তালহা হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং ইসলাম ধর্মে

দীক্ষিত হন। কেউ কেউ তাঁদের ইসলাম গ্রহণ সপ্তম হিজরীর শেষ ভাগে বলে উল্লেখ করেন।

যিলহজ্জ মাসে হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্ম গ্রহণের সংবাদদাতাকে একটি গোলাম দান করেন।

এ বছর মসজিদে নববীর মিম্বর তৈরি করা হয়। অন্য রিওয়ায়ত মতে, মিম্বর প্রস্তুতের ঘটনাটি সপ্তম হিজরীতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বছর 'মুতা'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস ইবনে ওমাইর নামক এক ব্যক্তির মারফত বসরার বাদশাহের নিকট একটি পত্র পাঠান। শুরাহবীল ইবনে আমর গসসানী তাঁকে হত্যা করে। হযরত নবী করীম ﷺ তার শিরোশ্চেদের জন্য হযরত যাইদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। শুরাহবীল ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে ছিল। যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন তখন হযরত যাফর ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু পতাকাটি আঁকড়ে ধরেন। যখন তিনিও শহীদ হন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তা ধারণ করেন, তিনিও শহীদ হলেন। নবী করীম ﷺ এদের শাহাদতের প্রতি ইশারা করেছিলেন। অবশেষে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহর হাতে এ যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে কুরাইশের কাফেলা অবরোধের মানসে সীফুল বাহারে (সাগরের কিনারা) ইসলামী সৈন্য প্রেরিত হয়। এর অপর নাম 'মরীয়ায়ে খবত'। সেখানে সৈনিকদের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গেলে আল্লাহর হুকুমে 'আম্বর' নামক একটি অতি বৃহদাকার মৎসকূলে এসে যায়। সাহাবাগণ পনের দিন পর্যন্ত তা ভক্ষণ করেন। অন্য রিওয়ায়ত মতে, তারা একমাস যাবৎ এ মৎস্যকে খাদ্য স্বরূপ গ্রহণ করেন।

এ বছর মক্কা বিজয় হয়। দশই রমযান হুযূর আকরম ﷺ মদীনা থেকে বের হন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'যুহফা' নামক স্থানে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্বীয় পরিবারসহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাচ্ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি হযরত ﷺ-এর অনুমতি ক্রমে যমযমের নিকটে অবস্থান করতেন। যেখানে যমযমের পানি পান করানো যেত। হযরত মুআবিয়া, আবু সুফিয়ান, তাঁর স্ত্রী হিন্দা, ইকরামা ইবনে আবী জাহেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এ সময় ঘটেছিল। হুযূর পাক ﷺ মক্কা বিজয়ের পর ইকরামা ইবনে আবী জাহেলকে কতল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী হুকাইমা বিনতুল হারিস ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার স্বামীকে হুযূর ﷺ নিকট নিয়ে এসে তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ইকরামা হুযূর আকরম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-

এর খিলাফতের যমানায় 'আযনাদীন' নামক যুদ্ধের সময় তিনি শহীদ হন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হারাম শরীফে প্রবেশ করেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﷺ তাঁর পিতা আবু কুহাফা ﷺ-কে হযরত ﷺ-এর সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁকে সম্মুখে বসালেন এবং তাঁর বক্ষের ওপর তাঁর হাত রাখেন। এর বদৌলতে আবু কুহাফা মুসলমান হয়ে গেলেন। যখন হযরত আবু বকর ﷺ তাঁর পিতাকে হুযূর ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে আসেন তখন হুযূরপাক ﷺ ইরশাদ করেন, 'এ বুড়োকে কেন কষ্ট দিলে, আমি নিজে তাঁর কাছে যেতাম।'

এ বছর রমযান মাসের বিশ তারিখে মক্কা বিজয় হয়। হুযূর ﷺ মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেন। সময় তিনি মক্কার আশে-পাশের এলাকায় ইসলামী ফৌজ প্রেরণ করেন। আল্লাহর ফযলে চতুর্দিক থেকে বিজয়ের সংবাদ আসতে থাকে তিনি হযরত খালিদকে 'উযযা' আমর ইবনুল আসকে 'সুআ' এবং সাদ ইবনে ফিরুযকে 'মনাত' মূর্তি ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন এবং এভাবে দুনিয়ার বুক থেকে শিরক এবং ফিতনা ফাসাদের নাম নিশান মুছে গেল।

অতঃপর শাওয়াল মাসের দশ তারিখ ১০ হাজার মদীনাবাসী এবং দু'হাজার মক্কাবাসী এক সাথে হুনাইনের দিকে রওয়ানা হন। কতেক সাহাবীদের দৃষ্টি যখন নিজেদের সৈন্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও শান শওকতের প্রতি নিবদ্ধ হল তখন তারা বললেন, এখনতো আর আমরা পরাজিত হব না।আল্লাহর নিকট কথাটি পছন্দ হল না। তিনি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। যদিও মুসলমান পরাজিত হননি। তথাপি কতেক নও-মুসলিমের হিংসা-বিদ্বেষের আত্মপ্রকাশ ঘটল। কেউ কেউ বলল মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এমনিভাবে পালিয়ে যাবে, সাগর তীরে পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে না। আবার কেউ কেউ বলল, 'আজ সেই দিন যে দিন সামিরীর যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বিশ্বনবী ﷺ স্বীয় হাত মুবারকে এক মুঠো কংকর (পাথরের টুকরা) নিয়ে কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। যার ফলে কাফিরগণ পরাজিত হয়। হুনাইনের এ যুদ্ধে চার জন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। সত্তর জন কাফির জাহান্নামে যায়।

অতঃপর আবু মূসা আশআরীর চাচা আবু আমির আশআরীকে এক দল সাহাবাসহ 'আওতাস' (একটি স্থানের নাম) এর দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল হস্তগত হয়। চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ সহস্রাধিক বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য মুসলমানদের হাতে আসে। এ যুদ্ধে শত্রুর ছয় হাজার লোক বন্দী হয়। এদরে মধ্যে সায়মা বিনতুল হারেস যিনি হযরত ﷺ-এর দুধবোন ছিলেন তিনিও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সম্মানের সাথে তাঁর পরিবারবর্গের নিকট অর্পণ করেন।

অতঃপর হুযূর পাক ﷺ তায়িফের দিকে যাত্রা করেন। তায়িফবাসীকে আঠার দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখার পর ঘোষণা করা হয়, যারা কিল্লা থেকে বের হয়ে আসবে, তারা আযাদ হবে। দশজন লোক বের হয়ে আসল। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকরাও ছিলেন। তিনি ফাঁরের সাহায্যে প্রাচীর পেরিয়ে বের হয়ে আসেন।

এ যুদ্ধে ১০জন সাহাবী শাহাদতবরণ করেন। বিজয় লাভ ব্যতিরেকেই তাঁরা (যীরানা) পৌঁছেন। সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে ছয়ই যিলকদ উমরা আদায় করেন। সেখানে তারা গণিমতের মাল বণ্টর করেন। (হাওয়াযিন) গোত্রের লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের অনুরোধে হুযূর পাক ﷺ তাদের বন্দীগণকে তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করেন। এ গোত্রের সরদার মালিক ইবনে আওফও ইসলামে দীক্ষিত হন। রাসূলেপাক ﷺ তাঁকে একশ উট পুরস্কার দেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর কাছে প্রত্যার্পণ করেন। আর তাঁকে তায়িফের উশুলকারক (আমিল) নিযুক্ত করেন।

এখানে কিছু সংখ্যক মূর্খ গনীমতের মাল প্রদানের ব্যাপারে হযরত ﷺ-এর ওপর চড়াও হয়ে অবাঞ্ছিত কথা-বার্তা বলে। এক বৃক্ষের তলে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং চাদর মুবারক শরীর থেকে ছিনিয়ে নেয়। আনসারদের থেকেও কতেক যুবক গণিমতের মাল সম্পর্কে কথা-বার্তা বলেন। পয়গম্বরদের সরদার বিশ্বজাহানের পথ প্রদর্শক হুযূর ﷺ পৃথিবীর অসারতা সম্পর্কে তাদের কাছে বর্ণনা দেন এবং আখিরাতের বিশেষ সওয়াব ও আল্লাহ তা'আলার সবিশেষ অনুগ্রহ লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ইরশাদ করেন, পৃথিবীর এ ধন-সম্পদ অতি নগন্য বস্তু। এ সব আমার গোত্রের লোক, তাদের হিতাহিত জ্ঞান স্বল্প, তাদের ঈমান দুর্বল তাদের মাল-আসবাব-সম্পদ ও জন্মভূমি হাত ছাড়া হয়ে গেছে। অতএব, আমি মনস্থ করেছি যে, তাদের মালামাল তাদের ফিরিয়ে দিই। যাতে তাদের ঈমানের মধ্যে অস্থিরতা না আসে। অতঃপর উত্তাব ইবনে উসাইদ এবং মুআযকে মক্কা শরীফের খলীফা নিযুক্ত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বছর কাব ইবনে যুহাইর কাসিয়াদে (রাসূলুল্লাহর প্রশংসার কবিতা) পেশ করে নিরাপত্তা লাভ করেন। এ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা বিনতে রবীআ ﷺ-কে তালাক দেয়ার মনস্থ করেন। তিনি তাঁর অধিকার হযরত আয়িশা ﷺ-এর নিকট অর্পন করে তাঁর বিবিগণের তালিকাভূক্ত থাকেন। হযরত ﷺ-এর বড় সাহেবজাদী হযরত যয়নাব ﷺ যিনি আবুল আসের স্ত্রী ছিলেন, ওই বছর মারা যান।

হিজরতের নবমবর্ষ

এ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়াইনা ইবনে হুসাইনকে ৫০ জন অশ্বারোহীসহ

শত্রুদের গ্রেফতারের জন্য পাঠালেন। তাঁরা ৫০ জনের মতো কাফির গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আকর ইবনে হারিস এবং আরও একজন লোক পয়গম্বর ﷺ-এর গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরজার বাইরে আওয়াজ দিতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন [সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:৪],

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ۝

রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকত উশুলের নিমিত্ত ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে খোযাআ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। যখন গোত্রের লোকেরা তাঁর সংবর্ধণার জন্য বের হয়ে আসেন তখন তিনি মনে করলেন তাঁকে মারবার জন্যই তারা বেরিয়ে আসছে। অতঃপর তিনি হুযূর পাক ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়: [সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:৬]

إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ۝

এ বছর নবী করীম ﷺ এক মাস যাবৎ বিবিদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

এ বছর তবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবুক যাত্রার প্রাক্কালে তিনি হযরত আলী ﷺ-কে মদীনায় স্বীয় পরিবারর্গের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেন। যখন হযরত আলী ﷺ মুনাফিকদের অপপ্রচারে দুঃখিত হলেন তখন তিনি

«أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ».

'তুমি আমার নিকট হযরত মূসা ﷺ-এর নিকট হযরত হারুন ﷺ-এর মতো।'[১]

ইরশাদ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। এবং তাঁর উচ্চ মর্যদা ও বিশেষত্ব বর্ণনা করেন। তবুক যুদ্ধের জন্য হযরত আবু বকর ﷺ নিজের সম্পূর্ণ ধণ-সম্পদ এবং হযরত উমর ﷺ স্বীয় অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষত্ব বর্ণনা করেন। হযরত উসমান ﷺ যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম যোগান দেন। যে তিন সাহাবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন তাঁদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয় [সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৮]:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ۝

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দু'মাস কাল অবস্থান করেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করেন। আইলা এবং সেখানকার অপর কয়েকটি গোত্র হুযূর ﷺ-এর দরবারে এসে জিযিয়া কর দেওয়ার অঙ্গীকার করে। অতঃপর হযরত

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৭০, হাদীস: ৩০ (২৪০৪); হযরত আবু ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত

খালিদ ﷺ-কে চারশ মুজাহিদসহ দুমতুল জুনদল এলাকার বাদশাহ নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাকে গ্রেফতার এবং তার ভাইকে হত্যা করেন। বাদশাহ জিযিয়া কর দেওয়ার অঙ্গীকার করে রক্ষা পায়। রাসূল আকরম ﷺ তবুক থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে 'কুবা' নামক স্থানে তশরীফ নিয়ে যায়। সেখানে মুনাফিকগণ হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে 'মসজিদে যিরার' (অনিষ্টকারক মসজিদ) তৈরি করেছিল। এই উদ্দেশ্যে যে, যে মসজিদখানি আল্লাহর তাকওয়া এবং ভয়ের ওপর নির্মিত হয়েছিল, যাতে ওখানে লোকজন জামাতে কম উপস্থিত হয়। হুযূর ﷺ উক্ত মসজিদটি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেন। কুরআনের আয়াতে এ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে [সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৭],

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ۝

রামাযান শরীফে যখন তিনি মদীনায় পৌছেন, তখন 'সকীফ' গোত্রের লোকজন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তারা এ শর্ত আরোপ করেন যে, কিছুদিন পর্যন্ত তারা 'লাত' এবং অপরাপর মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গবে না এবং ওদেরকে মন্দ বলবে না আর নামায পড়বে না। হযরত ﷺ তাদের শর্ত মেনে নিলেন না এবং তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় [সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৪]:

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ۝

উসমান ইবনে আবিল আসকে তাদের আমির নিযুক্ত করলেন এবং মূর্তি ভাঙ্গার জন্য আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং মুগীরাকে তাদের পিছনে পাঠিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর হযরত আবু বকর ﷺ-কে হজে পাঠান এবং তাঁর পেছনে হযরত আলী ﷺ-কেও মক্কায় প্রেরণ করেন। তিনি মক্কাবাসীদের কাছে সূরায়ে (বরাআত) পাঠ করে শুনান, মুশরিকদের চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কে অবহিত করেন, উলঙ্গ তওয়াফ করতে বাধা দেন এবং সেখানে একথাও ঘোষণা করে দেন যে, মুমিন ছাড়া কোন মুশরিক বেহেশত যাবে না। এ বছর ব্যভিচারিণী গামিদিয়াকে পাথর মারা হয়। ওয়াইমের ইবনে হারিসের (লিআন) করার ঘটনাও এ বছর ঘটে। এ বছর রযব মাসে হাবসার বাদশাহ নাজ্জাশী ওফাত পান। রাসূল করীম ﷺ মদীনায় তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। শাফিয়ী মাযহবের লোকেরা এ ঘটনা থেকে দলীল পেশ করেন যে, গায়িবানা জানাযার নামায পড়া জায়েয। হানাফীগণ বলেন, এটি হুযূর ﷺ-এর বিশেষত্ব। তা ছাড়া তাঁরা বলেন, নাজ্জাশী বাদশাহর লাশ হুযূর পাক ﷺ-এর সম্মুখে রাখা হয়েছিল। সুতরাং এটা উপস্থিত লাশের ওপরই জানাযা পড়া হয়েছিল। গায়িবানা নয়।

এ বছর উসমান (রা) এর বিবি উম্মে কুলসুম (রা) ওফাত পান। এ বছর আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই মুনাফিকের মৃত্যু ঘটে। ওয়াদা পূরণ করার এবং তার বংশের লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করার মানসে তিনি তাঁর জুব্বা মুবারক তার কাফনের জন্য প্রদান করেন। যখন তার বংশের লোকেরা দেখল যে, সে মৃত্যুর প্রাক্কালে তার কাফনের কাপড়ের জন্য হুযূর (সা)-এর জুব্বা মুবারক পেতে আগ্রহী যাতে সে জুব্বার ওয়াসিলায় আখিরাতের মুক্তি লাভ করতে পারে তখন তার দলের সহস্র লোক মুসলমান হয়ে গেল।

এ বছর আরবের চতুর্দিক থেকে হযরত (সা)-এর খিদমতে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়। এ কারণে এ বছরকে (আম্মুল ওয়াফুদ) প্রতিনিধি দল আগমনের বছর বলা হয়। কেননা আরববাসীরা তাদের ইসলাম গ্রহণ মক্কা বিজয়ের ওপর নির্ভরশীল রেখেছিল। যখন আরববাসীরা অনুধাবন করল যে, কুরাইশ বংশের লোকেরা যারা আরবের নেতৃস্থানীয় এবং বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিবেশি ছিল; পয়গম্বর (সা)-এর নুবুওয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসারী হয়েছে, তখন সকীফ বংশের লোকেরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারা বুঝতে পারল যে, এখন আর এদের সাথে মুকাবিলা করা যাবে না। তারা আরও বুঝতে পারল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর দীন হক ও সঠিক এবং মূর্তি পূজারিদের ধর্ম মিথ্যা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

'সত্য এসেছে এবং অসত্য নির্মূল হয়েছে। মিথ্যা এবং অসত্য নির্মূল হবেই।'[১]

অতঃপর চতুর্দিক থেকে এসে জনগণ মুসলমান হতে লাগল। যেমন কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে,

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি প্রত্যক্ষ করবেন যে, লোক দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।'[২]

হিজরতের দশমবর্ষ

এ বছর রাসূলুল্লাহ (সা) বনি হারিসের নিকট ইসলামী ফৌজ প্রেরণ করেন। তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হন।

এ বছর সালমান, গচ্ছান, আমিরা, যুবায়দা প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। এদের মধ্যে আমর ইবনে মাদী করব নামক লোকটি প্রথমে

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৮১
[২] আল-কুরআন, *সূরা আন-নসর*, ১১০:১-২

ইসলাম গ্রহণ করে, তারপর মুরতাদ হয়। পরে আবার মুসলমান হয়।

এ বছর আবদুল কাইস, আমআস বনি হানিফা গোত্রের প্রতিনিধি দল হযরত (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। বনী হানিফার প্রতিনিধিদের মধ্যে মুসাইলামাতুল কযযাব (বড় মিথ্যুক)ও ছিল। সে মুরতাদ হয় এবং দাবি করে যে, মুহাম্মদ (সা) তাকে তাঁর অংশীদায়িত্ব দিয়েছেন।

এ বছর নযরানবাসী নাসারাদের সাথে (মুবাহলা) এর ঘটনা ঘটে যরীর ইবনে আবদুল্লাহিল বযলী (রা) দেড়শ' লোকসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। পয়গম্বর (সা) তাঁকে মূর্তি ধ্বংসের নিমিত্ত জুল হুলাইফায় প্রেরন করেন। তমীদেররী এবং আদী নসরানী থেকে চুরিকৃত 'যাম' (পাত্র)-এর ঘটনাও এ বছর ঘটে। এ বছর রাসূলে খোদা (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামেন দেশে প্রেরণ করেন।

এ বছর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন হজ্জ করেননি। তবে হিজরতের পূর্বে এবং নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে হজ্জ করেছেন। আলিমগণ এর কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তিনি হিজরতের পরে সর্ব সম্মতভাবে চারবার উমরা আদায় করেন।

এ বছর বিদায় হজের সময় কুরআনের আয়াত:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ۝

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।'[১]

অবতীর্ণ হয়। হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে (গদীরে খুম) নামক স্থানে হযরত আলী (রা)-এর বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। রাসূলে করীম (সা)-এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা) এ বছর ওফাত পান। এ বছর (যমাম ইবনে সালবা) হুযুরের দরবারে উপস্থিত হন এবং নিজের কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে মুসলমান করেন। এ বছর হাতিম তাই গোত্রের বনি তাই এর লোকজনকে প্রেফতার করে হুযূর (সা)-এর খেদমতে আনা হয়। এদের মধ্যে হাতিম তাই এর কন্যাও ছিল। তার পুত্র পলায়ন করে সিরিয়ায় চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে রেহাই দেন এবং উপঢৌকন প্রদান করেন। সে তার ভাইয়ের কাছে চলে যায়। উভয়ে তাঁর খিদমতে এসে মুসলমান হন।

এ বছর হযরত খালিদকে নযরানের বনি হারিসের নিকট পাঠালে তারা মুসলমান হয়ে যখন দরবারে উপস্থিত হন তখন তিনি তাদেরকে দেখে বললেন, এরা কারা? এদেরকে তো হিন্দের (ভারতের) মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এ বছর ইয়ামেনের শাসক 'বাদান' মারা যায়।

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নসর*, ১১০:১-২

এ বছর হুযুরে আকরম ﷺ হযরত মুআয ইবনে জবলকে ইয়ামেন ও 'হাযরি মওতের' দিকে প্রেরণ করেন। তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে স্বয়ং হুযুরে পাক ﷺ ঘর থেকে খালি পায়ে বেরিয়ে এসে তাঁকে বিদায় জানান এবং ইরশাদ করেন, সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আর আমাকে পাবে না। হতে পারে আমার তোমার এ মুলাকাত শেষ মুলাকাত। একথা শুনে হযরত মুআয رضي الله عنه কাঁদলেন। তিনি তাঁকে বিদায় দিলেন।

এ বছর যরীর ইবনে আবদুল্লাহকে 'যিলকিলা' নামক একজন শাসকের কাছে পাঠান। তিনি তাঁর ওযির-নাযিরসহ মুসলমান হন। এ বছর রোমের বাদশাহের তরফের আমির ফরওয়া ইবনুল জুযামী মুসলমান হন। রোমের বাদশাহ তাঁকে বন্দী করেন এবং ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ফরওয়া বললেন তুমি নিজেই জান যে, ইনি সেই ব্যক্তি যার আবির্ভাবের সুসংবাদ স্বয়ং ঈসা عليه السلام দিয়ে গেছেন। কিন্তু তুমি রাজত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে কেন ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছ? অতঃপর বাদশাহ তাঁকে গ্রেফতার করে হত্যা করে।

হিজরতের একাদশবর্ষ

এ বছর হযরত সাইয়িদুল মুসরালীন ﷺ, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জান্নাতুল বকী'তে মুসলমানদের জন্য ইস্তিগফার ও গুনাহ মাফির জন্য দু'আ করেন এবং ওদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, 'ওহে বকী'র বাসিন্দারা! তোমাদের দিন-কাল কতই ভালো ছিল, তোমরা যে বিদায় নিয়ে গেছ? এখনতো এমন ফিতনা আসার পথে যা অন্ধকার রাতের চেয়েও আঁধার।'[১]

এ বছর সফর মাসের ২৪ তারিখ হযরত ওসামা ইবনে যাইদ رضي الله عنه-কে রোমের অন্তর্গত 'ওবনা' নামক স্থানে প্রেরণ করেন। যেখানে তাঁর পিতা হযরত যাইদ رضي الله عنه শহীদ হন। বুধবার রাসূল মকবুল ﷺ-এর শরীরে জ্বর আসে এবং মাথা ব্যাথা আরম্ভ হয়। বৃহস্পতিবার স্বহস্তে ইসলামের পতাকা ঠিক করে হযরত ওসামা رضي الله عنه-এর কাছে অর্পণ করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মদীনার নিকট যরফ নামক স্থানে অবস্থান করেন। হুযূর ﷺ হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه, হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস رضي الله عنه, হযরত আবু ওবাইদা رضي الله عنه প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণকে হযরত ওসামা رضي الله عنه-এর সাথে রওয়ানা করিয়ে দেন। হযরত ওসামা رضي الله عنه-কে সেনাপতি নিয়োগ করায় যখন কিছু সংখ্যক লোক আপত্তি তোলে তখন হুযূর আকরম ﷺ হযরত ওসামা رضي الله عنه এবং তাঁর পিতা হযরত যাইদ رضي الله عنه-এর প্রশংসা করে উচ্চাঙ্গের খুতবা প্রদান করেন এবং

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ২, পৃ. ১৫৪

আসওয়াদ আনসী উভয়ের আবির্ভাবের খবর পান। তিনি অহীর মারফত আনসীর মৃত্যুর খবর শুনে লোকজনকে বলে দেন। খবর যথাযথই ছিল। আসওয়াদ আনসী ইয়ামেনের অন্তর্গত 'চনআ' নামক এলাকায় বিদ্রোহ করেছিল এবং শহর ইবনে বাযানাকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। এ স্ত্রী লোকটি ফিরোযের চাচাত বোন ছিল এবং ফিরোয 'নাজ্জাশী' বাদশাহর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। ফিরোয কৌশলে আসওয়াদ আনসীর গৃহে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর সময় এ মালাউনের গলা থেকে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ বের হয়। গ্রামবাসী এ আওয়াজ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করল, এ আওয়াজটি কিসের? স্ত্রী লোকটি বলল, এও তার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে। দারোয়ান এবং পাহারাদারগণ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। এ যে তোমাদের পয়গম্বরের অহী। এ আসওয়াদ মালউনের নাম ছিল আবলা ইবনে কাআব। তাকে যুলহিমারও বলা হত। সে গণক ছিল এবং লোকজনকে আশ্চর্য জিনিস দেখাত। বিদায় হজের পরেই তার আবির্ভাভ ঘটে।[১]

মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হযরত আমির হামযা رضي الله عنه-এর হত্যাকারী ওয়াহশী হত্যা করে। ওয়াহশী বলতেন, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ভালো মানুষ এবং সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করেছি। মুসাইলামাতুল কায্যাব বেশি বুড়া হয়েছিল। সে বনি হানিফার প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযূর ﷺ-এর খিদমতে এসে মুসলমান হয়েছিল। নিজ দেশ ইয়ামামায় ফিরে গিয়ে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। সে হযরত ﷺ-এর নুবুওয়াতে অংশীদারিত্বের দাবি করে। সে মদ এবং জিনা হালাল ঘোষণা করেছিল। ফরয নামায তুলে দিয়েছিল। একদল অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার অনুসারী হয়েছিল। সে কুরআন পাকের মুকাবিলায় ছন্দের অবতারণা করে কিছু বাক্য গড়েছিল, যা জ্ঞানী লোকদের হাসি তামাশার খোরাক যোগিয়েছিল। সূরা আল-আযিয়াত এর মুকাবিলায় সে বলেছিল,

وَالذَّارِيَاتِ زَرْعًا، وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا، وَالطَّاحِنَاتِ طِحْنًا، وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا، وَالثَّارِدَاتِ ثَرْدًا.

'শপথ ক্ষেত করার মত ক্ষেতকারীদের এবং ক্ষেত কাটার মতো ক্ষেত কাটকদের, আটা পিষার মতো আটা পিষকদের রুটি বানার মতো রুটি তৈরিকারকদের, রুটি টুকরা করার মতো রুটি টুকরাকারকদের।'[২]

সে আরও বলেছিল,

[১] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ২, পৃ. ১৫৪–১৫৫
[২] আদ-দিয়ার বকরী, *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, খ. ২, পৃ. ১৫৮

يَا ضِفْدَعُ بِنْتَ ضِفْدَعَيْنِ إِلَى كَمْ تُبِقِيْنَّ، لَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ، وَلَا الشَّارِبِيْنَ تَمْنَعِيْنَ، رَأْسُكِ فِي الْمَاءِ وَذَنَبُكِ فِي الطِّيْنِ.

'হে বেঙ ! দুটি বড় বেঙের কন্যা, তুই কত দিন বেঁচে থাকবি? তুই তো পানির ওপর সাঁতারও কাটিস না। পিপাসাতুরদের বাধাও দিচ্ছিস না। তোর মাথা পানিতে আর লেজ মাটিতে।'[১]

সে আরও বলে,

اَلْفِيْلُ، مَا الْفِيْلُ؟ لَهُ خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا الْجَلِيْلِ.

'হাতি! হাতি কি? তার লম্বা শুড় আছে। নিশ্চয় এটি আমাদের মহান প্রভুর সৃষ্টি।'

এ মালউনের অনেক অলৌকিক ঘটনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু সব তার দু'আর বিরোধী। যদি সে কারো আয়ু বৃদ্ধির জন্য দু'আ করত, তবে সে অন্ধ হয়ে যেত। যদি সে কারো চক্ষুর রৌশনী (আলো) এর জন্য দু'আ করত, তবে সে অন্ধ হয়ে যেত।

একবার সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট এভাবে চিঠি লিখেছিল,

مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ، أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ الْأَرْضَ لَنَا نِصْفٌ، وَلِلْقُرَيْشِ نِصْفٌ، وَلَكِنَّ الْقُرَيْشَ يَعْتَدُوْنَ.

'মুসাইলামা আল্লাহর তরফ থেকে মুহাম্মদের প্রতি, নিশ্চয় জমিন অর্ধেক আমাদের, অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশরা অবিচার করছে।'[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে ইরশাদ করেন,

مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ: اَلسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরফ থেকে মিথ্যুক মুসাইলামার প্রতি। অতঃপর নিশ্চয় সারা বিশ্ব আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাগণ থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, এর ওয়ারিস করে দেন; ভালো পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।'[৩]

[১] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৫৯
[২] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৬০০
[৩] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৬০০-৬০১

হুযূর ﷺ সোমবার দিন মসজিদে তশরীফ নিয়ে যান। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল অন্য দিনের তুলনায় আজ হুযূর ﷺ-এর মেজাজ মুবারক ভালো। সেদিন বারই রবিউল আউয়াল দ্বিপ্রহরে অথবা চাশতের সময় তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। হুযুরের পরিবারের লোকেরা মঙ্গলবার তাঁকে গোসল দেন এবং সারা দিন দলে দলে মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। বুধবারের রাতে হুযুরের পবিত্র দেহ মুবারক অসার বিশ্বের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মসজিদে নববী নির্মাণের কৈফিয়ত এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত বর্ণনাকারী এবং ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন যে, যখন হযরত ﷺ-এর উষ্ট্র মুবারক মসজিদের সম্মুখে এসে বসে যায়, তখন তিনি ইরশাদ করলেন,

«هَذَا الْمَنْزِلُ إِنَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ».

'ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা এখানেই অবস্থানের স্থান হবে।'[১]

তিনি যখন উষ্ট্র পৃষ্ঠ থেকে নিচে অবতরণ করেন, তখন এ আয়াত শরীফ পাঠ করলেন,

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

'ওহে আল্লাহ! আমাকে মুবারক স্থানে অবতীর্ন করুন, আপনি ভালো অবতীর্ণকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'[২]

সে সময় সেখানে একটি খেজুরের বাগান ছিল। দু'জন ইয়াতিম খেজুরকে শুকিয়ে খুরমায় পরিণত করত। তারা উভয়ে এক আনসারীর গৃহে লালিত-পালিত হয়। হযরত ﷺ সেখানে আগমনের পূর্বে কেউ কেউ নামাযও আদায় করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ইয়াতিমকে ডেকে তাদের কাছ থেকে জায়গাটি খরিদ করার বাসনা প্রকাশ করলে তারা কোন বিনিময় ছাড়াই তা প্রদান করতে আকুল আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সেভাবে তিনি উহা গ্রহণ করলেন না। প্রথমে তাদেরকে তার মূল্য দিলেন। অতঃপর মসজিদের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করলেন। এক আনসারী যমিনের মূল্য ব্যতীত মালিককে সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি খেজুর গাছও অতিরিক্ত প্রদান করেন।[৩]

অতঃপর উঁচু-নীচু স্থানসমূহকে সমান করা হল। অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষসমূহকে উৎখাত করে মসজিদের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করা হল। জান্নাতুল বকী' এর বি'রে আইয়ুব যা সাইয়িদিনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পূর্ব দিকে অবস্থিত, তথা থেকে ইট আনা হল। মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবায়ে কিরামদের মনের সান্ত্বনার জন্য রাসূল ﷺ ইরশাদ করতেন,

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৪৯
[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-মু'মিনুন*, ২৩:২৯
[৩] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৪৯-২৫০

«اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ ☆ فَارْحَمِ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

'ওহে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণ নেই। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আনসার এবং মুহাজিরদের ওপর রহমত নাযিল করুন।'[১]

মসজিদ শরীফের ছাদ এবং খাম্বাসমূহ খেজুর বৃক্ষ দ্বারা তৈরি করা হয়। হাদীসে শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। তখন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহপাকের নিকট থেকে এ নির্দেশ নিয়ে আসলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর ছাদের মতো ছাদ তৈরি কর, উচ্চতা সাত গজ থেকে বেশি না হয় এবং কারুকার্যেও যেন অতিরিক্ত কিছু করা না হয়। এ কারণে দেখা যায় হযরত ﷺ-এর যামানায় বৃষ্টিপাতের সময় ছাদ থেকে মাটি এসে মানুষের মাথায় পতিত হত।[২]

প্রথম স্থাপনকালে উত্তর-দক্ষিণে মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল ৫৪ গজ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ছিল তেষট্টি গজ। খাইবার বিজয়ের পর আবার যখন নতুন সূত্রে স্থাপিত হল, তখন ১০০ গজ ১০০ গজ ছিল।

তাবারানী রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আনসারীকে ইরশাদ করলেন, 'তুমি বেহেশতের একটি ঘরের বিনিময়ে মসজিদের জন্য কিছু জমিন বিক্রয় কর, যাতে মসজিদটি সম্প্রসারিত হতে পারে।' লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি বেশি পরিবারওয়ালা একজন দরিদ্র ব্যক্তি। এই ব্যতীত আমার অপর কোন সম্পত্তি নেই। তিনি তার আপত্তি শুনলেন। অতঃপর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই জমিনখানি ১০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে হুযূর আকরম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, উল্লিখিত জমিন ওই বেহেশত গৃহের বিনিময়ে আপনি আমার নিকট থেকে খরিদ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের ঘরের বিনিময়ে তা ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং স্বীয় হস্ত মুবারাক দ্বারা একখানা ইট দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর হযরত রাসূল করীম ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুও এক একটি ইট স্থাপন করেন। মসজিদে নববীর মত কুবা এলাকার মসজিদ নির্মাণের প্রাক্কালেও তাঁরা সবাই ভিত্তি প্রস্তর রাখলেন।[৩] তবে এতে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ২, পৃ. ৫৩৯, হাদীস: ১২৯৪
[২] আল-হালবী, *ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন*, খ. ২, পৃ. ৯১-৯২
[৩] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৫২১

হিজরতের সময় তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। সে সময় পর্যন্ত তিনি হাবশা থেকে ফিরে আসেননি।

ইমাম আহমদ ﵀ হযরত আবু হুরাইরা ﵁ থেকে রিওয়ায়ত করেন, সাহাবীগণ ইট বহন করে নিয়ে আসতেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺও তাঁদের সাথে কাজে অংশ গ্রহণ করেন। একবার আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, তিনি তাঁর বক্ষ মুবারক পর্যন্ত পেটের ওপর ইট ধারণ করে বয়ে নিয়ে আসছেন। আমি বয়ে নিয়ে যাব। তিনি ইরশাদ করলেন, 'অনেক ইট পতিত অবস্থায় রয়েছে। ওখান থেকে বহন করে নিয়ে যাও। এগুলো আমাকে নিয়ে যেতে দাও।' তিনি আরও ইরশাদ করলেন,

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ».

'হে আবু হুরাইরা! পরকালের সুখ শান্তি ছাড়া কোন সুখ শান্তি নেই।'[১]

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণিত এ ঘটনাটি দ্বিতীয়বার নির্মাণের সময়কার ঘটনা। কেননা প্রথমবার নির্মাণের সময় তিনি মদীনায় আসেননি। সপ্তম হিজরীতে খাইবারের যুদ্ধের সময়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম নির্মাণ কার্য এর পূর্বেই হয়েছিল। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক সাহাবী এক একটি ইট বহন করে আনতেন, আর হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বয়ে আনতেন, দু' দু'খানা ইট। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

«وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ».

'আল্লাহ তা'আলা আম্মারের ওপর করুণা করুক। বিদ্রোহীদের একটি দল তাকে হত্যা করবে। তিনি তাদেরকে বেহেশতের দিকে আহ্বান করবেন। আর তারা তাঁকে দোযখের দিকে আহ্বান করবে।'[২]

প্রথমবার মসজিদ নির্মাণের সময় ১৬ অথবা ১৭ মাস যাবৎ কিবলা বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে ছিল। সেই সময় মসজিদে নববীতে দরজা ছিল তিনটি। একটি ছিল বাম দিকে, যেদিকে এখন কিবলা বিদ্যমান। অপর একটি পশ্চিম দিকে, যাকে এখন (বাবুর রহমত) বলা হয়। তৃতীয় দরজাটি ছিল ওখানে, যেখান থেকে হুযূর ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন। এটাকে (বাবে আল উসমান) বলা হত। এখন এ দরজাকে (বাবে জিবরাইল) বলা হয়। এটি মিহরাবের সন্নিকটে। জনগণের মধ্যে এ নামটি প্রসিদ্ধ লাভ করায় এর নাম 'বাবে জিবরাইল' রাখা হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরাইল ﵇ এ স্থানে

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৪, পৃ. ৫১২, হাদীস: ৮৯৫১
[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৮, পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ১১৮৬১

আগমন করে কাবা শরীফ পর্যন্ত যতগুলো পর্দা ছিল তিনি তা সরিয়ে দেন এবং হযরত ﷺ স্বয়ং মিযাবে কাবা অবলোকন করে কাবা শরীফের দিকে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করেছিলেন বলেই তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা নির্ধারিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পনের দিন পর্যন্ত নির্মিত খাম্বার পিছনে যাকে (ওস্তওয়ানে আয়িশা) বলা হয়, নামায আদায় করেন। অতঃপর মিহরাবের স্থানেই তাঁর দণ্ডায়মানের স্থান নির্দিষ্ট হয় বর্তমানের মত পূর্বে মিহরাবের কোন নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত ছিল না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয ﵀ যখন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের আমলে মদীনা শরীফের প্রশাসক ছিলেন তখনই তিনি তা চিহ্নিত করেন।

যে সময় হুযূর ﷺ প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে নামায আদায় করতেন তখন তিনি উক্ত খাম্বাটিকে পশ্চাতে রেখে সিরিয়ার দিকে মুখ করে 'বাবে উসমানের' মুকাবিলা স্থানে এভাবে দণ্ডায়মান হতেন, যাতে বাবে উসমান তাঁর ডান দিকে থাকে। এটি সেই স্থান যেখানে মিম্বর নির্মাণের পূর্বে পশ্চাতের দেওয়ালের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তিনি সাহাবায়ে কিরামদের খুতবা প্রদান করতেন। খুতবা প্রদানের প্রাক্কালে যদি তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন তখন একখানা কাঠের প্রতি হেলান দিতেন, যা সেখানে খাড়া রাখা হয়েছিল। আরব আনসারীর গোলাম ছিলো। হযরত ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, যদি আপনি কবুল করেন তবে আমি আপনার জন্য একখানা মিম্বর প্রস্তুত করে দেব, যাতে আপনার ওঠা-বসা সহজ হয়। তিনি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি মিম্বর প্রস্তুত করে দিলেন। মিম্বরখানার তিনটি সিঁড়ি ছিল। তৃতীয় সিঁড়িটি বসার স্থান ছিল। সহীহ রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, মিম্বর তৈরির পর যখন প্রথম স্থান বাদ দিয়ে তিনি ওঠা-বসা করতে লাগলেন। তখন পূর্বে যে কাঠে হেলান দিতেন তা তাঁর বিচ্ছেদ শোকে ফেটে গেল এবং ক্রন্দন করতে লাগল। আর উষ্ট্রের মতো চিৎকার আরম্ভ করে দিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এ অবস্থা দেখে তাঁরা নিজেও কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর হুযূর আকরম ﷺ দয়া পরবশ হয়ে এর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, 'যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে সেই স্থানে রাখব, যেখানে তুমি পূর্বে ছিল। আর যদি ইচ্ছা কর; তবে বেহেশত কাননে বসিয়ে দেব। যার নদ-নদী ও জলাশয়ে তুমি সিক্ত হবে।' কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর আসহাবের প্রতি লক্ষ করে বললেন, 'সে বেহেশতে অবস্থানই পছন্দ করেছে।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান বসরী ﵀ যখন একথাটি শুনলেন, তখন তিনি অনেক কান্নাকাটি করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! কাঠ যখন আমাদের হুযূর আকরম ﷺ-এর বিচ্ছেদ বেদনায় কাঁদে, তবে তোমরা কি এর চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত নয়?

سنگے ونباتے کہ درو خاصیتے ہست ☆ بہ ز آدمی دان کہ درو معرفتی نیست

'যে পাথর এবং গাছপালার মধ্যে নবী করীম ﷺ-কে জানার ও চেনার বিশেষ গুণ রয়েছে, তা মানুষ থেকে শ্রেয়, যার মধ্যে পরিচিতির তেমন গুণ নেই।'

কাজী আয়ায رحمه الله বলেন, কাঠ খণ্ডটির ক্রন্দনের হাদীসটি মশহূর বরং মুতওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ উহা নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য। অনেক সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত কাষ্ঠ খণ্ডটি একজন সাহাবীর নিকটে রক্ষিত ছিল। বেশি দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তা খারাপ হয়ে পড়ে। অন্য বর্ণনা মতে একে যেখানে রাখা হয়েছিল ওখানেই দাফন করা হয়। সহীহ বর্ণনা মতে মিম্বরের দৈর্ঘ্য দু'গজ এবং এক গজ ছিল। মিম্বরের প্রত্যেক স্তরে প্রস্থ এক এক বিঘত পরিমাণ ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে মিম্বরখানি পূর্ববৎ ছিল। তবে হযরত উসমান رضي الله عنه তাঁকে 'নবতী লেবাস' পরিয়ে সুশোভিত করেন। হযরত উসমান رضي الله عنه তাঁর খিলাফতের ষষ্ঠ বর্ষের পর মিম্বরে হযরত ওমরের رضي الله عنه নিম্নস্তরে উপবেশন করেন। আর হযরত উমর رضي الله عنه হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর নিম্নের সিঁড়িতে উপবেশন করতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه মিম্বর শরীফকে লেবাস পরান।

বর্ণিত আছে যে, একবার যখন হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মিম্বরটিকে মদীনা থেকে সিরিয়ায় নিয়ে যেতে চাইলেন। এ সময় সূর্য কালো হয়ে যায় এবং আকাশে নক্ষত্র রাজি দেখা দেয়। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি উক্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি উপস্থিত সাহাবাদের বললেন, মিম্বরটিকে নাড়া-চাড়া করার উদ্দেশ্য ছিল মাটি একে খেয়েছে কিনা, প্রত্যক্ষ করা। পরবর্তীতে ছ'স্তর বিশিষ্ট মিম্বর নির্মিত হয় এবং মিম্বরে নববীকে এর ওপর স্থাপন করা হয়। অতঃপর খলীফা মাহদী যখন মিম্বরের স্তর আরো বৃদ্ধি করার মনস্থ করেন তখন হযরত ইমাম মালিক رضي الله عنه তাঁকে বাধা দেন। হযরত মুআবিয়ার নির্মিত মিম্বর যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন আব্বাসীয় বংশের কোন খলীফা নতুন মিম্বর তৈরি করেন এবং মিম্বরে নববীর কিছু অংশ বিশেষ চিরুনীর মতো অঙ্কন করে সেখানে রেখে দিলেন।

৬৫৪ হিজরীতে অগ্নিকাণ্ডে যে মিম্বরখানা পুড়ে গিয়েছিল তা আব্বাসীয় বংশীয় খলীফার নির্মিত ছিল। তবে কেউ কেউ বলেন, তা হযরত আমীরে মুআবিয়া رضي الله عنه এর নির্মিত ছিল। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি নির্ভরযোগ্য। এর পরে মুসলিম বাদশাহগণ কিছু কিছু সংস্কার সাধন করতে থাকেন। ৯৯৮ হিজরীতে রোমের বাদশাহ মুরাদ খাঁ ইবনে সলীম খাঁ মরমর পাথরের মিম্বর তৈরি

করেন। রোমের মনীষীরা 'মিম্বরে উমর সুলতান মুরাদ' এ ফারসি শ্লোক থেকে মিম্বর তৈরির সন বের করেন অর্থাৎ ৯৯৮ হিজরী।

অনুচ্ছেদ-১ঃ মসজিদে নববীর থাম (স্তম্ভ)সমূহের বর্ণনা

মসজিদে নববীর এমন আটটি স্তম্ভ রয়েছে যেগুলো থেকে বিশেষ বরকত লাভ করা যায়।

প্রথম স্তম্ভঃ এ স্তম্ভটি মিহরাব সংলগ্ন এবং ইমাম খাড়া হওয়ার ডান পাশে অবস্থিত। মিম্বর তৈরির পূর্বে হযরত ﷺ এখানে খুতবা দিতেন। যে কাঠ খণ্ডটি হুযূর ﷺ-এর বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছিল, তা সেই স্থানেই ছিল। এ স্তম্ভটিকে 'ওস্তওয়ানাতু মুখাল্লক' বলা হয়। কিছু অপবিত্র জিনিস এতে লাগার কারণে এতে 'খলুক' নামক খুশবু লাগানো হয়েছিল বিধায় তা এ নামে অভিহিত হয়। হযরত ﷺ-এর কোন কোন্ সাহাবী এখানে নফল নামায আদায় করতেন।

দ্বিতীয় স্তম্ভঃ 'ওস্তওয়ানাতু আয়িশা' নামে অভিহিত। একে 'ওস্তওয়ানাতুল কুরা' এবং 'ওস্তওয়ানাতুল মুহাজিরীন'ও বলা হয়। এটি হুযূর ﷺ-এর হুজরা শরীফ ও মিম্বর শরীফের মধ্যকার তৃতীয় স্তম্ভ। কিবলা পরিবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্তম্ভটির দিকে নামায আদায় করেন। বিশিষ্ট মুহাজিরগণ যেমন- হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه প্রমুখ সাহাবীগণ এ স্তম্ভের দিকেই নামায আদায় করতেন এবং সেখানেই মিলিত হতেন।[১]

তাবারানী হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'এ স্তম্ভের সম্মুখভাগে এমন একটি স্থান রয়েছে যদি মানুষ এর মর্যাদা অবহিত হয়, তবে লটারি ছাড়া কেউ সেখানে নামায আদায়ে সক্ষম হবে না।' যখন হযরত আয়িশা رضي الله عنها এ হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন তাঁর ছেলেগণ (সাহাবায়ে কিরাম) জিজ্ঞাসা করেন স্থানটি কোথায়? হযরত আয়িশা رضي الله عنها স্থানটি নিরূপণ করলেন না। যখন সাহাবীগণ ওখান থেকে সরে আসলেন, হযরত আয়িশা رضي الله عنها-এর ভগ্নিপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رضي الله عنه সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। সাহাবীদেও ওই দলটি এ আশায় রইলেন যে, তিনি কাছ থেকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করবেন, মসজিদের মধ্যে বসে রইলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তিনি তাঁদেরকে জানাবেন। অল্পক্ষণ পর তিনিও বের হয়ে আসলেন এবং সে স্তম্ভের সন্নিকটে ডান পাশে নামায আদায় করতে লাগলেন। এতে লোকেরা জানতে পারল যে, স্থানটি এটিই। যার সুসংবাদ হুযূর ﷺ প্রদান করেছেন। এ স্তম্ভটির নিকটে দু'আ করা মুস্তাহাব।[২]

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৯-৪০

[২] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ১, পৃ. ২৬৪, হাদীস: ৮৬২

তৃতীয় স্তম্ভ: এটা 'ওস্তাওয়ানাতু তওবা' নামে পরিচিত। এটা হুজরা শরীফ থেকে দ্বিতীয় এবং মিম্বর শরীফ থেকে চতুর্থ স্তম্ভ। এ স্তম্ভটা হযরত আয়িশা ﵂-এর হুজরার দিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে, এ স্তম্ভও কবর শরীফের মধ্যে বিশ গজের ব্যবধান। এ স্তম্ভটিকে 'ওস্তাওয়ানাতু আবি লুবাবা'ও বলা হয়। হযরত আবু লুবাবা নামক আনসার গোত্রের একজন লোক এ স্তম্ভের সাথে নিজকে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল। ঘটনাটি হল, হযরত আবু লুবাবা ﵁-এর সাথে ইহুদি গোত্রের বনী কুরাইযার চুক্তি সম্পাদিত ছিল। যখন হযরত ﷺ তাদেরকে অবরোধ করলেন, তখন আবু লুবাবার পরামর্শ অনুযায়ী তারা কিল্লা থেকে অবতরণ করল। তাদের স্ত্রী-পুত্র সবাই আবু লুবাবা ﵁এর পায়ে জড়িয়ে ধরে আহাজারি করতে থাকে, যাতে তিনি তাদেরকে হুযূর ﷺ-এর দরবারে নিয়ে যান এবং তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের ওজর-আপত্তি পেশ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য তা করব। কিন্তু মাঝখানে তিনি তাদের প্রতি এমন ইঙ্গিতও দিলেন যার অর্থ ছিল তোমাদের হত্যা অবধারিত। অর্থাৎ তিনি নিজের হস্ত দ্বারা গলার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। হযরত আবু লুবাবা থেকে একথাটি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ রূপে বের হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি নিজকে এ স্তম্ভের সাথে জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে নিলেন। দশ দিনেরও বেশি সময় তিনি এ অবস্থায় অতিবাহিত করেন এবং কেঁদে কেঁদে অশ্রু জলে বুক ভাসাতেন। কেবল নামায ও প্রস্রাব-পায়খানার সময় তাঁর পুত্র এসে বাঁধন খুলে দিতেন। অতিরিক্ত ক্ষুধা ও ক্রন্দনের কারণে তাঁর শ্রবণশক্তি লোপ পেয়েছিল এবং দৃষ্টিশক্তিও যায় যায় প্রায়। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকের এ আয়াতটি নাযিল করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۝

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত করো না।'[১]

হযরত আবু লুবাবা শপথ গ্রহণ করেছিলেন যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজ হস্ত দ্বারা এ বাঁধন খুলে না দেবেন ততদিন পর্যন্ত আমি বন্ধন মুক্ত হব না এবং আহার বিহারও করব না। হয়ত এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করব, না হয় আমার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[২]

রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, 'যদি তিনি প্রথমে আমার কাছে আসতেন, আমি তাঁর জন্য ইস্তিগফার (গুনাহ মাফের দরখাস্ত) করতাম। কিন্তু যখন তিনি নিজকে আল্লাহর দরবারে বেঁধে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আনফাল*, ৮:২৭
[২] ইবনে কসীর, *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, খ. ৩, পৃ. ২৩১

নির্দেশ আসবে না, আমি বন্ধন মুক্ত করে দেব না।'[১]

একদিন সকাল বেলা হযরত উম্মে সালমার গৃহে তাঁর তাওবা কবুলের আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ﷺ নিজে এসে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি ওয়াদাবদ্ধ হলেন যে, তিনি আর কখনো বনু কুরাইযায় গমন করবেন না। কেননা সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বেলায় খিয়ানত সংঘটিত হয়েছে। আবু লুবাবা ব্যতীত অন্য সাহাবীও নিজকে এ স্তম্ভে বাঁধার বর্ণনা দেখা যায়।

মুহাম্মদ ইবনে কাব থেকে ইবনে যুবালা রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্তম্ভটির নিকট নফল নামায আদায় করতেন এবং ফযরের নামাযের পর এখানে তাশরীফ রাখতেন। দরিদ্র সাহাবা (মুআল্লাফাতুল কুলুব) আসহাবে সুফফা, মেহমানবর্গ এবং যারা শয়নের জন্য অন্যত্র স্থান পেতেন না। এরা সবাই এখানে জড় হতেন এবং বসতেন। হুযূর আকরম ﷺ এখানে আগমন করতেন এবং গরীব-মিসকীনদের মাঝখানে বসে যেতেন, যতটুকু কুরআন রাতে অবতীর্ণ হত তা সেখানে লোকদেরকে শুনিয়ে দিতেন। শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দিতেন। ওই সব লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁদের কথাবার্তা শ্রবণ করতেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، رَحِمَ الْفُقَرَاءِ، وَمُقِيْتًا لِّلضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ.

সূর্য উদয়ের পর যখন সচ্ছল ব্যক্তিগণ সেখানে হাযির হতেন এবং তাদের জন্য বসবার জায়গা হত না তখন তাঁদের অন্তর আকৃষ্টের খাতিরে তাঁর হৃদয় মুবারক তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়ত। এ সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় [সূরা আল-কাহফ, ১৮:২৮]:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۝

আপনি আপনার অন্তরকে সেই সব লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদের মহান প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁরই সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। হুযূর ﷺ ইতিকাফের সময় কখনো স্তম্ভটির নিকটে বিছানা পেতে আরাম করতেন।

চতুর্থ স্তম্ভ: এ স্তম্ভটির 'ওস্তওয়ানুতুস সরীর'। এটা জানালা শরীফের সন্নিকটে ওস্তওয়ানায়ে তাওবার পূর্বদিকে অবস্থিত। সম্ভবত বিছানা কখনো এখানেই রাখা হত। আবার কখনো এখান থেকে দূরে। কিন্তু এখন এ স্তম্ভটিকেই 'ওস্তওয়ানুতুস

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ৪, পৃ. ১৬, হাদীস: ১৩৬৪

সরীর' বলা হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ই'তিকাফ গ্রহণ করতেন এবং হযরত আয়িশা ﵂ চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। খেজুর গাছের শাখায় নির্মিত তাঁর একখানি চৌকি ছিল। তা কখনো ই'তিকাফ গ্রহণের স্থানে আবার কখনো স্তম্ভ ও বাতির মাঝখানে পেতে রাখা হত। রাতে প্রায় সেই চৌকিতে আরাম করতেন এবং দিনের বেলায় পায়ের নিচে রাখতেন।

পঞ্চম স্তম্ভ: 'ওস্তওয়ানাতু মুহাররস' একে ওস্তওয়ানাতু আলী ইবনে আবি তালিবও বলা হয়। কেননা তিনি প্রায় এ স্থানে নামায আদায় করতেন এবং এখানে বসে রাতে হযরত ﷺ-কে পাহারা দিতেন। মদীনায় ইতিহাসবিদ সওরী বলেন যে, হযরত আলী ﵁-এর বসার স্থান সেই দরজার সম্মুখ ভাগেই ছিল, যে দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়িশা ﵂-এর হুজরা থেকে মসজিদে গমনাগমন করতেন।[১]

ষষ্ঠ স্তম্ভ: 'ওস্তওয়ানাতুল ওফুদ' এটা ওস্তওয়ানাতুল মুহাররসের পশ্চাতে অবস্থিত। ইসলাম গ্রহণের জন্য যখন বিভিন্ন এলাকার লোকজন এবং বিভিন্ন গোত্রের ও রাষ্ট্রের দূত মদীনায় আসতেন, তিনি এখানে উপস্থিত হয়েই তাদেরকে দর্শন লাভের সুযোগ প্রদান করতেন। আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর আশেপাশে বসে যেতেন।[২]

সপ্তম স্তম্ভ: 'মুরব্বআতুল বঈর'-এর অপর নাম 'মাকামে জিবরাইল'। কেননা হযরত জিবরাইল ﵇ অধিকাংশ সময় এখানে অহী নিয়ে অবতরণ করতেন। এ স্তম্ভ এবং 'ওস্তওয়ানাতুল ওফুদ'-এর মাঝখানে আর একটি স্তম্ভ রয়েছে। যা জানালার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ স্থানেই হযরত ফাতিমা ﵂এর দরজা ছিল। হুযূর ﷺ হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এখানে দাঁড়াতেন এবং হযরত আলী ﵁, হযরত ফাতিমা ﵂, হযরত হাসান ﵁ ও হযরত হুসাইন ﵁-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করতেন[৩],

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا».

হযরত সাইয়িদ সামহূদী ﵀ বলেন, এ স্তম্ভ এবং ওস্তওয়ানাতুস সরীর থেকে বরকত গ্রহণ থেকে এখন মানুষ মাহরুম হয়ে গেছেন। সম্ভবত একথার

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৫
[২] আস-সামহূদী, *ওফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৫
[৩] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ২, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৭২০; (খ) আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৩৩

দ্বারা হযরত সাইয়িদ ﵀-এর উদ্দেশ্য, এর চতুর্দিকে বসবার সুযোগ না থাকা হতে পারে। অন্যথায় এটা পরিস্কার যে, ওস্তওয়ানাতুস সরীরের পশ্চিম দিকের অর্ধেকাংশ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে বসতে ও নামায আদায় করতে পারা যায়। ওস্তওয়ানাতুল ওফুদেরও একই অবস্থা। এ কারণে সেই স্তম্ভগুলো উল্লেখের কারণ বুঝা যায় না। তবে এটুকু হতে পারে যে, হুযূর ﷺ-এর ই'তিকাফের স্থান জানালার অভ্যন্তরে ওস্তওয়ানাতুস সরীরের পাশেই ছিল, যার থেকে এখন বরকত লাভ করা যাচ্ছে না।

অষ্টম স্তম্ভ: 'ওস্তওয়ানা তাহাজ্জুদ' এখানে হযরত ﷺ-এর তাহাজ্জুদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এ স্তম্ভটি হযরত ফাতিমা যুহরা ﵂-এর হুজরা শরীফের পশ্চাতে উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানা পেতে এখানে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। যখন সাহাবীগণ তাঁর অনুসরণ করে সেখানে ভীড় জমাতে লাগলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'বিছানা গুটিয়ে ঘরের ভেতর রেখে দাও।' সাহাবগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাতে এখানে নামায আদায় করতেন। বরকত এবং বুযুর্গী হাসিলের জন্য আমরাও আপনার অনুসরণ করে এখানে সমবেত হতাম। তিনি ইরশাদ করলেন, 'তোমাদের ওপর এ নামায ফরয হবার আশঙ্কায় আমি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কেননা যদি এ নামায তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যায় এবং তোমরা ঠিকমত তা আদায় করতে না পার, তবে কি অবস্থা হবে'?[১]

উল্লিখিত বর্ণনায় সেই সব স্তম্ভ স্থান পেয়েছে। যেগুলো অপরাপর স্তম্ভ থেকেও অধিকতর মর্যাদাশীল। অন্যথায় সমস্ত স্তম্ভ ও সম্পূর্ণ মসজিদের মধ্যেই তো বরকত ও ফযীলত বিদ্যমান। এমন কোন স্তম্ভ নেই যথায় সাহাবীগণ নামায পড়েননি। সহীহ বুখারী শরীফে উল্লিখিত রওযাতুমিন রিয়াযিল জান্নাহর মধ্যে কোন কোন স্তম্ভ তাঁদের নামও লেখা রয়েছে। যেমন, ওস্তওয়ানায়ে আবু বকর ﵁, উমর ﵁, উসমান ﵁, সাঈদ ইবনে যাইদ ﵁, ইবনে আব্বাস ﵄ তবে শেষ দু'জনের স্তম্ভ সম্পর্কে হযরত সাইয়িদ ﵀-এর তারিখে কোন উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ–২: সুফফা এবং আহলে সুফফার বর্ণনা

কাযী আয়ায ﵀ বলেন যে, মসজিদে নববীর পশ্চাতের দিকে অবস্থিত বৃক্ষের ছায়া বিশিষ্ট একটি স্থানের নাম ছিল সুফফা। এখানে গরীব-মিসকীন সাহাবীগণ অবস্থান করতেন। যাঁদের কাছে ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা ও পরিবার পরিজন কিছুই ছিল না। এ কারণে তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফফা' বলা হয়।[২]

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৬
[২] (ক) কাযী আয়ায, *আল-ইমলা ইলা মা'রিফাতি উসূলিস রিওয়ায়া ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'*, খ. ২, পৃ. ৫৫; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৮

যাহবী ﵀ বর্ণনা করেন যে, কিবলা পরিবর্তন হবার পূর্বে মসজিদে নববীর উত্তরে ছিল। যখন কিবলা কাবা শরীফের দিকে পরিবর্তিত হয়, তখন কিবলায়ে আওয়াল (প্রথম কিবলা) এলাকাটি পূর্ববৎ ছেড়ে দেওয়া হয়।[১]

যাতে গরীব ও দরিদ্র সাহাবীগণ অবস্থান করতে পারেন। বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ বা সফরে গমন অথবা মৃত্যুর কারণে সুফফাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রাস পেত। হাফিয আবু নঈম ﵀ তাঁর 'হুলয়া' নামক কিতাবে শতাধিক নাম উল্লেখ করেছেন।[২]

এ মহান ব্যক্তিবর্গ মসজিদেই নিদ্রা যেতেন। কারণ শয়নের জন্য অপর কোন স্থান ছিল না।[৩] আল্লাহর নির্দেশে

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ۞

'আপনি আপনার অন্তরকে ওদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখুন যারা তাদের মহান প্রভুকে ডাকে।'[৪]

অনুসারে তাঁদের বিশেষভাবে মেলামেশা ও তাঁদের মজলিশে উপবেশন করতেন। তাঁদেরকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন।

دلا خوش باش کان سلطان دین را ☆ بدرویشان و مسکینان سری ہست

'হে অন্তর! সন্তুষ্ট থাক কেননা দীনের বাদশাহ দরবেশ এবং গরীবদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন।'

ক্ষুধায় কাতর অনেক সময় এ মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় পড়ে থাকতেন। সেখানে গমনাগমনকারী লোকেরা এঁদেরকে পাগল মনে করত। হযরত ﷺ তাঁদের নিকটে এসে সান্ত্বনা প্রদান করতেন এবং ইরশাদ করতেন, 'তোমরা আমার সহচর। আল্লাহর নিকট তোমাদের যে মান-মর্যাদা যদি তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারতে তবে তোমরা এ দরিদ্রতাকে অবশ্যই ভালোবাসতে।' কখনো তিনি তাঁদের দু'একজনকে বিত্তবান সাহাবীর নিকট অর্পণ করতেন। যাতে তাঁরা তাঁদের মেহমান হন। অবশিষ্টদেরকে নিজের সাথে নিয়ে আসতেন। আর সদকার সূত্রে যা কিছু হস্তগত হত তা তাদের নিকট অর্পণ করতেন। তাঁরা 'মুসলমানদের মেহমান' নামে অভিহিত হতেন।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৮

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৫৯৫; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৮

[৩] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২১৯, হাদীস: ৫৯৭; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৯

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-কাহফ*, ১৮:২৮

আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন যে, আমি ৭০ জন আসহাবে সুফফায় দেখেছি যাঁদের পরিধানে একটি ইযার (লুঙ্গি) ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাও ছিল হাঁটু পর্যন্ত। নামাযে সিজদা করার সময় তারা একে কুড়িয়ে নিতেন। যাতে সতর দেখা না যায়।[১]

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ আরও বর্ণনা করেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় অনেক সময় আমার পেটে পাথর বাঁধতে হত এবং বুককে মাটিতে লুটিয়ে দিতে হত। এরূপ দুঃখ-কষ্টের অবস্থায় একদিন আমি রাস্তায় বসে থাকাকালীন সময়ে হযরত আবু বকর ﵁ সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনে পাকের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম, যাতে তিনি আমার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তিনি এদিকে মনোনিবেশ করলেন না এবং চলে গেলেন। পরে আবুল কাসিম ﷺ সে পথ দিয়ে যান। যখন তিনি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'আবু হুরাইরা!' আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ। ইরশাদ করলেন, 'এদিকে এস।' আমি তাঁর পেছনে হুজরা শরীফ পর্যন্ত চললাম। হুযূর পাক ﷺ-এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ এক পেয়ালা দুধ আনা হয়েছিল। তিনি ইরশাদ করলেন, 'যাও আসহাবে সুফফাকে ডেকে নিয়ে এস।' আমি মনে মনে ভাবলাম, দুধ তো তত বেশি নয় যে, আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনা হচ্ছে। যদি এই দুধ আমাকে দেওয়া হত, আমি পান করতাম এবং কিছু সময় আরামে অতিবাহিত করতাম। কিন্তু হুযূর ﷺ-এর আনুগত্য ছাড়া আরতো কোন উপায় নেই। আমি আসহাবে সুফফার নিকট গমন করে তাঁদেরকে নিয়ে আসলাম। সবাই হযরত ﷺ-এর দৌলতখানায় বসে গেলো। ইরশাদ করলেন, 'আবু হুরাইরা! দুধের পাত্র নিয়ে এসে দুগ্ধ বণ্টন করে দাও। আমি সবাইকে দিলাম। সবাই পেট ভরে পান করল, কিন্তু দুধ কমল না। অতঃপর দুধের পেয়ালাকে হুযূর পাক ﷺ-এর সম্মুখ পানে রেখে দিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, এখন তুমি এবং আমি বাকি আছি। আরজ করলাম, আপনি সত্যিই বলেছেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, 'বসে যাও। তোমার ক্ষুধা মাফিক খেয়ে নাও।' যতদূর পান সম্ভব ছিল আমি পান করলাম। অবশিষ্ট তাঁকে প্রত্যার্পন করলাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং পাত্রের দুধ পান করলেন।[২]

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৯৬, হাদীস: ৪৪২; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ».

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৯৬-৯৭, হাদীস: ৬৪৫২; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৪৯

এ ছাড়াও খাদ্যদ্রব্যেও বরকত হয়েছিল বলে হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন। অন্য রিওয়ায়তেও এর বর্ণনা রয়েছে। প্রত্যেক আনসার নিজের খুরমা বৃক্ষ থেকে এক একটি থোকা ছিঁড়ে নিয়ে আসতেন। সমস্ত থোকাকে মসজিদের দুটি স্তম্ভের মাঝখানে রশি দ্বারা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হত। ঝুলানো থোকা গুলোর নিচে তাঁরা বসে যেতেন। অতঃপর লাকড়ি দ্বারা থোকাগুলোকে মেড়ে দেওয়া হত, যাতে তাঁরা ইচ্ছামত খেতে পারেন।

একদিন এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও একটা খারাপ থোকা এনে ঝুলিয়ে দিল। হুযূর ইরশাদ করলেন, 'এ সদকার মালিক যে, সে এর চেয়ে ভালো থোকাও নিয়ে আসতে পারত; কিন্তু কিয়ামতের দিন সে ভালো ফল খাওয়ার ইচ্ছা করেনি।'[1]

অনুচ্ছেদ-৩

হযরত সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মসজিদে নববী তৈরির প্রাক্কালে দুটি হুজরাও নির্মাণ করেছিলেন। কেননা সে সময় উম্মুহাতুল মুমিনীন কিবলা দুজনই ছিলেন ১. হযরত সওদা ও ২. হযরত আয়িশা। পরবর্তীতে বিবিগণের সংখ্যা যতই বেড়ে যায় হুজরার সংখ্যাও তত বেড়ে যায়। হযরত হারিস ইবনে নু'মান আনসারীর বাড়ি মসজিদের সন্নিকটে ছিল। কিছুদিন পর তিনি তাঁর সমস্ত ঘর-বাড়ি হযরত -এর নিকট অর্পণ করেন।[2] আরব দেশের প্রথা অনুযায়ী তাঁর প্রায় বাড়ি খেজুর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং পশমী কাপড়ের দ্বারা নির্মিত ছিল। দরজার মধ্যে পশমী কাপড়ের পরদা ঝুলানো ছিল। সমস্ত ঘর-বাড়ি পূর্ব এবং সিরিয়ার দিকে ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে খেজুর গাছের শাখা দ্বারা নির্মিত এক একটি হুজরা ছিল। যাতে আলকাতরা লাগান ছিল। অধিকাংশ ঘরের দরজা মসজিদমুখী ছিল। ছাদের উচ্চতা পাঁচ হাতের বেশি ছিল না। হযরত ফাতিমা -এর কবরের স্থানেই তাঁর ঘর ছিল।

হযরত ফাতিমা এবং হযরত -এর গৃহের মাঝখানে একটা জানালা ছিল যাকে খুখা বলা হত। রাসূলুল্লাহ প্রায় সময় এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করতেন এবং হযরত আলী, হযরত ফাতিমা হযরত হাসান-হুসাইন -এর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন রাতের বেলা হযরত আয়িশা এদিক দিয়ে আসছিলেন এমন সময় সে ফটক সম্পর্কে হযরত ফাতিমা -এর সাথে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়। অতঃপর হযরত ফাতিমা যুহরা হুযূর -কে অনুরোধ করে ফটকটি বন্ধ করান।

[1] (ক) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস ২২০০, হযরত আওফ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৫১

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪

তাবারানী হযরত আবু সা'লাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দু'রাকাআত নামায পড়তেন। অতঃপর হযরত ফাতিমার গৃহে প্রবেশ করে তাঁদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। এরপর পবিত্র বিবিগণের হুজরায় গমন করতেন।

হযরত আলী থেকে বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আমাদের গৃহে তশরীফ আনেন। তাঁর জন্য আমরা খাবার প্রস্তুত করি। হযরত আনাস -এর মাতা উম্মে আয়মান কিছু দুধ পাঠিয়ে ছিলেন, তাও তাঁর নিকট পেশ করি। তিনি খাবার গ্রহণ ও দুগ্ধ পান করলেন। আমি তাঁর হস্ত মুবারক ধৌত করে দিলাম। তিনি হস্ত মুবারক চেহারা মুবারকের ওপর ফেরালেন এবং দু'আ করলেন। অতঃপর সিজদায় চলে যান এবং ক্রন্দন করতে থাকেন। ভয়ে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। এমন সময় হযরত হুসাইন তাঁর পৃষ্ঠ মুবারকের ওপর ওঠে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ক্রন্দনে হুযূর -এর ক্রন্দন স্থিমিত হয়ে গেল। তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হে হুসাইন! আমার মাতা-পিতা তোমার ওপর কুরবান হোক।' হযরত হুসাইন বললেন, হে নানাজান! আজিকার মতো আমরা আপনাকে কখনো এমনভাবে ক্রন্দন করতে দেখিনি। আপনি কেন এভাবে ক্রন্দন করলেন? ইরশাদ করলেন, 'হে প্রিয় বৎস! আজিকার দিনে তোমাকে আনন্দিত দেখে আমি এমন আনন্দ উপভোগ করছি যে, এমন আনন্দ আর কখনো উপভোগ করিনি। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে জিবরাইল সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে, আমার উম্মতরা নিতান্ত দুঃখ-যাতনা দিয়ে তোমাকে শহীদ করবে। এ সংবাদ শুনে আমি দু'আ করলাম যে, পৃথিবীতে এ মুসীবত হয়তো হোক কিন্তু আখিরাতের যেন মঙ্গল হয়।'[1]

অনুচ্ছেদ-৪

মদীনার প্রথম জীবনে কোন কোন সাহাবীর ঘরের দরজা ও রাস্তা মসজিদে নববীর দিকে ছিল। পরে আল্লাহর আদেশে রাসূলুল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক -এর ঘরের দরজা ব্যতীত সকল দরজা বন্ধ করে দেন।

সহীহ হাদীসে কয়েক সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে মসজিদের মিম্বরে খুতবা দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ তাবারকা ওয়াতা'আলা তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে একজন বান্দকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন পৃথিবীতে থাকতে পারেন নতুবা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যেও চলে যেতে পারেন। আল্লাহর সে বান্দাটি আল্লাহর সান্নিধ্যেই

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৫৯

গ্রহণ করেছেন।' উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ বুঝতে পারলেন না যে, এ মহান বান্দাটি কে? তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী শোনামাত্র ক্রন্দন রোলে ফেটে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁরই মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর আখেরাতের সফর নিকটবর্তী। অতঃপর ইরশাদ করলেন, 'আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই আমাকে অপরাপর সাহাবী থেকে অধিকতর আর্থিক সাহায্য করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কাউকে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কেই করতাম।' উপরন্তু আমাদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট থাকবে। মসজিদের দিকে যতই দরজা আছে একমাত্র আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর দরজা ব্যতীত সবই বন্ধ করে দাও। আবু বকরের (রাঃ) জানালা ছাড়া যেন অন্য কোন জানালা খোলা না থাকে। এ জানালা দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মসজিদে গমনাগমন করতেন।[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ঘরের দরজা মসজিদের দিকে ছিল না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিমগণ এ হাদীসের অপরাপর সাহাবীদের ওপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ফযীলত প্রমাণ করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) একদিন আরজ করলেন, আমি আমার ঘরের মধ্যে এমন একটি ছোট জানালা স্থাপনের প্রার্থনা জানাই, যার মধ্য দিয়ে আমি আপনার ঘর থেকে আপনার বেরিয়ে আসা প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইরশাদ করলেন, 'একটি সূচের ছিদ্র পরিমাণেরও অনুমিত নেই।' কোন কোন ব্যক্তি বললেন, আপনার বন্ধুর দরজাতো খোলা রেখেছেন, অন্য সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ করলেন, 'আমি এটা নিজের তরফ থেকে করিনি। আল্লাহ তা'আলার আদেশেই করেছি। আমি এতে নূর (আলো) প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু অন্যগুলোতে অন্ধকার।'

কোন কোন আলিমের মতে হাদীসের মধ্যে বাবুন শব্দের অর্থ ঘরের দরজা নয়; বরং খিলাফতের দরজাই উদ্দেশ্যে। অন্যান্য লোকের দরজা বন্ধ করে দেয়ার অর্থ হল, অন্যদের জন্য খিলাফতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। অর্থাৎ আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ যেন খিলাফতের দাবিদার না হয়। হাদীসের এ অর্থ গ্রহণের কারণ হচ্ছে মসজিদে নববীর বরাবরে হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রাঃ) কোন ঘরই ছিল না। বরং তাঁর দু'টি ঘরই ছিল। একটি আওয়ালিয়ে মদীনাতে, অপরটি বকী'তে। তবে কোন কোন আলিমদের এ উক্তি সম্পর্কে কথা হচ্ছে এ যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বিবিদের সংখ্যা হিসেবে কয়েক স্থানেই তাঁর ঘর ছিল। যে ঘরের খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১০০, হাদীস: ৪৬৬; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬০

মসজিদের নববীর বাবুস সালাম এবং বাবুর রহমতের মাঝখানেই অবস্থিত ছিল। এ সময় তিনি চার হাজার দিরহাম মূল্যে তা হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট বিক্রয় করে সে অর্থ কোন এক গোত্রের লোকদের জন্য ব্যয় করেছিলেন, যারা তাঁর নিকট কোন স্থান থেকে আগমন করেছিলেন।

শায়খ ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) বুখারী শরীফের শরাহ (ব্যাখ্যা)-এর মধ্যে বর্ণনা করেন যে, এ সম্পর্কে আরও অপরাপর হাদীসও বর্ণিত আছে, যা পূর্বোক্ত হাদীসের বিরোধী। সে সমুদয় হাদীসের মধ্যে হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর দরজা ব্যতীত অন্য দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রহঃ) ও নাসায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ শক্তিশালী।[১]

তাবারানী তাঁর *আওসত* কিতাবের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ পয়গম্বর (সাঃ)-এর নিকট একত্রিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আপনি সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ)-এর দরজা খোলা রেখেছেন। ইরশাদ করলেন, 'আমি বন্ধও করিনি খোলাও রাখিনি। আল্লাহই বন্ধ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহই খোলা রেখেছেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আলীর দরজা ব্যতীত সব দরজাই বন্ধ করে দিই।'[২]

ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (রহঃ) উত্তম সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘরের দরজা ব্যতীত অপরাপর সমুদয় দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেননা তাঁর ঘরের দরজা মসজিদের দিকেই ছিল। এ ছাড়া যাতায়াতের অন্য কোন দরজা ছিল না। এমনকি অপবিত্র অবস্থায় পর্যন্ত এ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হত।[৩]

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩২, পৃ. ৪১, হাদীস: ১৯২৮৭; (খ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৪২৪, হাদীস: ৮৩৬৯; হযরত যায়দ ইবনে আরকম (রাঃ) থেকে বর্ণিত; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৪-১৫; (ঘ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৩

[২] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬, হাদীস: ৩৯৩০; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৫৯

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَدَدْتَ الْأَبْوَابَ كُلَّهَا، إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: «مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ سَدَّهَا».

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩২, পৃ. ৪১, হাদীস: ১৯২৮৭; (খ) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৪২৪, হাদীস: ৮৩৭৩ ও ৮৩৭৩; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত; (গ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৩ =

ইমাম আহমদ ﵀ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁-কে এবং তাঁর পরে হযরত উমর ﵁-কে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করতাম।[১]

মাওয়াহেবে লাদুনিয়া নামক কিতাবে বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁-কে তাঁর পরে হযরত উমর ﵁-কে এবং তাঁর পরে হযরত উসমান ﵁-কে সর্বোত্তম মানুষ মনে করতাম। অন্য কাউকে এ তিনজনের সমতুল্য ধারণা করতাম না।[২]

হযরত সাইয়েদ ﵀ শুধু হযরত আবু বকর ﵁ এবং হযরত উমর ﵁-এর নাম উল্লেখ করেছেন। এর অতিরিক্ত শুধু এটাই বলেছেন যে, হযরত ইবনে উমর ﵄ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের মধ্যে এমন তিনটা ফযীলত দিয়েছেন যে, যদি উক্ত ফযীলতসমূহের মধ্য থেকে আমি একটারও অধিকারী হতাম তবে আমি সমস্ত পৃথিবী ও এর যাবতীয় বস্তু থেকে নিজকে শ্রেয় মনে করতাম:

১. পয়গম্বর ﷺ তাঁর সাথে নিজের সাহেবজাদীকে বিবাহ দিয়েছেন এবং এ ঘরে সন্তান-সন্ততি হয়েছে।
২. মসজিদের দিকের সকলের দরজা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত আলী ﵁-এর ঘরের দরজা খোলা রাখা হয়েছে।
৩. খায়বারের যুদ্ধের দিন ইসলামী পতাকা হযরত আলী ﵁-এর হাতে অর্পণ করা হয়েছে।[৩]

= قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ: وَسُدَّ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ؛ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ.

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৮, পৃ. ৪১৬, হাদীস: ৪৭৯৭; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ: رَسُولُ اللهِ خَيْرُ النَّاسِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ.

[২] (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ২, পৃ. ৭০১; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১৪-১৫, হাদীস: ৩৬৯৭:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ».

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৮, পৃ. ৪১৬, হাদীস: ৪৭৯৭; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৩; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত,

... وَلَقَدْ أُوتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَأَنْ تَكُونَ لِيْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ «زَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ، وَوَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ».

ইমাম নাসায়ী ﵀ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে উমর ﵄ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি হযরত উসমান ﵁ ও হযরত আলী ﵁ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন, হযরত আলী ﵁ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা কর না। তাঁর সাথে কাউকে তুলনা কর না। কারণ ভেবে দেখ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর কতটুকু মান-মর্যাদা ছিল। তিনি সকলের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী ﵁-এর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেননি।[১]

হাফিয ইবনে হাজর ﵀ বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য। বিশেষত এ কারণে যে হাদীসের এক সূত্র অন্য সূত্র কর্তৃক শক্তিশালী হয়। তিনি বলেন যে, আল্লামা ইবনে জাওযী ﵀ হযরত আলী ﵁ সম্পর্কীয় হাদীসকে (বানোয়াট) বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ হাদীসটি সেই সহীহ হাদীসের বিরোধী, যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[২]

শায়খ ইবনে হাজর ﵀ বলেন যে, ইবনে জওযীর কথা সঠিক নয়। কেননা এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রেও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর এমন বহু সূত্র রয়েছে যা সহীহ (উৎকৃষ্ট)-এর পর্যায়ে গন্য হয়। দ্বিতীয়ত এ হাদীসের সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁ সম্পর্কীয় হাদীসের কোন বিরোধও নেই। অথচ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যও হাদীসটি কুফাবাসীদের এবং হযরত আবু বকর ﵁ সম্পর্কীয় হাদীসটি মদীনাবাসীদের দ্বারা বর্ণিত উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সমস্ত দরজা বন্ধের নির্দেশ দেন তখন সম্ভবত হযরত আলী ﵁-এর ঘরের দরজা মসজিদের দিকেই ছিল এবং এ দরজা ব্যতীত যাতায়াতের অন্য কোন পথই ছিল না।[৩]

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের দ্বারা একথা যথাযথ প্রমাণিত হয়। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, 'অপবিত্র অবস্থায় আমি আর তুমি ব্যতীত অপর অন্য কেউ এ মসজিতেদ প্রবেশ করবে না।'[৪] সে সময় হযরত আলী ﵁-এর দরজা ব্যতীত

---

[১] (ক) আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৪২৪, হাদীস: ৮৪৩৭; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৩-৬৪

[২] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মওযূ'আত*, খ. ১, পৃ. ৩৬৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৫; (গ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৪

[৩] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৫; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৪

[৪] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৯-৬৪০, হাদীস: ৩৭২৭:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ».

সকল ব্যক্তির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্য এক সময় যখন সব ধরনের জানালাও ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জানালা ব্যতীত অপর সকল সাহাবীর জানালা ও ছিদ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কেননা মসজিদের দিকে যাতায়াতের জন্য তাঁর কোন দ্বার ছিল না। যেমন– হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছিল। মসজিদের দিকে তাঁর শুধু একটা জানালাই ছিল। যেমন– সীরাত এবং ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাওয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) *আল-আসার* নামক কিতাবে এবং *মা'নিয়ুল আখবার* নামক কিতাবে এর উল্লেখ করেছেন।[১]

সাইয়েদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দ্বার খোলা রাখার ঘটনাটি আগেই ঘটেছিল। যেমন– ইবনে যুবালা বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত অপর সকল সাহাবীর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সজল নয়নে তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচাতো ভাইকে তো ভেতরে ডেকে নিলেন, আর চাচাকে বাইরে নিক্ষেপ করলেন। ইরশাদ করলেন, 'আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি শুধু তেমনই করেছি। এতে আমার নিজের কোন অধিকার ছিল না।' এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারটি পূর্বে ঘটেছিল। কেননা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জানালা খোলা রাখার নির্দেশটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তিম শয্যায় ঘটেছিল। আর হযরত হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধে।[২]

হযরত সাইয়েদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দ্বার উন্মুক্ত রাখার হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এর মধ্যে হযরত ইবনে যুবালা ও ইয়াহয়া একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, সমস্ত সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে বসে আছেন এমন সময়ে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন যে, 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দাও। এ আওয়াজ শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কেউ স্বস্থান ত্যাগ করে ওঠে গেলেন না। আবার ঘোষণা দেওয়া হল,

«أَيُّهَا النَّاسُ! سُدُّوْا أَبْوَابَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْعَذَابُ».

'হে জনগণ! আল্লাহর আযাব হওয়ার পূর্বেই তোমরা দরজাসমূহ বন্ধ

[১] (ক) আল-কালাবাযী, *বাহরুল ফাওয়ায়িদ*, পৃ. ১০৪; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৭, পৃ. ১৫; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৪

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৫

করে দাও।'

তখন লোকজন মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে ধাবিত হন। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ইরশাদ করলেন, দাঁড়িয়েছ কেন? ঘরে প্রবেশ কর এবং ঘরের দরজাকে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখ। একথা শ্রবণের পর মানুষের অন্তরে কিছু রেখাপাত করল। তারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগল।

পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত অবস্থায় মসজিদের মিম্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন, তুমি পাক-পবিত্র একখানা মসজিদ নির্মাণ কর। যথায় তুমি হারুন এবং তদীয় দু'পুত্র শববর এবং শববীর ব্যতীত যেন আর কেউ না থাকে। তদ্রুপ আমার নিকটও অহী এসেছে যে, আমিও একটা মসজিদ নির্মাণ করি, যেখানে আমি, আলী এবং তাঁর দু'পুত্র হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ব্যতীত যেন আর কেউ না থাকে। অতএব আমি মদীনায় এসে মসজিদ নির্মাণ করি। আমার মদীনা আগমনের এবং মসজিদ নির্মাণের কোন ক্ষমতা ছিল না। আমি সেই কাজই করি যার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আমি কোন কিছুই করি না। আমি উষ্ট্রের ওপর আরোহণ করে বের হয়ে আসালাম। আনসারের বিভিন্ন গোত্র সামনে এসে দাঁড়াল, যাতে আমি তাদের ওখানে অবতরণ করি। কিন্তু আমি তাদের আগ্রহ মোতাবেক অবতরণ করলাম না। আমি তাদেরকে বললাম আমার উষ্ট্রকে তোমরা আটক কর না। সে নির্দেশ মতেই চলে। যথায় সে বসে যাবে আমি সেখানে অবতরণ করব। সেখানেই আমার অবস্থান হবে। আল্লাহর শপথ, দ্বারসমূহকে আমি বন্ধও করিনি এবং খুলেও দেইনি। আর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আমি অন্দরে নিয়ে আসিনি। আল্লাহ তাঁকে নিয়ে এসেছেন। এ অবস্থায় আমার করার কি আছে'?[১]

বিশুদ্ধতার কারণে হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কীয় হাদীস নিশ্চিত রূপে গ্রহণ যোগ্য এবং হাদীসের বিভিন্ন সূত্র থাকার কারণে হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কীয় হাদীসকেও অস্বীকার করা যায় না। আসল কথা হল, উভয় হাদীসই সঠিক। তবে আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি সেভাবেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন। যেমন শায়খ ইবনে হাজর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীস শাস্ত্রবিদ আলিমদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৫–৬৬

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন বাদশাহের আমলে মসজিদে নববীর যে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

প্রথম দফা সংস্কার

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-ই সর্বপ্রথম মসজিদে নববীর সংস্কার সাধন করেন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) হয়ত অবসর পাননি অথবা এটা ভালো মনে করেননি। অবশ্য তাঁর আমলে এতটুকু কাজ হয়েছে যে, পতিত স্তম্ভসমূহকে একই বৃক্ষের শাখা দ্বারা পুনঃনির্মাণ করেন।[১]

মসজিদে নববীকে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে হযরত (সা.)-এর ইঙ্গিতপ্রাপ্তির কারণে তিনি মসজিদকে কিবলা এবং পশ্চিম দিকে বৃদ্ধি করেছিলেন। পূর্ব দিকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের হুজরা বিদ্যমান থাকায় সে দিকে বাড়ানো হয়নি। কিবলার দিকে সিরিয়া, উত্তর-দক্ষিণ দিকে ১৪০ গজ এবং পূর্ব পশ্চিম দিকে ১০০ গজ পর্যন্ত প্রশস্ত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলতেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে না শুনতাম তবে মানুষের জন্য সংকুলন না হলেও আমি মসজিদকে প্রশস্ত করতাম না।[২] পয়গম্বর (সা.)-এর ন্যায় হযরত উমর (রা.)ও কাঁচা ইট খেজুর গাছের শাখা এবং গাছের দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর বাড়ি মসজিদে নববীর অতি সন্নিকটে ছিল। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, মুসলমানদের জন্য মসজিদ সংকুলন হয়নি, আমি একে প্রশস্ত করতে চাই। মসজিদের একদিকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের হুজরাসমূহ অপর দিকে আপনার বাড়ি। উম্মাহাতুল মুমিনীনের ঘর-বাড়ি উচ্ছেদ করার সাহস আমার নেই। বাকি রইল আপনার ঘর। হয়তো আপনি তা বিক্রি করে দেন। বায়তুল মাল থেকে আপনার চাহিদা মোতাবেক মূল্য প্রদান করা হবে। অথবা এ ঘরের পরিবর্তে মদীনায় যে স্থানটি আপনি পছন্দ করেন আমি ওখানে ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। অথবা আপনি আপনার গৃহখানাকে মুসলমানদের জন্য দান করেন। উল্লিখিত তিনটার কোন একটিকে আপনার পছন্দ করা বাঞ্ছনীয়।

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৭

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৪১৪, হাদীস: ৩৩০:

وَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ «نَبْغِيْ نَزِيْدُ فِيْ مَسْجِدِنَا» مَا زِدْتُ فِيْهِ.

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৯৭, হাদীস: ৪৪৬

হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, لَا وَاللهِ খোদার শপথ, আমি একটাও পছন্দ করিনা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার জন্য এ স্থানটি নির্বাচিত করেছেন। অগত্যা হযরত উমর (রা.) এ ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য হযরত ওবাই ইবনে কাবের ওপর ভার দেন। তিনি হযরত রাসূলে করীম (সা.) থেকে একটা হাদীস শুনেছিলেন। তা তিনি হযরত উমর (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করেন। হাদীসটি হচ্ছে, 'আমি হুযূর (সা.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তুমি আমার নিমিত্ত একটা ঘর নির্মাণ কর, যাতে লোকজন আমাকে স্মরণ করতে পারে। হযরত দাউদ (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করলেন। হঠাৎ দেখা গেল মসজিদের ইমারতের ভিত্তির মধ্যে ইহুদির একখানা ঘর পড়েছে।

হযরত দাউদ (আ.) ঘরের মালিককে ডেকে বললেন, 'তুমি ঘরটি আমার কাছে বিক্রি কর এবং উচিত মূল্য নিয়ে যাও। এতে সে একেবারেই রাজি হল না।' অগত্যা হযরত দাউদ (আ.) মনস্থ করলেন যে, যেভাবেই হোক না কেন ঘরটি নিতেই হবে। আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার জন্যে একটি ঘর নির্মাণ কর, যাতে মানুষ আমার ইবাদত করতে পারে। কিন্তু তুমি জোরপূর্বক লোকের ঘর ছিনিয়ে নিচ্ছ! এর শাস্তি এই যে, এখন আর তুমি তা তৈরি কর না।' হযরত দাউদ (আ.) আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার সন্তানের থেকে কাউকে তুমি এর পূর্ণরূপ দেয়ার তাওফীক দান করুন। হযরত দাউদ (আ.)-এর পর হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজ সম্পন্ন করেন।''[১]

এ হাদীসটি শ্রবণের পর হযরত উমর (রা.) উক্ত গৃহ দখল থেকে বিরত রইলেন। পরবর্তীতে যখন হযরত আব্বাস (রা.) ঘরখানিকে মুসলমানদের জন্য সদকা করে দেন, তখন হযরত উমর (রা.) একে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উক্ত গৃহের সংলগ্ন হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর একখানা ঘর ছিল। উক্ত ঘরের অর্ধেকাংশে এক লক্ষ দিরহাম মূল্যে খরিদ করে তিনি একেও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাকি অর্ধেক হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের আমলে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হযরত উমর (রা.) মসজিদের পূর্ব প্রান্তে একটা মিম্বর তৈরি করেন। যার নাম রাখলেন 'বুতহা'। এর উদ্দেশ্য ছিল, যদি কেউ ইচ্ছে করে সেখানে বসে কবিতা আবৃত্তি ও উচ্চ স্বরে কথাবার্তা বলতে পারে। কেননা মসজিদের ভেতরে

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ১৯–২০, হাদীস: ৪৭২৭; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৬৮–৬৯

কথাবার্তা বলা এবং কবিতা পাঠ করা অবৈধ।[১]

একদিন দু'জন লোক মসজিদের অভ্যন্তরে উচ্চ স্বরে কথাবার্তা বলছিল। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা? লোকেরা বলল, এরা তায়িফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি এরা মুসাফির না হত, আমি তাদেরকে শাস্তি দিতাম। কেননা পয়গম্বর (সা)-এর মসজিদে আওয়াজ বুলন্দ করা অবৈধ।[২]

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা) মসজিদে বসে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, এমনি সময় হযরত উমর (রা) ওদিক থেকে যাচ্ছিলেন। হযরত হাসসান (রা)-কে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখে তাঁর প্রতি চক্ষু বড় করে দেখলেন। হযরত হাসসান (রা) বললেন, আপনি কি দেখছেন? হে আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট লোকের অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর সামনে এখানে কবিতা পাঠ করেছি। হযরত আবু হুরাইরা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে আবু হুরাইরা (রা)! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি শুনেছ যে, পয়গম্বর (সা) ইরশাদ করেছেন,

«اَللّٰهُمَّ أَيِّدْ حَسَّانًا بِرُوْحِ الْقُدُسِ».

(আয় আল্লাহ) হাসসানকে রুহুল কুদুস (জিবরাইল) দ্বারা শক্তিশালী করুন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বললেন,

«اَللّٰهُمَّ نَعَمْ».

হ্যাঁ।[৩]

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মসজিদের মধ্যে ধর্মবিরোধী মিথ্যে এবং কুপ্রবৃত্তিমূলক কবিতা পাঠ করা হারাম। হিদায়াত মূলক কবিতা পাঠ করা জায়েয। যেমন– তিরমিযী শরীফে হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাসসান ইবনে সাবিতের জন্যে মসজিদে মিম্বর রাখতেন, যার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাফিরদের কুৎসা বর্ণনা করতেন এবং ভালো কবিতা পাঠ করতেন।[৪]

[১] (ক) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৩৪; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৭৮–৭৯

[২] (ক) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৩৩; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৭৯

[৩] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১১২, হাদীস: ৩২১২; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯৩২, হাদীস: ১৫১ (২৪৮৫)

[৪] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ২৮৪৬

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'কবিতা এমন কথা, যার ভালোটা ভালো এবং মন্দটা মন্দ।'[১]

দ্বিতীয় দফা সংস্কার

দ্বিতীয় দফায় হযরত উসমান (রা) মসজিদের নববীর সংস্কার সাধন করে মসজিদকে আরও সম্প্রসারিত ও সুশোভিত করেন। তিনি দেয়াল ও স্তম্ভসমূহকে কারুকার্যমণ্ডিত করেন এবং সেগুন বৃক্ষের দ্বারা ছাদ তৈরি করেন। পয়গম্বর (সা) ও হযরত উমর (রা)-এর যমানায় মসজিদকে পরিবর্তন করে স্তম্ভসমূহকে লৌহ এবং সীসা দ্বারা নির্মাণ করা হয়। হযরত উসমান (রা) মসজিদকে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অতি সামান্য বৃদ্ধি করেন। পবিত্র হুজরা শরীফের কারণে পূর্ব দিকে আগের মতো রেখে দেন। হযরত উসমান (রা) মসজিদ সংস্কারের কাজ ২৯ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আরম্ভ করেন এবং ৩০ হিজরীর মুহররম মাসে সমাপ্ত করেন। এ হিসেবে মসজিদ নির্মাণের কাজ দশ মাসে সমাপ্ত হয়। তবে কেউ কেউ মনে করেন, হযরত উসমান (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের কাজ খিলাফতের শেষ বর্ষ অর্থৎ ৪৫ হিজরী পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত রায়টিই বেশি প্রণিধানযোগ্য।[২]

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত উসমান (রা) নতুন সূত্রে মসজিদ নির্মাণের বাসনা ব্যক্ত করেন তখন লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি বললেন, আমি রাসূল মকবুল (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে বেহেশতে একখানা ঘর তৈরি করেন।'[৩]

সম্ভবত মসজিদের প্রথম বুনিয়াদ বহাল এবং কারুকার্যখচিত পাথর ব্যবহারের কারণেই জনগণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। অন্যথায় মসজিদ বৃদ্ধি করার অনুমতি হযরত (সা) কর্তৃক প্রদত্ত ছিল যার ওপর ভিত্তি করে হযরত উমর (রা) মসজিদকে প্রশস্ত করেছিলেন।[৪]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'যদি এ মসজিদটিকে ইয়ামেন দেশের 'সানআ' পর্যন্ত প্রশস্ত করা যায়, তবে তা আমারই মসজিদ।'[৫]

বর্ণিত আছে যে, ২৪ হিজরীতে যখন হযরত উসমান (রা) খিলাফতের

[১] আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৪৩০৬, হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮১

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২৭৮, হাদীস: ৪৪ (৫৩৩)

[৪] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮১–৮২

[৫] (ক) আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮, হাদীস: ৫১৫২; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৭৮

মসনদে আরোহন করেন, তখন মুসলমানগণ জুমাবারে মসজিদের মুসল্লিদের স্থান সংকুলন না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেন। এ ব্যাপারে হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে মুফতী ও রায়দানকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে মসজিদে নববীর মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা প্রদান করেন এবং হাদীসে নববী ﷺ হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামদের সম্মিলিত রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জনগণের সন্দেহ দূরীভূত করেন। অতঃপর কার্যনির্বাহকদের ডেকে এনে মসজিদের কাজ আরম্ভ করে দেন। তিনি অনবরত রোযাদার এবং সারারাত ইবাদতকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজে মসজিদের কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। এমন কি মসজিদ থেকে বের পর্যন্ত হতেন না।[১]

ইবনে আবু শাইবা (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব ইবনে আহবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, আহা যদি মসজিদের এ নির্মাণ কার্য সমাপ্ত না হত। এক দিকে তো মসজিদ তৈরি হত, আর অন্য দিকে ভেঙে যেত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবু ইসহাক! আপনি এমন কথা কেন বলেন? আপনি কি এ হাদীসটা শুনেননি যে, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'এ মসজিদে এক রাকাআত নামায অন্য মসজিদের এক হাজার রাকাআত থেকে বেশি সওয়াব মসজিদে হারাম ব্যতীত।'

হযরত কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ, আমি এখন একথায় বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও একথা বলার কারণ এই যে, এ মসজিদটা পরিপূর্ণতার সাথে আসমান থেকে নাযিলকৃত একটা মহাবিপদ সংযুক্ত। পৃথিবী এবং এ ফিতনাটির মধ্যে শুধু এক বিঘত ব্যবধান। মসজিদের ইমারত হওয়ার ওপর এ বিপদের অবতরণ নির্ভরশীল। যেই মাত্র ইমারতটি পরিপূর্ণ হবে, বিপদটা এসে যাবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, বিপদ কি? তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদত। একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, এ ঘটনাটি কি হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতের ঘটনার মতোই হবে? তিনি বললেন, না, বরং তা হতে লক্ষ গুণ বেশি ভয়ঙ্কর হবে। ঘটনার পর এডেন থেকে রোম পর্যন্ত হত্যা এবং ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা বয়ে যাবে।[২]

সম্ভবত হযরত কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যে সব লোকেরা অন্তরে হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শত্রুতা ও বিদ্বেষ নিহিত ছিল, মসজিদে নববী ভেঙে ফেলার দরুণ তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ আরও বেড়ে যাবে। এসব লোক অরাজকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য মসজিদের কাজটা সম্পন্ন হওয়ারই অপেক্ষায় ছিল। অতঃপর মসজিদ নির্মাণের পর তারা যে কতদূর ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮২

[২] (ক) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ৪, পৃ. ১২৯৫; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮৩

করেছিল তা সকলেরই জানা কথা। হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনায় আজো অশ্রুজলে বুক ভেসে যায়। এরপর মারওয়ানীদের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড রক্তপাত ও ফাসাদের বন্যা বয়ে যায় তাও কারো অজানা নয়। এসব ঘটনা হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকাণ্ড এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা থেকেই ঘটেছিল। এ ব্যাপারে হাররা'র ঘটনার মধ্যে এর কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় দফা সংস্কার

মসজিদে নববীর তৃতীয় দফা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে সাধিত হয়েছিল। ইতঃপূর্বে আর কোন খলীফা অথবা আমীর হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইমারতে হস্তক্ষেপ করেনি। খলীফা ওয়ালিদ মদীনায় নিযুক্ত শাসনকর্তা উমর ইবনে আবদুল আযীযকে নির্দেশ দিল যে, মসজিদে নববীর আশে-পাশে যার ঘরই হোকনা কেন, ক্রয় করে নাও। যে ব্যক্তি ঘর বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে তার ঘর ভেঙ্গে দাও। এবং তার বিনিময়ে অর্থ প্রদান কর। আর যদি অর্থ না নেয়, তবে ঘর ছিনিয়ে নাও এবং গরীব-মিসকীনদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করে দাও। পয়গম্বর ﷺ-এর বিবিগণের হুজরাসমূহ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কর। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত নির্দেশ পালন করেন এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের হুজরাসমূহকে ভেঙে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১]

কথিত আছে যে, যেদিন এ ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন মানুষের ওপর এক বড় বিপদ নেমে এসেছিল। মদীনায় এমন লোক ছিল না যে, এ ঘটনায় অশ্রু ফেলেনি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আহা! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরাসমূহকে পূর্ব অবস্থায় বহাল রাখা হত লোকেরা অনুধাবন করত যে, পয়গম্বর ﷺ এ নশ্বর জগতে কিভাবে কালাতিপাত করেছেন।[২]

ইবনে যুবালা বিদ্বান ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মক্কা শরীফে হজ করতে আসেন তখন হজ আদায়ের পর তিনি মদীনা গমন করেন এবং মসজিদে নববীর মিম্বরে ওঠে খুতবা দেন। খুতবার সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি হযরত হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি নিবদ্ধ হয়। তিনি আয়নার মধ্যে স্বীয় চেহারা দেখছিলেন। যখন খলীফা মিম্বর থেকে নিচে অবতরণ করেন তখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)-কে ধমক দিয়ে বললেন, এরা এখানে কেন?

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮৯

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯২

এদেরকে এখান থেকে বের করে দাওনি কেন? আমি এদেরকে এখানে দেখতে চাই না। তাদের ঘর-বাড়ি খরিদ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

এই সময়ে ফাতিমা বিনতে হুসাইন এবং হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রা) এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি ঘরের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা তাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। ওয়ালিদের বাহিনী তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে আসবাবপত্র ঘর থেকে বের করতে আরম্ভ করল। অগত্যা আহলে বাইত (ঘরে অবস্থানকারীগণ) ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। দিন দ্বি-প্রহরে পর্দানশীল স্ত্রীলোকগণ মদীনার বাইরে চলে যান এবং অন্যত্র বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১]

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, উল্লিখিত ঘটনা ওয়ালিদ মদীনা আগমনের পূর্বে তাঁর নির্দেশে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা) দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাঁদের বাড়ি ঘরের বিনিময়ে সাত হাজার দিনারের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু হাসান ইবনে হাসান (রা) শপথ করেন যে, তিনি কখনো উক্ত মূল্য নেবেন না। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা) এ ঘটনা ওয়ালিদকে লিখে জানালে ওয়ালিদ নির্দেশ দেন যে, যদি তিনি দীনার গ্রহণ না করেন তবে তাঁর থেকে ঘর ছিনিয়ে নাও এবং তাঁদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। আর ঘরের মূল্য বায়তুল মালে দিয়ে দাও।[২]

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর ঘর সম্পর্কেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘরের মধ্যে হযরত উমর (রা)-এর সন্তানগণ বসবাস করতেন। তাঁরা বললেন, আমরা এ ঘর ছেড়ে চলে যাব না এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করব না। তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফও মদীনায় অবস্থান করত সে নির্দেশ দিল যে, তাঁদের ওপর ঘর ছাপিয়ে দাও। কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে যখন ওয়ালিদকে জ্ঞাত করা হয় তখন তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযকে নির্দেশ দেন যে, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখ, ঘরের মূল্য পরিশোধ কর। যদি তাঁরা গ্রহণ না করেন তবে তাঁদেরকে সম্মান কর। তাঁদের জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে দাও। মসজিদের দিকে তাঁদের দ্বারও উন্মুক্ত রাখ।[৩]

ওয়ালিদের আমলে মসজিদে নববীর দৈর্ঘ্য দু'শ গজ এবং প্রস্থ একশ' গজ ছিল। ওয়ালিদ মসজিদকে খুব সুন্দর সুশোভিত ও চিত্তাকর্ষকভাবে নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের ছাদ দেওয়াল ও স্তম্ভকে সোনালি এবং মণি-মুক্তা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং বিশেষ কারুকার্য দ্বারা এর শোভা বর্ধন করেছিলেন।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮৯-৯০
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯০
[৩] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯০-৯১

খলীফা ওয়ালিদ কায়সার (রোম সম্রাট)-কে নির্দেশ দিলেন, দেশে যত ভালো কারিগর ও উত্তম শিল্পী পাওয়া যায় তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দাও। খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী রোম সম্রাট ৪০ জন বিশিষ্ট কারিগর এবং ৪০ জন কিবতী মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে ৮০ হাজার দিনার এবং রৌপ্যের নির্মিত শিকল এবং বাতিও পাঠালেন। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ৪০ হাজার (মিসকাল) ওজনের স্বর্ণ, শিকল এবং মণি-মুক্তা প্রেরণ করেন। মসজিদের মিহরাবের নিশানা এদের দ্বারাই নির্মিত হয়, পূর্বে এ নিশানা ছিল না।[১]

বর্ণিত আছে যে, রোম দেশীয় মজুরদের মধ্যে এক দুষ্ট লোক হুজরা শরীফের মধ্যে প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলে সাথে সাথে সে মাটিতে ওপুড় হয়ে যায় এবং তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ দুষ্ট লোকটির এ পরিণতি দেখে তাদের মধ্যে কোন কোন লোক মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে এরপর এক অসভ্য মসজিদের কিবলার দেয়ালে শুয়ারের চিত্র অঙ্কন করে। উমর ইবনে আবদুল আযীয তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করার নির্দেশ দেন। বর্ণিত আছে যে, রোম দেশীয় শিল্পীদের মধ্যে যারা কোন বৃক্ষের অথবা অন্য কোন সুন্দর চিত্র অঙ্কন করত সাধারণ মজুরী ব্যতীত তাকে আরো পুরস্কৃত করা হত।[২]

মদীনার ইতিহাসবিদ ইবনে যুবালা বলেন, মসজিদে নববী নির্মিত হওয়ার পর ওয়ালিদ এক একবার মদীনায় আসেন। মসজিদের ইমারত পরিদর্শনকালে ছাদের ওপর যখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখন তিনি একে বিশেষভাবে পছন্দ করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বললেন, তুমি সম্পূর্ণ মসজিদকে এভাবে তৈরি করনি কেন? উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, যদি সম্পূর্ণ মসজিদ এভাবে নির্মাণ করা হত তবে ব্যয় অনেক বেড়ে যেত। তিনি বললেন, এতে অসুবিধে কি? যতই ব্যয় হোক না কেন এভাবেই তৈরি করতে। উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, আপনি কি জানেন যে, কিবলার দিকের দেয়ালটিতে কত অর্থ লেগেছে? শুধু তার কারুকার্যে ৪৫ হাজার দিনার ব্যয় হয়েছে। একথা শুনে ওয়ালিদ একান্ত দুঃখিত হলেন এবং বলতে লাগালেন, এত অর্থ কেন ব্যয় করলে? তুমি কি তোমার বাপের অর্থ ভাণ্ডার মনে করেছ?[৩]

বর্ণিত আছে যে, মসজিদকে ঘুরে ফিরে দেখার প্রাক্কালে ওয়ালিদের সাথে হযরত উসমান (রা)-এর সাহেবযাদার সাথে দেখা হলে ওয়ালিদ বললেন, দেখ তোমার পিতার ইমারত কেমন ছিল আর আমার ইমারত কেমন? উত্তরে হযরত

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯৩
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯৩-৯৪
[৩] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯৭

উসমান (রা.)-এর সাহেবযাদা বললেন, আমার পিতার তৈরি ইমারত ছিল মসজিদ আর আপনার তৈরি ইমারত গির্যা।[1]

ওয়ালিদের ইমারত ৮৮ হিজরীতে আরম্ভ হয় এবং ৯১ হিজরীতে সমাপ্ত হয়। সর্বমোট তিন বছর সময় লাগে। এ ইমারতে মধ্যে চার কোণায় চারটি মিনার নির্মিত হয়। কিন্তু যখন সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক হজ্জে আসেন তখন তিনি বাবুস সালামের নিকটবর্তী মিনারটি ভেঙে ফেলেন। কারণ বাবুস সালামের নিকট মারওয়ানের ঘর ছিল। সে ঘরের প্রাঙ্গণে সেই মিনারটির ছায়া পড়ত।

ইতিহাসবিদ সামহূদীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ওয়ালিদের পূর্ববর্তী যমানায় মিনার প্রস্তুতের রীতি ছিল না। সর্বপ্রথম ওয়ালিদই তা আবিস্কার করেন। ওয়ালিদের আমলে মসজিদে জানাযার নামায পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[2]

চতুর্থ দফা সংস্কার

আব্বাসী বংশের খলীফা মাহদী মসজিদ নববীকে আরও কিছু প্রশস্ত করেন। তিনি উত্তর দিকে কিছু স্তম্ভ বাড়ান। মাহদীর পূর্বে ওয়ালিদের ইমারত পূর্ববৎ বহাল ছিল এবং খলীফা মাহদী ও ওয়ালিদের কারুকার্যের ওপর কোন হস্তক্ষেপ করেননি। কোন বর্ণনায় একথা পাওয়া যায়নি যে, মাহদীর পরবর্তী যুগে অন্য কেউ ওয়ালিদের ইমারতের ওপর কিছু বৃদ্ধি করেছে। তবে কেউ কেউ বলেন, ২০২ হিজরীতে খলীফা মামুন মাহদী নির্মিত ইমারতকে কিছু প্রশস্ত করেন।

অনুচ্ছেদ-১: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরা শরীফের বর্ণনা

এ হুজরা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর গৃহের অন্তর্ভুক্ত। এটা খেজুরের শাখা-প্রশাখায় তৈরি ছিল। যেমন– তাঁর অপরাপর হুজরাও খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখা দ্বারা নির্মিত ছিল। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাঁকে এখানেই সমাধিস্থ করা হয়। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর এ গৃহেই বসবাস করতেন। তাঁর বাসস্থান এবং কবর শরীফের মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। অবশেষে জনগণের অবাধ গমনাগমন ও কবরের মাটি নিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি গৃহখানাকে দু'ভাগে ভাগ করে মাঝখানে একটা দেয়াল খাড়া করে দিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর দাফনকাল পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফ এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কবরের মধ্যে যাতায়াত

[1] আস-সামহূদী, [illegible] বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, [illegible] ২, পৃ. [illegible]
[2] আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ৯৮

করতেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর দাফনের পর তিনি কবর যিয়ারতের যেতেন না।

যখন হযরত উমর (রা.) মসজিদকে প্রশস্ত করেন, একই সাথে হুজরা শরীফকেও কাঁচা ইটের দ্বারা নির্মাণ করেন। তখন থেকে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এভাবে বিদ্যমান। এরপর খলীফা ওয়ালিদের নির্দেশে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) একে ভেঙে ফেলেন এবং চিত্রাঙ্কিত পাথর দ্বারা পুনর্নির্মাণ করেন। আর এর বাইরে অপর একটা দালান নির্মাণ করেন। উভয় দালানে কোন দরজা রাখেননি। তবে কেউ কেউ বলেন যে, উত্তর দিকে একটা বদ্ধ জানালা ছিল। কিন্তু প্রথম কথাটাই সঠিক।

হযরত উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-কে বললেন, হুজরা শরীফকে যদি পূর্ববৎ বহাল রেখে এর চতুষ্পার্শ্বে ইমারত নির্মাণ করা হয়, তবে ভালো হয়। তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনীনও আমাকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করেন যে, হুজরার ভেতর খোঁড়ার সময় একটা পা দৃশ্য হয়। অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, তা আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর পা ছিল। স্থানের অসংকুলানের কারণে তা হুজরা শরীফের ভেতরে এসে যায়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, হুজরা শরীফের কবরসমূহের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়। হুযুরে পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ মুবারকের বরাবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মস্তক মুবারক রাখা হয় এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকে (রা.)-এর বক্ষে বরাবর হযরত উমর (রা.)-এর শির মুবারক রাখা হয়। রওযা পাকের কবরসমূহের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল:

হুযূর ﷺ-এর কবর শরীফ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কবর শরীফ

হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর কবর শরীফ

অতএব যদি এ অবস্থায় হযরত উমর (রা.)-এর কদম মুবারক হুজরা শরীফের দেয়ালে পড়ে, তবে এতে আশ্চার্যের কিছুই নেই। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর সময় হুজরা শরীফের মধ্যে আর কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে উল্লেখ্য যে, ৫৪৮ হিজরীতে হুজরা শরীফ থেকে একটা শব্দ শোনা যায়, যার থেকে অনুমিত হয় যে, দালানের কোন অংশ পতিত হয়েছে। অতএব একজন সুবিখ্যাত সূফী সাধককে রজ্জুর সাহায্যে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানতে পারেন যে, ছাদের কিছু মাটি নিচে পড়ে গেছে। তিনি তা পরিস্কার করেন। উক্ত সময়ে একজন হিজড়া (না-মর্দ) ব্যক্তিকে নিচে নামিয়ে দিয়ে এ পবিত্র স্থানটিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।

৫৫০ হিজরী জামাল উদ্দীন ইসফাহানী নামক এক মহান ব্যক্তি যাঁর দান-খয়রাতের কথা মদীনা শরীফের দিক-দিগন্তে মুখরিত এবং যাঁর প্রশংসায় মসজিদের খতীবগণ পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি বাবে জিবরাঈলের নিকটে একটা মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। যা 'রিবাতে আজম' নামে অভিহিত হয়। তিনি রওযা শরীফের চার পাশে চন্দন কাষ্ঠের একখানি জালি তৈরি করেন। এ সময় মিসরের উযীর ইবনে আবুল হায়জা শরীফ সাদা দীবা (এক প্রকার সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়)-এর তৈরি গিলাফ পাঠান, যার মধ্যে লাল রেশমি ফুল অঙ্কিত ছিল এবং তার ওপর সূরা ইয়াসীন লেখা ছিল। হুজরা শরীফকে আচ্ছাদিত করার নিমিত্ত তিনি এটা প্রেরণ করে। এরপর খলীফা মুস্তাযী বিল্লাহর আদেশে তিনি এটা হুজরা শরীফের ওপর পরিয়ে দেন। পরবর্তী যুগে বাদশাহগণের সিংহাসনে আরোহণের সময়ে প্রত্যেকেরই একটা নতুন গিলাফ প্রেরণ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

৬৭৮ হিজরী 'কলাউন সালিহী' রওযা শরীফের ওপরের সবুজ গুম্বুজ যা মসজিদের ছাদ থেকেও বেশি উঁচু তামার জালিসহ নির্মাণ করেন। ইতঃপূর্বে তা মসজিদের ছাদ থেকে দু'হাতের বেশি উঁচু ছিল না। মসজিদের বর্তমান দালান ১০০১ হিজরীতে মিসরের বাদশাহ 'কাতিবা' কর্তৃক নির্মিত হয়। তিনি হারামাইন শরীফাইনের খাদিম এবং বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। এ দালানের নির্মাণ কাজ ৮৮৮ হিজরীতে আরম্ভ হয়। তাঁর মহানুভবতার লক্ষণ এই যে, তিনি সেখানে সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং হারামাইন শরীফাইনের খাদিমদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। পবিত্র হজ পালনে তিনি বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। রোম সম্রাটদের অভ্যুত্থানে তাঁর রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। পবিত্র রওযা শরীফের ওঠানকে তিনি কোন পাথর ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করেননি। কেননা এ পবিত্র মাটির ওপর সাইয়িদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদচারণ করতেন।

অতঃপর ১০০০ হিজরীর মাঝা-মাঝি সময়ে সুলতান সুলায়মান রূমী এতে কাঁচা পাথর বিছিয়ে দেন। যা অদ্যাবধি বিদ্যমান। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে এবং রওযা পাকের দেয়াল নতুন সূত্রে নির্মাণ করেন।

নোট: অতঃপর উসমানিয়া বংশের সুলতান আবদুল মজীদ খান রূমী মসজিদে নববীকে পুনরায় নতুন সূত্র তৈরি করেন এবং এমন চিত্তাকর্ষকভাবে নির্মাণ করেন যে, পৃথিবী অবাক হয়ে গেছে। তিনি সম্পূর্ণ মসজিদকে গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত করেন এবং গম্বুজসমূহকে সীসার চাদর দ্বারা আবৃত করেন। বিভিন্ন রকমের কারুকার্য দ্বারা প্রত্যেক গম্বুজকে মনোহরী করে তুলেন। তিনি রোম সাম্রাজ্য থেকে বিখ্যাত কারিগর ও শিল্পীদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। সমুদয় স্তম্ভ, সমস্ত দরজা বিশেষভাবে বাবুস সালামকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। রওযায় পাক এবং পুরো মসজিদে

মরমর পাথর বিছিয়ে শোভা বর্ধন করেন। পূর্ববর্তী চারটি দরজা ব্যতীত 'বাবে মজীদ' নামক আরও একটি দরজা বৃদ্ধি করেন। পুরাতন পাঁচটা মিনারের মধ্যে চারটা পূর্ববৎ বহাল রাখেন। অপরদিকে নতুন রূপে সুশোভিত করেন। যা প্রত্যেক দর্শকের হৃদয় অভিভূত করে। হযরত উসমান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ধিত স্থানকে পিতলের পিঁজারার দ্বারা চিহ্নিত করেন। মসজিদের ওঠানে বাগে ফাতিমা رضي الله عنها-এর চতুষ্পার্শ্বে পিতলের পিঁজারার দ্বারা সুরক্ষিত করেন। কিন্তু আফসোস! বাদশাহ ইবনে সঊদ তা ভেঙে ফেলেন।

তিনি সম্পূর্ণ মসজিদ অতিমূল্যবান উন্নতমানের চিত্র ও ফুল অঙ্কিতকালীন গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত করেন। সম্পূর্ণ মসজিদের মধ্যে উন্নতমানের কাঁচ নির্মিত বাতি লাগান, যার আলোতে মসজিদে নববীকে নূরের টুকরো মনে হয়। হুজরা মুবারককে নানা ধরনের ফুলের চিত্র অঙ্কন দ্বারা আকর্ষণীয় করে তুলেন। দ্বিতীয় ইবনে সঊদের আমলে মসজিদে নববীকে আরও প্রশস্ত ও সুশোভিত করা হয়।

দ্রষ্টব্য: মরহুম শাহ ফয়সল এবং বাদশাহ ফাহাদের আমলে এক বিরাট কর্মসূচির অধীনে হারামাইন শরীফাইনকে এক অতুলনীয় অপরূপ সজ্জায় সুশোভিত ও প্রশস্ত করা হয়।

অনুচ্ছেদ–২: হুযূর পাক ﷺ-এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির বর্ণনা

প্রথম ঘটনা: পবিত্র রওযা মুবারক খোদাইয়ের ঘটনা

এ ঘটনা ৫৫৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়। বর্ণিত আছে যে, সুলতান নূর উদ্দীন সাইয়েদ মাহমূদ ইবনে জঙ্গী একদিন রাতের বেলা হযরত ﷺ-কে তিনবার স্বপ্নে দেখেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমাকে এ দু'ব্যক্তির (যারা সেখানে দণ্ডায়মান ছিল) ষড়যন্ত্র থেকে নিস্কৃতি দাও। সুলতান স্বীয় বিচক্ষণতার বুঝতে পারেন যে, আজ মদীনা মুনাওয়ারায় কোন অঘটন ঘটেছে এবং এ ঘটনা কী? সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ সুলতান জনগণের অজানা অবস্থায় শেষ রাতে বিশজন বিশিষ্ট আপনজন ও বহু সম্পদ নিয়ে মদীনা তাইয়েবার দিকে রওয়ানা হয়ে যান ষোল দিন পর সন্ধ্যায় তিনি মদীনা শরীফে পৌঁছেন। মদীনায় উপনীত হওয়া মাত্রই তিনি সেই মালাউন দু'জনের অনুসন্ধানে লেগে যান। সারা মদীনায় ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মদীনার সর্বস্তরের বাসিন্দারা যেন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে শাহী দান ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি শাহী বখশিশকে উক্ত পাপী দু'জনকে খুঁজে বের করার একটা অজুহাত হিসেবে খাড়া করেন। কিন্তু পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে উক্ত মালাউল দু'জনকে পাওয়া যায়নি, যাদেরকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। কেননা তারা শাহী বখশিশ নিতে আসেনি।

সুলতান লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন ব্যক্তি কি বাকি রয়ে গেছে যারা পুরস্কার গ্রহণ করেনি। লোকেরা বলল, এমন কোন ব্যক্তি তো অবশিষ্ট নেই। তবে পশ্চিম দেশীয় দু'জন অত্যন্ত নেককার, পরহেযগার, দানশীল ব্যক্তি বাদ রয়েছে যারা দিন-রাত তাদের স্বীয় স্থানে ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকে। কোন লোকের সাথে মেলামেশা করে না। তারা তাদের ঘর থেকে খুবই কম বের হয়। নির্দেশ মতো সুলতানের নিকট তাদেরকে উপস্থিত করা হল। তাদের দেখামাত্র সুলতান চিনতে পারলেন, এরাই সেই দু'ব্যক্তি যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্ন যোগে দেখিয়ে ছিলেন।

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কোথায় থাক? তারা বলল, রওযা শরীফের সন্নিকটে একটা সরাইখানায়। এ স্থানটা রওযা পাকের পশ্চিম পাশে এখনও বিরানা অস্থায় পড়ে আছে। মসজিদের দেয়ালের দিকে এর জানালা রয়েছে। তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে স্বয়ং তাদের বাসস্থানে প্রবেশ করলেন, যেখানে তারা তাঁকে বাসার ঠিকানা দিয়েছিল।

বর্ণিত আছে যে, সুলতান তাদের নির্দেশিত বাসায় উপস্থিতির পর দেখতে পান, সেখানে একখানা কুরআন মজিদ এবং কিছু ওয়ায-নসীহতের কিতাব মওজুদ রয়েছে। অপর দিকে কিছু মাল-সম্পদও দেখতে পান, যা তারা মদীনার গরীব লোকদেরকে বিতরণ করে। তিনি সেখানে তাদের শোয়ার একটা বিছানাও দেখতে পান। সুলতান যখন উক্ত বিছানাকে সরিয়ে ফেললেন, তখন পবিত্র রওযা মুবারক দিকে একটি খোদিত সুড়ঙ্গ দেখতে পান। অপর দিকে একটা খোদিত কূপ দেখতে পেলেন, যেখানে তারা সেই সুড়ঙ্গের মাটি ভর্তি করে।

অপর এক বর্ণনায় জানা যায়, তাদের নিকট দুটো বস্তাও ছিল যাতে করে তারা রাতের বেলা গর্তের খোদিত মাটি বাকিতে রেখে আসত। অনেক ধমক ও শাস্তি প্রদানের পর তারা স্বীকার করল যে, তারা নাসারা (ঈসায়ী) জাতি এবং নাসারাগণই তাদেরকে বিস্তর মাল-দওলত দিয়ে পশ্চিমা দেশের হাজীদের লেবাসে সেখানে প্রেরণ করে। যাতে তারা মদীনায় এসে রওযায়ে পাকের দিকে গর্ত খুঁড়ে হুজরা শরীফে পৌছে। (নাউযু বিল্লাহ) হুযূর আকরম ﷺ-এর পবিত্র দেহ মুবারকের সাথে যেন বেয়াদবি করে। যখন তাদের খোদিত গর্ত কবর শরীফের সন্নিকটে পৌছে, তখন বৃষ্টি-বাদল গগণস্পর্শী মেঘের গর্জন, বিস্ফোরণ ও প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়। যে রাতে উক্ত পাপীরা রওযা শরীফের সন্নিকটে এসে পৌছে, তারপর দিন সকালে নেকবখত সুলতান মদীনা শরীফ পৌছেন।

সুলতান এ ঘটনা শুনে অতিশয় অভিভূত হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করেন। হুজরা শরীফের জানালার নিকটে এ পাপী বদবখতদের গর্দান মেরে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যাবেলা তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। নেকবখত সুলতান রওযা পাকের ভবিষৎ নিরাপত্তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

তিনি হুজরা শরীফের চতুষ্পাশে গভীর খন্দক (খাই) খনন করেন এবং সীসা বিগলিত করে সেই খাইয়ে পুড়িয়ে দেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কোন বেয়াদব এ কাজ করতে সাহস না করে।[১]

দ্বিতীয় ঘটনা:

ইবনুন নাজ্জার *তারীখে বগদাদে* লিখেছেন, মিসরের ওবাইদিয়া বংশের কতিপয় যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী) শাসনকর্তা পরস্পর সলা-পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের পবিত্র দেহসমূহ মদীনা শরীফ থেকে মিসরে নিয়ে আসা হয়, তবে তা মিসরের জন্য বড় সৌভাগ্যের বস্তু হবে। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে হারামাইন শরীফাইন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। সারা বিশ্বের লোকজন তাদের যিয়ারতের জন্য মিসরের দিকে আকৃষ্ট হবে। মিসরের শাসনকর্তা এ মনোভাবকে সামনে রেখে একটি বিরাট দালান ও একটি কবর স্থান তৈরি করে।

আবুল ফুতূহ নামক তাদের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কবরের লাশগুলোকে মদীনা থেকে মিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মদীনায় প্রেরণ করা হয়। সম্ভবত তারা মদীনায় আগমনের পূর্বেই মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন। মদীনায় তার প্রথম মজলিসেই একজন কারী তাকে দেখামাত্রই কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ
اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا
بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

'যদি ওয়াদাবদ্ধ হবার পর তারা শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের সমালোচনা করে, তবে তোমরা এমন কাফিরদের সরদারগণকে হত্যা কর, যাতে তারা বিরত থাকে। তোমরা এমন লোকদের হত্যা করছ না কেন? যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং রাসূল ﷺ-কে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।'[২]

কুরআন মজীদের এ আয়াতটা তিলাওয়াতের পর জনগণের মধ্যে আলোড়ন ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমনকি উক্ত মজলিসের মধ্যেই তাকে হত্যা করার উপক্রম হয়। কিন্তু মদীনা শরীফ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হত্যা করেনি। স্বয়ং আবুল ফুতূহও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৮৪-১৮৫
[২] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২-১৩

সে বলল, খোদার শপথ! যদি আমাকে কতল করেও দেওয়া হয়, তবু আমি কবর শরীফকে স্পর্শও করব না। অতঃপর সে এ গর্হিত পাপকার্য থেকে বিরত থাকে। সে রাতে এমন ঝড়-তুফান এল এবং মাটি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, ঘোড়া, উষ্ট্র ইত্যাদির কদম ফুটবলের ন্যায় মাটির ওপর দোলতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে আবুল ফাতুহ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বাদশাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভের তার যে সাধ ছিল, সে তা অন্তর থেকে বের করে ফেলল এবং নির্বিঘ্নে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।[১]

তৃতীয় ঘটনা:

কতিপয় খোদাদ্রোহী মাটিতে ধ্বসে যাবার অপর এক ঘটনা। তাবারী তাঁর *রিয়াযে নযরা* নামক কিতাবে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'হলব' নামক স্থানের রাফিযী সম্প্রদায়ের কতেক লোক মদীনা শরীফের আমীরের নিকট অনেক হাদিয়া ও উপঢৌকন নিয়ে আসে। এ পাপীদের উদ্দেশ্য ছিল যে, রওযা মুবারকের দ্বার খুলে তারা সাইয়িদিনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং সাইয়িদিনা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লাশ বের করে নিয়ে যাবে। লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মদীনার আমীর এতে রাজি হয়। সে এ কাজের অনুমতি দান করে দারোয়ানকে বলল, যদি এ লোকগুলো এখানে আসে, তুমি তাদেরকে হারাম শরীফ খুলে দিয়ো এবং তাদেরকে প্রবেশের পথে বাধা দিয়ো না। দারোয়ান বলেন, যখন লোকজন ইশার নামায আদায় করেন এবং দরজা বন্ধ করার সময় হয়, তখন দেখা গেল, চল্লিশজন লোক কোদাল-শাবল এবং বাতি নিয়ে বাবুস সালামের নিকট বিদ্যমান। তারা দরজা নাড়া দিল এবং আমীরের নির্দেশ মোতাবেক আমি তাদের জন্য দরজা খুলে দিলাম এবং এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলাম এবং ভাবতে লাগলাম, না জানি কি কিয়ামত এসে যায়। সুবহানাল্লাহ এ পাপীরা মিম্বর শরীফ পর্যন্তও পৌঁছেনি সকলেই তাদের মাল-আসবাবপত্রসহ হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ানো স্তম্ভের নিকট মাটিতে ধ্বসে যায়।

মদীনার আমীর তাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। যখন বেশি বিলম্ব হয়ে গেল। সে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল। তাদের অবস্থা কী? আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বললাম। আমীর আমার কথা বিশ্বাস করল না এবং বলল, তুমি পাগল। আমি বললাম, তারা যে মাটির মধ্যে ধ্বসে গেছে তার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান আছে। 'তাবারী' এ ঘটনাকে অতিবিশ্বস্ত লোকদের বর্ণনা বলে দাবি করেছেন। এ ছাড়া মদীনার কোন কোন ইতিহাসবিদও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। *তারিখে সামহূদীতে* এ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।[২]

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৮৪-১৮৫
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৮৯

অষ্টম অধ্যায়
মসজিদে নববী, রওযা পাক ও মিম্বর শরীফের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

মসজিদ শরীফ

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে *বুখারী শরীফের* হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

'আমার এ মসজিদে নামায পড়া, অপরাপর মসজিদে নামায পড়ার চাইতে হাজার গুণ বেশি উত্তম, মসজিদে হারাম ব্যতীত।'[১]

সহীহ মুসলিম শরীফেও এ ধরনের হাদীস বিদ্যমান। তবে এতে এতটুকু বেশি আছে যে,

«فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ».

'আমি সর্বশেষ পয়গম্বর আর আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ।'[২]

বুখারী শরীফের হাদীসের সাথে *মুসলিম শরীফের* হাদীস সংযুক্ত করলে উভয় হাদীসের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, অপরাপর মসজিদ এবং পয়গম্বরদের মসজিদ যেমন- হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকেও মসজিদে নববীতে হাজার গুণ বেশি সওয়াব। তবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে বেশি নয়।

মু'জমে কবীর নামক হাদীস গ্রন্থে বিশ্বস্থ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতি দিয়ে তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে,

> একদিন হযরত আরকম রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের জন্য তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। তাঁর কথা শুনে তিনি ইরশাদ করলেন, 'তুমি ওখানে কেন যাচ্ছ? ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে'? তিনি বললেন, না, ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আমি ওখানে গিয়ে নামায পড়তে চাই।

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬০, হাদীস: ১১৯০; হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত
[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০১২, হাদীস: ৫০৭ (১৩৯৪); হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

ইরশাদ করলেন, 'আমার মসজিদের এক ওয়াক্ত নামায সেখানকার হাজার নামায থেকে উত্তম।'[1]

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'বায়তুল মুকাদ্দাসে এক ওয়াক্ত নামায অন্য মসজিদের এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম।'[2]

এতে সহজে বোঝা যায় যে, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের ফযীলত অন্যত্র নামায পড়া থেকে হাজার হাজার নামাযের বরাবর হবে এবং এ ফযীলত মসজিদে হারাম ব্যতীত।

উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীর মধ্যে সমতা বর্ণনা করা। অর্থাৎ অপরাপর মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে নামায পড়া হাজার গুণ উত্তম। তবে মসজিদে হারাম থেকে উত্তম নয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মসজিদে হারামের অধিকতর ফযীলত বর্ণনা করা। অর্থাৎ মসজিদে হারামে নামায পড়ার ফযীলত মসজিদে নববীতে নামায পড়ার তুলনায় অনেক বেশি।

আবার কেউ কেউ একথা বলেছেন যে, হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একথা বর্ণনা করা যে, মসজিদে নববীর ফযীলত অপরাপর মসজিদের তুলনায় তো হাজার গুণ বেশি, তবে মসজিদে হারাম থকে হাজার গুণ বেশি নয়, বরং হাজার গুণ থেকে কম।

কোন কোন আলিম প্রথমোক্ত অর্থটি এবং ইমাম মালিক ﵀ এবং তাঁর অনুসারীদের একটি দল তৃতীয় অর্থটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাঁরা মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারামের হাজার গুণ কম বলে মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মদীনার এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারামের একশ' নামাযের সমান। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মসজিদে নববীর এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারামের ৯

---

[1] আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৯০৭

عن الأرقم، قال: جئت رسول الله ﷺ لأودعه وأردت الخروج إلى بيت المقدس، فقال لي رسول الله ﷺ: «أين تريد؟» قلت: أريد بيت المقدس، قال: «وما يخرجك إليه، أفي تجارة؟» قلت: لا، ولكني أصلي فيه، فقال رسول الله ﷺ: «صلاة هاهنا خير من ألف صلاة ثم».

[2] আল-ফাকিহী, আখবারু মক্কা ফী কাদীমিদ দাহর ওয়া হাদীসিহি, খ. ২, পৃ. ৮২, হাদীস: ১১৮০

عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في بيت المقدس أفضل من ألف صلاة فيما سواه».

শত নামাযের সমান। এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব দাবির সমর্থন হাদীস থেকে দলীল পেশ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলিমদের মতে উক্ত হাদীসে মসজিদে নববী থেকে মসজিদে হারামের অধিকতর ফযীলতই বর্ণিত হয়েছে। যেমন- অপরাপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'মসজিদে নববী থেকে মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব একশ' গুণ বেশি।'[1]

এতে বোঝা যায়, অপরাপর মসজিদের তুলনায় মসজিদে হারামে নামায পড়ার সওয়াব লক্ষ গুণ বেশি। তবে মসজিদে নববী থেকে নয়। যেমন- অপরাপর হাদীসে স্পষ্টভাবে এটি বর্ণিত হয়েছে।

«الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ».

'মসজিদে হারামের এক ওয়াক্ত নামায অন্য স্থানের এক লক্ষ নামাযের, আমার মসজিদের নামায এক হাজার নামাযের এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের নামায ৫ শত নামাযের সমান।'[2]

উল্লেখ্য যে, এক মসজিদের ওপর অন্য মসজিদের উল্লিখিত ফযীলত সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই বর্ণিত হয়েছে। আর এ তারতম্য স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষ হতে পারে। আর সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প হলেও সওয়াব এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর হতে পারে।

মসজিদে নববীতে নামায পড়ার যে ফযীলত ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তা কি শুধু সেসব মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা নবী করীম ﷺ নির্মাণ করেছেন। না পরবর্তীতে যা বাড়ানো হয়েছে। তাও এর অন্তর্ভুক্ত? এ সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ থাকলেও বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম, হাদীস বিশারদ ও বিশিষ্ট বুযুর্গানে দীনের মতে পরবর্তী যুগে যা বৃদ্ধি করা হয়েছে তাও মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«لَوْ مُدَّ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي».

'আমার এ মসজিদকে যদি মক্কার 'সফা' পাহাড় পর্যন্ত বাড়ানো হয়, তবে তা আমারই মসজিদ হবে।'

---

[1] আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ, খ. ৫, পৃ. ১২১, হাদীস: ৯১৩৩; হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه من المساجد».

[2] আস-সামহুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ২, পৃ. ২৫

আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ﷺ বলেছেন,

«لَوْ مُدَّ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ».

'যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদকে যুলহুলাইফা পর্যন্ত বাড়ানো হয়, তবে তা এই মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১]

বর্ণিত স্থানের মিহরাবে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদেরকে নামায পড়িয়েছেন। এটি একটি প্রমাণ যে, মসজিদের বর্ধিত স্থান মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা না হলে তাঁরা সেই স্থানে নামায পড়াতেন না। কারণ মসজিদে নববীর ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়া তাঁদের বেলায় কল্পনাতীত। অবশ্য হুযূর আকরম ﷺ-এর অবস্থানের আলাদা ফযীলত এখনও বিদ্যমান। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, উল্লিখিত বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলিমদের কারো দ্বিমত নেই। তাঁর একথার উদ্দেশ্য এই যে, যারা এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণ এই যে, কোন কোন আলিম বলেছেন যে, মসজিদে নববীর এ ফযীলত আসল মসজিদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। ইমাম নববী ﷺও তাঁর কোন কোন কিতাবে একথার উল্লেখ করেছেন। তবে মুহিব্বুত তাবারী ﷺ বলেছেন যে, ইমাম নববী ﷺ পরে একথা থেকে ফিরে এসেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত মসজিদসমূহে নামায পড়ার যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা কি শুধু ফরয নামাযের ক্ষেত্রে, না নফল নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে উলামাদের মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের কোন কোন আলিম এবং মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ আলিমদের মতে এসব বৈশিষ্ট্য শুধু ফরয নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা এ হাদীসটি পেশ করেন অর্থাৎ

«لَوْ مُدَّ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللهِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لَكَانَ مِنْهُ».

'ফরয নামায ব্যতীত অপরাপর নামায ঘরে পড়াই উত্তম।'[২]

তবে অধিকাংশ আলিমদের মতে, এতে ফরয ও নফল উভয়ই সমান। সুতরাং ঘরে এবং অন্যান্য স্থানে নফল নামায পড়া অপেক্ষা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে নফল নামায পড়া উত্তম হবে। আর এ কারণেই শায়খ ইবনে হাজার আসকলানী ﷺ লিখেছেন যে, যেভাবে মক্কা মদীনায় নামায পড়ার সওয়াব অধিক, অনুরূপভাবে অপরাপর ইবাদত ও দান-খয়রাতের সওয়াবও

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৭৮

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ৩৫, পৃ. ৪৯৩, হাদীস: ২১৬২৪:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

অধিক। যেমন– ইমাম বায়হাকী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে,

«اَلصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

'আমার এ মসজিদের নামাযে অপরাপর মসজিদের নামায থেকে এক হাজার গুণ বেশি ফযীলত। মসজিদে হারাম ব্যতীত, আর আমার এ মসজিদের জুমা অপর মসজিদের জুমা থেকে হাজার গুণ বেশি ফযীলত, মসজিদে হারাম ব্যতীত।'[১]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে যে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, এর অর্থ সওয়াব বৃদ্ধি। তার এ অর্থ নয় যে, মসজিদে হারাম অথবা মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করলে এক লক্ষ বা এক হাজার নামায আদায় হয়ে যাবে।

একজন আলিম বলেছেন, আমি মসজিদে হারামের এক ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করে দেখেছি যে, তা পঞ্চান্ন বছর ছয় মাস, বিশ দিনের নামাযের সমান হয়। তবে এ হিসাবের মধ্যে উক্ত বর্ধিত সওয়াবের হিসাব ধরা হয়নি। যা এক নেকিতে দশ নেকি লেখা যায়, আর মিসওয়াক ও জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে যে অতিরিক্ত নেকি পাওয়া যায়, তাও এ হিসাবে ধরা হয়নি। যদি এসবও ধরা যায়, তবে সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে, যা নিরূপণ করা দুষ্কর।

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে ইমাম আহমদ ﷺ ও তবরানী ﷺ আরও একটি হাদীস বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

«مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً».

তাবারানী রিওয়ায়তে এতটুকু আরও বেশি আছে,

«لَا تَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

'যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে এভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যাতে কোন এক ওয়াক্ত নামায বাদ না পড়ে, তবে তার জন্য

[১] আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৪৩-৪৪, হাদীস: ৩৮২১

দোযখ থেকে মুক্তি, আযাব থেকে মুক্তি এবং নিফাক (মুনাফিকী) থেকে মুক্তি লিখা হবে।'[1]

হাদীসে 'চল্লিশ' সংখ্যাটি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি দীনের মধ্যে দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণতা এনে দেয়, যা মুনাফিকদের জন্য অর্জিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা ইখলাস এবং সততা ব্যতীত এ দৃঢ়তা হাসিল হয় না, যা মুনাফিকদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। মানুষের মধ্যে মুনাফিকী একটি মারাত্মক ব্যাধি। যদি এ ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, তবে আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ সে নিশ্চয় আযাব এবং দোযখ থেকেও নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

মসজিদে নববীর ফযীলত সম্পর্কে তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী (রহ.)। যার সারমর্ম এই যে,

'যে ব্যক্তি আমার মসজিদে নামায পড়ার জন্য পাক পবিত্র হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আসবে। তার আমলনামাতে পূর্ণ এক হজের সওয়াব লেখা হবে।'[2]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'যে ব্যক্তি ভালো কথা শিখে নেয়ার অথবা অপরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার এ মসজিদে আগমন করবে, তবে সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে নয়, বরং লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ অথবা কিসসা-কাহিনী বলা বা শোনার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তবে সে সেই ব্যক্তির মতোই, যে নিজের প্রিয় বস্তুকে অপরের হাতে তুলে দেয়।'[3]

অনুচ্ছেদ-১: রওযা মুবারক এবং মিম্বর শরীফের ফযীলত

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের বর্ণিত আছে যে,

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

---

[1] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২০, পৃ. ৪০, হাদীস: ১২৫৮৩; (খ) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ৫, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৫৪৪৪; হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত

[2] আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, খ. ৬, পৃ. ৬৯–৭০, হাদীস: ৩৮৯০; হযরত সুহায়ল ইবনে হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি ﷺ থেকে বর্ণিত:

«مَنْ خَرَجَ عَلَى طُهْرٍ لَا يُرِيدُ إِلَّا مَسْجِدِي هَذَا يُرِيدُ مَسْجِدَ النَّبِيِّ لِيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَتْ لَهُ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ».

[3] আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ৬, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ৫৯১১

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدِي هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَرَى مَا يُعْجِبُهُ وَهُوَ شَيْءُ غَيْرِهِ».

'আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মাঝখানে বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যে থেকে একটি বাগান আছে।'[1]

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে,

«مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي».

'আমার কবর এবং আমার মিম্বরের মাঝখানে।'[2]

বুখারীর রিওয়ায়তে এ বাক্যটিও বর্ণিত আছে যে,

«وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

'আমার মিম্বর আমার হাওযের ওপর।'[3]

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

«وَإِنَّ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ».

'আমার মিম্বর বেহেশতের দরজায় অথবা বেহেশতের উচ্চ বাগানে অবস্থিত।'[4]

একদিন নবী করীম ﷺ মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ইরশাদ করলেন, 'এখন আমার কদম বেহেশতের বাগানসমূহ থেকে এক বাগানে অথবা দরজাসমূহ থেকে এক দরজায় অবস্থিত।'[5]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'আমার মিম্বর আমার হাওযের ওপর।'[6]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'এখন আমি আমার হাওযের (আকার)-এর ওপর দাঁড়িয়েছি।'[7]

---

[1] (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৫; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০১০, হাদীস: ৫০০ (১৩৯০); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত

[2] আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৮, পৃ. ১৫৪, হাদীস: ১১৬১০; হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত

[3] আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৬; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত

[4] আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ২০, পৃ. ৩৬৭, হাদীস: ১৫১৮৭; হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত

[5] আহমদ ইবনে হাম্বল, ফাযায়িলুস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ২১১, হাদীস: ২৩৭;

عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ مِنْبَرِهِ: «إِنَّ قَدَمَيَّ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ».

[6] আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৬; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

«وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي».

যে স্থান দিয়ে হাওযের মধ্যে পানি আসে (অর্থাৎ নালা), তাকে বলা হয় (আকব)।[2]

মিম্বরের নিকটে মিথ্যা কসম গ্রহণ করার ওপরও বিশেষভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের হক ধ্বংস করার জন্য আমার মিম্বরের নিকটে মিথ্যা শপথ গ্রহণ করবে। সে নিজের অবস্থান দোযখে তৈরি করবে।'[3]

অপর হাদীসে বলা হয়েছে,

«فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ».

'তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং লোকদের অভিশাপ।'[4]

বাস্তব ক্ষেত্রে যখন মিম্বরের স্থানটি বেহেশতেরই অংশ বিশেষ, তখন কুরআন মজীদের আয়াত:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝

'তোমরা বেহেশতের মধ্যে বাজে ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না।'[5]

এ আয়াত অনুসারে বেহেশতে যেমন মিথ্যার অস্তিত্ব বিলুপ্ত, সে স্থানে মিথ্যা থাকতে পারে না। সুতরাং মিম্বরের নিকট মিথ্যা বলা হারাম হবে।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

'আমার হুজরা এবং আমার মুসল্লা (নামায পড়ার স্থান) এর মধ্যে বেহেশতের বাগান থেকে একটি বাগান আছে।'[6]

---

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৩:

«إِنَّ قَوَائِمَ الْمِنْبَرِ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ».

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৩

[3] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২২২, হাদীস: ৩২৪৬: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

«لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ».

[4] আন-নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ৪০৭, হাদীস: ৫৯৭৪: হযরত উমামা ইবনে সা'লাবা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

«مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...».

[5] আল-কুরআন, *আন-নাবা*, ৭৮:৩৫

[6] আত-তাবরানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৫২৩১: হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

কোন কোন আলিমগণের মতে 'মুসল্লা' শব্দের অর্থ মসজিদে নববীর মিম্বর এবং হুজরা শরীফের মাঝখানের স্থান, যেখানে নামায পড়া হয়। আবার কেউ কেউ মদীনার ময়দানকে 'মুসল্লা' বলেছেন, যেখানে ঈদের নামায আদায় করা হতো। এটি মদীনার বাইরে মক্কার পথে অবস্থিত।[1]

বর্ণিত আছে যে, এ হাদীসটি শ্রবণের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ﷺ মসজিদে নববী ও ঈদগাহের মাঝখানে স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করেন।

এ রিওয়ায়াত মোতাবেক আসল মসজিদ এবং পশ্চিম দিকের বাড়ানো মসজিদ সবই «رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।[2]

আর এটি শুধু হুজরা শরীফ ও মিম্বর শরীফের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় উলামাদের মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন- কোন কোন আলিম বলেছেন যে, মিম্বর শরীফ হাওযের ওপরে হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মিম্বর শরীফের নিকটে নেক আমল সওয়াবের কাজ এবং এখান থেকে বরকত হাসিলের দ্বারা হাওযে কাওসারের মিষ্টি পানি পানের সুযোগ লাভ হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, দুনিয়াতে যে মিম্বরের ওপর হুযূর আকরম ﷺ উপবেশন করতেন, সে মিম্বরখানাকে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির খাতিরে কিয়ামতের দিন হাওযে কাওসারের পাড়ে নিয়ে আসা হবে।

আবার কেউ কেউ এ মতবাদও করেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে মিম্বরের কথা বলা হয়েছে, তা মসজিদে নববীর মিম্বর নয়, বরং এটি সেই মিম্বর যা কিয়ামতের দিন তাঁর আসনের জন্য হাওযে কাওসারের নিকটে রাখা হবে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এ অর্থ সমর্থিত নয়। কেননা তিনি বলেছেন, ওপরের উল্লিখিত ইত্যাদি হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি মসজিদে নববীরই মিম্বর।[3]

এভাবে হাদীসে বর্ণিত রওযা সম্পর্কেও বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত: «رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»-এর অর্থ এ নয় যে, হুজরা শরীফ এবং মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশতের একটি বাগান আছে, বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে এ স্থানটি বেহেশতের সাদৃশ্য। যেমন- অপর একটি হাদীসে মসজিদসমূহকে রিয়াযুল জান্নাহ বলা হয়েছে,

«إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا».

---

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৩

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩৩

[3] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩১

'যদি তোমরা (মসজিদসমূহে) গমন কর, তবে তোমরা এ সুমিষ্ট ফল উপভোগ কর।'[১]

উল্লিখিত অর্থেরই ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ বেহেশতের বাগানে যেমন আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হয়, তদ্রূপ এ স্থানেও আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর যমানায় তাঁর সাহাবীগণ সেখানে তাঁর মজলিসে বসে তাঁর নিকট থেকে পর্যাপ্ত ইলম, ফয়েয ও বরকত হাসিল করে নিজকে ধন্য করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেন, উল্লিখিত হাদীসে সে স্থানে ইবাদত-বন্দিগি করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ স্থানে ইবাদত করার বরকতে মানুষ বেহেশতে পৌঁছে। যেমন- হাদীসে বর্ণিত আছে,

«اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ».

'বেহেশত তরবারিসমূহের ছায়া তলে।'[২]

আরও বর্ণিত আছে,

«اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ».

'বেহেশত মাতাদের পায়ের নিচে।'[৩]

কিন্তু উল্লিখিত অর্থ দুটি (অর্থাৎ বেহেশতের সাথে তুলনা দেওয়া এবং বেহেশত গমনের কারণ হওয়া) অত্যন্ত দুর্বল। কেননা অপরাপর মসজিদসমূহের মধ্যেও তো এ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। এতে মসজিদে নববীর কি বৈশিষ্ট্য রইল?

যদি হাদীসকে তার বাস্তব অর্থে গ্রহণ করে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ রহমতে বেহেশতের এক টুকরা মাটি হুজরা শরীফ ও মিম্বর শরীফের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন, তবে এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? সুতরাং আমরা বলব যে, হাদীসের অর্থ হচ্ছে এই যে, হুজরা শরীফ এবং মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশতেরই একখণ্ড জায়গা এনে দেওয়া হয়েছে, অতঃপর কিয়ামতের দিন আবার সে স্থান থেকে তুলে নিয়ে বেহেশতে স্থাপন করা হবে।

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৩৫১০; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] (ক) ইবনে আবদুল বর, *আল-ইসতিযকার*, খ. ২, পৃ. ৭৬৩, হাদীস: ১১/৪০৪; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৮৩; (গ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২, হাদীস: ২৮১৮; (ঘ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৬২, হাদীস: ১৭৪২

[৩] আল-বুখারী, *[illegible]*, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস: ১১৮, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

ইবনে ফারহূন رحمه الله ও ইবনে জওযী رحمه الله প্রমুখ আলিমগণ ইমাম মালিক رحمه الله থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করেছেন এবং এক দল আলিমের এই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন।[১]

মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম ইবনে আবু হামযা رحمه الله বলেন, একথা সম্ভব যে, হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম মতো এখানেও রিয়াযুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান) থেকে একখণ্ড পবিত্র মাটি দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের পরে আবার তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হবে। আল্লাহর রহমত নাযিল এবং বেহেশত লাভের ক্ষেত্রে এ স্থানের অটুট সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যান্য লোকের বক্তব্য অপেক্ষা হাদীসের ব্যাখ্যা এ অর্থটিই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তা ছাড়া হাদীসকে তার আসল অর্থে গ্রহণের মধ্যে হুযূর আকরম ﷺ-এর এক বিশেষ মর্যাদা ও তাঁর আলীশানের সন্ধান পাওয়া যায়। যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মকবুল বান্দা এবং আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, যেভাবে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় খলীল (বন্ধু) হযরত ইবরাহীম عليه السلام-কে বেহেশতের একটি পাথর প্রদান করে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা অধিকারী করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁর হাবীব সাইয়িদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর আকরম ﷺ-কেও (বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান) প্রদান করে তাঁকেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন। এতে আশ্চর্যের কি আছে? আর যদিওবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে পৃথিবীরই মাটি অনুভূত হয়। এতেও আশ্চর্যের তেমন কিছুই নেই। কারণ স্থূলকায়ী হওয়ার কারণে আখিরাতের বস্তুকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।[২]

যেসব মনীষীবৃন্দ হাদীসটিকে অধিকতর সওয়াব এবং ফযীলতের ওপর প্রয়োগ করেছেন তাঁদের উক্তি সেই সমুদয় হাদীসের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, যা উহুদ পর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

'উহুদ পর্বত বেহেশতের এবং ঈর পর্বত দোযখের অংশ।'[৩]

কোন আলিম এ হাদীসের এ অর্থ করে যে, উহুদ পর্বতের নিকট ইবাদতের দ্বারা বেহেশত লাভ এবং ঈর পর্বতের নিকট ইবাদত করলে দোযখে

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩১-৩২

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩২

[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১০৪০, হাদীস: ৩১১৫; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

«إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ».

যেতে হবে। বরং এর বাস্তব অর্থ হচ্ছে এই যে, আখিরাতের উহুদ পর্বত বেহেশতের দরজায় এবং ঈর পর্বত দোযখে থাকবে। যদি কেউ এখানে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে হুজরা এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতেরই অংশ বিশেষ হয়, তবে আল কুরআনের আয়াতঃ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

'বেহেশতে ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে না।'[১]

এ আয়াত অনুসারে এ স্থানেও ক্ষুধা পিপাসার বালাই না থাকা চাই। কিন্তু বাস্তবে তো এখানে তাই নয়। এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, বেহেশত থেকে অপসারিত হওয়ার পর তার মধ্যে আর বেহেশতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। যেমন- হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কেও সে একই কথা। যদি বলা হয় যে, রুকন এবং মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে তো দলীল প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু মিম্বর এবং রওযা পাক সম্পর্কে তেমন কোন বিশেষ প্রমাণ নেই। অথচ এসব কথা বিশ্বাস করা প্রমাণ সাপেক্ষে।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, রুকন এবং মাকামে ইবরাহীম সম্পর্কে যেমন হযরত ﷺ-এর বর্ণনার দ্বারা অবহিত হয়েছি, তেমনি রওযা শরীফ ও মিম্বর শরীফ সম্পর্কেও তাঁর খবর দেওয়ার ফলে আমরা জানতে পেরেছি। যদি আসল অর্থ নেওয়া হয়, তবে উভয় স্থানে নেওয়া দরকার। আর যদি আসল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ নেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে নেওয়া উচিত। পার্থক্যের হেতু কি?

[১] আল-কুরআন, *সূরা ত্বাহা*, ২০:১১৮

নবম অধ্যায়

মসজিদে কুবার নির্মাণ এবং সেই সমুদয় মসজিদসমূহের বর্ণনা, যেখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ঝলক বিদ্যমান

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, তখন মদীনা নগরীতে প্রবেশের পূর্বে তিনদিন যাবৎ কুবা এলাকায় আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি মসজিদে কুবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[১]

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, কুবাবাসীগণ তাঁর নিকট মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে ইরশাদ করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কোন একজন আমার উটের ওপর সওয়ার হয়ে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আস।' প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, কিন্তু উট স্বীয় স্থান থেকে নড়ল না। এর পর হযরত উমর رضي الله عنه সওয়ার হলেন। এবারও উটের নড়া-চড়া নেই। অতঃপর হযরত আলী رضي الله عنه যখন উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করেন, উট লাফ দিয়ে ওঠে। তিনি ইরশাদ করলেন, 'লাগাম ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেখানে নির্দেশ দেবেন, সে সেখানে গিয়ে থামবে।' অবশেষে উটনী যে স্থানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, ওখানেই তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং কুবাবাসীদের নির্দেশ দেন যে, 'তোমরা পাথর এনে একত্রিত কর।' অতঃপর তিনি কিবলা নির্দেশক একটি দাগ এঁকে দিলেন এবং স্বহস্তে একখানা পাথর স্থাপন করেন। এরপর সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন, 'যাতে তারা পর্যায়ক্রমে পাথর স্থাপন করেন।'[২]

তবে কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাইল عليه السلام আগমন করে কাবা শরীফের দিক নির্দেশনার্থে কাবা শরীফের ছাদ দেখিয়ে ছিলেন, সম্ভবত তা দ্বিতীয় দফা মসজিদ নির্মাণের ঘটনা যা কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পর

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৬

[২] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস ২০৩৩

عن جابر بن سمرة قال: لما سأل أهل قباء النبي ﷺ أن يبني لهم مسجدا، فقال رسول الله ﷺ:
«ليقم بعضكم فيركب الناقة»، فقام أبو بكر رضي الله عنه فركبها فحركها فلم تنبعث، فرجع فقعد، فقام عمر
رضي الله عنه فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد، ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «ليقم بعضكم
فيركب الناقة»، فقام علي رضي الله عنه، فلما وضع رجله في غرز الركاب، وثبت به، قال رسول الله ﷺ: «يا علي
أرخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة».

নির্মাণ করা হয়েছিল। কেননা প্রথম নির্মাণের সময় বায়তুল মুকাদ্দাসই কিবলা ছিল।[1]

বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত আছে যে, মসজিদে কুবা নির্মাণের সময় হযরত ﷺ স্বয়ং পাথর বহন করেছিলেন।[2]

আরও বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদের এ আয়াতটি:

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

'নিশ্চয় যে মসজিদটির বুনিয়াদ প্রথম দিন থেকে খোদাভীতি এবং পরহেযগারির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই আপনার দাঁড়ার হকদার বেশি।'[3]

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে মসজিদে কুবা সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কেননা এ মসজিদটিই ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। আর কুরআন শরীফের এ আয়াতটি:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝

'সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন।'[4]

উক্ত মসজিদে অবস্থানকারীদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বনী আমর! তোমরা এমনকি আমল কর, যার কারণে তোমরা এমন প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করেছ'। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন তো আমরা তেমন কোন আমল করিনি, তবে একটি কথা এই যে, আমরা ইস্তিনজার সময় ঢিলা ব্যবহারের পর পুনরায় পানি ব্যাহার করে পবিত্রতা অর্জন করি। তিনি ইরশাদ করলেন, 'এ কারণেই তোমরা এ প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করেছ। এ আমলটি আঁকড়িয়ে ধরা তোমাদের উচিত।'[5]

কোন কোন আলিম বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'মসজিদে তাকওয়া' হল মসজিদে নববী। কোন কোন হাদীসের দ্বারা এ উক্তি সমর্থন পাওয়া

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ১৯৭

[2] আত-তাবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ৩১৮, হাদীস: ৮০২; হযরত শামুস বিনতুন নু'মান رضي الله عنها থেকে বর্ণিত

[3] আল-কুরআন, আত-তাওবা, ৯:১০৮

[4] আল-কুরআন, আত-তাওবা, ৯:১০৮

[5] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৪৭।

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝﴾ [التوبة] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَهْلَ قُبَاءٍ، بِالْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ، فَمَا تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: إِنَّا نَغْسِلُ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ.

যায়। তবে সঠিক কথা হল এই যে, মসজিদে নববী এবং মসজিদে কুবা উভয়ের ওপরই এ আয়াতটি প্রযোজ্য। কেননা উভয়ই 'তাকওয়ার' ওপরে প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাদীস বিশারদ আলিমগণ এর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ رحمه الله, হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, কয়েকজন সাহাবী হুযূর পাক ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাঁদেরকে ইরশাদ করলেন, 'মসজিদে তাকওয়ার দিকে যাও।' এ কথা বলার পর তিনি ও হযরত আবু বকর رضي الله عنه ও হযরত উমর رضي الله عنه-এর কাঁধের ওপর হাত রেখে তাঁদের পিছনে মসজিদে কুবার দিকে চললেন।[1]

এ হাদীসটির দ্বারা বোঝা যায় যে, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি হল মসজিদে কুবা। যেমন– হযরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে,

«الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝﴾ [التوبة]».

'যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে মসজিদে কুবা।' আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা পাক পবিত্র থাকতে ভালোবাসে।'[2]

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ পদাচরণে এবং সওয়ার হয়ে মসজিদে কুবার যিয়ারতে যেতেন দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন।[3]

বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর পাক ﷺ প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। পয়গম্বর ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه-ও প্রত্যেক শনিবার সেখানে গমন করতেন।[4]

[1] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ১৬, পৃ. ৪৪৭, হাদীস: ১০৭৬৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا لَنَا: انْطَلِقُوا نَحْوَ مَسْجِدِ التَّقْوَى، فَانْطَلَقْنَا نَحْوَهُ، فَاسْتَقْبَلْنَاهُ يَدَاهُ عَلَى كَاهِلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَثُرْنَا فِي وَجْهِهِ.

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৪; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০১৩, হাদীস: ৫০০ (১৩৯৯); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল-মাযিনী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১, হাদীস: ১১৯৩; ■

ইবনে শাব্বাহ সোমবার দিন গমনের কথাও বলেছেন ।[১] মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম ﷺ রামাযানের সতের তারিখ সকালে কুবা মসজিদে তশরীফ নিয়ে যেতেন ।[২]

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত উমর رضي الله عنه মসজিদে কুবার যিয়ারতে যান । তিনি সেখানে কাউকে না দেখে বললনে, আল্লাহর শপথ! যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমি পয়গম্বর ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনিও এ মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবায়ে কিরামের সাথে পাথর বহন করেছেন । আল্লাহর শপথ! যদি এ মসজিদ বিশ্বের কোন এক প্রান্তেই হত, আর ওখানে গমন করতে গত উটের (সওয়ারির) প্রয়োজন হোক না কেন, আমি সেখানে পৌঁছে যেতাম । একথা বলার পর তিনি খুরমা গাছের একটি শাখা নিয়ে মসজিদে ঝাড়ু দিয়ে মসজিদের আবর্জনা দূরীভূত করেন । উপস্থিত জনতা আরজ করল, আমিরুল মুমিনীন! এ খিদমতের জন্য আমরা কি যথেষ্ট নই? তিনি বললেন, না তোমরা যথেষ্ট নও ।[৩]

ইবনে যুবালা যাইদ ইবনে আসলাম থেকে রেওয়াত করেন যে, তিনি বলেছেন,

«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ قَرَّبَ مِنَّا مَسْجِدُ قُبَاءٍ، وَلَوْ كَانَ بِأُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادُ الْإِبِلِ».

'আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া যে, তিনি মসজিদে কুবাকে আমাদের নিকটবর্তী করে দিয়েছেন । যদি এটি পৃথিবীর কোন এক প্রান্তেইবা হত, তবে আমরা উষ্ট্রের কলিজায় আঘাত করে যেতে হলেও সেখানে পৌঁছে যেতাম ।'[৪]

বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ رضي الله عنه বলেছেন, মসজিদে কুবায় দু'রাকাআত নামায আদায় করা

---

* عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا»، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنه «يَفْعَلُهُ».

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২০; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৪৫; মুরসাল সূত্রে বর্ণিত:

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ النَّمِرِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيْ قُبَاءً يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ».

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২০; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৪৪; মুরসাল সূত্রে বর্ণিত:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ قُبَاءً صَبِيْحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ».

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২০

[৪] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২১

দ্বিতীয় বার বায়তুল মক্বদিস যিয়ারত থেকে আমার কাছে উত্তম । তিনি আরও বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এ মসজিদে কি রহস্য রেখেছেন যদি তোমরা অবগত হতে, তবে এ মসজিদের যিয়ারতে আসতে যত কষ্টই হোক না কেন, তোমরা তা বরণ করে নিতে ।[১]

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকেও বিশুদ্ধ সূত্রে একথা বর্ণিত আছে । অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ صَلَّى فِيْ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ».

'যে ব্যক্তি চার মসজিদের (মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মাক্বদিস, মসজিদে কুবা) কোন একটিতে নামায আদায় করবে । তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।'[২]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«اَلصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ».

'মসজিদে কুবায় নামায পড়া উমরা আদায় করার মতই ।'[৩]

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে । কোন কোন হাদীসে চার রাকাআত নামায পড়ার কথাও রয়েছে ।[৪]

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, মসজিদের ওঠানে যেখানে সরাইখানা আছে, ওখানেই হযরত ﷺ-এর উট বসেছিল ।

সামহূদী বলেন, ইবনে যুবাইরের বর্ণনা ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ নেই, তবে লোক মুখে মুখরিত যে, মসজিদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছেষট্টি গজ ছিল ।

---

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৪২:

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: «لَأَنْ أُصَلِّيَ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ، لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ قُبَاءٍ لَضَرَبُوْا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ».

[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৫৭, হাদীস: ১০১৯; হযরত আসিদ ইবনে যুহাইর আল-আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১৪৫–১৪৬, হাদীস: ৩২৪; হযরত উসাইদ ইবনে যুহাইর আল-আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৪] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৪১:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَرَكَعَ فِيْهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةٍ».

আলিমগণ বলেন যে, হযরত উসমান رضي الله عنه মসজিদের মিনারার দিকে কিছু জায়গা বাড়ান। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله মসজিদে নববী পুনর্নির্মাণের সময় এ মসজিদটির সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। কালচক্রে যখন এটি ভেঙে পড়ে, তখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমীর-উমরাগণ নতুন নতুন সূত্রে এটি নির্মাণ করেন।

মসজিদে কুবার যিয়ারতের সময় বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সা'দ ইবনে খায়সমা رضي الله عنه-এর ঘরের যিয়ারত করাও আবশ্যক। এটি মসজিদের কিবলার দিকে অবস্থিত। পূর্বে মসজিদের দরজা এ ঘরের উঠানের দিকে ছিল। পরে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেনে রাখা দরকার যে, যদি প্রথম রাস্তা দিয়ে মসজিদের প্রবেশ করা যায়, তবে হুযূর পাক ﷺ-এর মুসল্লা (নামায আদায়ের স্থান) হবে তৃতীয় স্তম্ভের নিকটে। এ ছাড়া মসজিদের পশ্চিম কোণের কিবলার দিকে আরও একটি স্থান আছে, যাকে মসজিদে আলী বলা হয়।

সামহূদী বলেন, সম্ভবত এ মসজিদটিই সা'দ ইবনে খায়সমার বাড়ি, যেখানে হযরত ﷺ আরাম করেছেন, অযু করেছেন এবং নামায পড়েছিলেন।[১]

এ ছাড়া 'আরীস' নামক কূয়াটিও কুবার সন্নিকটে অবস্থিত। বরকত সম্পন্ন অপরাপর কূয়াসমূহের বর্ণনার সময় এ কূয়াটিরও বর্ণনা দেওয়া হবে।

এখানে মসজিদে কুবার বর্ণনার সাথে মসজিদে যেরার সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা এ মসজিদটি মসজিদে কুবার মুকাবিলায় নির্মিত হয়েছিল। আনসার গোত্রের কিছুসংখ্যক মুনাফিক নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে মসজিদে কুবার মুকাবিলায় উক্ত মসজিদখানা নির্মাণ করে। যেমন– কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ۝

'যে সব লোক অনিষ্ট সাধন ও কুফরী করার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে।'[২]

ইমাম বায়হাকী رحمه الله ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, আবু আমির নামক একজন দুষ্ট লোক মুনাফিকদেরকে ডেকে বলল, তোমরা আরেকটি মসজিদ তৈরি কর এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে মুনাফিকী এবং ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত থাক। ইতোমধ্যে আমি রোম সম্রাটের নিকট গিয়ে তার কাছ থেকে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এবং তিনি আর তাঁর সাহাবীদেরকে ওখান থেকে বের করে দেব। যখন মসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তখন মুনাফিকগণ পয়গম্বর ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, আমরা একখানা মসজিদ

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২৬
[২] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১০৭

নির্মাণ করেছি, যদি আপনি আপনার সাহাবীগণসহ এ মসজিদে নামায আদায় করেন, তবে স্থানটি বরকত সম্পন্ন হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করলেন যে,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۝ إِلَىٰ قَوْلِهِ: وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

'আপনি কখনও সেখানে খাড়া হবেন না। যে মসজিদখানা প্রথম দিন থেকে তাকওয়া ও খোদা ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে খাড়া হবারই আপনি বেশি হকদার। ... আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়ত দান করেন না।'[১]

বর্ণিত আছে, যে স্থানে মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা লাইয়া নামক একজন স্ত্রীলোকের স্বত্ব ছিল। সে সেখানে তার গর্দভ বাঁধত। মুনাফিকগণ বলতে লাগল, বাঁধার স্থানে যে আমরা নামায পড়বো, একথা কখনও হতে পারে না। আমরা আমাদের নামায পড়ার জন্য আর একখানা মসজিদ নির্মাণ করবো। ততদিনের মধ্যে আবু আমির আমাদের কাছে ফিরে আসবে এবং আমাদের ইমাম হবে। আবু আমির খোদা ও রাসূল বিদ্রোহী একজন কাফির ছিল। সে মক্কাবাসীদের সাথে সলা-পরামর্শ করে সিরিয়ায় গমন করে এবং সেখানে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। সে ধর্মের ওপরই সে দোযখে চলে যায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মসজিদে যেরারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেন।[২]

তাবারী একজন আলিম থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি জা'ফর আল-মনসুরের আমলে মসজিদে যেরার থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখেছি, এখন সে মসজিদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। এখনো জানা যাচ্ছে না যে, উক্ত মসজিদটি কোথায় ছিল। তবে এতটুকু জানা যায় যে, সেটি মসজিদে কুবার আশেপাশেই ছিল।

মসজিদে জুমা

এ মসজিদটিকে মসজিদে ওয়াদী ও মসজিদে আতিকাও বলা হয়। হুযূর পাক ﷺ-এর মদীনা গমনের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যখন তিনি আল্লাহর

[১] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১০৮–১০৯; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২৮; (গ) আল-বায়হাকী, *দালাইলুন নুবুওয়াত ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শারীয়াহ*, খ. ৫, পৃ. ২৬২–২৬৭, হাদীস: ২০১০.
[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৫৪–৫৫

নির্দেশে জুমাবার কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা হন, তখন সালিম ইবনে আওফের গোত্রের নিকট পৌছলে জুমার নামাযের সময় হয়। সেখানে তিনি জুমার নামায আদায় করেন। মদীনা এলাকায় এটিই ছিল তাঁর প্রথম জুমার নামায। এই মসজিদের সন্নিকটে একটি উপত্যকা আছে। এই উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে সালিম ইবনে আওফ গোত্রের ঘর-বাড়ি ছিল।

যার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান। সেখানে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইতবানের বাড়ি ছিল। যাঁর কাহিনী সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে। তিনি একবার হুযূরপাক ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। এ কারণে আমি বৃষ্টি বন্যার সময় মসজিদে গিয়ে নামাযের জামাআতে শরীক হতে পারি না। যদি আপনি আমার ঘরে তাশরীফ এনে নামায আদায় করেন, আমি সে স্থানেই নামায পড়বো। কোন কোন সীরাত লেখক বলেছেন, বনী সালামের মধ্যে দুটো মসজিদ ছিল। উভয়ের মধ্যে মসজিদে জুমা ছোট ছিল। সম্ভবত বড় মসজিদ ওটাই ছিল যেখানে হুযূর ﷺ-এর নামায পড়ার কথা এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ মসজিদের পুরাতন ইমারত নষ্ট হওয়ার পর ৯০০ হিজরীতে কোন একজন অনারব এটি পুনর্নির্মাণ করেন। এ মসজিদের ছাদ ও দেয়াল ছিল এবং এর কিবলা ছিল সিরিয়ার দিকে, দৈর্ঘ্য বিশ গজ, আর পূর্ব ও পশ্চিমে প্রস্থ ছিল ষোল গজ।[১]

মসজিদে ফযীখ

এ মসজিদটি এখন লোকমুখে মসজিদে শামস নামে অভিহিত। এটি একটি ছোট মসজিদ। এ মসজিদটি কুবার সন্নিকটে পূর্ব দিকের উচ্চ ভূমিতে ছাদবিহীন চতুর্ভুজ আকারে কালো পাথরের দ্বারা নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান এগার গজ। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নযীর অবরোধ করেন, তখন এ মসজিদের নিকটে তাঁর জন্য একটি কুব্বা তৈরি করা হয়। সেখানে তিনি ছয় দিন যাবত নামায আদায় করেন। উক্ত স্থানেই এ মসজিদটি নির্মিত হয়।

ইবনে শাব্বাহ ও ইবনে যুবলা বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه ও আনসার গোত্রের আরও কয়েকজন লোকসহ এ মসজিদের স্থানে বসে ফযীখ নামক পানীয় দ্রব্য পান করার প্রাক্কালে যখন শরাব অবৈধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন তাঁরা তাঁদের মদের কলসীর মুখ খুলে দিয়ে সমস্ত মদ ঢেলে দেন। এ কারণে এ মসজিদটির নাম হয় মসজিদে ফযীখ।[২]

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩২

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩২; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬৯

কোন কোন আলিম বলেন, সম্ভবত মসজিদ নির্মাণের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে ছিল, অথবা পরে হলেও হতে পারে যে, মদ অবৈধ বলে তাঁদের জানা ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁরা পরে জানতে পেরেছে।[১]

ইমাম আহমদ رحمه الله তাঁর মসনদে ইবনে উমর থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, এ স্থানে হযরত ﷺ-এর নিকট এক কলসী ফযীখ বলা হয়। কিন্তু কোন কোন আলিম হাদীসটিকে (দুর্বল) বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরুযাবাদী رحمه الله বলেন, মসজিদটি মসজিদে শামস নামে অভিহিত হওয়ার এছাড়া অন্য কোন হেতু জানা নাই যে, এ স্থানটি অন্য স্থানের তুলনায় উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে সর্বপ্রথম সূর্যের কিরণ বিকিরিত হয়। সর্বপ্রথম এখানেই সূর্যের আলো ছড়ায়। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, এ স্থানে হযরত আলী رضي الله عنه-এর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল বলে এর নাম মসজিদে শামস হয়েছে। এ অনুমানটি সঠিক নয়। কারণ সূর্য ফিরিয়ে আনার ঘটনাটি সাহবা নাম স্থানেই সংঘটিত হয়েছেল, যা খায়বার এলাকায় অবস্থিত। যেমন- কাযী আয়ায رحمه الله একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, সূর্য ফিরিয়ে আনার হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাওয়ী رحمه الله হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণ করেছেন। ইবনুল জওযী رحمه الله হাদীসটিকে বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] কিন্তু শায়খ ইবনে হাজর আসকলানী رحمه الله বুখারী শরীফের শরাহ ফতহুল বারীতে বলেছেন যে, ইবনুল জওযী হাদীসটিকে বানোয়াট বলে ভুল করেছেন।[৫]

মসজিদে কুরাইযা

এ মসজিদটি সমগ্র বাগানের শেষ প্রান্তে হাররার পূর্ব এলাকায় মসজিদ

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১০, পৃ. ৯৪, হাদীস: ৫৮৪৪:

عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أتي بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه، فلذلك سمي

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩; (খ) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৮৩-২৮৪; (গ) আত-তাহাবী, *শরহু মুশকিলিল আসার*, খ. ৩, পৃ. ৯২, হাদীস: ১০৬৭

[৪] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মওযূআত*, খ. ১, পৃ. ৩৫৫; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩

[৫] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ২২২; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩

[illegible] পূর্ব দিকে অবস্থিত। রাসূলে খোদা ﷺ যখন বনী কুরাইযা অবরোধ করেন, তখন তিনি এ মসজিদের স্থানে অবতরণ করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, এ মসজিদের পাশে একজন স্ত্রী লোকের বাড়ি ছিল, সেখানে হযরত ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। যখন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন, তখন স্ত্রী লোকটির ওই ঘরটিকেও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। যা মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল।[১]

পুরাতন ইমারতের মধ্যে সে স্থানে মসজিদে কুবার মিনারার মতো একটি মিনারাও ছিল। কালের আবর্তনে মিনারটি ভেঙে যায়। সাতশ হিজরী পর্যন্ত এর কিছু ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল। পরে সে স্থানে ছয় হাত উঁচু একখানা সরাইখানা নির্মিত হয়। যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এ মসজিদের পুরাতন ইমারত মসজিদে কুবার মতো ছাদ, থাম ও মিনারা বিশিষ্ট ছিল। এখন শুধু ছিল চারটি দেয়াল বিশিষ্ট, উত্তর-দক্ষিণে চুয়াল্লিশ এবং পূর্ব-পশ্চিমে তেতাল্লিশ গজ পরিমাণ একটি মসজিদ রয়ে গেছে।[২]

বনী কুরাইযা অবরোধের ঘটনা

হুযূরপাক ﷺ খন্দক যুদ্ধ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনেরর পর তখনও গোসল সেরে ওঠেননি। গোসলখানায় থাকাকালীন সময়েই জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধের জামা পরিহিত, ধুলা-বালি মাখানো অবস্থায় হযরত ﷺ-এর দরবারে উপস্থি হন এবং বলেন, ফেরেশতাগণ এখনও হাতিয়ার রেখে দেননি, আল্লাহর নির্দেশ যে, আপনি এখনই সওয়ার হয়ে বনী কুরাইযার ওপর আক্রমণ করুন। তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আমি এখনই ওখানে গমন করছি। তিনি তাঁকে এর সংবাদ দিয়ে সে দিকে চলে যান।[৩]

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদের ঘোড়া চলাচলে বাজারে এবং অলি-গলিতে ধুলো-বালি উত্থিত হয়ে এভাবে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, কিছু পরিদৃষ্ট হয়নি। হযরত ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের তাবেদার, তিনি যেন বনী কুরাইযায় গিয়েই আসরের নামায আদায় করেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে ইসলামের পতাকা দিয়ে অগ্রবর্তী দলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এ অপবিত্র গোত্রকে পঁচিশ দিন যাবৎ অবরোধ রাখার ফলে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা যুদ্ধ চালিয়ে

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৪; (খ) ইবনে নজ্জার, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৭০

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৪–৩৫

[৩] (ক) আবুল হাসান আল-কালাঈ, *আল-ইকতিফা বিমা তাযাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া আস-সালাসাতিল খুলাফা*, খ. ১, পৃ. ৪৩০; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৬

যেতে অক্ষম হয়। অবশেষে সে গোত্রের বন্ধু হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর নির্দেশে নিচে নেমে আসে এবং বলে, তিনি যা হুকুম দেবেন, তা তারা মেনে নেবে। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা.) তীরবিদ্ধ হওয়ার ফলে তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরত। যখন হযরত ﷺ তাঁকে ডেকে নিয়ে আসেন, তখন তাঁর রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। যখন হযরত ইবনে মুআয (রা.) মজলিশে এসে উপস্থি হন, তখন বনী কুরাইযাকে নির্দেশ দেন যে, 'তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও।'[১]

কোন কোন আলিম এ হাদীস থেকে সম্মান প্রদর্শনকল্পে দণ্ডায়মানের বৈধতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন যে, এটি সম্মানের জন্য দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি, বরং হযরত সা'দ (রা.) অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সওয়ারি থেকে অবতরণের ফলে তাঁর দেহে শক্তি না থাকায় তিনি তাদেরকে এ নির্দেশ দেন যে, তোমরা ওঠে গিয়ে তাঁকে সওয়ারি থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আস। তাঁর এ নির্দেশ শুধু তাঁদের জন্যই ছিল। অপর কারো জন্য নয়। তাঁর এ নির্দেশের মধ্যে একথার সূচনা নিহিত রয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.) তাঁদেরকে যে নির্দেশ প্রদান করবেন, তা তারা মেনে নেবে।

এরপর রাসূল করীম ﷺ হযরত সা'দ (রা.)-কে ইরশাদ করলেন যে, 'হে সা'দ ইবনে মুআয! বনী কুরাইযা সম্পর্কে তোমার নির্দেশ কি'? তিনি আরয করলেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তাদের বালিগ পুরুষদেরকে হত্যা করুন এবং তাদের ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। আর নাবালিগ ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীলোকদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করুন। তাঁর এ নির্দেশ দেওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) সম্পর্কে হযরত ﷺ ইরশাদ করেন যে, 'হযরত সা'দ (রা.) যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা সাত পর্দা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।' হযরত সা'দ (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ছয়শ' বা কিছু কমবেশি লোকদেরকে হত্যা করা হয়।[২]

এ ঘটনায় হুযূরপাক ﷺ-এর ফরমান,

«أَنَا الضَّحُوكُ الْقَتُولُ»

'আমি হাসি মুখ এবং হত্যাকারী।'[৩]

একবাটির রহস্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ:

«نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ»

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৭

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৮

[৩] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৪, পৃ. ২০৯

'তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান'-এর তজল্লীর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

মসজিদে মাশরুবা উম্মে ইবরাহীম

এটি বনী কুরাইযার মসজিদের উত্তরে খেজুর বাগানের মধ্যে হাররার পূর্ব পাশে চার দেয়াল বিশিষ্ট, ছাদবিহীন একটি মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে এটি এগার গজ, পূর্ব-পশ্চিমে চৌদ্দ গজ।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে নামায আদায় করেছেন।[1]

মাশরুবা অর্থ বাগান, আর উম্মুন শব্দের অর্থ মাতা। হযরত মারিয়া কিবতিয়া رضي الله عنها যিনি হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূল ﷺ-এর মাতা ছিলেন এখানে তাঁর একটি বাগান ছিল।[2] যেখানে হযরত ইবরাহীম عليه السلام জন্মগ্রহণ করেন।[3]

এখানে গরীব, মিসকীনদের জন্য ওয়াকফকৃত হযরত ﷺ-এর কিছু সদকার জায়গা ছিল।[4]

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها বর্ণনা করেন যে, হযরত মারিয়া কিবতিয়া খুবই সুন্দরী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অত্যাধিক ভালোবাসতেন। তিনি প্রথমে তাঁকে হারিসা ইবনে নু'মানের গৃহে রাখেন। তাঁর ওপর আমার ঈর্ষা সৃষ্টির আশঙ্কায় পরে তিনি তাঁকে মদীনার উপকণ্ঠে যেখানে এ মসজিদ অবস্থিত, সেখানে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে দেখার জন্য কখনও কখনও সেখানে গমন করতেন। কিন্তু এটি আমার জন্য পূর্বের চেয়েও অধিকতর বিষণ্ণতার কারণ হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, কিন্তু আমি এ দান থেকে বঞ্চিত।[5]

---

[1] (ক) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, তারীখুল মদীনা, খ. ১, পৃ. ৬৯:

عن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت: أن النبي ﷺ صلى في مسجد الفضيخ، وفي مشربة أم إبراهيم

[2] (ক) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩২; (খ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন নাজ্জার, আদ-দুররাতুস সামীনা ফী আখবারিল মদীনা, পৃ. ১২৭

[3] (ক) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩২; (খ) ইবনে শাব্বাহ, তারীখুল মদীনা, খ. ১, পৃ. ১৭৩

[4] আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩৫

[5] (ক) ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১০, পৃ. ২০১, হাদীস: ১১৪৯২; (খ) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩৬:

عن عائشة، قالت: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة من النساء جعدة، وأعجب بها رسول الله ﷺ، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها، فجزعت فحولها إلى العالية فكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد علينا، ثم رزق الله منها الولد وحرمناه.

কুরআন মজীদের আয়াত:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۝

'হে নবী! আপনি কেন তা হারাম করেছেন যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছে।'[1]

এ আয়াতখানা হযরত মারিয়া কিবতিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বিশেষভাবে খ্যাত।

মসজিদে বনী যুফুর

এ মসজিদটিকে মসজিদে বগলাও বলা হয়। সাধারণ লোকের নিকট এটি সুফরায়ে গয়গম্বর নামে অভিহিত। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رضي الله عنه-এর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর গুম্বদের পথে জান্নাতুল বকী'র পূর্ব পাশে এটি অবস্থিত।

বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবাকে সাথে নিয়ে বনী যুফুরের মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং নামায আদায় করেন। সেখানে তিনি একখানা পাথরের ওপর উপবিষ্ট হয়ে একজন কারীকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের নির্দেশ দেন। যখন কারী সাহেব কুরআন মজীদের আয়াত:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝

'কি যে অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী নিয়ে আসবো এবং এদের ওপর আপনাকে সাক্ষী বানাবো।'

তিলাওয়াত করেন, তখন হযরত ﷺ ক্রন্দন করতে লাগলেন। আর বললেন, 'হে খোদাওন্দ করীম! আমি যাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি, তাদের সম্পর্কেতো আমি সাক্ষী দিতে পারি, কিন্তু যাদেরকে আমি দেখিনি, তাদের সম্পর্কে আমি কি জানি'?[2]

---

[1] আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:১

[2] (ক) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১৯, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৫৪৬; (খ) আস-সামহূদী, ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা, খ. ৩, পৃ. ৩৭:

عن محمد بن فضالة الظفري، وكان ممن صحب النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ أتاهم في مسجد بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم، ومعه عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل وأناس

ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, যে পাথরের ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সে প্রস্তর খণ্ডের এই বৈশিষ্ট্য যে, যদি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ না হয়, তবে যদি তাকে এ পাথরের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে সে গর্ভধারণ করে। উক্ত পাথরের এ বৈশিষ্ট্যের কথা মদীনা শরীফের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের নিকট বিশেষভাবে খ্যাত।[1]

মাতারী রহ. বলেন, এ মসজিদের কেবলার দিকে হাররা এলাকায় অনেক পাথর আছে, যার মধ্যে নিদর্শন বিদ্যমান। বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত পাথরে হযরত ﷺ-এর খচ্চরের পায়ের খুরের নিদর্শন রয়েছে। আরেকটি পাথরের ওপর তাঁর হাতের কনুইয়ের আলামত আছে। বর্ণিত আছে যে, তিনি এর ওপর তাঁর বালিশ স্থাপন করেছিলেন এবং কনুই রেখেছিলেন। আর একখানা পাথরে তাঁর হাতের আঙুলের চিহ্ন রয়েছে। সেখানকার মেহরাবের একটি পাথরে লেখা আছে যে,

«خلّد الله ملك الإمام أبي جعفر المنصور المستنصر بالله أمير المؤمنين عمر سنة ثلاثين وستمائة».[2]

মসজিদুল ইযাবত

এ মসজিদটি জান্নাতুল বকী'র উত্তর দিকে একটি উঁচু স্থানে অবস্থিত। এটি উত্তর-দক্ষিণে বিশ গজের কাছাকাছি এবং পূর্ব-পশ্চিমে পঁচিশ গজ। একে মসজিদে মুআবিয়াও বলা হয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদিন যখন হযরত ﷺ মদীনার উচ্চ এলাকার দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এ মসজিদে প্রবেশ করে তিনি দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। তাঁর সাথে যত সাহাবী ছিলেন, তাঁরাও সেখানে নামায পড়েন। নামাযের পর সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আয় মশগুল থাকেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি ইরশাদ করেন, 'আমি পরওয়ারদিগারের নিকট তিনটি দু'আ করেছি:

১. হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করে মেরো না।
২. পানির আযাব দিয়ে ডুবিয়ে মেরো না।

من أصحابه، فأمر رسول الله ﷺ فترك، فقرأ حتى أتى على هذه الآية: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ [النساء: ٤١]، فبكى رسول الله ﷺ حتى اضطرب لحياه، فقال: «أي رب شهدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره؟».

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৭

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৭

৩. আমার উম্মত যেন পরস্পর সংঘর্ষে ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত না হয়।'[1]

প্রথমোক্ত আবেদন দুটো মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত আবেদনটি মঞ্জুর হয়নি। এ সম্পর্কে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, 'তোমার উম্মত তরবারীর দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'[2]

এখানে দু'আ কবুল হওয়ার কারণেই এ মসজিদটি মসজিদুল ইযাবত নামে অভিহিত হয়।[3]

মুআত্তা ইমাম মালিকে পানি 'ডুবিয়ে ধ্বংস করা'র স্থলে 'কাফিরদের আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা ধ্বংস করা'র উল্লেখ রয়েছে।[4]

হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস রাযি.-এর রিওয়ায়তে বলা হয়েছে যে, নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে দু'আ করেন।[5]

মুহাম্মদ ইবনে তালহা রহ. থেকে বর্ণিত রিওয়ায়তে বলা হয়েছে, তাঁর নামায আদায়ের স্থান: মিহরাবের ডান পাশের দু'গজ অন্তরে ছিল।[6]

উল্লেখ্য যে, এ মসজিদের একটি বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, যখন ইবাদত ও দু'আ সমাপনান্তে এ মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র

[1] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২১৬, হাদীস: ২০ (২৮৯০); (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮:

عن سعد، أن رسول الله ﷺ أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال ﷺ: «سألت ربي ثلاثا، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها».

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮

[3] (ক) মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুআত্তা*, খ. ১, পৃ. ২১৬, হাদীস: ৩৫: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবির ইবনে আতীক রাযি. থেকে বর্ণিত; (খ) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮:

دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين، فأعطيتهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها.

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬৮:

عن سعد بن أبي وقاص أنه كان مع النبي ﷺ فمر بمسجد بني معاوية، فدخل فركع فيه ركعتين، ثم قام فناجى ربه، ثم انصرف.

[5] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৭৪–৭৫:

عن محمد بن طلحة بن الطويل التيمي، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة...: وبلغني أنه صلى في مسجد بني معاوية عن يمين المحراب نحوا من ذراعين.

মসজিদে নববীর গুম্বজের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আহা! তা যে কতই আনন্দের মুহূর্ত, তা কেবল তখনকার সময়ের সাথেই বিজড়িত। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের এটি এক উত্তম মুহূর্ত।

اوقات خوش آن بود کہ با دوست بسر شد

باقی ہمہ بے حاصلی و بے خبری بود

'যে সময়টুকু বন্ধুর সাথে অতিবাহিত হয়, কেবল তাই আনন্দদায়ক অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো অনর্থক নিষ্ফল।'

মসজিদে আবু যর গিফারী

এ মসজিদটি শহীদগণের সরদার হযরত আমির হামযা -এর শায়নস্থলের পূর্ব দিকে ডান পাশে অবস্থিত।

বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে রিওয়ায়ত করেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি মসজিদে নববীর এক কোণায় অবস্থানরত ছিলাম, এমনি সময়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, হুযূরপাক সে স্থানের নিকটতম দরজা থেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু চললাম। যখন তিনি (সওয়াফ) নামক বাগানে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে ওযু করে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। নামায সমাপনান্তে তিনি সিজদায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সিজদায় নিমগ্ন থাকেন। সিজদার সময়-কাল বেশি দেরি হওয়ার কারণে আমি মনে করলাম, সম্ভবত হুযূরপাক -এর রূহ মুবারক ইল্লীঈনের মধ্যে চলে গেছে। এ ধারণায় আমি ক্রন্দন করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি শির মুবারক উত্তোলন করলেন এবং ইরশাদ করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনেকক্ষণ ধরে সিজদায় নিমগ্ন থাকার কারণে আমি মনে করেছি, আপনার রূহ মুবারক বের হয়ে গেছে। ইরশাদ করলেন, আমার কাছে জিবরাঈল অহী নিয়ে এসে বলে গেছেন, 'যে ব্যক্তি আপনার ওপর সালাম পেশ করে, আমি তার ওপর শান্তি বর্ষণ করি।'[1]

---

[1] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৮; (খ) আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ৩, পৃ. ১২৫-১২৬, হাদীস: ১৪৫১:

عَنْ مَوْلَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كُنْتُ قَاعِدًا بِرَحْبَةِ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجًا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الْمَقْبَرَةَ، قَالَ: فَلَبِثْتُ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ حَائِطًا مِنَ الْأَسْوَافِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَسَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ السُّجُودَ فِيهَا، فَلَمَّا تَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَبَدَّأْتُ لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي حِينَ سَجَدْتَ أَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاكَ مِنْ طُولِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ».

অপর এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি আপনার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আমি তার জন্য দশটি নেকি।'[2]

অপর রিওয়ায়ত মতে, 'দশবার রহমত বর্ষণ করি। অতএব আমি আমার প্রভুর এ নিয়ামত প্রদানের নিমিত্ত শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেছি।'[3]

ইমাম বায়হাকী হাকিম থেকে উদ্ধৃত করেন যে, এ হাদীসটি সহীহ, আর শুকরিয়ার সিজদা আদায়ের ক্ষেত্রে এর চাইতে অধিকতর সহীহ রিওয়ায়ত আর নেই।[4]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন। তবে তাঁর রিওয়ায়তে সিজদায়ে শুকরের কথা নামাযের উল্লেখ ব্যতিরেকেই বর্ণিত হয়েছে।[5] এ মসজিদটি অতিশয় ছোট, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মাত্র আট গজ।

মসজিদে বকী

জান্নাতুল বকীর দরজা দিয়ে প্রবেশের পর ডান পাশে হযরত আকীলের এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের মাযারের পশ্চিম দিকে এটি অবস্থিত। এ মসজিদ সম্পর্কে বিশ্বস্ত সনদের অভাবে কোন কোন আলিম মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত এটি সেই স্থান, যেখানে হুযূরপাক ঈদের নামায আদায় করেছেন।

সামহুদী বলেন, বিভিন্ন দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমিত হয় যে, এটি উবাই ইবনে কা'ব -এর মসজিদ, যেখানে হযরত নামায আদায় করতেন।[6]

তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'যদি লোকজনের ভীড়ের সম্ভাবনা না হত, তবে আমি প্রায় সময় এখানে এসে নামায আদায় করতাম।'[7]

---

[2] আল-বায্যার, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২১৯, হাদীস: ১০০৬; হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত: «مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْهُمْ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ».

[3] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৭০৫, হাদীস: ২০১৯ ও পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৮১০; হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত:

«مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا».

[4] (ক) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ৮১০; (খ) আল-বায়হাকী, *মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার*, খ. ২, পৃ. ১৯৭

[5] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২০১, হাদীস: ১৬৬৪

[6] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫৪-৫৫

[7] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬৪; হযরত ইয়াযীদ ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণিত: = «لَوْلَا أَنْ يَمِيلَ النَّاسُ إِلَيْهِ لَأَكْثَرْتُ الصَّلَاةَ فِيهِ».

এ পর্যন্ত মসজিদে কুবা থেকে মদীনা শরীফের পূর্ব ও উত্তর দিকের মসজিদসমূহের বর্ণনা দেওয়া হল। এখন মদীনা তাইয়িবার পশ্চিম ও উত্তর দিকের মসজিদসমূহের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

মুসল্লায়ে ঈদ

এটি মিসরী দরজার নিকটে, মদীনার বাইরে, পশ্চিম দিকে সেই রাস্তায় অবস্থিত, যে রাস্তা দিয়ে মক্কার কাফেলা মদীনায় আসে।

ওয়াকিদী বলেন, দ্বিতীয় হিজরীতে সর্বপ্রথম হযরত ﷺ এখানে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন।[1]

ইবনে যুবালা হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম দারে হাকীম ইবনে আদ্দাদের নিকটে উভয় ঈদের নামায আদায় করেন।[2]

কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেন, এ স্থানটি বাবুস সালাম থেকে এক হাজার গজ দূরে অবস্থিত।[3] বর্তমানে এটি মসজিদে মুসল্লা নামে একখানা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বে এখানে মদীনার বাজার ছিল এবং দারে হাকীম ইবনে আদ্দাদও সেই স্থানে ছিল।

মসজিদে আবু বকর সিদ্দীক (রা)

উল্লিখিত স্থানে মসজিদে আবু বকর (রা) নামে আরও একখানা মসজিদ আছে। বর্ণিত আছে যে, মসজিদটি যখন ভেঙে পড়ে, মদীনার শায়খুল হারাম মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন। মসজিদগৃহ খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মনোরম। তিনি মসজিদের পাশে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং একটি নহর জারি করে দেন। এ মসজিদের নিকট আরীযা নামক একটি পুরাতন বাগান ছিল, যার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

মসজিদে আলী

এ মসজিদখানা কোন এক অনারব সংস্কার করে দিয়েছেন। এ

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩৪।

«أَوَّلُ فِطْرٍ وَأَضْحَى صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ بِالْمَدِينَةِ بِفِنَاءِ دَارِ حَكِيمِ بْنِ الْعَدَّاءِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَحَامِلِ».

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩৮

মসজিদের ওঠান খুবই প্রশস্ত। বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা)-কে যখন অবরোধ করে রাখা হয়, সে সময় হযরত আলী (রা) স্বীয় বাসভূমি পরিত্যাগ করে সেখানে এসে বসবাস করেন এবং ঈদের নামায আদায় করেন।

সামহূদী এ মসজিদকেই মুসল্লায়ে ঈদ মানে করেন। তাঁর মতে, এখানেই নবী করীম ﷺ ঈদের নামায আদায় করেন এবং তাঁর অনুসরণে হযরত আলী (রা)ও এখানে ঈদের নামায পড়েন।

হযরত ﷺ-এর সময়ে মুসল্লায়ে ঈদ কোন দালান ছিল না। বরং তিনি দালান নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি ঈদের খুতবা মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে দেননি।

কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম যিনি ঈদের খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বর ব্যবহার করেন, তিনি হচ্ছেন মারওয়ান ইবনে হাকাম।

শায়খ ইবনে হাজার আসকলানী (রহ) কোন কোন হাদীস থেকে কথা বের করেছেন। ইবনে আবু শাইবা (রহ) বর্ণনা করেন, "সর্বপ্রথম মিম্বরে দাঁড়িয়ে যিনি খুতবা দেন, তিনি হযরত উসমান (রা)।"[4]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গিয়ে ইস্তিসকার নামায আদায় করেন এবং মিম্বরের ওপর খুতবা দেন।[5]

কোন কোন আলিম বলেছেন, ইস্তিসকার নামাযে যে চাদর পাল্টানো হয়, হাত ওঠানো হয় ইত্যাদি কার্যাবলি যাতে সব লোক দেখতে পায়, এ কারণেই সম্ভবত ইস্তিসকার নামাযের খুতবাতে মিম্বর ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঈদের খুতবাকে এর ওপর কিয়াস করা হয়েছে।[6]

হযরত সাইয়িদ (রহ) বলেন, উল্লিখিত মসজিদ তিনটি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ)-এর খিলাফতের সময় নির্মিত হয়। মুসল্লা শরীফের ফযীলত এবং সেখানে দু'আ কবুল হওয়া সম্পর্কে অনেক খবর ও আসার (হাদীস) বিদ্যমান আছে। যেমন–

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ২, পৃ. ৪৫৯; (গ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩৫:

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى عَلَى مِنْبَرٍ عُثْمَانُ رضي الله عنه».

[5] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪৪২, হাদীস: ৫৫৮; (গ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৪৩: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত

[6] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০

'আমার গৃহ ও মুসল্লা (ঈদগাহ)-এর মাঝখানে বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান আছে।'[১]

এ হাদীসটিও এ পর্যায়ভুক্ত। কেননা হযরত ﷺ প্রায় সময় এখানে আগমন করতেন। আর সফর থেকে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি মুসল্লায় পদার্পণ করে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতেন।[২]

এতে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় যে, তাঁরগৃহ ও ঈদগাহের মধ্যবর্তী স্থানে দু'আ কবুল হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়ব (রহ.)-এর রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাবশার বাদশা নজ্জাশীর জানাযার নামাযও এখানে আদায় করেন।[৩]

মসজিদে ফতহ

সাধারণত মসজিদে ফতহ আশে-পাশের সমুদয় মসজিদকেই মসজিদে ফতহ বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মসজিদে ফতহ শুধু ওটাই যা সিল'আ পাহাড়ের পশ্চিম দিকে উঁচু স্থানে অবস্থিত এবং যে মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে সিঁড়ি আছে। এটি মসজিদে আহযাব এবং মসজিদে আ'লা নামেও অভিহিত।[৪]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর বিখ্যাত মসনদে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম ﷺ মসজিদে ফতহে তিনদিন সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবারে দু'আ করেন। বুধবার দিন দু'নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ কবুলের সুসংবাদ নাযিল হয়। যার পরে হুযূর পাক ﷺ-এর চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করতে থাকে। অপর এক রিওয়ায়তে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখনই আমি কোন বিপদের সম্মুখীন হতাম মসজিদে ফতহে গিয়ে দু'আ

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৩৩১; হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩৮:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِالْمُصَلَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَوَقَفَ يَدْعُو».

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৪৫:

عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَتَعْرِفُ مَوْضِعَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقَامَ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ حِينَ مَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ.

[৪] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৯

করতাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'আ কবুলের সুসংবাদ দেন।[১]

বর্তমানে যেখানে মসজিদে ফতহ বিদ্যমান, খন্দকযুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ সেখানে আগমন করেন এবং যেসব কাফির সেখানে একত্রিত হয়েছিল দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে তাদেরকে বদ দু'আ করেন কিন্তু নামায পড়েননি। এরপর পুনরায় তিনি সেখানে আগমন করে তাদেরকে বদ-দু'আ করেন এবং নামায পড়েন।[২]

ইবনে যুবালা বর্ণনা করেন যে, খন্দকযুদ্ধের দিন হযরত ﷺ মসজিদে ফতহে কেবল দু'আ করেছেন। শত্রু ভয়ে যুহর, আসর এবং মাগরিবের নামায আদায়ের তিনি অবসর পাননি। মাগরিবের পর তিনি সব নামাযই কাযা আদায় করেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, আহযাব এবং খন্দক একই যুদ্ধের নাম। এ যুদ্ধের পর কুরাইশগণ আর কখনও মদীনা আক্রমণের সাহস পায়নি। এদিন মুসলমানদের অবস্থা যখন কাহিল হয়ে পড়ে, তখন রাসূলে খোদা ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা দমকা হাওয়া প্রেরণ করে তাদেরকে পরাস্ত করে দেন। কাফিরগণ এতে টিকে থাকতে না পেরে পলায়ন করে। কুরআন মজীদের সূরা আল-আহযাবে এর বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৪]

হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের পর কুরাইশরা আর কখনও তোমাদের মুকাবিলা করতে সাহস করবে না এবং তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে না।'[৫]

---

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৯; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২২, পৃ. ৪২৫, হাদীস: ১৪৫৬৩:

حَدَّثَنِي جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ». قَالَ جَابِرٌ: «فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ، إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ».

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৯; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৩, পৃ. ৩৯২, হাদীস: ১৫২০০:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ - يَعْنِي الْأَحْزَابِ - فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَقَامَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ» قَالَ: «ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ، وَصَلَّى».

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৯:

عَنِ الْمُطَّلِبِ مُرْسَلًا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ حَتَّى ذَهَبَتِ الظُّهْرُ وَذَهَبَتِ الْعَصْرُ وَذَهَبَتِ الْمَغْرِبُ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُنَّ شَيْئًا، ثُمَّ صَلَّاهُنَّ جَمِيعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ».

[৪] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪২

[৫] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৯; (খ) [illegible], *[illegible]*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮, হাদীস: ১০৪৬১ =

এ কারণে এ মসজিদকে মসজিদে ফতহ এবং মসজিদে আহযাব বলা হয়। এ মসজিদ এবং এর সংলগ্ন এলাকায় বিজয়ের এবং দু'আ কবুলিয়াতের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।[১]

এ মসজিদের ... দিকে সীহ নামক একটি উপত্যকা আছে। এখানে প্রচুর খেজুর বৃক্ষ আছে এবং স্থানটি খুবই মনোরম।[২]

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে খোদা ﷺ মসজিদে ফতহে প্রবেশ করে সম্মুখ পানে দু'এক কদম চলার পর দাঁড়িয়ে উভয় হস্ত উত্তোলন করে দু'আ করেন। দু'আতে তিনি হস্ত মুবারক এতদূর উত্তোলন করেছিলেন যে, তাঁর চাদর মুবারক মাটিতে পড়ে যায় এবং তিনি বারবারই দু'আতে নিমগ্ন থাকেন।[৩]

বিভিন্ন রিওয়ায়তের দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, মসজিদের মধ্যবর্তী স্তম্ভের নিকটই তাঁর দু'আর স্থান ছিল।[৪]

সাইয়িদ (রহ.) বলেন, যখন মসজিদের ইমারত বদলে গেছে, এখন দু'আ করার সময় মসজিদের মিহরাবের বরাবর ওঠানে খাড়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ রিওয়ায়তের সাথে অপরাপর রিওয়ায়তসমূহ সংযুক্ত করলে বোঝা যায়, তাঁর দু'আর স্থান পশ্চিম দিকেরই বেশি নিকটবর্তী ছিল তিনি উত্তর দিক সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠে ছিলেন, পূর্ব দিকের সিঁড়ি বেয়ে নয়। সেখান থেকে দু'কদম সামনেই তাঁর দাঁড়াবার স্থান।

বর্ণিত আছে যে, সেদিন তিনি এ মসজিদে এ দু'আর করেছিলেন।

«اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هَدَيْتَنِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ، فَلَا مُكْرِمَ لِمَنْ أَهَنْتَ، وَلَا مُهِيْنَ لِمَنْ أَكْرَمْتَ، وَلَا مُعِزَّ لِمَنْ أَذْلَلْتَ، وَلَا مُذِلَّ لِمَنْ أَعْزَزْتَ، وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ، وَلَا خَاذِلَ لِمَنْ نَصَرْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ

– عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنِ الْخَنْدَقِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنَا: «لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا، وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ».

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪২

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ৯৮; (খ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সামীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ৮১

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৩৯:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَسْجِدَ الْفَتْحِ، فخطا خطوة ثم الخطوة الثانية، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللهِ حَتّٰى رُئِيَ بياض إبطيه- وَكَانَ أعفر الإبطين، فَدَعَا حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتّٰى دَعَا وَدَعَا كَثِيْرًا، ثُمَّ انْصَرَفَ».

[৪] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪০

لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا رَازِقَ لِمَنْ حَرَمْتَ، وَلَا حَارِمَ لِمَنْ رَزَقْتَ، وَلَا رَافِعَ لِمَنْ خَفَضْتَ، وَلَا خَافِضَ لِمَنْ رَفَعْتَ، وَلَا خَارِقَ لِمَنْ سَتَرْتَ، وَلَا سَاتِرَ لِمَنْ خَرَقْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَنْ بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَنْ قَرَّبْتَ، يَا صَرِيْخَ الْمَكْرُوْبِيْنَ، وَيَا مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ، وَيَا كَاشِفَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ وَكَرْبِيْ، فَقَدْ تَرَى حَالِيْ وَحَالَ أَصْحَابِيْ».

হযরত ﷺ-এর দু'আর পর জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ শ্রবণ এবং কবুল করেছেন। তিনি আপনাকে এবং আসহাবকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। একথা শ্রবণের পর তিনি দু'জানু (উরু) ওপর বসে যান এবং হস্ত মুবারক প্রসার করে এবং চক্ষু মুবারক নিচে নামিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেন, 'আপনি এবং আমার আসহাবের ওপর যে দয়া করেছেন তার জন্য অশেষ শুকরিয়া।'[১]

আবু নু'আইম (রহ.) ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর বরাত দিয়ে আহযাবের (খন্দকের) দিন তাঁর এ দু'আ উদ্ধৃত করেছেন,

«﴿شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝﴾ [آل عمران: ١٨]، وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللهُ بِهٖ وَأَسْتَوْدِعُ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ وَدِيْعَةً لِّيْ عِنْدَ اللهِ، يُؤَدِّيْهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ قُدْسِكَ، وَعَظِيْمِ بَرَكَتِكَ، وَعَظَمَةِ طَهَارَتِكَ وَبَرَكَةِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَطَارِقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ غِيَاثِيْ فَبِكَ أَغُوْثُ، وَأَنْتَ مَلَاذِيْ فَبِكَ أَلُوْذُ، وَأَنْتَ عِيَاذِيْ فَبِكَ أَعُوْذُ، أَعُوْذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَرَمِ جَلَالِكَ مِنْ خِزْيِكَ وَكَشْفِ سِتْرِكَ، وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ، وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ، أَنَا فِيْ حِرْزِكَ

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪০; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৪, পৃ. ১৫৭:

...فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ دَعْوَتَكَ وَكَفَاكَ هَوْلَ عَدُوِّكَ، فَخَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَأَرْخَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: «شُكْرًا شُكْرًا كَمَا رَحِمْتَنِيْ وَرَحِمْتَ أَصْحَابِيْ».

وَكَنَفِكَ وَكَلَاءَتِكَ فِي لَيْلِي وَنَهَارِي، وَنَوْمِي وَقَرَارِي، وَظَعْنِي وَأَسْفَارِي، وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي، ذِكْرُكَ شِعَارِي، وَثَنَاؤُكَ دِثَارِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَنْزِيهًا لِاسْمِكَ وَعَظَمَتِكَ، وَتَكْرِيمًا لِسُبُحَاتِ وَجْهِكَ، أَجِرْنِي مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِكَ، وَاضْرِبْ عَلَيَّ سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ، وَقِنِي سَيِّئَاتِ عَذَابِكَ، وَجُدْ عَلَيَّ، وَعِدْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُرْتَضَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ».

বর্ণিত আছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফিয়ী رحمه الله-এর অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়, তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচান।[১]

হযরত মু'আয ইবনে সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অপরাপর মসজিদসমূহ যা এর নিচে অবস্থিত, সবখানে তিনি নামায আদায় করেন।[২]

মসজিদ ফতহের নিকটবর্তী কিবলার দিকে অবস্থিত প্রথম মসজিদটিকে মসজিদে সালমান ফারসী বলা হয়। এর পশ্চাতের মসজিদটিকে মসজিদে আলী মুরতযা বলা হয়।

আর পাহাড়ের তলদেশের মসজিদ যা কিবলার দিকে অবস্থিত এবং সবচেয়ে ছোট, তাকে মসজিদে আবু বকর বলা হয়। স্পষ্টভাবে এসব নামে অভিহিত করার কারণ জানা না থাকলেও বাহ্যত দৃষ্টিতে মনে হয়, সম্ভবত আহযাবযুদ্ধের দিন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং হযরত ﷺ নামায আদায় করেছিলেন। এ কারণে উক্ত মসজিদসমূহের ওই নামকরণ করা হয়।

সর্বপ্রথম হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله এ মসজিদগুলো

---

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪১; (খ) আবু নু'আইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৯, পৃ. ৮০; (গ) আস-সাখাবী, *আত-তাকদীর*, খ. ১, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৩:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِي عَلَى الْجَبَلِ وَفِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي حَوْلَهُ».

নির্মাণ করেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন ভেঙে যায়, তখন সাইফুদ্দীন হুসাইন ইবনে আবুল হায়জা মসজিদসমূহকে ৫৭৫ হিজরীতে পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর ৫৭৭ হিজরীতে তিনি আরও দু'খানা মসজিদ নির্মাণ করেন।

ইবনুল হায়জার পরে ৮৭৬ হিজরীতে যায়নুদ্দীন দায়গম মনসূর মসজিদে আলী মুরতযাকে পুনঃনির্মাণ করেন। কিন্তু মসজিদে আবু বকর কেউ সংস্কার করেনি। ভগ্নাবস্থায় পড়ে থাকার পর ৯৮২ হিজরীতে একজন ভাগ্যবান লোক এসব সংস্কার করেন।[১]

মসজিদে নবী হারাম

মদীনা থেকে মসজিদে ফতহ গমনের অর্ধেক পথে ডান পার্শ্বে সিলআ পাহাড়ের ঘাটিতে এ মসজিদ অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, হুযুর পাক ﷺ এখানে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করেন।[২]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله মসজিদটির ছাদ এবং স্তম্ভ বৃদ্ধিসহ একে নতুনভাবে সংস্কার করেন। এখন শুধু চারটি দেয়াল বিদ্যমান আছে। ঘাটির সন্নিকটে একটি গুহা আছে, যেখানে খন্দকযুদ্ধের সময়ে হযরত ﷺ পদার্পণ করেছিলেন। আবার কখনও কখনও তিনি সেখানে রাত যাপনও করেন।[৩]

তাবারানী হযরত আবু কাতাদা رضي الله عنه-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত মু'আয ইবনে জবল رضي الله عنه হযরত ﷺ-এর সন্ধানে এসে তাঁকে জবলে সওয়াবের দিকনির্দেশ দিলে তিনি ওই পাহাড়ের ওপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি এদিক-ওদিক প্রত্যক্ষ করছিলেন, এমনি সময় হঠাৎ তিনি এক গুহার মধ্যে তাঁকে সিজদারত অবস্থায় দেখতে পান। ভয়ে তিনি সে দিকে না গিয়ে নিচে নেমে আসেন। কিছুক্ষণ পর আবার যখন তিনি সেখানে যান, এবারও তিনি তাঁকে সিজদায় দেখতে পান। হযরত মু'আয رضي الله عنه বলেন, এবার আমি মনে করলাম, সম্ভবত তিনি এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। পরে তিনি সিজদা থেকে মস্তক উত্তোলন করলেন এবং বললেন, 'হযরত জিবরাঈল আমার কাছে এসে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৩-৪৪

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৪:

عَنْ يَحْيَى بْنِ قَتَادَةَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ مَشْيَخَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي دُورَ الْأَنْصَارِ، فَيُصَلِّي فِي مَسَاجِدِهِمْ».

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৪

উম্মতের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন? আমি বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবিশেষ জ্ঞাত। পুনর্বার হযরত জিবরাঈল এসে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, খোদাওন্দ করীম ইরশাদ করেছেন যে, আপনি সন্তুষ্ট থাকুন, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না, যাতে আপনার অন্তরে ব্যথা পায়। এ সুসংবাদ শ্রবণের পর আমি সিজদায় গিয়ে আল্লাহ তবারক ওয়া তা'আলার শুকরিয়া আদায় করি। হে মু'আয! যে সমুদয় পন্থায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়, তার মধ্যে সিজদাই সর্বোত্তম পন্থা।[1]

মসজিদে কিবলতাইন

এ মসজিদটি মসজিদে ফতহের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। উভয় মসজিদের মধ্যকার ব্যবধান আধ মাইল অথবা এর চেয়েও কম। ওয়াদীয়ে আকীক ও বীরে রুমার সন্নিকটেই অবস্থিত।

মুহাম্মদ ইবনে আখনাস ﵁ থেকে বর্ণিত যে, হযরত ﷺ একদিন সালামা গোত্রের উম্মে বশর নামক এক স্ত্রী লোকের বাড়িতে যান। স্ত্রী লোকটি তাঁর খাদ্য পরিবেশন করেন। উপস্থিত জনতা তাঁর কাছে এ মজলিসে মুমিন এবং কাফিরদের রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি মজলিসে অবস্থানরত অবস্থায় যুহর নামাযের সময় হলে তিনি সেখানকার মসজিদে নামায পড়তে যান। যুহরের নামায দু'রাকাআত সমাপনান্তে তাঁর নিকট বায়তুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের ওহী নাযিল হয়। তখনই তিনি বায়তুল মাকদিস থেকে কাবার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং অবশিষ্ট দু'রাকাআত কাবামুখী হয়ে আদায় করেন। এ কারণে এই মসজিদটিকে মসজিদে যুল-কিবলতাইন বলা হয়।

ইবনে যুবালা মুহাম্মদ ইবনে জাবির ﵁ থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, মসজিদে কিবলাতাইন নামে খ্যাত এই মসজিদে বনী সালামার একদল লোক যুহরের নামায পড়ছিলেন। দু'রাকাআত নামায শেষ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল ﵇ কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশনা নিয়ে অবতরণ করেন। তাই এই নামাযেই কাবার দিকে মুখ পরিবর্তন করা হয়।[2]

অবশ্য এই বর্ণনায় উক্ত নামাযে কিবলা পরিবর্তনের সময় নবী করীম ﷺ-এর উপস্থিতির উল্লেখ।

শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরূযাবাদী ﵀ বলেন, মসজিদে কুবাই এর জন্য উত্তম স্থান। কেননা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি সেখানে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, প্রথমোক্ত কথাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[3]

মসজিদে যুবাব

এ মসজিদের অপর নাম মসজিদুর রায়া। মদীনা থেকে সিরিয়া অভিমুখে গমনকারীদের ডান পাশে যুবাব নামক পাহাড়ের ওপর মসজিদটি অবস্থিত। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয ﵀ মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরে তা ভেঙে যাবার পর ৮৪৫ অথবা ৮৪৬ হিজরীতে মদীনার কোন আমীর কর্তৃক এটি পুনঃনির্মিত হয়। মসজিদে ফতহ এবং মসজিদে যুবাবের মাঝখানে সিল'আ পর্বত অবস্থিত। এ পর্বতের পশ্চিমে মসজিদে ফতহ এবং পূর্বে অতিশয় মনোরম একটি উঁচু স্থানে এ মসজিদটি বিদ্যমান। এ স্থান থেকে মদীনা মুনওয়ারা এবং রওযার পাকের গুম্বজ দেখা যায়।

বর্ণিত আছে যে, রাসূল করীম ﷺ এ পর্বতের ওপর নামায পড়েছেন। এবং তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এখানে তাবু স্থাপন করেছেন।[4]

হারিস ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, যুবাব নামক একটি ব্যক্তি বাদশাহ মারওয়ান ইবনে হাকামের তরফ থেকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা ছিল। মারওয়ান তাকে যুবাব পাহাড়ের ওপর ফাঁসি দেয়। ফাঁসি দেওয়ার খবর শুনে হযরত আয়িশা ﵂ মারওয়ানের নিকট সংবাদ দিলেন, আফসোস! যে স্থানে

---

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৫; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১৪০, হাদীস: ১০২৭:

عن أبي قتادة قال: خرج معاذ بن جبل يطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجده، فطلبه في بيوته، فلم يجده، فأتبعه في سكة سكة حتى دل عليه في جبل ثواب، فخرج حتى رقي جبل ثواب، فنظر يمينا وشمالا، فبصر به في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقا إلى مسجد قباء، قال معاذ: فإذا هو ساجد، فهبطت من رأس الجبل، وهو ساجد، فلم يرفع رأسه حتى أسأت به الظن، فظننت أنه قد قبض، فلما رفع رأسه قلت: يا رسول الله! لقد أسأت بك الظن، وظننت أنك قد قبضت، فقال: «جاءني جبريل عليه السلام بهذا الموضع، فقال: إن الله يقرئك السلام، ويقول لك: ما تحب أن أصنع بأمتك؟ قلت: الله أعلم، فذهب، ثم جاءني، فقال: إنه يقول: لا أسوؤك في أمتك، فسجدت، فأفضل ما يتقرب به إلى الله السجود».

[2] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ২৪০, হাদীস: ১০২৭:

عن محمد بن جابر، قال: صرفت القبلة ونحن نفر من بني سلمة يصلون الظهر في المسجد الذي يقال له مسجد القبلتين، فأتاهم آت، فأخبرهم وقد صلوا ركعتين، فاستداروا حتى جعلوا وجوههم إلى الكعبة.

[3] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৬-৪৭

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬১: عن عبد الرحمن الأعرج، أن النبي ﷺ صلى على ذباب.

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছেন, তুমি কি সেখানে তাকে ফাঁসি দিলে? মরওয়ানের পরে আরও অনেক আমীর-উমরা লোকজনকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। অবশ্য পরে কতেক বুযুর্গানে দীনের নিষেধ করার ফলে এ রীতির অবসান ঘটে।[১]

কেউ কেউ বলেন যে, খন্দকযুদ্ধের প্রাক্কালে যুবাব পাহাড়ের ওপর হযরত ﷺ-এর তাবু স্থাপিত হয়েছিল।[২]

উল্লেখ্য যে, আহযাব যুদ্ধের সময় সিল'আ পাহাড় থেকে পশ্চিমে মুসল্লায়ে ঈদ এবং মসজিদে ফতহ থেকে যুবাব পাহাড় পর্যন্ত খন্দক খোদিত হয়েছিল। সীরাত এবং ইতিহাসের কিতাবে খন্দক যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। লোকের যিয়ারতে স্থান ব্যতীত খন্দকের এখন অপর কোন নাম-নিশানা নেই। কেউ কেউ এ মসজিদের স্থান সানীয়তুল ওয়াদা হিসেবে চিহ্নিত করে। সম্ভবত এটি সানীয়তুল ওয়াদার নিকটে হওয়ায় লোকদের এ ধারণা জন্মেছে।

মসজিদে ফসহ

উহুদ পর্বতের পাদদেশে সাইয়িদুনা হযরত আমীর হামযা (রা)-এর মাযারের উত্তর দিকে এ মসজিদটি অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, কুরআন মজীদের আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

'হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা মজলিসকে প্রশস্ত করে দাও। তবে তোমরা প্রশস্ত করে দেবে।'[৩]

এ মসজিদেই নাযিল হয়।

মাতরী বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ অবসানের পর হুযূর আকরাম ﷺ এ স্থানে যুহর এবং আসরের নামায আদায় করেন।

ইবনে আবু শাব্বাহও একথা বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি কোন নামায, তা নির্দিষ্ট করে বলেননি।[৪]

---

১ (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৯-৫০; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬২

২ (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৪৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৬২:

عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: «ضربت للنبي ﷺ قبة يوم الخندق على ذباب».

৩ আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদিলা, ৫৮:১১

৪ (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫১; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৫৭:

عن رافع بن خديج، «أن النبي ﷺ صلى في المسجد الصغير الذي بأحد في شعب الجزار على يمينك

মসজিদে আইনাইন

সাইয়িদুনা হযরত হামযা (রা)-এর কিবলার দিকে এ মসজিদটি অবস্থিত। উহুদযুদ্ধের দিন মুসলিম তীরআন্দাজ বাহিনী এ পর্বতের ওপর অবস্থান নিয়েছিলেন। বিধায় এ পর্বতকে জবলুর রুমাতও বলা হয়। মসজিদটি এখন ভেঙে গেছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত হামযা (রা) এখানেই বর্শাবিদ্ধ হন।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন হযরত ﷺ আইনাইন পর্বতের ওপর যুহরের নামায আদায় করেন।[১]

অপর এক রিওয়ায়ত মতে, অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় তিনিও তাঁর সাহাবীদের সাথে সেখানে নামায পড়েন।

মসজিদুল ওয়াদী

এটি আইনাইন পর্বতের উত্তরে অবস্থিত।

মাতরী বলেন, সাইয়িদিনা হযরত হামযা (রা)-এর এটিই শাহাদাতস্থল। বর্শাবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি এখানে এসেই ধরাশায়ী হন।[২]

ইবনে শাব্বাহ বর্ণনা করেন, হযরত হামযা (রা) শাহাদাতবরণ করার পরও জবলুর রুমাতের মধ্যে পড়ে থাকেন। পয়গম্বর ﷺ-এর নির্দেশে তাঁর লাশ বতনুল ওয়াদী থেকে বর্তমান কবরের স্থানে নিয়ে এসে দাফন করা হয়।[৩]

কোন কোন আলিম এ মসজিদটিকে মসজিদে আসকরী নামেও অভিহিত করেছেন।[৪]

মসজিদুস সুক্‌য়া

এটি একটি কূয়ার নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণকে গ্রহণ করেন এবং এ স্থানে নামায আদায় করেন, আর

لازقا بالجبل».

১ (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫১; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৭২:

عن جابر، «أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم أحد على عينين الطريب الذي بأحد عند القنطرة».

২ আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫২

৩ (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১৪; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৫-১২৬:

عن الأعرج، قال: «لما قتل حمزة رضي الله عنه أتي إلى موضعه تحت جبل الرماة، وهو الجبل الصغير الذي يخرج من بطن الوادي الأحمر، ثم أمر به النبي ﷺ فحمل من بطن الوادي إلى الربوة التي هو بها اليوم».

৪ আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫২

মদীনাবাসীদের জন্য বরকতের দু'আ করেন।[১]

কোন কোন আলিম এ মসজিদটির উল্লেখ করেননি এবং স্থান নির্ধারণে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সামহূদী বলেন, স্থানটির নির্ধারণে আমি চিন্তিত ছিলাম। এ অবস্থায় মাটির মধ্যে চতুর্দিকে আধা গজ এর দেয়াল দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর লোকেরা একে নতুনভাবে সংস্কার করেন। বর্তমানে ওই মসজিদকে মসজিদে সুক্‌য়া বা মদীনার নিকট মক্কার রাস্তায় অবস্থিত। মক্কা শরীফ থেকে যেসব লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতে আসেন, সর্বপ্রথম তারা এ মসজিদটিরই যিয়ারত করেন। মসজিদটি প্রায় সাত গজ দীর্ঘ এবং সাত গজ প্রস্থ।

এ পর্যন্ত বাইশটি বিখ্যাত মসজিদের উল্লেখ করা হল। এ সমুদয় মসজিদের যিয়ারত করে আল্লাহর বান্দাগণ ধন্য হন। এ ছাড়া আরও কিছুসংখ্যক মসজিদ আছে, যেগুলোর সংখ্যা আনুমানিক চল্লিশে দাঁড়াতে পারে। তবে দিক নির্ণয় ছাড়া ওগুলোর আর কোন বিবরণ জানা যায়নি। ওগুলোর মধ্যে কোন কোন মসজিদের স্থান নির্ধারিত হলেও এতে যিয়ারতকারীদের বিশেষ কোন উপকার হবে না। এ কারণে এ সমুদয় মসজিদের বর্ণনা দেওয়া হল না। সামহূদী ওগুলোরও উল্লেখ করেছেন।

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৫৯

দশম অধ্যায়

সেই সমুদয় কূপসমূহের বর্ণনা যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পদচারণে ধন্য করেছেন

মসজিদের ন্যায় কূপ অনেক রয়েছে, যেগুলোকে হুযূরপাক ﷺ স্বীয় পদচারণে ধন্য করেছেন। এগুলোর মধ্যে এমনও অনেক রয়েছে, যেগুলো ভেঙে গেছে এবং যার নাম-নিশানা পর্যন্ত এখন বিদ্যমান নেই। আবার এমনও অনেক আছে, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান।

সাইয়িদ সামহূদী رحمه الله তাঁর ইতিহাসে বিশটি কূপের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে যেসব কূপের বর্তমানে যিয়ারত করা হয়, ওগুলো হচ্ছে মোট সাতটি। যেমন– কোন কবি তাঁর কবিতায় এভাবে বর্ণনা করেছেন,

إذا رمت آبار النبيّ بطيبة ❁ فعدّتها سبع مقالا بلا وهن

أريس، وغرس، رومة، وبضاعة ❁ كذا بئر، قل بئر حاء مع العهن

'যদি তুমি মদীনা তাইয়্যিবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কূপ সম্পর্কে অবহিত হতে চাও, তবে জেনে রাখ, এদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে সাতটি। যথা– ১. আরিস, ২. গরস, ৩. রূমা, ৪. বুযা'আ, ৫. বুস্‌সা, ৬. বায়রুহা ও ৭. 'ইহন।'[১]

১. বিরে আরীস

আরীস নামক এক ইহুদির নামানুসারে কূপটির নামকরণ করা হয়েছে। এটি কুবা মসজিদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর পানি অতীব সুস্বাদু। বিভিন্ন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ এ কূপের মধ্যে তাঁর থুথু মুবারক নিক্ষেপ করেছেন। যার ফলে এ কূপের পানি সুস্বাদু হয়েছে এর পূর্বে পানি সুস্বাদু ছিল না।

বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه কুবায় যান এবং জনগণ থেকে এ কূপের কথা জিজ্ঞাসা করেন। একজন লোক তাঁকে কূপের নিকট নিয়ে যায়। হযরত আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কূপের নিকট গমন করেন এবং পানি উত্তোলনকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এক বালতি চেয়ে নিয়ে কিছু পানি নিজে পান করেন, আর কিছু পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দেন।

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৭

সেখানে তিনি ওযু করে মৌজার ওপর মাসেহ করেন এবং নামায আদায় করেন।[১]

কেউ কেউ বলেন, এ ঘটনাটি বিরে গরসই ঘটেছিল। বিরে আরীস সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায়।[২]

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন আমি ওযু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের নিমিত্ত ঘর থেকে বের হই। আমি মসজিদে গমন করে তাঁকে তালাশ করলাম। কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ হল না। আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, আজ আমি নিশ্চয়ই তাঁর সান্নিধ্যে থাকবো, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। লোকজন বলল, তিনি এখনই কুবার দিকে চলে গেছেন। আমিও তাঁর পিছনে কুবায় চলে আসলাম। লোকজন থেকে জানতে পারলাম যে, তিনি বিরে আরীসে অবস্থান করছেন। আমিও সেখানে চলে যাই এবং দরজার নিকটস্থ বৈঠকখানায় বসে যাই। দেখতে পেলাম, তিনি ইসতিনজা শেষে ওযু করলেন। এরপর আমি অভ্যন্তরে গমন করে দেখতে পাই যে, তিনি হাঁটুর নিম্নভাগ খোলা অবস্থায় কদম মুবারক কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে সালাম করে আবার দরজায় ফিরে আসলাম। আমি মনস্থ করলাম যে, আজ আমি তাঁর দারোয়ান হিসেবে থাকবো। কিছুক্ষণ পর দেখি হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে? বললেন, আবু বকর। আমি বললাম, একটু থামেন। আমি জিজ্ঞেস করে আসি। হুযূর ﷺ-এর দরবারে গিয়ে আরজ করলাম, আবু বকর (রা.) এসেছেন এবং প্রবেশের অনুমতি তলব করেছেন। ইরশাদ করলেন, 'অনুমতি দিয়ে দাও এবং সাথে সাথে বেহেশতেরও সুসংবাদ দাও।' আমি তাঁকে এ সুসংবাদ প্রদান করলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণে পা ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁর ডান পাশে কূপের পাড়ে বসে গেলেন। আমি পুনরায় দরজায় এসে বসে যাই। বসে বসে আমি আমার ভাইয়ের প্রতীক্ষা করছিলাম, যাকে আমি ওযু করা অবস্থায় বাড়িতে রেখে এসেছি। আমি ভাবছিলাম, আহা! এ সময়ে যদি আমার ভাই এখানে এসে যেত, হয়তো তিনিও বেহেশতের সুসংবাদ পেয়ে যেতেন। কেননা এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এক বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছে। এমন সময়

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৩; (খ) আল-বারযানী, *বাসাতিমুল মুহাররাত ওয়া যাদিয়াতু আখবারি মাসাজিদিল হারামাইন*, খ. ৬, পৃ. ১৩৬, হাদীস: ২৩৮০:

عن يحيى بن سعيد أنه حدثه، أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسألهم عن بئر هناك، قال: فدللته عليها،
فقال: لقد كانت هذه، وإن الرجل لينضح على حماره فتنزح فتستسقي منها، فجاء رسول الله ﷺ وأمر
بذنوب فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه ثم أمر به فأهريق في البئر، قال: فأخرجت بعضه، قال:
فأخرجته فرأيته بال، ثم جاء فتوضأ، ومسح على خفيه ثم صلى.

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৩

হযরত উমর (রা.) এসেছেন এবং প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন। ইরশাদ করলেন, 'আসতে বল এবং বেহেশতের সুসংবাদ দাও।' আমি অনুমতি এবং বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করি। তিনি ভেতরে এসে হুযূরপাক ﷺ-এর ডানপাশে কূপের পাড়ে তাঁর অনুকরণে বসে গেলেন। আমি আবার আমার ভাইয়ের কথা চিন্তা করছিলাম, এমন সময় হযরত উসমান (রা.) এসে উপস্থিত। হযরত উসমান (রা.)-এর সংবাদও আমি তাঁর নিকটে পৌঁছে দিলাম। ইরশাদ করলেন, 'তাঁকে আসতে বল এবং বেহেশতের সুসংবাদ দাও। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর মাথার ওপর আগত একটি বিপদেরও সংবাদ দাও।' আমি গিয়ে তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ ও বিপদের খবর প্রদান করলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন, যে দিকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) উপবিষ্ট, সেদিকে স্থান অসংকুলান। সুতরাং তিনি অপর পাশে বসে যান।[১]

সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম ﷺ-এর হস্ত মুবারকে যে একটি আংটি শোভা পেত। তাঁর ইন্তিকালের পর আংটিটি পর্যায়ক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর পর হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। একদিন তিনি এ কূপের পাড়ে বসে তাঁর অভ্যাস মতো আংটিটি আঙ্গুলের মধ্যে নাড়াচাড়া দিচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আংটিটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। কূপের মধ্যে তিন দিন যাবৎ তল্লাশি চালিয়েও আংটিটি উদ্ধার করা যায়নি।[২]

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, আংটিটি হযরত উসমান (রা.)-এর মু'আইকীব নামক গোলামের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।[৩]

হাদীস শাস্ত্রবিদদের নীতি অনুযায়ী উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। উক্ত আংটিটি কূপের মধ্যে পতিত হওয়ার ঘটনা খিলাফতের ষষ্ঠ বর্ষে সংঘটিত হয়। এ আংটিটি যেদিন হারিয়ে যায়, সেদিন থেকে তাঁর রাজত্বের মধ্যে দুর্যোগ নেমে আসে। যেমন– হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আংটি হারিয়ে যাবার পর তাঁর হুকুমতের মধ্যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল।

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২০-১২১; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬৮, হাদীস: ২৯ (২৪০৩)

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২১; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৫৮৭৯:

عن أنس قال: كان خاتم النبي ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان
عثمان جلس على بئر أريس، قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع
عثمان فننزح البئر فلم نجده.

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৬৫৬, হাদীস: ৫৫ (২০৯১); হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত

কেউ কেউ বলেন, যে কূপটি হযরত উসমান رضي الله عنه সাদকা করে দিয়েছিলেন, তা অন্য কূপে ছিল। সেই কূপের মধ্যে তাঁর অংশ ছিল। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নযীরের মাল থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ رضي الله عنه চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা খরিদ করে উম্মাহাতুল মুমিনীনের জন্য দান করেন।[1]

কথিত আছে যে, বিরে আরীসের নিচে নামবার জন্য সিঁড়ি ছিল। এই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ওযু করা যেত। ৭১৪ হিজরীতে কূপটিকে সংস্কার করা হয়। বর্তমানে সেখানে যাতায়তের রাস্তা বন্ধ। কূপের ইমারত পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না।

কথিত আছে যে, রোম দেশীয় একজন লোকের এক মুনাফিক গোলাম ছিল। সে এলাকায় তার একটি বাগান ছিল। সে দুষ্ট লোকটি হযরত ﷺ-এর নিদর্শনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মানসে কূপটির দিকে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয় এবং ইমারত ধ্বংস করে দেয়।

কোন কোন উরদু অনুবাদক লিখেছেন যে, সম্ভবত হযরত শায়খ رحمه الله (কিতাব প্রণেতা)-এর যমানায় কূপের এ অবস্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে ১২৭৬ হিজরীতে সেখানে ইমারত পরিদৃষ্ট হয়েছে এবং চতুর্দিকে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে।

২. বিরে গরস

শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরযাবাদী رحمه الله বলেন যে, গরস শব্দটি রা হরফে সাকিন এবং যবর উভয় রূপ ব্যবহৃত হয়। তিনি আরও বলেন, কোন কোন মদীনাবাসীকে আমি গাইন হরফটির ওপর পেশ পড়তেও শুনেছি। কিন্তু যবরই সঠিক। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বৃক্ষ বা চারা রোপণ করা।

এ কূপটি মসজিদে কুবার উত্তর-পূর্ব দিকে অর্ধেক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। কূপটি গরস নামক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় কূপটি এ নামে অভিহিত হয়। কূপটি অতি বৃহৎ এর পরিধি চল্লিশ হাত থেকেও বেশি এবং পানি খুব বেশি। পানির রং সবুজ প্রায়। ৮৮২ হিজরীতে কূপটি সংস্কার সাধিত হয়।[2]

বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ এ কূপের পানি দ্বারা ওযু করেছেন এবং অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন।

ইবনে হিব্বান বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বিরে গরসের পানি আনয়ন করতেন এবং বলতেন,

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২০–১২১

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৩

আমি রাসূলে খোদা ﷺ-কে এর পানি পান করতে এবং ওযু করতে দেখেছি।[1]

ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুজাম্মি' থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি বেহেশতের একটি কূপের নিকট সকাল করেছি।' এরপর তিনি সকালে বিরে গরসের নিকট গমন করেন এবং সেখানকার পানি দ্বারা ওযু করে থুথু মুবারক পানিতে নিক্ষেপ করেন। একজন লোক তাঁকে কিছু মধু উপহার দেন। তিনি তাও পানির মধ্যে ঢেলে দেন।[2]

ইমাম ইবনে মাজাহ رحمه الله উত্তম সনদ-সহকারে বর্ণনা করেন যে, হযরত ﷺ ওয়াসীয়ত করেন যে, 'আমার ইন্তিকালের পর আমাকে বিরে গরসের সাত মশক পানি দ্বারা গোসল দিও।' তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ও এ কূপের পানি পান করেছেন।[3]

আরও বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরম ﷺ হযরত আলী رضي الله عنه-কে বলেছেন যে, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে বিরে গরসের এমন সাত মশক পানি দ্বারা গোসল দিও যার মুখ কেউ খোলেনি।'[4]

হযরত ইমাম বাকির رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁকে বিরে গরসের পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয়েছে। তিনি তার জীবদ্দশায়ও এ কূপের পানি পান করতেন।[5]

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৩; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সিকাত*, খ. ৫, পৃ. ৫০, হাদীস: ৩৮০৪:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُنَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: ثُمَّ قَالَ: اسْقُونِي مِنْ مَاءٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأُ.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; (খ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দুররাতুস সামীনা ফী আখবারিল মাদীনা*, পৃ. ৬১:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ أَنِّي أَصْبَحْتُ عَلَى بِئْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ»، فَأَصْبَحَ عَلَى بِئْرِ غَرْسٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَبَزَقَ فِيهَا، وَأُهْدِيَ لَهُ عَسَلٌ فَصَبَّهُ فِيهَا، وَغُسِّلَ بِهَا حِينَ تُوُفِّيَ.

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৪৭১, হাদীস: ১৪৬৮:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ».

[4] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪:

عَنْ عَلِيٍّ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ بِسَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ».

৩. বিরে রুমা

এটিও একটি বড় কূপ। মসজিদে কিবলাতাইনের উত্তরে 'আকীক' নামক উপত্যকায় এটি অবস্থিত। এর পানি কত যে সুস্বাদু তা বর্ণনাতীত।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«نِعْمَ الْقَلِيبُ قَلِيبُ الْمُزَنِيِّ».

'মুযনী (রুমা) খুবই উৎকৃষ্ট কূপ।'[2]

কূপটির মালিক ছিল রুমা। তাকেই মুযনী বলা হয়েছে। হযরত উসমান ﷺ তার নিকট থেকে কূপটি খরিদ করে আল্লাহর নামে সাদকা করে দেন। বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত উসমান ﷺ এ কূপটি সম্পর্কে হাদীস শুনেন, তখন তিনি একশ উটের বিনিময়ে এর অর্ধেকাংশ খরিদ করে সাদকা করে দেন। পরবর্তীতে যখন কূপের মালিক দেখতে পায় যে, কূপের নিকটে লোকজনের অতিরিক্ত ভীড়ের কারণে তার অর্ধেকাংশের পানি উত্তোলন করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তখন তিনি বাকি অর্ধেকাংশও স্বল্প মূল্যে হযরত উসমান ﷺ-এর নিকট বিক্রি করেন।[3]

ইবনে শাব্বাহ ﷺ ইমাম যুহরী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ يَشْتَرِي رُومَةَ يَشْرَبُ رُوَاءً فِي الْجَنَّةِ».

'যে ব্যক্তি রুমা কূপটি খরিদ করে সদকা করে দেবে, তিনি বেহেশতের মধ্যে তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানীয় দ্রব্য পান করতে পারবে।'

হযরত উসমান ﷺ হাদীসটি শ্রবণের পর কূপটি করিদ করে চদকা করে দেন।[4]

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*... *আত-তারাজুমুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ২২৮৯:

عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: غسل النبي ﷺ ثلاث غسلات بماء وسدر، وغسل في قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس لسعد بن خيثمة بقباء، وكان يشرب منها.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৩; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৫৫; হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ﷺ থেকে বর্ণিত

[3] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৬

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৫৪:

عن الزهري، أن النبي ﷺ قال: «من يشتري رومة يشرب رواء في الجنة»، فاشتراها عثمان ﷺ بن عفان فتصدق بها.

ইমাম বগবী বশীর আসলমী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুজাহিদগণ অধিকহারে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মদীনা নগরীতে মিঠা পানির খুবই অভাব ছিল। গিফার গোত্রের একজন লোকের নিকট বীরে রুমা নামক একটি কূপ ছিল। সে এক মশক পানি এক সের খাদ্যের পরিবর্তে বিক্রি করত। একদিন হযরত ﷺ লোকটিকে বললেন, 'তুমি বেহেশতের একটি কূপের পরিবর্তে এ কূপটি বিক্রি কর।' লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কূপটি ব্যতীত আমার এবং আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের অপর কোন উপায় নেই। হযরত উসমান ﷺ একথা শুনে পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে সেই কূপ খরিদ করে মুসলমানের জন্য ওয়াকফ করে দেন।[1]

ইবনে আবদুল বর বলেন, এ কূপটি একজন ইহুদির মালিকানায় ছিল। সে মুসলমানদের নিকট এর পানি বিক্রয় করত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কূপটি খরিদ করার জন্য লোকদের উৎসাহিত করেন এবং এর খরিদদারদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দেন, তখন হযরত উসমান ﷺ কূপটির অর্ধেকাংশ বার হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেন। যখন উক্ত ইহুদি তা অর্ধেকাংশের পানি ব্যবহারে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন সে তার বাকি অংশটুকুও আট হাজার দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয়।[2]

নাসায়ী এবং তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, যখন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান ﷺ-কে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদেরকে খোদা এবং দীন ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, তোমরা কি অবগত আছ, যখন নবী করীম ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনা শরীফে বীর রুমা ব্যতীত অপর কোন স্থানে মিঠা পানি ছিল না। এ অবস্থায় হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি বীরে রুমা খরিদ করে সদকা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে তাকে অনুরূপ কূপ দান

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭; (খ) আল-বাগভী, *মু'জামুস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ২৯৩–২৯৪, হাদীস: ১১১, (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ৪১, হাদীস: ১২২৬:

عن بشير الأسلمي، قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له رسول الله ﷺ: «بعنيها بعين في الجنة»، فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها، لا أستطيع ذلك، فبلغ ذلك عثمان ﷺ، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثل الذي جعلته له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: «نعم»، قال: قد اشتريتها، وجعلتها للمسلمين.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৮; (খ) ইবনে আবদুল বর, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ৩, পৃ. ১০৩৯–১০৪০

করবেন।' তখন আমি কূপটি খরিদ করে ধনী, গরীব এবং মুসাফিরের জন্য ওয়াকফ করে দিই।[1]

আর যখন হুযূর পাক ﷺ বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি তবুক যুদ্ধের অভাবগ্রস্থ মুজাহিদদের অস্ত্র ও খাদ্য ইত্যাদির অভাব পূরণ করে দেবে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' তখন আমি মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামানা সরবরাহ করি। তখন বিদ্রোহীরা বলল, আমরা এগুলো অবগত আছি। এ ছাড়া অপরাপর আরও সহীহ রিওয়ায়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

এ কূপটি জাহিলিয়াতের যুগ থেকে বিদ্যমান ছিল। পরে কিন্তু ভেঙে যাওয়ার পর ৭৫০ হিজরীতে কূপটির সংস্কার সাধিত হয়। কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে,

«مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ».

'যে ব্যক্তি বীরে রূমাকে খনন করে দেবে, তার জন্য বেহেশত।'[2]

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, তখনকার দিনেও কূপটি খননের প্রয়োজন ছিল।

৪. বিরে বুযা'আ

মদীনা মুনাওয়ারার শামী দরজার নিকটে এ কূপটি অবস্থিত। এ দরজা থেকে বের হয়ে সাইয়্যিদিনা হযরত হামযা رضي الله عنه-এর মাযার যিয়ারতে যান, তবে কূপটি ডান পাশে থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর ﷺ বীরে বুযা'আর নিকটে আগমন করে এক বালতি পানি চেয়ে নিয়ে ওযূ করেন এবং অবশিষ্ট পানি তাঁর থুথু মুবারকসহ কূপে নিক্ষেপ করেন। হযরত ﷺ-এর জমানায় কেউ রোগাক্রান্ত হলে

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬২৭, হাদীস: ৩৭০৩, (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৬, পৃ. ২৩৫, হাদীস: ৩৬০৮, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান رضي الله عنه বলেন,

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ؟ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟» فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৯; (খ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫, হাদীস: ৪৪৪৭, হযরত আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

তাকে শিফা দান করতেন।[1]

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হত, আমরা তাকে তিন দিন এ কূপের পানি দ্বারা গোসল দিতাম, এতে সে আরোগ্য লাভ করত।[2]

আবু দাউদ, আহমদ এবং তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, একদিন লোকেরা হযরত ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার জন্য বীরে বুযাআর পানি আনা হয়, অথচ এ কূপের অবস্থা এই যে, এ কূপের মধ্যে কুকুরের গোস্ত, স্ত্রীলোকদের ঋতুকালীন নাপাক কাপড়-চোপড় এবং অপরাপর নাপাকীসমূহ এসে নিক্ষিপ্ত এবং নিপতিত হয়। তিনি ইরশাদ করলেন, 'পানি পাক, একে কোন কিছু নাপাক করে না।'[3]

ইমাম নাসায়ী رحمه الله হযরত আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, একদিন আমি হুযূর পাক ﷺ-এর দরবারে হাযির হই। আমি দেখতে পাই যে, তিনি বীরে বুযাআর নিকটে বসে ওযু করছেন। আমি আরজ করলাম, আপনি এ পানি দ্বারা ওযু করছেন? এতে তো বিভিন্ন প্রকারের নাপাক বস্তু নিপতিত হয়। ইরশাদ করলেন,

«الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

'পানি পবিত্র, কোন বস্তু একে অপবিত্র করে না।'[4]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ رضي الله عنه রিওয়ায়াত করেন যে, হযরত ﷺ এ কূপের মধ্যে থু থু মুবারক নিক্ষেপ করেছেন, এর পানি পান করেছেন এবং

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৮–১২৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৫৭, (গ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৬, পৃ. ২৩৫, হাদীস: ৩৬০৮

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৮–১২৯

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৮; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ১৭, পৃ. ৩২৮–৩২৯, হাদীস: ১১২৫৭, খ. ১৮, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ১১৮১৫, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ১১৮১৮, (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামিউল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৯৫–৯৬, হাদীস: ৬৬, (ঘ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৭৪, হাদীস: ৩২৬:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ؟ قَالَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

[4] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৮; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৭৪, হাদীস: ৩২৭:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ؟ فَقَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

বরকতের জন্য দু'আ করেছেন।[১]

আবু উসাইদ رضي الله عنه বীরে বুযাআর মালিক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বীরে বুযাআর মধ্যে হযরত ﷺ থু থু মুবারক নিক্ষেপের পর থেকে আমরা এর পানি তাবাররুক হিসাবে পান করতাম। বাগানের মধ্যে বীরে বুযাআ অবস্থিত, একদিন সেখানে এক অপরিচিত লোক এসে বাগানের কিছু ফল নিয়ে যায়। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে এর অভিযোগ পেশ করি। তিনি ইরশাদ করলেন, 'সে মরু এলাকার ভূত, যে তোমার বাগানের ফল চুরি করে নিয়ে যায়। যদি এরপর আবার কখনও চুরি করতে দেখ, তবে তাকে বলবে অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি, আমার জন্য আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।' নবী করীম ﷺ-এর ফরমান মোতাবেক আবু উসাইদ যখন উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেন তখন ভূত বলে উঠল, হে আবু উসাইদ! আমার দোষ মার্জনা কর, আমাকে দরবারে মুহাম্মদী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যেয়ো না। আমি আর কখনো এ বাগানে প্রবেশ করব না। আমি তোমাকে এমন একটি আয়াত শিক্ষা দিচ্ছি, যার বরকতে তুমি এবং তোমার পরিবারবর্গ দুঃখ-কষ্ট এবং আপদ বলা থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। উক্ত আয়াতটি হল আয়াতুল কুরসী। যখন আমি হুযুর পাক ﷺ-এর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করি, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'সে যা বলেছে, সত্যই বলেছে, তবে সে নিষ্ঠুর।'[২]

হায়সমী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, তবে কেউ কেউ দুর্বল বলেও উল্লেখ করেছেন।[৩]

বর্তমানে কূপটি লোকের বাগানে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে গমনাগমন দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কূপটি জান্নাতুল বাকীর নিকটে অবস্থিত। যদি কোন লোক জান্নাতুল বকী' থেকে কুবা মসজিদে গমন করে, তবে কূপটি তার বাম পাশে থাকে।

৫. বিরে বুস্সা

ইবনে আদী رحمه الله হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং ইরশাদ করলেন, 'তোমার কাছে কুল আছে কি'? আজ জুমাবার, মাথা ধোয়ে নেবে। আমি বললাম হ্যাঁ। আমি কুল নিয়ে তাঁর খিদমতে হাজির হই এবং তাঁর সাথে বীরে

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৫৭

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৯; (খ) আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ*, খ. ৬, পৃ. ৩২২-৩২৩, হাদীস: ১৭৮৭৬, (গ) আত-তবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৪০১১

[৩] আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ*, খ. ৬, পৃ. ৩২২-৩২৩

বুস্সাতে যাই। সেখানে তিনি মস্তক মুবারক ধোয়ে নেন। তিনি তাঁর মস্তক বিধৌত পানি বীরে বুযাআতে ঢেলে দেন। এ কূপে সিঁড়ি আছে এবং পানি অতি নিকটে।[১]

৬. বিরে হাআ

হাদীসের ব্যাখ্যা দানকারী মুহাদ্দিসগণ এ শব্দটির বিভিন্নরূপ তাহকীক করেছেন। তবে বীরে হাআই সমধিক উল্লেখযোগ্য। 'হাআ' নামক কোন পুরুষ অথবা কোন স্ত্রীলোকের নামানুসারে কূপটির এ নামকরণ করা হয়। এ কূপটি মসজিদে নববীর উত্তর দিকে কিল্লার দেয়ালের সন্নিকটে অবস্থিত। যদি কিল্লার দেয়ালের আড়াল না থাকত, তবে মসজিদে নববী থেকে এ কূপে যাতায়তের পথ খুবই নিকটবর্তী হত।

বর্ণিত আছে যে, 'নবী করীম ﷺ প্রায় সময় এখানে পদার্পণ করতেন এবং সেখানকার বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করতেন। আর কূপের পানি পান করতেন।'[২]

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত আবু তালহা رضي الله عنه-এর অনেক সম্পদের মধ্যে তাঁর নিকট বীরে হাআই সর্বাধিক প্রিয় ছিল। নবী করীম ﷺ সেখানে পদার্পণ করতেন এবং কূপের পানি পান করতেন।'[৩]

হযরত আবু তালহা رضي الله عنه স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের জন্য কূপটি সদকা করে দেন। হযরত হাসসান رضي الله عنه এবং হযরত ওবাই رضي الله عنه তাঁর নিকটতম আত্মীয় ছিলেন। যখন হযরত হাসসান তাঁর অংশ বিশেষ হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه-এর নিকট বিক্রি করেন, তখন কূপের অপরাপর অংশীদারগণ তাঁকে বললেন, তুমি কেন আবু তালহা رضي الله عنه-এর সদকাকে বিক্রি করলে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার অংশ বিক্রি করব না কেন? যখন তিনি এ সাআ অর্থাৎ পৌনে দুই সের খেজুর কয়েক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه সেখানে একটি দালান নির্মাণ করেন, সেখানে পূর্বে জদীলা গোত্রের মহল ছিল।[৪]

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১২৭

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৮, হাদীস: ২৭৫৮; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৩২; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ৩৭, হাদীস: ৪৫৫৪; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَخْلًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ
الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ

[৪] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৩২; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৮, হাদীস: ২৭৫৮; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ∎

আবু মনসুরও সেখানে দালান নির্মাণ করেন। বর্তমানে কূপটি একটি ছোট বাগানে অবস্থিত। সেখানে একটি মসজিদও রয়েছে। কূপের পানি অতিশয় সুস্বাদু এবং বাতাস খুবই আনন্দদায়ক।

৭. বীরে ইহন

এ কূপটি আওয়ালিয়ে মদীনায় মসজিদে কুবার পূর্ব দিকে এক ভদ্র লোকের বিরাট বাগানে অবস্থিত। এখানে বিপুল ক্ষেত ও বৃক্ষরাজি দেখা যায়। স্থানটি খুবই মনোরম। হুযূর পাক ﷺ এখানে পদার্পণ করেছেন এবং ওযু করে নামায আদায় করেন।

এ ছাড়া অপরাপর যে সমুদয় কূপ, ঝর্ণা, সম্পদ, সদকাত এবং বিভিন্ন মসজিদসমূহ হুযূর পাক ﷺ-এর পদার্পণে ধন্য হয়েছে। আর সেসবের বর্ণনা মদীনা তাইয়্যিবার ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এ কিতাবের পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এখানে এর বর্ণনা বাদ দেওয়া হলো।

মদীনা শরীফের মধ্যে আজকাল যে সমুদয় ঝর্ণাসমূহ প্রবাহমান এবং লোকের উপকার সাধিত হচ্ছে, এসবের মধ্যে যরকা নামক ঝর্ণাটি কুবা এলাকার খেজুর বাগান থেকে নির্গত হয়েছে। যে সময়ে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার প্রশাসক ছিলেন, তখন তিনি হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه-এর নির্দেশে এ ঝর্ণাটিকে জারি করে দেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসেন। এর পানি যে কতদূর সুস্বাদু তা পান না করলে বোঝা যাবে না।[১]

৮. ওয়াদিয়ে আকীক

বিখ্যাত এবং পবিত্র উপত্যকাসমূহের মধ্যে (ওয়াদিয়ে আকীক) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাদীসে নববীতে এর ফযীলতসমূহ বর্ণিত আছে। এ ছাড়াও আরবী কবিতায়ও এর অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– কোন কবি বলেছেন,

يَا صَاحِبِيَّ هَذَا الْعَقِيقُ فَقِفْ بِهِ * مُتَوَالِهًا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِوَالِهِ

'হে আমার বন্ধু! এই যে ওয়াদিয়ে আকীক'। তুমি এখানে অভিভূত হয়ে দাঁড়াও, যদি তুমি এর পূর্বে অভিভূত না হয়ে থাক।'

শায়খ আবদুল হাদী সূদী বলেন

حي العقيق ودمع جفنك مطلق * قد بدا الحسن البديع المطلق

«تَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ، قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ، قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ».

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮

'এ যে আকীক উপত্যকা। এখানে তোমার চোখের জল নির্বিঘ্নে ঝরছে। এতে অপূর্ব এবং অনবদ্ধ সৌন্দর্য প্রকাশ পাচ্ছে।'

قد صادني فيه غزال أحور * تبدت عنه واشتياقي مطلق

'এখানে আমাকে এক অতি সাদা এবং অতি কালচোখ বিশিষ্ট হরিণ শিকার করেছে। সে আমাকে আবদ্ধ করে ফেলেছে, অথচ প্রেম ও ভালোবাসা সীমাবদ্ধ নয়।'

আবদুস সালাম ইবনে ইউসুফ বলেন,

عَلَى سَاكِنِ الْبَطْنِ الْعَقِيقِ سَلَامٌ * وَإِنْ أَسْهَرُونِي بِالْفِرَاقِ وَنَامُوا

حَظَرْتُمْ عَلَيَّ النَّوْمَ وَهُوَ مُحَلَّلٌ * وَحَلَّلْتُمُ التَّعْذِيبَ وَهُوَ حَرَامٌ

'আকীক উপত্যকার বাসিন্দাদের ওপর আমার সালাম। যদিও বা তারা আমাকে বিরহ-বেদনার শোকে জাগ্রত রেখেছে এবং তারা নিদ্রা-সুখে বিভোর হয়েছে। নিদ্রা হালাল হওয়া সত্ত্বেও তোমরা নিদ্রাভিভূত হয়ে অন্যায় করেছ। তোমরা যাতনা দেওয়াকে বৈধ মনে করেছ, অথচ তা অবৈধ।'[১]

সহীহ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত ﷺ-কে ওয়াদিয়ে আকীক সম্পর্কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, 'আজ রাতে আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে বললেন,

«صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ».

'আপনি ওয়াদিয়ে আকীকে নামায পড়ুন।'[২]

অপর একটি হাদীসে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে,

«الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ».

'আকীক একটি বরকত বিশিষ্ট উপত্যকা।'[৩]

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ২০২

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৫; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৩৫, হাদীস: ১৫৩৪; (গ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৪৮
عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: ...».

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৪৮: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «...»

হযরত আনাস ইবনে মালিক ؓ থেকে বর্ণিত যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ওয়াদিয়ে আকীকে গমন করি। তিনি ইরশাদ করলেন, 'হে আনাস! এ ওয়াদী থেকে এক লোটা পানি নিয়ে এসো। আমি এ ওয়াদিকেও ভালোবাসি।'[1]

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' ؓ বলেন, আমি বন্যজন্তু শিকার করতাম এবং তাঁকে গোস্ত হাদিয়া দিতাম। একদিন আমি হযরতের নিকট হাজির হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে'? আমি বললাম, শিকার করতে গিয়েছিলাম। ইরশাদ করলেন, 'যদি পূর্ব থেকে জানা থাকত, তবে আমিও তোমার সাথে ওয়াদিয়ে আকীক পর্যন্ত গমন করতাম।'[2]

ওয়াদীয়ে আকীকের প্রবাহমান পানি মদীনা মুনাওয়ারার কিবলার দিকে যায়। কুবা এবং ওয়াদিয়ে আকূকের মধ্যে একদিনের রাস্তার ব্যবধান, বরং এর চেয়েও বেশি। ওখান থেকে পানির ঢল যুলহুলাইফা হয়ে বীরে রুমার পশ্চিম দিক দিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছে এ উপত্যকার ঢল সম্পর্কে যেসব কাহিনী বর্ণিত আছে, তা আশ্চর্যজনক।

---

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৬:

عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي العقيق، فقال: يا أنس! خذ هذه المطهرة املأها من هذا الوادي، فإنه يحبنا ونحبه.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৮৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৪৭:

عن سلمة بن الأكوع ؓ، قال: كنت أصيد الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله ﷺ، ففقدني فقال: يا سلمة! أين كنت؟ فقلت: يا رسول الله! تباعد الصيد، فأنا أصيد بصدور قناة نحو ثيب، فقال: لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا خرجت، وتلقيتك إذا جئت.

একাদশ অধ্যায়
মক্কা এবং মদীনার রাস্তায় বিদ্যমান কয়েকটি বিশেষ মসজিদের বর্ণনা

পবিত্র সীরাত ও ইতিহাস বিশারদ আলিমগণ হুযূর পাক ﷺ তাঁর বিভিন্ন সফরে এবং যুদ্ধের সময় কোথায় কি কাজ করেছেন, এসব যাবতীয় বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আজকাল উক্ত নিদর্শনসমূহের অনেক কিছু নিশ্চিহ্ন ও অজানার অতল গর্ভে নিমজ্জিত হলেও অনেক নিদর্শনের সন্ধানও পাওয়া যায়, যেগুলোর যিয়ারত করে মানুষ ধন্য হয়। এ স্থলে সেই সমুদয় মসজিদসমূহের ওপর কিছু আলোকপাত করা হল যা মক্কা-মদীনার রাস্তায় অবস্থিত।

মসজিদে যুল-হুলাইফা

মক্কা ও মদীনার রাস্তায় যে সব মসজিদসমূহ বিদ্যমান, এ মসজিদটি এর মধ্যে অন্যতম। একে মসজিদুশ শজরাও বলা হয়।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ এখানে নামায আদায় ও রাত যাপন করেন।[1]

প্রথমবার উমরা আদায় করতে যাবার সময়, দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে যাবার সময় তিনি সেখানে বাবুল নামক বৃক্ষের তলে উপবেশন করেছিলেন। তিনি এখানে নামায আদায় ও রাত যাপন করেন। এখানেই তিনি ইহরাম বাঁধেন। মদীনাবাসীদের জন্য এটিই ইহরাম বাঁধনস্থান। এখানে একটি বড় মসজিদ ছিল, যা কালক্রমে ভেঙে যাওয়ার পর ৬৮১ হিজরীতে পুনরায় নির্মিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যবর্তী স্তম্ভের নিকট নামায আদায় করেন এবং বাবুল বৃক্ষটিও এ স্থানে ছিল।[2]

মসজিদে মুআররস

মতরী বলেন, মসজিদুস শজরার কিবলার দিকে এক তীর পরিমাণ ব্যবধানে আরও একটি ছোট মসজিদ আছে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে নামায পড়েছেন।

সামহূদী বলেন, এ ছোট মসজিদটিকে মসজিদে মুআররস বলা হয়।

---

[1] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৮৯, হাদীস: ৩৩ (১১৮৮); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৯-১৬০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম ﷺ কোন কোন যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এখানে রাত যাপন করতেন।

মসজিদে শরফুর রওহা

'রওহা' একটি স্থানের নাম। এটি মদীনা শরীফ থেকে ৪১ মাইল এবং মুসলিম শরীফের রিওয়ায়ত মতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। রওহা থেকে মদীনা মুনাওয়ারের দিকে একটি প্রবাহমান উপত্যকা রয়েছে। শরফুর রওহার নিকট একটি মসজিদ আছে, যা মক্কা থেকে মদীনার দিকে গমনকারীর ডান পাশে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ উক্ত স্থানে নামায পড়েছেন।[১]

তাঁর ইন্তিকালের পরবর্তীতে এ উপত্যকায় দালান নির্মিত হয়েছে এবং ঝর্ণা ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। মদীনার প্রশাসকের তরফ থেকে এখানে একজন শাসক নিযুক্ত করা হত। এ উপত্যকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে অনেক কবিতা ও কাহিনী এখন বিদ্যমান আছে। তাদের অনেক নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কাফেলা চলাচলের পথে এ উপত্যকার বাসিন্দাদের একটি পুরাতন কবরস্থান আছে সামহূদী বলেন, জনগণ এ কবরসমূহকে শহীদের কবর মনে করে। সম্ভবত আহলে বাইতের যেসব লোক জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন, এগুলো তাঁদেরই কবর।

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ ওয়াদিকে 'ওয়াদিয়ে বনী সালিম' বলা হত। বনী সালিম হিজাযের একটি গোত্র ছিল। এখন কিন্তু তাদের কোন নাম-নিশানা নেই। বন্যার পানিতে এরা সব ধ্বংস হয়ে গেছে।[২]

এ স্থানে 'যবলে ওয়ারকান' নামে একটি পাহাড় আছে। এটি 'আরকুয যাবয়া' নামেও অভিহিত। বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি তাঁর সর্বপ্রথম ইসলামী জিহাদ গযওয়ায়ে আবওয়ায় গমনের প্রাক্কালে রওহার আরকুয যাবয়ায় পৌঁছেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা যবলে ওয়ারকানের নাম কি জান? এর নাম হচ্ছে হামত।' এরপর তিনি দু'আ করেন,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَبَارِكْ لِأَهْلِهِ فِيْهِ».

'হে আল্লাহ! আপনি এখানে এবং এখানকার বাসিন্দাদের ওপর বরকত নাযিল করুন।'

পুনরায় তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা এ ওয়াদির নাম সম্পর্কে অবগত আছ কি? এর নাম সাজাসিজ।' এটি বেহেশতের ওয়াদিসমূহের মধ্যে অন্যতম

[১] আল-বুখারী, [illegible], খ. ১, পৃ. ১০৪, হাদীস: ৪৮৩
[২] আস-সামহূদী, [illegible] দারিল মুস্তফা, খ. ৩, পৃ. ১৯৭ [illegible]

ওয়াদি। আমার পূর্বে এখানে ৭০ জন পয়গাম্বর নামায পড়েছেন। হযরত মূসা ইবনে ইমরান عليه السلام ৭০ হাজার বনি ইসরাইলসহ এখানে অবতরণ করেছিলেন। তিনি দুটো আবা (জামা বিশেষ) পরিহিত এবং ধূসর রংয়ের উষ্ট্রের ওপর সওয়ার ছিলেন। যতদিন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম عليه السلام উমরা অথবা হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে এ ওয়াদি অতিক্রম করবেন না, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[১]

আবু ওবায়দা বকরী বলেন, হযরত ﷺ-এর পিতামহ মুযর ইবনে নাযারের কবর রাওহায় অবস্থিত।

মসজিদে গযালা

'রাওহা' উপত্যকা পাহাড়ের কিনারায় একটি মসজিদ আছে, যাকে 'মসজিদে গযালা' বলা হয়। মদীনা থেকে গমনের পথে ডান পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে নামায আদায় করেছেন। এখানে 'নাযিয়া' নামক একটি বিশেষ স্থান আছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما সেখানে অবতরণ করতেন এবং বলতেন,

«هٰذَا مَنْزِلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

'এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবতরণের স্থান।'

সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। হযরত ইবনে উমর رضي الله عنهما সেখানে অবতরণ করতেন। আর ওযু করে এর অবশিষ্ট পানি ওই বৃক্ষের গোড়ায় ফেলে দিতেন এবং বলতেন,

«هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ».

'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।'

এ মসজিদ পর্যন্ত আসার পর যে সড়ক দিয়ে হুযুর পাক ﷺ মক্কা শরীফ গমন করতেন, তিনিও অনুরূপভাবে সে সড়ক দিয়ে মক্কা শরীফ যেতেন। সড়কটি

[১] আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ. ১৭, পৃ. ১৬, হাদীস: ১৫:

عن عمرو بن عوف، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ أول غزوة غزاها الأبواء، حتى إذا كنا بالروحاء نزل بعرق الظبية، فصلى، ثم قال: «هل تدرون ما اسم هذا الجبل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبل من جبال الجنة، اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه»، وقال للروحاء: «هذه سجاسج واد من أودية الجنة، لقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبيا، ولقد مر بها موسى عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء في سبعين ألفا من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق، ولا تقوم الساعة حتى يمر بها عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرا، أو يجمع الله له ذلك».

মসজিদের বামে অবস্থিত। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ যখন হজ্জ অথবা উমরা উপলক্ষে মক্কা শরীফ যেতেন, তখন এ রাস্তা দিয়েই যেতেন। এ কারণে একে 'নবীগণের রাস্তা' বলা হয়। এ রাস্তায় 'বীরুস সুকয়া' নামক একটি কূপ আছে যা 'হারশা' নামক একটি পাহাড়ের কিনারায় অবস্থিত। এ রাস্তার ডান দিকে বর্তমানে আরো একটি নতুন রাস্তা চালু হয়েছে।[1]

উল্লেখ্য যে, সীরাত এবং ইতিহাস বিশারদ আলিমগণ উল্লিখিত মসজিদসমূহ ব্যতীত আরও অনেক মসজিদের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে উল্লিখিত মসজিদসমূহ ব্যতীত অপরাপর মসজিদের কোন নাম-নিশানা নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ এবং সূক্ষ্মদর্শী মনীষীবৃন্দ পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী পাহাড় এবং উপত্যকাসমূহে জামালে মুহাম্মদীর অপূর্ব ঝলক এবং কমালে আহমদীর অসীম নূর অবলোকন করেন। কেননা এ সমুদয় স্থানের কণা পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যেখানে তাঁর নূরের দৃষ্টি নিপতিত হয়নি এবং যেগুলো তাঁর সৌন্দর্যের ঝলক প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়নি।

بہر زمیں کہ نسیمی ز زلف او زدہ است ☆ ہنوز از دم آں بوی عشق می آید

'যে মাটিতে তাঁর যুলফের স্নিগ্ধ বাতাস লেগেছে, সেখান থেকে এখনও প্রেমের খুশবু বয়ে আসছে।'

মসজিদে বদর

বদর একটি স্থানের নাম। এ স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ইসলামের অভূতপূর্ব শান-শওকত বৃদ্ধি পায়। আর মুসলমানগণ আশাতীত বিজয় লাভ করেন। গযওয়াতের কিতাবসমূহে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ যুদ্ধের সময় খেজুর গাছের শাখা-প্রশাখা দিয়ে হযরত ﷺ-এর নির্মিত একখানা 'আরীশ' (অবস্থান স্থল) নির্মিত হয়। এ স্থানেই একখানা মসজিদও নির্মাণ করা হয়। এখনো মসজিদটি ওখানে বিদ্যমান আছে। বদর যুদ্ধের শহীদগণের কবর এ স্থানেই বিরাজমান। এখানে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, এখানে শহীদগণের কবর যার ওপর বালির স্তূপ রয়েছে। ওখান থেকে বাদ্যের আওয়াজ শোনা যায়। বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। তবে কোন কোন আলিম বলেন, উক্ত আওয়াজের কথা ভিত্তিহীন। বাতাস প্রবাহের কারণেও এ রূপ শব্দ শোনা যেতে পারে। পরবর্তী কোন কোন আলিম বলেন, এতে কোন রহস্য থাকতে পারে, যা আমাদের বোধগম্য নয়। সামহূদী মসজিদটির কথা উল্লেখ করেননি।

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৬৪-১৬৬

মসজিদে খুলায়স

এ মসজিদটি মক্কা শরীফ থেকে তিন দিনের রাস্তার ব্যবধান। এখানে খেজুর গাছ ও ঝর্ণা আছে। এখানে একটি মসজিদ আছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছেন। ৯৬৮ হিজরীতে রুমের বাদশাহ মসজিদটি সংস্কার করেন এবং মসজিদের উঠানে একটি ঝর্ণা তৈরি করেন।

সামহূদী ؒ বলেন, খুলায়সের আসল বস্তির তিন মাইল দূরে, শাবরায়ে আকবাতে আরও একটি মসজিদ আছে। তিনি আরও বলেছেন, খুলায়স থেকে মদীনার দিকে দু'মনযিল অন্তরে কুদাইদ নামক স্থানেও আর একটি মসজিদ বিদ্যমান। 'উম্মে মা'আবদ'-এর খীমা (তাঁবু) ওখানে স্থাপন করা হয়েছিল। হিজরতের প্রাক্কালে হযরত ﷺ এবং হযরত আবু বকর ؓ এখানে পদার্পণ করেছিলেন। এখানে তাঁর মু'জিযার বরকতে একটি অতি দুর্বল ছাগীর দুধ বের হয়।[2]

মসজিদে সরফ

মক্কা শরীফ থেকে এক মনযিল (তিন মাইল) অন্তরে তানয়ীমের রাস্তায় এ মসজিদটি অবস্থিত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা ؓ-এর আকদ-নিকাহ এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এখানেই ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর কবর শরীফও এখানে অবস্থিত।[3]

মসজিদে তানয়ীম

'তানয়ীম' একটি স্থানের নাম। মক্কাবাসীরা এখানে উমরার ইহরাম বাঁধেন। সামহূদী বলেন, এখানে একটি গাছ, কয়েকটি কূপ এবং হযরত ﷺ-এর একটি মসজিদ ছিল। বর্তমানে এখানে হযরত আয়িশা ؓ-এর মসজিদ বিখ্যাত। বিদায় হজ্জের সময় হুযুর আকরম ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আয়িশা ؓ এখান থেকে উমরার ইহরাম বাঁধেন। এটি একটি বিখ্যাত স্থান।[4]

মসজিদে যী-তুওয়া

এটি মক্কা নগরীর বাইরে একটি কূপের নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা নগরীতে গমনের সময় এখানে অবতরণ করেন। এখানে রাত যাপনের পর মক্কায় প্রবেশ করেন। হুযুর পাক ﷺ-এর নামায আদায়ের স্থান বর্তমানে নির্মিত মসজিদের স্থানে ছিল না, বরং যেখানে পানি জমে, সেখানেই ছিল।[5]

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭৩
[3] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭৩
[4] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭২
[5] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭৩

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

জান্নাতুল বকী'র ফযীলত এবং বিখ্যাত কবরসমূহের বর্ণনা

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে যে, এক রজনীতে রাসূলে খোদা ﷺ আমার হুজরায় অবস্থান করেছিলেন, শেষ রাতে তিনি জান্নাতুল বকী'তে চলে যান। সেখানে তিনি বকী'র বাসিন্দাদের সালাম দেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি বলেন,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اَللّٰهُمَّ، اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ».[1]

হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে অন্য এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, এক রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বাইরে চলে যান। অপর কোন বিবির হুজরায় তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন মনে করি আমি। তিনি জান্নাতুল বকী'তে চলে যান এবং অনেক্ষণ ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি তিনবার হস্ত মুবারক উত্তোলন করে দু'আ করেন। পরে যখন তিনি ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন হন, তিনি আমাকে দেখতে পাবেন, এ আশঙ্কা করে আমি তাঁর আগেই গৃহে চলে আসি এবং শুয়ে পড়ি। ঘরে প্রবেশ করে তিনি আমার অশান্তভাব প্রত্যক্ষ করে আমাকে বললেন, 'হে আয়িশা! ভালো তো? এ সময়ে এমন অস্বস্থি কেন'? আমি সব কথা খুলে বলে দিলাম। আমার কথা শুনে ইরশাদ করলেন, 'আমার আগে আগে যে কার ছায়া দেখেছি বোধ হয়, সে তুমিই ছিলে'? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর তিনি আমার বক্ষের ওপর হাত রেখে বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে তোমার ওপর অন্যায় আচরণ করবেন, তোমার এ ধারণা হল কেমনে'? আমি আরজ করলাম, আল্লাহর কাছে কোন কিছু লুকায়িত নেই। আপনার কথা সত্য। তবে আমি মানুষের স্বভাবগত কারণে এ আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি। এরপর তিনি ইরশাদ করেন, 'হযরত জিবরাঈল এসে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে যান। যখন তিনি তোমার থেকে কথা অগোচরে রেখেছেন, আমিও তোমাকে

[1] (ক) আস-সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৩২৫; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬৬৯, হাদীস: ১০২ (৯৭৪):

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «...».

অবগত করিনি। হযরত জিবরাঈলের এটাই স্বভাব যে, যখন তুমি তোমার শরীর থেকে বস্ত্র আলগ কর, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন না। আর আমিও তোমাকে ঘুমন্ত মনে করে জাগ্রত করিনি। যাতে তুমি বিব্রতবোধ না কর। জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, আমার মালিক আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি বকী'তে গিয়ে বকী'বাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।'[2]

নাসায়ী শরীফে এ দু'আ এভাবে বর্ণিত আছে,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَدًا مُوَاكِلُونَ».[3]

কোন কোন রিওয়ায়তে একথাগুলো বর্ধিত আছে,

«اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ».[4]

বায়হাকীতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ঘটনাটি অর্ধেক শাবানের রাতের বেলায় সংঘটিত হয়।[5] এ কিতাবে তাঁর দু'আ এভাবে বর্ণিত আছে,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، وَيَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَأَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ».[6]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন অর্ধেক রজনীতে তিনি আমাকে জাগ্রত করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন জান্নাতুল বকী'তে গিয়ে বকী'বাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করি। আমি তাঁর সাথী হলাম। তিনি বকী'তে পৌঁছে দাঁড়িয়ে বললেন,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيَهْنِ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ آخِرُهَا أَوَّلَهَا، الْآخِرَةُ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى».

এরপর তিনি আবু মাওহাবাকে ইরশাদ করলেন, 'হে আবু মুওয়ায়হিবা! আমার নিকট দুনিয়ার ধন-সম্পদের চাবিসমূহ অর্পণ করা হয়েছে এবং আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে সর্বদা ইহজগতে থাকতে

[2] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬৭০, হাদীস: ১০৩ (৯৭৪)

[3] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৯৩, হাদীস: ২০৩৯;

[4] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯১;

[5] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৫, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ৩৫৫৬

[6] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৩, পৃ. ৩৬০, হাদীস: ১০৫৩

পারি, আর যদি ইচ্ছা করি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যেও চলে যেতে পারি। আমি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যাওয়াকে গ্রহণ করেছি।' আমি আরজ করলাম, আপনি পৃথিবীর সম্পদের চাবি হস্তগত করুন। এরপর আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। ইরশাদ করলেন, 'হে আবু মুওয়াইহিবা, খোদার শপথ! আমি এমন চাই না। আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যেতে চাই।' একথা বলে তিনি বকী' থেকে ফিরে আসেন। তখন তাঁর মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়, যা তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি।'[1]

রিওয়ায়তের মধ্যে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ বকী'তে গমনের পর তিনবার ইরশাদ করেন, «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ» এরপর তিনি ইরশাদ করেন, 'হে এ নশ্বর জগত থেকে পর জগতে গমনকারীরা! তোমরা সেখানে সুখ শান্তিতে থাক। সেখানে গমন করে তোমরা সেসব ফিতনা-ফাসাদ ও আপদ-বালা থেকে মুক্তি লাভ করেছ, যা তোমরা চলে যাবার পর এখানে অবতীর্ণ হয়েছে।' এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামদের লক্ষ করে বললেন, 'যারা এখান থেকে ওপারে চলে গেছেন, তাঁরা তোমাদের থেকে উত্তম।' সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা তো আমাদেরই ভাই। তাঁরা যেমন ঈমান এনেছেন, আমারাও তো ঈমান এনেছি। তাঁরা যেমন আল্লাহর রাস্তায় টাকা-পয়সা দান করেছেন, আমরা তো আল্লাহর রাস্তায় টাকা পয়সা দান করি। যেভাবে তাঁরা এ নশ্বর জগত ছেড়ে চলে গেছেন, আমরাও তো চলে যাবো। সুতরাং তাঁরা আমাদের থেকে উত্তম হয় কিরূপে? ইরশাদ করলেন, 'তাঁরা এ জগত ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এ দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় তাঁদের নেক আমলসমূহের কোন প্রতিফল ভোগ করেনি। কিন্তু আমি তোমাদের সম্পর্কে অবগত নই যে, তোমরা এরপর কিরূপ কাজ করবে এবং তোমাদের মাঝে কত যে ফিতনা-ফাসাদ ঢুকে পড়ে।'[2]

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ জান্নাতুল বকী'তে যান এবং বলেন,

[1] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৬-৮৭

[2] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৪-৯৫:

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَامَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ» ثَلَاثًا، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا الَّذِي نَجَّاكُمُ اللهُ مِنْهُ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «هَؤُلَاءِ خَيْرٌ مِنْكُمْ»، وَنَحْنُ خَلْفَهُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُنَا، أَسْلَمُوا كَمَا أَسْلَمْنَا، وَأَنْفَقُوا كَمَا أَنْفَقْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا، وَأَتَوْا عَلَى آجَالِهِمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ؟ قَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا لَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَقَدْ أَكَلْتُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلَا أَدْرِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بَعْدِي».

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ».

পরে তিনি ইরশাদ করেন, 'আহা! যদি আমি আমার ভাইদেরকে দেখতাম।' সাহাবাগণ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা আমার সাহাবী, আমার ভাই ওরাই, যাঁরা আমার পরে দুনিয়াতে আসবেন।' তাঁদেরকে তো আপনি দেখেননি, আপনি কিভাবে পরিচয় করতে পারবেন যে, তাঁরা আপনার উম্মত? ইরশাদ করেন, 'যদি তোমাদের কারো নিকট ফাঁকে ফাঁকে সাদা বিশিষ্ট কালো রংয়ের ঘোড়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি কি অনেকগুলো ঘোড়ার মধ্যে থেকে তার ঘোড়াটিকে বেছে নিতে পারবে না? কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য দৈনিক পাঁচবার ওযু করার কারণে তাদের চেহারা ও হস্ত-পদ সেই সাদা বিশিষ্ট ঘোড়ার মত সাদা ও উজ্জ্বল হবে।'[1]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতুল বকী'র কবরস্থান থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করবেন, যাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে এরা সেসব লোক যারা হস্ত পদে চিত্র অঙ্কন করতেন না, বদ ফাল বের করতেন না এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করতেন।'[2]

অন্য রিওয়ায়তে এরূপ লোকের সংখ্যা এক লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ হাদীসে একথাটির উল্লেখ রয়েছে যে, 'তাঁরা বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা করতেন না।'

মুসআব ইবনুয যুবাইর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি ইবনে রাস জালূত নামক একজন আহলে কিতাব সাথীসহ জান্নাতুল বকী'র পথে মদীনায় যাচ্ছিলেন। যখন বকী'র ওপর তার দৃষ্টি পড়ে, তখন সে বলে ওঠে, এটাই,

[1] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৩৯ (২৪৯):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ».

[2] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৩:

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُحْشَرُ مِنَ الْبَقِيعِ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

এটাই। মুসআব তাকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এটি কি বললে? তোমার এ কথার উদ্দেশ্য কী? সে বলল, আমি তাওরাত কিতাবে এ কবরস্থান সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি যে, খেজুর গাছে ভরা একটি মরু উদ্যানের কবরস্থান থেকে কিয়ামতের দিন ... সত্তর হাজার লোক বেরিয়ে আসবেন, যাঁদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মতো ঝিকমিক করতে থাকবে।[১]

অপর একটি হাদীসে সালিমা গোত্রের কবরস্থান সম্পর্কেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[২]

যেসব ভাগ্যবান ব্যক্তি বকী'তে দাফন হবেন, তাঁদের ফযীলত সম্পর্কে এবং তাঁদের জন্য যে হুযূর পাক ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম সাক্ষ্য দেবেন ও সুপারিশ করবেন, সে সম্পর্কেও অনেক হাদীস ও আসার বর্ণিত আছে।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন, তিনি হচ্ছেন হযরত নবী করীম ﷺ, এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., তার পরে হযরত উমর রাযি., এরপর বকী'বাসী, এরপর মক্কাবাসী।[৩]

হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার কোন এক হারাম শরীফে মৃত্যুবরণ করেন, কিয়ামতের দিন তিনি নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের মধ্যে ওঠবেন।'[৪]

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এমন দুটো কবরস্থান আছে, যার আলো আসমানের ওপর এমন উদ্ভাসিত, যেমন– চন্দ্র ও সূর্যের আলো পৃথিবীর ওপর উদ্ভাসিত। এ দুটোর একটি জান্নাতুল বকী' অপরটি মিসরের আসকালান নামক কবরস্থান।[৫]

হযরত কা'আব আহবার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বকী'র মধ্যে এমন কতেক ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, যাঁরা লাশের দ্বারা কবরস্থানটি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তাঁদেরকে বকী'র কিনারায় নিয়ে এসে বেহেশতে উৎক্ষেপণ করেন।[৬]

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৭৭-৮১
[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩৮
[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৪৫ ও খ. ৩, পৃ. ৮১
[৪] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; (খ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ২৬৯৪, হযরত হাতিব রাযি. থেকে বর্ণিত
[৫] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮১।

عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: «مَقْبَرَتَانِ يُضِيئَانِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، مَقْبَرَتُنَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمَدِينَةِ، وَمَقْبَرَةٌ بِعَسْقَلَانَ».

[৬] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮১। =

উল্লেখ্য যে, যাঁরা জান্নাতুল বকী'তে দাফন হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা গণনাতীত। তবে হুযূর আকরাম ﷺ-এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর যেসব সাহাবায়ে কিরাম এ কবরস্থানে দাফন হয়েছেন, আলিমগণ তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করেছেন।

কাযী আয়ায রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অন্তত পক্ষে দশ হাজার সাহাবায়ে কিরাম মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেছেন এবং সবসংখ্যক আহলে বায়ত ও সাইয়িদ বংশ ব্যতীত অপরাপর তাবেয়ী আলিমগণ এখানে ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাঁদের কবরের স্থান জানা নেই। অবশ্য কোন কোন লোকের কবরের দিক হয়ত জানা আছে। কেননা তখনকার দিনে কবরের ওপর ঘর নির্মিত হত না এবং কবরে নাম লিখে দেওয়ার প্রথাও ছিল না। এ কারণে তাঁদের কবরের নিশানা বর্তমানে নেই তবে কোন কোন লোক কোন কোন কবর যে এখানে বলে নির্দিষ্ট করেন, এটি অনুমান অথবা কোন রিওয়ায়তের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যথায় আসল কথা তাই, যা আমরা বলেছি।[১]

অনুচ্ছেদ-১: জান্নাতুল বকী'র বিশিষ্ট কয়েকটি কবরের বর্ণনা

হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর কবর

এ কবরস্থানে যে সমুদয় কবর বিখ্যাত, এর মধ্যে সাইয়িদিনা হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-এর কবর অন্যতম। এ কবরস্থানে সর্বপ্রথম হযরত উসমান ইবনে মাযউন রাযি.-কে দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূলে খোদা ﷺ তাঁর কপালে চুমো খেয়ে ইরশাদ করেন,

«نِعْمَ السَّلَفُ سَلَفُنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ».

'উসমান ইবনে মাযউন আমাদের উত্তম পূর্বসূরি। আর তোমরা তাঁকে বকী'তে দাফন কর।'[২]

সেই সময়ে সেখানে খুব বেশি বৃক্ষরাজি থাকার ফলে তা 'বকী'উল গারকদ' নামে অভিহিত হয়। কিছুসংখ্যক গাছ কেটে, মাটি সমতল করে তাঁকে

= «عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: نَجِدُهَا فِي التَّوْرَاةِ كَفْتَةً مَحْفُوفَةً بِالنَّخِيلِ وَمُوَكَّلًا بِهَا الْمَلَائِكَةُ، كُلَّمَا امْتَلَأَتْ أَخَذُوا بِأَطْرَافِهَا، فَكَفَئُوهَا فِي الْجَنَّةِ».

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০০
[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৩, (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৯।

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْفِنُوا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بِالْبَقِيعِ، يَكُنْ لَنَا سَلَفًا...».

সেখানে দাফন করা হয়। আকীলের বাড়ির পূর্ব দিকে যেখানে এখন আকীলের গম্বুজ বিদ্যমান, সেখানে তাঁর কবর অবস্থিত। হযরত ﷺ-এর নাম রাওহা রাখেন। এটি বকী'র মাঝখানে অবস্থিত।[1]

হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ সর্বপ্রথম মুহাজির, যিনি মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে? ইরশাদ করলেন, 'তাঁকে বকী'তে দাফন কর এবং কবরকে লাহ্‌দ খোদাই কর।' কবর খোদাই করার পর দেখা গেল, সেখানে একটি পাথর অতিরিক্ত রয়ে গেছে। রাসূলে করীম ﷺ স্বহস্তে পাথরখানাকে সরিয়ে নিয়ে কবরের পশ্চাৎভাগে অথবা শিরহানায় পুঁতে দেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত হয়, তখন তিনি একবার হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ-এর কবরের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাঁর কবরের ওপর পাথরখানাকে দেখে নির্দেশ দেন যে, পাথরখানাকে এখানে সরিয়ে ফেল। আমি তাঁর কবরের ওপর এমন কোন নির্দশন দেখতে চাই না, যা দ্বারা তাঁর বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক যখন পাথরখানাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন উমাইয়া বংশীয় লোকেরা তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, যে পাথরখানাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে পুঁতে দিয়েছেন, তুমি কেন একে সরিয়ে দিলে? তুমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করেছ। মারওয়ান বলল, আমার হুকুম পরিবর্তন হবে না।[2]

---

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৩; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০০:

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَانَ الْبَقِيعُ غَرْقَدًا، فَلَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَقُطِعَ الْغَرْقَدُ عَنْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ عُثْمَانُ ؓ: «مَقْبَرَةُ الرَّوْحَاءِ»، وَذَلِكَ كُلُّ مَا حَاذَتِ الطَّرِيقُ مِنْ دَارِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى زَاوِيَةِ دَارِ عَقِيلٍ الْيَمَانِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ.

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৪; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০১-১০২:

عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يُدْعَى عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ؓ مِنْ أَوَّلِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ نَدْفِنُهُ؟ قَالَ: «بِالْبَقِيعِ». قَالَ: فَلَحَدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفَضَلَ حَجَرٌ مِنْ حِجَارَةِ لَحْدِهِ، فَحَمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَضَعَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا وَلِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَدِينَةَ مَرَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَجَرِ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُمِيَ بِهِ وَقَالَ: وَاللهِ لَا يَكُونُ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَجَرٌ يُعْرَفُ بِهِ، فَأَتَتْهُ بَنُو أُمَيَّةَ فَقَالُوا: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، عَمَدْتَ عَلَى حَجَرٍ وَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَمَيْتَ بِهِ، بِئْسَ مَا فَعَلْتَ بِهِ، فَأْمُرْ بِهِ فَلْيُرَدَّ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ إِذْ رَمَيْتُ بِهِ فَلَا يُرَدُّ.

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে যে, পাথরখানাকে পুনরায় স্বস্থানে পুঁতে দেওয়া হয়।[1]

আবু দাউদ শরীফে অতি উত্তম সনদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ-কে দাফন করার পর রাসূল পাক ﷺ ইরশাদ করেন, 'একখানা পাথর নিয়ে এসো।' সেখানে একখানা বড় পাথর পতিত অবস্থায় মওজুদ ছিল। পাথরখানাকে কেউ উত্তোলন করে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। হযরত ﷺ স্বয়ং পাথরটিকে নিয়ে এসে তাঁর কবরের শিরহানায় পুঁতে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, 'আমি এ পাথরখানাকে আপন ভাইয়ের কবরের নিদর্শন-স্বরূপ রেখে দিলাম। এখন থেকে যদি আমার পরিবারের কোন লোক ইন্তিকাল করেন, আমি তাঁকে এখানে দাফন করবো।'[2]

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ-এর কবর হযরত ﷺ-এর বাড়ির মুকাবিলায় বিদ্যমান। এমনকি যদি কেউ হযরত উসমান ইবনে মাযঊনের কবরে দাঁড়াত, তবে সেখান থেকে পরিষ্কারভাবে তাঁর বাড়ি প্রত্যক্ষ করা যেত।

হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর

হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ-এর পর হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়। তাঁর নির্দেশে তাঁকে হযরত উসমান ইবনে মাযঊন ؓ-এর পাশে দাফন করা হয়। তিনি ইরশাদ করেন যে, 'বেহেশতের মধ্যে একজন দুধ পিলানেওয়ালী স্ত্রীলোক তাঁকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুধ পান করাবে।'[3]

হযরত উমর ؓ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তাঁর কবরের মধ্যে মাটি ফেলেন এবং পানি ছিটকিয়ে দেন। যখন তাঁর দাফন সম্পন্ন

---

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৩-৮৪

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২১২, হাদীস: ৩২০৬:

عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، ... ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮২; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৭:

عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفِنُوهُ فِي الْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُتِمُّ رَضَاعَهُ».

হয়, তখন তিনি বলেন, «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»।[১]

হযরত ইবরাহীম ﷺ-কে জান্নাতুল বকী'তে দাফন করার পর প্রত্যেক গোত্রের লোকজন বকী'তে তাদের জন্য এক এক স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। এমনিভাবে সমস্ত বকী'উল গরকদ মুসলমানদের গোরস্থানে পরিণত হয়।[২]

হযরত রুকাইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর

যখন হযরত রুকাইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন তখন তিনি ইরশাদ করেন,

«اَلْحَقِيْ بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ»।

'আমাদের পূর্ববর্তী উসমান ইবনে মাযউনের সাথে তাঁকে সংশ্লিষ্ট করে দাও।'[৩]

এ কারণে তাঁকেও তাঁর নিকটে দাফন করা হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত রুকাইয়া ﷺ-এর ওফাত হয়, তখন কয়েকজন স্ত্রীলোক কাঁদতে থাকে। হযরত উমর ﷺ তাদেরকে নিষেধ করেন। তাঁরা তাঁর কথা অমান্য করার ফলে যখন তিনি তাঁদেরকে পিটুনী দেন, তখন হুযূর আকরম ﷺ তাঁর হাত ধরে বাধা দিয়ে বলেন, 'তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা ক্রন্দন করুক। হাত এবং মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়, তাই শয়তানী কাজ এবং যা অরূপ না হয়, তা নিষিদ্ধ নয়।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা ﷺ হযরত রুকাইয়ার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন আর রাসূলে করীম ﷺ তাঁর আঁচল দিয়ে হযরত ফাতিমা ﷺ-এর অশ্রু জল মুছে ফেলতেন।

কিন্তু এটিই বিশেষ খ্যাত যে, হযরত রুকাইয়ার ইন্তিকালের সময় তিনি মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। হযরত রুকাইয়ার সেবার জন্য হযরত উসমান ﷺ-কে মদীনায় রেখে তিনি বদর প্রান্তরে চলে যান। যখন হযরত যায়দ ইবনে হারিসা ﷺ বদর যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে, হযরত উসমান ﷺ তাঁকে কবরে দাফন করছেন।[৪]

---

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮২; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৯

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২১

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৩; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৯, পৃ. ৩৭, হাদীস: ৮৩১৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত

[৪] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০২-১০৩

কিন্তু সঠিক তথ্য এই যে, হযরত ﷺ হযরত রুকাইয়ার ইন্তিকালের সময় নয়, বরং উম্মে কুলসুমের ওফাতের সময়ই মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। অতএব প্রথম বর্ণনায় যা বলা হয়েছে সম্ভবত তা হযরত উম্মে কুলসুম অথবা হযরত যয়নাবের বেলায় ঘটেছিল। যা অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়। হযরত সাইয়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় পয়গাম্বর ﷺ-এর হযরত উসমান ইবনে মাযউনের দাফন এবং কবরে পাথর পুঁতে দেওয়ার সময় বলেছিলেন,

«وَأُدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِيْ»।

'আমার পরিবারের যে কেউ ইন্তিকাল করেন, আমি তাঁকে তাঁর কবরের পাশেই দাফন করবো।'[১]

বর্তমানে এ স্থানের সান্নিকটে একটি গুম্বদ ছিল। যাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ের গুম্বদ বলা হতো।

হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ ﷺ-এর কবর

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ-এর আম্মাজান হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ ﷺ-এর কবরও হযরত উসমান ﷺ-এর কবরের পাশে অবস্থিত। যেমন– হযরত মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা বিনতে আসদকে সাইয়িদিনা হযরত ইবরাহীম এবং উসমান ইবনে মাযউনের পাশে দাফন করা হয়েছে।[২]

অপরাপর রিওয়ায়তের দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সামহুদী বলেন, হযরত উসমান ইবনে আফফান ﷺ-এর গুম্বদের উত্তর পাশের গুম্বদটিকে যে কোন লোক হযরত ফাতিমা বিনতে আসদের গুম্বদ বলে ধারণা করেন, তা ঠিক নয়। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক তা সমর্থন করেছেন। কেননা হযরত ফাতিমা বিনতে আসদের প্রতি হযরত ﷺ-এর প্রগাঢ় ভালোবাসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে যে বকী'র বাইরে দাফন করেছেন, একথা সমর্থন করা যায় না।

তা ছাড়া হুযূর আকরম ﷺ-এর ইরশাদ, 'আমার পরিবারের যে কেউ ইন্তিকাল করেন, আমি তাঁকে তাঁর (হযরত উসমান ইবনে মাযউনের) পাশে দাফন করব।'-এর পরিপ্রেক্ষিতেও এটি সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান ﷺ-এর কবর বকী'র বাইরে অবস্থিত এবং হযরত ফাতিমার নামে অভিহিত গুম্বদটি এর থেকেও দূরে অবস্থিত।[৩]

---

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৫; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ২১২, হাদীস: ৩২০৬

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৫

[৩] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৩

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে, তখন হযরত ﷺ ইরশাদ করেন, 'যদি তাঁর মৃত্যু হয়, আমাকে সংবাদ দিয়ো ।' তাঁর মৃত্যুর পরে যখন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়, তিনি ইরশাদ করেন, 'এ মসজিদের স্থানে যেখানে এখন তাঁর কবর বিদ্যমান তার জন্য লাহদ কবর খনন কর ।' যখন তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কবর খনন করা হয়, তখন তিনি কবরে নেমে শুয়ে পড়েন এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন । পরে তিনি তাঁর গায়ের জামা খুলে দিয়ে বললেন, 'তাঁর কাফনের মধ্যে এ জামাটিকেও অন্তর্ভুক্ত কর ।' এরপর কবরের নিকটে তাকবীরসহ নামায আদায় করেন এবং বলেন, 'তোমরা (কবরের চাপ) থেকে নিরাপদ থাকবে না, ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها ব্যতীত ।' সাহাবাগণ আরজ করলেন, আপনার সাহেবযাদা হযরত কাসিমও কি নয়? অথচ তিনি তো ছোটবেলায় ইন্তিকাল করেছেন । তিনি ফরমান, 'তোমরা কাসিমের কথা কি জিজ্ঞাসা কর, ইবরাহীমও রেহাই পাবে না ।' অর্থাৎ ইবরাহীম কাসিম থেকেও শৈশবে ইন্তিকাল করেছেন ।'[১]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি শৈশবে ইন্তিকাল করেছেন । তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ সাহাবাদের সাথে একত্রে বসেছিলেন, এমন সময় খবর এসে পৌঁছে যে, হযরত আলী رضي الله عنه, হযরত জাফর رضي الله عنه ও হযরত আকীলের মা ইন্তিকাল করেছেন । এ খবর শুনে তিনি বললেন, 'আপন মায়ের দিকে চল ।' তখন সকলে كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ (যেমন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে) অতীব নম্রতা সহকারে সেখানে রওয়ানা হয়ে যান । গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পর তিনি তাঁর জামা দেহ মুবারক থেকে খুলে দিয়ে বললেন, 'গোসলের পর একে তাঁর কাফনের মধ্যে পরিয়ে দিও ।' জানাযা বের হওয়ার পর তিনি খাটের পায়া স্বীয় কাঁধে তুলে নেন । কখনও সামনের

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৭; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৩–১২৪:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَتْ فَاطِمَةُ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تُوُفِّيَتْ فَأَعْلِمُونِي»، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَبْرِهَا لِيُحْفَرَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْيَوْمَ قَبْرُ فَاطِمَةَ، ثُمَّ لَحَدَ لَهَا لَحْدًا، وَلَمْ يَضْرَحْ لَهَا ضَرِيحًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ نَزَلَ فَاضْطَجَعَ فِي اللَّحْدِ وَقَرَأَ فِيهِ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَزَعَ قَمِيصَهُ، فَأَمَرَ أَنْ تُكَفَّنَ فِيهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ قَبْرِهَا فَكَبَّرَ تِسْعًا وَقَالَ: «مَا أُعْفِيَ أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ إِلَّا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْقَاسِمُ؟ قَالَ: «وَلَا إِبْرَاهِيمُ»، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَصْغَرَهُمَا.

আবার কখনও পশ্চাতের পায়া ধারণ করেন । কবরে পৌঁছার পর তিনি কবরে অবতরণ করে শুয়ে পড়েন । পরে কবরের বাইরে এসে বললেন, মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দাও ।' এরপর তিনি বলেন,

«بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى اسْمِ رَسُولِ اللهِ».

দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বলেন,

«وَجَزَاكِ اللهُ مِنْ أُمٍّ وَرَبِيبَةٍ خَيْرًا، فَنِعْمَ الْأُمُّ، وَنِعْمَ الرَّبِيبَةُ».

এরপর সাহাবাগণ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর বেলায় আপনার মধ্যে এমন দুটো জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি যা আর কারো বেলায় দেখিনি । প্রথমত আপনি তাঁকে কাফনের জন্য স্বীয় জামা অর্পন করলেন । দ্বিতীয়ত তাঁর কবরে অবতরণ করে শুয়ে পড়লেন । তিনি ইরশাদ করেন, 'দোযখের আগুন স্পর্শ না করার জন্যই প্রথম কাজটি করেছি । আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় কাজটি করেছি ।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আবু তালিবের পরে ফাতিমা বিনতে আসাদ থেকে আন্তরিকতা সহকারে আমার কেউ কল্যাণকামী ছিলেন না । আমি তাঁর আমার দেহের লেবাস পরিয়েছি, যাতে তাঁকে বেহেশতের লেবাসে পরান হয় । আমি তাঁর কবরে শয়ন করেছি, যেন তিনি কবরের আযাব থেকে রেহাই পান ।'[৩]

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৭; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৪:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ أَتَى آتٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمَّ عَلِيٍّ وَجَعْفَرٍ وَعَقِيلٍ قَدْ مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا بِنَا إِلَى أُمِّي»، فَقُمْنَا وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِ مَنْ مَعَهُ الطَّيْرَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَابِ نَزَعَ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: «إِذَا غَسَّلْتُمُوهَا فَأَشْعِرُوهَا إِيَّاهُ تَحْتَ أَكْفَانِهَا»، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً يَحْمِلُ، وَمَرَّةً يَتَقَدَّمُ، وَمَرَّةً يَتَأَخَّرُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَتَمَعَّكَ فِي اللَّحْدِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: «أَدْخِلُوهَا بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى اسْمِ اللهِ»، فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهَا قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: «جَزَاكِ اللهُ مِنْ أُمٍّ وَرَبِيبَةٍ خَيْرًا، نِعْمَ الْأُمُّ، وَنِعْمَ الرَّبِيبَةُ كُنْتِ لِي». قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ، أَوْ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ صَنَعْتَ شَيْئَيْنِ مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُمَا قَطُّ، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْنَا: بِنَزْعِكَ قَمِيصَكَ، وَتَمَعُّكِكَ فِي اللَّحْدِ، قَالَ: «أَمَّا قَمِيصِي فَأَرَدْتُ أَلَّا تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَمَّا تَمَعُّكِي فِي اللَّحْدِ فَأَرَدْتُ أَنْ يُوَسِّعَ اللهُ عَلَيْهَا قَبْرَهَا».

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৭; (খ) ইবনে আবদুল বর, *আল-ইস্তিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯১; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ইরশাদ করেন, =

হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন ফাতিমা বিনতে আসাদ ইন্তিকাল করেন, তখন রাসূল মকবুল তাঁর শিয়রে বসে বলেন, «يَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي» (আমার মায়ের পরে মা।) তিনি তাঁর অনেক প্রশংসা করেন এবং তিনি তাঁর কাফনের জন্য নিজের জামা দান করেন, এরপর তিনি হযরত ওসামা ইবনে যায়দ, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী এবং হযরত উমর ইবনে খাত্তাব-কে কবর খননের নির্দেশ দেন এবং নিজে কবরের মাটি উত্তোলন করেন। কবর খননের কাজ সম্পন্ন হবার পর কবরে নেমে তিনি স্বহস্তে লাহাদ ঠিক করেন। আর কবরের মধ্যে শুয়ে পড়ে বলেন,

«اللهُ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، اغْفِرْ لِأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ».

'আল্লাহ তাআলাই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সদা জীবিত। তাঁর মৃত্যু নেই। হে আল্লাহ! আমার মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ কে মাগফিরাত দান করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আপনার নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াসীলায় নিশ্চয় আপনি সমস্ত দয়ালুদের থেকে অধিকতর দয়াবান।'

এরপর চার তাকবীর বলে তিনি তাঁকে কবরে শুয়াইয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আব্বাস এবং হযরত আবু বকর তাঁকে সহায়তা করেন।[1]

আবদুল আযীয ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ পাঁচ ব্যক্তি কবরসমূহের মধ্যে একটি উম্মুল মুমিনীন হযরত খদীযাতুল কুবরা এর কবর, যা মক্কায় অবস্থিত। অপর চারটি মদীনায়: এগুলো হচ্ছে, ১. হযরত খদীযাতুল কুবরা-এর পূর্বের স্বামীর পুত্র, যাকে হুযূর লালন-পালন করেছেন, ২. আবদুল্লাহ আল-মুযনীর কবর, যাঁকে যুল বিজাদায়ন বলা হয়, ৩. হযরত আয়িশা-এর মাতা উম্মে রুমান-এর কবর ও ৪. হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ-এর কবর।[2]

= «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ أَبِيْ طَالِبٍ أَبَرَّ بِيْ مِنْهَا، إِنَّمَا أَلْبَسْتُهَا قَمِيْصِيْ لِتُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا لِيُهَوَّنَ عَلَيْهَا».

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৭-৮৮; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ৩৫১ হাদীস: ৮৭১; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ১, পৃ. ৬৭-৬৮, হাদীস: ১৮৯

[2] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৬; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২১

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর কবর

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর কবরও হযরত ইবনে মযউন-এর কবরের পাশে অবস্থিত।

ইবনে যুবালা হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন হযরত আয়িশা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান যে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে হযরত নবী করীম ও আপন দু'ভাই হযরত আবু বকর ও হযরত উমর-এর পাশে দাফন করা হবে। তিনি সংবাদ দিলেন যে, আমি আপনার হুজরা শরীফকে ছোট করতে চাই না। উসমান ইবনে মাযউনের সাথে আমার অঙ্গীকার হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে, অপরজনও তাঁরা পাশে কবরস্থ হবে। একথা শ্রবণের পর হযরত আয়িশা বললেন, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর জানাযা যেন, আমার ঘরের সামনে নিয়ে আসা হয়। যখন হযরত আয়িশা-এর ঘরের সম্মুখে তাঁর জানাযা নিয়ে আসা হয়, তিনি তাঁর জানাযার নামায পড়েন।[1]

বর্ণিত আছে যে, হুজরা শরীফের মধ্যে শুধু একটি কবরের স্থান রয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, উক্ত স্থানে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম-কে দাফন করা হবে। এ কারণে আল্লাহর হিকমতের বিপরীত হওয়ায় সেখানে আর কাউকে দাফন করা হয়নি। হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট একথা সুস্পষ্ট।[2]

হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস-এর কবর

ইবনে শাব্বাহ ইবনে দাহকান থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁকে ডেকে পাঠান এবং সাথে করে বকী'তে নিয়ে যান। যাবার সময় কয়েকটি পেরাকও সাথে করে নিয়ে যান। যখন দারে আকিলের (আকিলের বাড়ি) নিকটে পৌঁছেন, যেখানে হযরত উসমান ইবনে মাযউন-এর কবর অবস্থিত। তিনি তাঁকে এর পূর্ব কোণে নিয়ে যান এবং বলেন, 'কবর খনন কর।' আমি নির্দেশ পালন করলাম। সাথে করে তিনি যে পেরাক নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো তিনি আমার হাতে প্রদান করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর সাহাবাদেরকে দেখিয়ে দিও, যেন তাঁরা আমাকে এ স্থানে দাফন করেন। ইবনে দাহকান বলেন, আমি তার মৃত্যুর পর তাঁর সাহেবযাদাগণকে উক্ত স্থান চিহ্নিত করে দিই। তাঁরা তাকে উক্ত স্থানে দাফন করেন।[3]

---

[1] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৮

[2] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১১০

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১১৬ =

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-এর কবর

ইবনে সা'দ তাঁর বিখ্যাত তাবকাতের মধ্যে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه অসিয়ত করেছেন যে, তাঁকে যেন হযরত উসমান ইবনে মাযউন رضي الله عنه-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[১]

অপর এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনা মুনওয়ারায় ইন্তিকাল করেন এবং ৩২ হিজরীতে তাঁকে জান্নাতুল বকী'তে সমাধিস্থ করা হয়।[২]

অপর এক রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, ৩৬ হিজরীতে তিনি কুফায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস-সাহমী رضي الله عنه-এর কবর

যাঁরা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরত করেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন। হুযুর আকরম ﷺ-এর পূর্বে তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা رضي الله عنها-এর স্বামী ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর বিদ্ধ হয়ে তৃতীয় হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান ইবনে মাযউনও এ বছর ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর মৃত্যু ঘটে শাবান মাসে।[৩]

হযরত সা'দ ইবনে যুরারা رضي الله عنه-এর কবর

মসজিদে নববী নির্মাণের প্রাক্কালে প্রথম হিজরীতে তিনি ওফাত পান। হযরত উসমান ইবনে মাযউনের কবরের নিকটে রাওহায় তাঁর কবর।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম رضي الله عنه এর যিয়ারতের সময় উল্লিখিত সাহাবায়ে কিরামের ওপরও সালাম প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। সাইয়িদিনা হযরত ইবরাহীম رضي الله عنه-এর কবরের দেয়ালে তাঁদের নামও লেখা আছে। উল্লিখিত

• عن ابن وقاص قال: دعاني سعد بن أبي وقاص، فخرجت معه إلى البقيع، وخرج بأوتاد، حتى إذا جاء بين موضع زاوية دار عقيل الشرقية الشامية، أمرني فحفرت، حتى إذا بلغت باطن الأرض ضرب فيها الأوتاد، ثم قال: إن هلكت فادللهم على هذا الموضع يدفنوني فيه، فلما هلك قلت لبنيه: لو لم... فخرجنا حتى دللتهم على ذلك الموضع، فوجدوا الأوتاد فحفروا له ثم دفنوه.

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৮। (খ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৩৩২৮:

عن عبد الله بن مسعود قال: ادفنوني عند قبر عثمان بن مظعون.

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৮। (খ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৩৩২৯:

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: مات عبد الله بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين.

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৮

হযরত ব্যতীত আরও দুইজনের নাম দেখা যায়, তবে এর কোন ভিত্তি নেই। সামহূদী এভাবেই বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত ফাতিমাতুয যুহরা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়নমণি, কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমাতুল বাতুল رضي الله عنها-এর কবর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলেন, মৃত্যুর পরেও তিনি তদ্রূপ অজানাই রয়ে গেছেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁর মৃত্যু এবং দাফন সম্পর্কে ধনী, দরিদ্র কাউকে অবহিত করা হয়নি। শুধু আহলে বায়তের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক ব্যতীত অপর কেউ এ সম্পর্কে অবহিত নয়।

আবার কেউ কেউ ধারণা করেন যে, তাঁকে অপরাপর আহলে বাইতের সাথে জান্নাতুল বকী'তেই দাফন করা হয়েছে।

কারও কারও মতে, তাঁকে তাঁর স্ব-গৃহেই দাফন করা হয়েছে। এখন উক্ত স্থান মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত।

সামহূদী এ সমুদয় উক্তির উল্লেখ করে কোন কোনটাকে নাকচ করে দিয়েছেন এবং কোন কোনটাকে গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তবে প্রথমে উল্লিখিত উক্তিটিই গ্রহণযোগ্য বলে অধিকাংশ লোকের মত।

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতুল বকী'র সড়কে দারে আকীলের নিকট ইয়ামনী কোণায় তাঁর কবর অবস্থিত।[২]

অপর এক রিওয়ায়তেও দারে আকীলের সন্নিকটে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

কোন কোন রিওয়ায়ত মতে, দারে আকীলের বত্রিশ গজ শরয়ীর মধ্যে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমামুল মুসলিমীন হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنهما-এর দাফন সম্পর্কে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করেন যে, যদি লোকেরা আমাকে আমার নানাজানের পাশে দাফন করতে সম্মত না হয়, তবে আমাকে বকী'তে আমার আম্মাজানের নিকটেই দাফন করবে।[৪]

---

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৯

[২] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০৫:

عن محمد بن علي بن عمر، أنه كان يقول: قبر فاطمة بنت رسول الله ﷺ زاوية دار عقيل اليمانية الشارع في البقيع.

[৩] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০৫

[৪] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০৬

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কবর বকী'তেই অবস্থিত। কেননা হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)-এর কবর বকী'তেই অবস্থিত।[1]

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে তাঁর হুজরা শরীফে দাফন করা হয়েছে। যাকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর হুজরা শরীফে দাফন করা হয়েছে।

হযরত ফাতিমা (রা.)-কে রাতের বেলায় দাফন করা হয়, যাতে লোকজন অবহিত হতে না পারে। যেমন- বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করেছিলেন। আমি আমার দেহকে লোক সমক্ষে উপস্থিত করতে লজ্জাবোধ করি। সেই সময়ে পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকদের লাশকেও বাইরে নিয়ে যাওয়া হত। হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) বললেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেছেন, আমি দেখেছি যে, হাবশা-আবিসিনিয়ার লোকেরা এক প্রকারের নকশা তৈরি করে, যাতে খুব বেশি পর্দা হয়। আমরাও আপনার জন্য তেমন নকশা তৈরি করব।[2]

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাইয়িদা ফাতিমা (রা.) অসিয়ত করেন, আমার গোসল এবং দাফন-কাফনের ভার যেন হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) গ্রহণ করেন। অপর কোন লোকজন যেন এতে অংশগ্রহণ না করেন।

যেসব লোক বলে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর মৃত্যুসংবাদ অবগত না হওয়ার কারণে জানাযায় উপস্থিত হননি। এ রিওয়ায়তের দ্বারা তাদের ধারণা অমূলক সাব্যস্ত হয় কেননা তৎকালীন সময়ে হযরত আসমা বিনতে ওমাইস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। আর একথা কিরূপে সম্ভব যে, তাঁর বিবি হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে হাযির হয়ে তাঁকে গোসল দেবে, আর তাঁর স্বামী মৃত্যুসংবাদ অবগত হয়ে জানাযায় উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন। কিন্তু একথা ভেবে যে, জানাযায় উপস্থিত তাঁর কাম্য নয়, তিনি তাঁর জানাযায় শরীক হওয়া সমীচীন মনে করেনি।

আল্লামা ইবনে হাজর আসকলানী (রহ.) বলেন, সম্ভবত হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) জানাযা এবং দাফনের সময় তাঁকে ডেকে পাঠাবেন। আর হযরত

[1] ইবনে শাব্বাহ, তারীখুল মদীনা, খ. ১, পৃ. ১০৭

[2] ইবনে শাব্বাহ, তারীখুল মদীনা, খ. ১, পৃ. ১০৮

আলী (রা.) মনে করেছিলেন যে, তিনি ডেকে পাঠান ছাড়াই উপস্থিত হবেন।[3]

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তিকালের খবর অবহিত হওয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য রিওয়ায়ত এই যে, এখন হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর লাশ খোলাভাবে বাইরে নিয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করেন, তখন আসমা বিনতে উমায়স (রা.) হাবশীদের অনুকরণে খুরমা গাছে শাখা-প্রশাখা দ্বারা একটা দোলনা নির্মাণ করে তাঁর নিকটে নিয়ে যান। তিনি তা প্রত্যক্ষ করে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন এবং মুচকি হাসি হাসেন। অথচ ইতঃপূর্বে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁকে আর কেউ হাসতে দেখেননি। তিনি আসমা বিনতে উমায়স (রা.)-কে অসিয়ত করেন যে, তুমি এবং হযরত আলী (রা.) আমাকে গোসল দেবে। আর কেউ যেন না আসে।

যখন হযরত ফাতিমা (রা.) ওফাত পান, হযরত আয়িশা (রা.) তার গৃহে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ওসিয়ত মোতাবেক হযরত আসমা (রা.) তাঁকে বাঁধা প্রদান করেন। হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট এর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, এ স্ত্রী লোকটির কি হয়েছে যে, তিনি আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ের মধ্যে আড়াল হয়ে রয়েছেন। তিনি আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। আর তিনি জানাযার খাটের ওপর নতুন দোলনার স্টেইজের ওপর নির্মিত দোলনার মতো কি যে একটি আড়াল তৈরি করেছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে হযরত আসমা (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি পয়গম্বর ﷺ-এর বিবিকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছ কেন? এবং ওপরে ডোলার মতো এ যে কি তৈরি করেছ? হযরত আসমা (রা.) উত্তর দিলেন, আমাকে হযরত সাইয়িদা ফাতিমা (রা.) অসিয়ত করেছেন যে, আমি যেন কাউকে তাঁর নিকট যেতে না দিই। আর আমি যা কিছু তৈরি করেছি, তা আমি তাঁর জীবদ্দশায় করেছি এবং তিনি তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। একথা শ্রবণে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, যদি ঘটনা এরূপই হয়, তবে তুমি তাঁর অসিয়ত মতই আমল কর।[4]

এ রিওয়ায়তের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ওফাত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ রিওয়ায়তের দ্বারা একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তাঁকে তাঁর হুজরা শরীফে দাফন করা হয়নি। কেননা যদি তাঁকে তাঁর হুজরা শরীফে দাফন করা হতো, তবে তাঁর লাশের ওপর চাঁদোয়ার (দোলনা) আড়াল দেওয়ার কোন প্রয়োজন হতো না।

[3] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯১; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আত-তালখীসুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীসির রাফিয়ী আল-কাবীর*, খ. ২, পৃ. ৩২৭

[4] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৯-৯২

কোন কোন দুর্বল রিওয়ায়তে বলা হয়েছে যে, হযরত ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) ভোর বেলা খুবই সন্তুষ্টচিত্তে ঘুম থেকে ওঠেন এবং দাসীকে বলেন যে, গোসলের জন্য পানি নিয়ে এসো। এরপর তিনি খুব উত্তম রূপে গোসলের কাজ সম্পন্ন করে পবিত্রতা অর্জন করেন। তিনি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরিধান করে বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং হাত মুবারক মুখমণ্ডলের নিচে রাখেন। এরপর তিনি বলেন, এখন আমার ইন্তিকাল হবে। আমি গোসল করেছি। পাক-পবিত্র বস্ত্র পরিধান করেছি। সুতরাং আমার ইন্তিকালের পর আমাকে গোসল দেওয়ার জন্য আমার দেহের বস্ত্র যেন না খোলে। আর আমি যে স্থানে শুয়েছি, সেখানে যেন আমাকে দাফন করা হয়। যখন হযরত আলী (আলাইহিস সালাম) বাড়িতে আসেন, তখন লোকজন তাঁকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত ফাতিমা (আলাইহাস সালাম)-এর নিকট গমন করে দেখতে পান যে, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরে তিনি বলেন, তাঁর বস্ত্র যেন কেউ না খোলেন। তিনি যে বস্ত্র পরিধান করেছেন সে বস্ত্রেই তাঁকে দাফন করা হবে। এরপর পূর্বের গোসলের ওপর নতুন কোন গোসল না দিয়েই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

এখানে এটি উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী রিওয়ায়তটি উল্লিখিত হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর রিওয়ায়তের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হযরত আসমা বিনতে উমায়সের হাদীসটিকে হাদীসশাস্ত্রের আলিমগণ বর্ণনা করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করেছেন। আর পরবর্তী হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে হাদীসবেত্তাদের মতভেদ রয়েছে। ইবনুল জওযী এ হাদীসটিকে বানোয়াটি উদ্ভট বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

মাসউদী তার কিতাব *মরূজুয যহবে* বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইমাম হাসান (আলাইহিস সালাম), ইমাম যাইনুল আবেদীন (আলাইহিস সালাম), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে বাকির (আলাইহিস সালাম) ও ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-এর কবরের নিকটে একখানা পাথর পাওয়া গেছে। উক্ত পাথরে লিখা আছে,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لله مُبِيْدِ الْأُمَمِ، وَمُحْيِى الرِّمَمِ، هٰذَا قَبْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ، وَقَبْرُ حَسَنِ بْنِ الْعَلِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَبْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجْعَفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০৮-১০৯
[২] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১০৮-১০৯

এ পাথরটি ৩৩৩ হিজরীতে পরিলক্ষিত হয়। এ রিওয়ায়তের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপরাপর আহলে বায়তের সাথেই হযরত ফাতিমা (আলাইহাস সালাম)-এর কবর জান্নাতুল বকী'তে অবস্থিত।[১]

অপর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, জান্নাতুল বকী'তে 'মসজিদে ফাতিমা' নামে যে একটি মসজিদে রয়েছে, সেখানেই তাঁর কবর। হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বজের কিবলার দিকে সামান্য পূর্বভাগে এ স্থানটি অবস্থিত। ইমাম গাযালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) জান্নাতুল বকী'র যিয়ারতের বর্ণনায় এ মসজিদটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে নামায আদায়ের অসিয়ত করেছেন।[২]

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এটি 'বায়তুল হুযন' নামেই খ্যাত। কেননা রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) বেদনাতুর হয়ে এখানে এসে অবস্থান করেন।

আরও বর্ণিত আছে যে, বকী'র ঘরটিকে হযরত আলী (আলাইহিস সালাম) ক্রয় করে নিয়েছিলেন।

মুহিব্বুত তাবারী *যাখায়িরুল উকবা* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমন একজন নেককার ব্যক্তি, যিনি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আমাকে বলেছেন যে, শায়খ আবুল হাসান শাযলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর একজন বিশিষ্ট শাগরিদ শায়খ আবুল আব্বাস মরসী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন জান্নাতুল বকী'র যিয়ারতে যেতেন, তিনি হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বজের সামনে দাঁড়িয়ে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ওপর সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, কাশফের দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবর এখানেই। কাশফের মধ্যে হযরত আবুল আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।[৩]

আল্লামা তাবারী বলেন, হযরত শায়খের খেদমতে থাকার কারণে আমি শায়খের বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হয়েছিলাম। পরে যখন হযরত ইমাম হাসান (আলাইহিস সালাম)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কে হযরত ইবনে আবদুল বরের বর্ণনা দেখি, তখন হযরত শায়খ কাশফের দ্বারা যে রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন এর ওপর আমার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে যায়। যদিও শাফিয়ী মাযহাবের কোন কোন আলিমগণ ঘরে দাফনের রিওয়ায়তকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মতপ্রকাশ করেছেন।[৪]

কিন্তু হযরত সাইয়িদ আলাইহির রহমাহ বলেন, জান্নাতুর বকী'তে দাফনের রিওয়ায়তই সর্বাপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য। হযরত সাইয়িদা ফাতিমা যুহরা (আলাইহাস সালাম) এগার হিজরী সনে রামাযান মাসে মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন।

[১] আল-মাসউদী, *মারূজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহর*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫
[২] আল-গাযালী, *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ২৬০
[৩] আত-তাবারী, *যাখায়িরুল উকবা ফী মানাকিবি যাওয়ীল কুরবা*, পৃ. ৫৪
[৪] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৮৯-৯৪

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর

বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকটে এ মর্মে সংবাদ পাঠান। আপনি আমাকে আমার নানা সাহেবের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি দিন। হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এতে রাজি হন এবং বলেন এমনিই হবে। সেখানে একটি কবরের স্থানও খালি রয়েছে। কিন্তু যখন উমাইয়া বংশের লোকেরা এ খবর শুনতে পায়, তখন তারা হাতে অস্ত্র ধারণ করে বেরিয়ে আসে। এদিকে হাশেমী বংশের লোকেরাও অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। উভয় পক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যখন ইমাম হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একথা শুনতে পান, তখন তিনি বলেন, সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটা আমি পছন্দ করি না। যদি অবস্থা এমনই হয় তবে তোমরা আমাকে আমার মাতার পাশে জান্নাতুল বকী'তেই দাফন করবে।[১]

অন্য একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, ইমাম হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যু মুহূর্তে বলেন, আমাকে আমার নানার পাশে দাফন করবে, যদি ওই গোত্র এতে বাধা প্রদান করে যেমনিভাবে আমরা হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বেলায় বাধা প্রদান করেছিল তবে আমাকে বকী'উল গরকদে নিয়ে দাফন করবে। তোমরা তাদের কাছে কাকুতি-মিনতি কর না। ঘটনা তেমনিই ঘটল, যেমনি তিনি বলেছিলেন। মদীনার প্রশাসক মারওয়ান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বলে, এটি কখনও বরদাশত করা হবে না যে, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুজরা শরীফে দাফন করা হবে। আর হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাইরে পড়ে থাকবেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)সহ অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম যাঁরা তৎকালীন সময়ে মদীনায় উপস্থিত ছিলেন গোপনে বলাবলি করেন যে, এতো প্রকাশ্য জুলুম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাতীকে তাঁর পাশে দাফন করতে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব সাহাবায়ে কিরাম তাঁর ভাই হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যান এবং বলেন যে, আপনার ভাই অসিয়ত করে গেছেন যে, যদি পরিস্থিতি সংঘর্ষের দিকে মোড় নেয়, তবে তোমরা আমাকে মুসলমানের গোরস্থানে দাফন করবে এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে যাবে, যাতে ঝগড়া-বিবাদ না হয়। সুতরাং তাঁর অনুরোধে তাঁকে বকী'তে দাফন করা হয়।[২]

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন সময়ে হযরত সায়ীদ ইবনুল আস হযরত আমীর মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক মদীনা শরীফের প্রশাসক নিযুক্ত ছিলেন। যখন হযরত হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশ বাইরে নিয়ে আসা হয়, তখন ইমাম

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১১১

[২] (ক) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১১০-১১১; (খ) ইবনে আবদুল বর, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ১, পৃ. ৩৯২

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেন সামনে আসুন এবং জানাযার নামায পড়ান। যদি আমার নানা সাহেবের এটা সুন্নত না হতো যে, শাসনকর্তাই জানাযার নামায পড়াবেন। তবে আমি কখনও আপনাকে এ নামাযের ইমামতির কথা বলতাম না।

হযরত ইমাম হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবরের নিকট হযরত যাইনুল আবেদীন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম জাফর সাদিক ইবনে ইমাম মুহাম্মদ বাকির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর বিদ্যমান।[১]

প্রকৃতপক্ষে হযরত আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বদের ভেতরেই সমস্ত আহলে বায়তের কবর অবস্থিত। যুবাইর ইবনে বক্কার বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশ নিয়ে আসেন এবং তাঁকেও জান্নাতুল বকী'তে দাফন করেন।

৮৬৭ হিজরীতে হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবরের কিবলার দিকে একটি কবর খনন করা হয়। যার মধ্যে একটি লাকড়ির (তাবুত) বের হয়। এ তাবুতের ওপরে লাল পোষাক ছিল এবং এতে পেরাক প্রোথিত ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পোষাক পুরাতন হয়নি এবং পেরাকসমূহেও মরীচিকা ধরেনি।

হযরত সৈয়দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সম্ভবত এ তাবুতটি হযরত আলী মরতুযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাবুত হবে। যুবাইর ইবনে বক্কার এবং অপরাপর বর্ণনাকারীগণ রিওয়ায়ত করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মস্তক মুবারক বদবখত ইয়াযীদ মদীনার প্রশাসক সায়ীদ ইবনে আসের নিকট মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করেন এবং সে তা কাফন পরায়ে তাঁর মাতা হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট বকী'তে দাফন করেন।

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মস্তক মুবারক ইয়াযীদের মালখানায় পাওয়া গেছে এবং জনগণ একে কফিন পরিয়ে দামেস্কের বাবুল ফরাদীসের নিকট দাফন করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, যাঁরা এ কবর স্থানে যিয়ারতে আসবেন তাঁদের উচিত, যেন তাঁরা এ সব হিদায়তের ইমামদের ওপর সালাম পেশ করেন।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর

ইবনে শাব্বাহ রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বনি হাশিমের সর্বপ্রথম কবরস্থান, যা

[১] মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ১৬৬

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৪-৯৫

দারে আকীলের পাশে অবস্থিত, সেখানে হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবরের নিকটে দাফন করা হয়।

ইবনে শাব্বাহ আরও বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জান্নাতুল বকী'র মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা হয়েছে।[১]

বর্তমানে বকী'তে একটি বড় গুম্বদ আছে, সেখানে হযরত আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হিদায়তের অপরাপর ইমামদের কবর বিদ্যমান। যেমনটি ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফু হযরত সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবর

জান্নাতুল বকী'তে গমনাগমনের সড়কের শেষ প্রান্তে দ্বারের মুগীরা ইবনে শু'বার নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরা ইবনে শু'বাকে উক্ত স্থানটি প্রদান করেন। যখন মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে গৃহ নির্মাণ আরম্ভ করেন, তখন হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সে দিক গমনের সময়ে তা প্রত্যক্ষ করে বলেন, তুমি আমার মায়ের কবরের ওপর দেয়াল খাড়া করবে এ আমার কাম্য নয়। কিন্তু হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় তিনি তাঁর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। তখন হযরত যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হস্তে তরবারি ধারণ করে, তাঁর ঘরের ভিত্তি স্থাপনের নিকটে এসে খাড়া হয়ে যান। যখন হযরত উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি হযরত মুগীরা ইবনে শু'বাকে সেখানে দেয়াল খাড়া করতে নিষেধ করেন। বর্তমানে বকী'র দিকে মদীনার শহর প্রাচীরের দ্বারের নিকটে তাঁর কবর অবস্থিত।[২]

আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর

তিনি পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কবরস্থানে ঘুরাফিরা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে চাচাত ভাই! আপনি এখানে কি খুঁজছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি কবর স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি, যাতে আমি সেখানে দাফন হতে পারি। হযরত আকীল তাঁকে স্বীয় গৃহে নিয়ে আসেন এবং তিনি তাঁর এলাকায় তাঁর কবরের জন্য কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করে দেন। সেখানে তাঁর কবর খনন করা হয়। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর তিনি চলে যান। এ ঘটনার পর

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৫; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৭

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৬; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৬

দু'দিন যেতে না যেতেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন এবং উক্ত কবরেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

বিশ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। বর্তমানে তাঁর নাম এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম আকীল ইবনে আবু তালিবের গুম্বদের দেয়ালে লিপিবদ্ধ আছে।

সাইয়িদ সামহূদী বলেন, পরিস্কার বোঝা যায় যে, হযরত আকীলের নামে অভিহিত গুম্বদের মধ্যেই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিসকে দাফন করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, ইবনে যুবালা ও ইবনে শাব্বাহ উভয়ই হযরত আকীলের কবর বকী'তে বলে উল্লেখ করেনি এবং ইমাম গাযযালীও তাঁর বিখ্যাত *ইয়াহইয়াউল উলুম* কিতাবে বকী'র যিয়ারত প্রসঙ্গে তাঁর কবরের কথা উল্লেখ করেননি। বরং ইবনে কুদামা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ বলেন যে, হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে হযরত আকীলের মৃত্যু সিরিয়ায়ই ঘটেছে। তবে বকী'তে হযরত আকীলের বাড়ি থাকার কারণে সেখানকার গুম্বজটি আকীলে গুম্বজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সিরিয়া থেকে তাঁর লাশ মদীনায় নিয়ে এসে বকী'তে দাফন করা হয়।

ইবনে নজ্জার বলেন, বকী'র সর্বপ্রথম গুম্বজের সর্বপ্রথম কবর হচ্ছে, হযরত আকীলের কবর এবং তাঁর পাশেই রয়েছে, তাঁর ভাইপো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর যিনি আরবের বিখ্যাত দানশীল ও বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি মদীনাতে ওফাত পান।

কোন কোন সীরাত লিখক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে ৯০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। সুতরাং দেখা যায় প্রথম হিজরী সনেই তাঁর জন্ম।[২]

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিত বিবিগণের কবর

মুমিনদের আম্মাজানগণের কবরসমূহ উল্লিখিত দারে আকীলের সন্নিকটেই অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, হযরত আকীল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় গৃহের নিকটে একটি কূপ খননের সময় একখানা পাথর বের হয়। পাথরখানায় লিখা ছিল, উম্মে হাবীবা বিনতে সখর বিনতে হারব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবর। তখন হযরত আকীল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূপ খনন বন্ধ করে দেন এবং কবরের ওপর ইমারত নির্মাণ করেন।[৩]

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৭

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৬-৯৭

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৭; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২০

সামহূদী বলেন যে, সমুদয় রিওয়ায়ত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, উম্মাহাতুল মুমিনীনের কবর ওখানেই, যেখানে লোকজন যিয়ারত করে থাকেন। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়তের দ্বারা বোঝা যায় যে এদের মধ্যে কারো কবর হযরত ইমাম হাসান ও হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের সন্নিকটে অবস্থিত।

ইবনে শাব্বাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া থেকে বর্ণনা করেন, আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি, হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কবর জান্নাতুল বকী'তেই অবস্থিত। যেখানে হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়দ ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর ও ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরও বিদ্যমান। বর্ণিত আছে যে, এ স্থানে আট গজ পরিমাণ মাটি খনন করা হলে সেখানে একখানা পাথর বের হয়, যাতে লিখা ছিল এটি হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কবর।[১]

সহীহ আল-বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অসিয়ত করেন যে, তাঁকে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথীদের হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যেন দাফন না করেন। বরং অপরাপর উম্মাহাতুল মুমিনীনের সাথে বকী'তেই যেন দাফন করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, প্রায় সমস্ত উম্মাহাতুল মুমিনীনের কবর মদীনা শরীফেই অবস্থিত। তবে উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কবর মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে তান'ঈমের নিকটে সরফ নামক স্থানে অবস্থিত। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর নিকাহও ওই স্থলে অনুষ্ঠিত হয়।[৩]

আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর

ইবনে শাব্বাহ বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন, তখন লোকেরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে হুজরা শরীফেই দাফন করার ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে এর অনুমতিও নিয়েছেন। কিন্তু মিসরীয়গণ এর বিরোধিতা করেন এমন কি তারা তাঁর জানাযার নামায পর্যন্ত সেখানে পড়তে দেননি। তারা বলতে থাকে যে, তাঁকে কোথাও দাফন করতে দেওয়া হবে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৭; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২০

[২] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৭; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১০৩, হাদীস: ১৩৯১:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ﷺ «لَا تَدْفِنِّي مَعَهُمْ وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ لَا أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا».

[৩] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৮

রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন একথা শুনলেন, তখন তিনি মসজিদে নববীর দরজায় এসে বলেন, খোদার শপথ তোমরা দাঁড়াও, আমি তাঁর দাফনের ব্যবস্থা করি। অন্যথায় আমি বের হয়ে পড়ব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর্দা খুলে দেবো।

এরপর মিসরীয়গণ তাঁর দাফনকার্যে বাধা প্রদান থেকে বিরত থাকেন। যেদিন তিনি শহীদ হন, সেদিন রাতে হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর লাশ মুবারক যেখানে পতিত ছিল, সেখান থেকে বকী'তে নিয়ে যান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে সেখানে দাফন করতেও বাধা দেয়। অবশেষে তাঁরা তাকে হুশ্‌শে কাওকব নামক স্থানে নিয়ে যান। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁর জানাযার নামায পড়েন। সেখানে একটি কবর খনন করে তাঁকে দাফন করেন এবং কবরের ওপর একটি দেয়াল নির্মাণ করে দেন। যাতে তাঁর দাফনের ব্যাপারটি প্রকাশ না পায়। হুশ্‌শে কওকব নামক স্থানটি জান্নাতুল বকীর বাইরে, এর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে হযরত আব্বাস ইবনে উসমানের একটি বাগান ছিল। এ স্থানে লোকজন তাঁদের মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে অপছন্দ করত।[১]

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, একজন নেককার লোক মারা যাবে, তাঁকে এ স্থানেই সমাধিস্থ করা হবে এবং এ কারণে এ স্থানটির প্রতি জনগণের আগ্রহ বেড়ে যায়। হযরত উসমানই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাঁকে এ স্থানে দাফন করা হয়। মারওয়ান যখন হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে মদীনা মুনাওয়ারার প্রশাসক ছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানটিকে জান্নাতুল বকী'র অন্তর্ভুক্ত করেন। যে পাথরখানাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উসমান ইবনে মাযঊন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের নিদর্শনস্বরূপ পুঁতে দিয়েছিলেন, যাতে লোকজন মৃত ব্যক্তিদেরকে সেখানে দাফন করতে আগ্রহী হয়। তিনি আরও বলেছিলেন, «لَأَجْعَلَنَّكَ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» (আমি তোমাকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দেব।) মারওয়ান সে পাথরখানাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরে লাগিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন, যেন লোকজন মৃত ব্যক্তিদেরকে তাঁর কবরের আশে-পাশে সমাধিস্থ করেন।[২]

হযরত সাদ ইবনে মুআয আল-আশহালী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর

হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু খন্দক যুদ্ধের দিন আহত হন। ইহুদী গোত্র কুরাইযার ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করার নিমিত্ত

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১১১–১১৫

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৮–৯৯

একে পাঠান, তখন তাঁর ক্ষত স্থান থেকে রক্তঝরা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যখন বিচারকার্য সম্পাদনের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, ক্ষত স্থান থেকে আবার রক্ত ঝরা আরম্ভ হয় এবং এতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। হুযূর আকরম ﷺ তাঁর জানাযার নামায পড়েন। হযরত ইবনুল আসওয়াদ رضي الله عنه-এর বাড়ির পাশ দিয়ে যে সড়কটি চলে গেছে তারই এক পাশে তাঁর বাড়ির নিকটে শেষ প্রান্তে তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

সামহূদী বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ হযরত সাদ ইবনে মুআয رضي الله عنه-এর কবরের যে পরিচিতি দান করেছেন, এতে প্রতীয়মান হয় যে, লোকেরা যে গুম্বজটিকে হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর দিকে সম্পর্কিত করে, সেখানে তাঁর কবর বিদ্যমান। তবে হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ رضي الله عنها-এর প্রতি লোকেরা গুম্বজটিকে সম্পর্কিত করেছেন। সম্ভবত তা সন্দেহের বশীভূত হয়েই করেছে। কেননা সহীহ রিওয়ায়তের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর কবর আহলে বায়তের কবর স্থানে। হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের পাশেই অবস্থিত।[২]

হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী رضي الله عنه-এর কবর

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু সয়ীদ খদুরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদিন আমার আব্বাজান আমাকে ডেকে বললেন, হে প্রাণপ্রিয় পুত্র! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার বন্ধুবান্ধব অপরাপর সাহাবীগণ সবাই ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। আমারও চলে যাবার সময় এসেছে। তুমি আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতুল বকী'তে নিয়ে যাও। আমি আদেশ অনুসারে তাঁর হাত ধরে তাঁকে বকী'তে নিয়ে যাই। যখন তাঁকে নিয়ে আমরা বকী'র শেষ প্রান্তে যেখানে ইতঃপূর্বে কোন লোকজন দাফন করা হয়নি উপস্থিত হই। তিনি আমাকে বললেন, যদি আমার ইন্তিকাল হয়, আমাকে এখানেই কবর দেবে। লোকজনকে আমার মৃত্যুসংবাদ দেবে না। আর আমকার গলি দিয়ে (যেখানে লোক জনের চলাচল কম) আমার লাশ নিয়ে যাবে। জানাযা দ্রুতগতিতে নিয়ে যাবে, যাতে লোকজন জানাযার সাথে শরীক না হয়। আর কাউকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে দেবে না। আমার কবরের ওপর তাঁবু স্থাপন করবে না।[৩]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ رضي الله عنه বলেন, যখন আমার আব্বাজানের ইন্তিকাল হয়, তখন লোকজন ঘরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১২৫
[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৯
[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৫

লাশ বাইরে নিয়ে আসার সাথে তাঁরা লাশের পিছনে চলতে পারে। অথচ আমি আমার আব্বাজনের অসিয়ত মতে কাউকে মৃত্যুসংবাদ দেইনি এবং লোকের ভিড় হওয়ার আগেই তাঁর লাশকে বকী'তে নিয়ে যাই। কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, আমি লাশ নিয়ে বকী'তে পৌঁছার পূর্বেই লোকজন একত্রিত হয়ে ভিড় জমে গেছে এবং লাশের অপেক্ষায় রয়েছে।[১]

এ পর্যন্ত জান্নাতুল বকী'র সেসব কবরের কথা উল্লেখ করা হল, যা ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন রিওয়ায়ত ও সূত্রধরে বর্ণনা করেছেন।

জান্নাতুল বকী' ও মদীনা নগরীর আশে-পাশের গুম্বজসমূহের বর্ণনা, যা প্রাচীন আমলের বা নতুন যমানার বাদশাগণ বাস্তব তথ্য বা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন

- **প্রথম গুম্বজ:** হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের গুম্বজ। কথিত আছে যে, ৫১৯ হিজরীতে আব্বাসীয় বংশের কোন খলীফা এ গুম্বজটি নির্মাণ করেন। এ গুম্বজটিই সর্ববৃহৎ।
- **দ্বিতীয় গুম্বজ:** পয়গম্বর ﷺ-এর মেয়েদের গুম্বজ।
- **তৃতীয় গুম্বজ:** উম্মাহাতুল মুমিনীন গুম্বজ।
- **চতুর্থ গুম্বজ:** সাইয়িদুনা ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুম্বজ।
- **পঞ্চম গুম্বজ:** হযরত আকীল ইবনে আবু তালিবের গুম্বজ। এ স্থানে দু'আ কবুল হয় বলে একটি রিওয়ায়ত আছে।
- **ষষ্ঠ গুম্বজ:** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফী হযরত সুফিয়া رضي الله عنها-এর গুম্বজ।
- **সপ্তম গুম্বজ:** হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর গুম্বজ। এটি ছাড়াও এখানে আরও একটি কবর আছে। লোকেরা ধারণা করেন যে, এ কবরটি ইমারতের মুতাওয়াল্লীর কবর।
- **অষ্টম গুম্বজ:** আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رضي الله عنه-এর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ رضي الله عنها-এর গুম্বজ।

এ ছাড়াও বকী'তে আরও দুটো গুম্বজ আছে। এর মধ্যে একটি দারে হিজরত (মদীনা শরীফ)-এর ইমাম হযরত ইমাম মালিক رضي الله عنه-এর গুম্বজ। যিনি মালিকী মাযহাবের প্রবর্তক, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একান্ত আশেক এবং মদীনা তাইয়িবায় বসবাসকারী ছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত নাফি رضي الله عنه-এর গুম্বজ।

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৯; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৭

সাইয়িদ সামহূদী এভাবেই উল্লেখ করেছেন। মদীনাবাসীদের মধ্যে এটি খ্যাতি লাভ করেছে যে, মদীনার কারী হযরত নাফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর মদীনায় অবস্থিত।

সামহূদী বলেন, ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা থেকে বোঝা যায় যে, সাইয়িদুনা হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুম্বজ এবং ইমাম মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বজদ্বয়ের মাঝখানে আবদুর রহমান ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবেরও একটি কবর আছে। তাঁকে আবদুর রহমান আওসত (মধ্য) বলা হত। তিনি আবু শাহমা নামেই পরিচিতি। তাঁর ওপর যিনার শরয়ী হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করার কারণে দুঃখে এবং চিন্তায় জর্জরিত হয়ে ইন্তিকাল করেন।

সাইয়িদ সামহূদী বলেন, হযরত নাফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে যে গুম্বজটিকে সম্পর্কিত করা হয়, এটিই সেই গুম্বজ।

হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর গুম্বজের পথে আরো একটি ছোট গুম্বজ আছে যা হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধাত্রী হযরত হালীমা সাদিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর প্রতি সম্পর্কিত। কিন্তু ইতিহাসের যতগুলো পুস্তক নযরে পড়েছে সেসব পুস্তকে কেউ এর উল্লেখ করেননি। উল্লিখিত মাযারসমূহ সবিশেষ বিখ্যাত। তবে পূর্বে যেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাই বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত।[১]

মদীনা নগরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গুম্বজসমূহের বর্ণনা

মদীনা শরীফের শহর প্রাচীরের অভ্যন্তরে যে সমুদয় গুম্বজ রয়েছে তার মধ্যে সাইয়িদিনা ইসমাইল ইবনে ইমাম জাফর সাদিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বজই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এ গুম্বজটি সাইয়িদিনা হযরত আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর গুম্বজের মুকাবিলায় পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এ গুম্বজটি শহর প্রাচীর নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়। ওবাইদিয়া বংশীয় বাদশাহগণের উযীর ইবনে আবুল হায়জা এ গুম্বজটি নির্মাণ করেন। তিনিই মসজিদে কুবাকে নতুন সূত্রে নির্মাণ করেছিলেন। ৫৪৬ হিজরীতে গুম্বজটি নির্মিত হয়।

বর্ণিত আছে, যেমন এ গুম্বজটি উত্তর দিকে হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৌলতখানার দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাইরের দরজা এবং বাগানের দরজার মাঝখানে একটি কূপ আছে। এ কূপটি হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কূপ বলে খ্যাত। এ কূপের পানি পানে রোগ আরোগ্য হয়।

বর্ণিত আছে যে, একদিন ছোট বেলায় হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কূপের মধ্যে পতিত হয়। ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন নামাযে মশগুল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার কারণে তিনি নামায ভঙ্গ করেননি। এ গুম্বজের পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ আছে, যাকে ইমাম যাইনুল

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ৯৯–১০২

আবেদীনের মসজিদ বলা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ লোক এর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত।[১]

বকী'র বাইরের কবরস্থানসমূহ

৪. হুযূর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা এবং তাঁর দুধ ভাই, শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কবর

৫৯৫ হিজরীতে খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহর মাতা এ কবরের ওপর গুম্বজ নির্মাণ করেন। হযরত আমির হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদত বরণের পর যে স্থানে পড়ে গিয়েছিলেন, সেখানে একখানা পাথরের ওপর তারিখ লেখা ছিল। কোন একজন মূর্খ ব্যক্তি পাথরখানাকে ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসে। ৮৯৩ হিজরীতে সুলতান কাতীবা কবরের ইমারত ও এর প্রাঙ্গণকে আরও প্রশস্ত করেন।

এখানে সান্‌কর তুর্কী নামক আরেক ব্যক্তিরও একটি কবর আছে। এ লোকটি এ ইমারতের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। এ ইমারতের প্রাঙ্গণে মদীনার একজন ভদ্র আমীরেরও অপর একটি কবর আছে। কেউ যেন এগুলোকে শহীদের কবর মনে না করে।

এখানে যাঁরা যিয়ারতে আসবেন, তাঁরা যেন হযরত হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাগিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপরও সালাম পাঠ করেন। কেননা এ উভয় বুযুর্গকেও এখানে দাফন করা হয়েছে।[২]

হযরত আবু জাফর ইমাম মুহাম্মদ বাকির রিওয়ায়ত করেন যে, ফাতিমা যুহরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত আমির হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর যিয়ারতে যেতেন এবং কবরের সংস্কার ও মেরামত করতেন। তিনি তাঁর কবরের নিদর্শন স্বরূপ একখানা পাথর স্থাপন করেছিলেন।[৩]

হাকিম আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রত্যেক জুমাবার হযরত আমির হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর শরীফ যিয়ারতে গমন করতেন। সেখানে তিনি নামায আদায় করতেন ও ক্রন্দন করতেন।[৪]

[১] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৩

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৪–১০৫

[৩] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১১; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩২:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ ﷺ تَرُمُّهُ وَتُصْلِحُهُ، وَقَدْ تَعَلَّمْتُهُ بِحَجَرٍ.

[৪] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১১; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৫৩৩, হাদীস: ১৩৯৬: =

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, তিনি দু'তিন দিন অন্তর সর্বদা উহুদের শহীদগণের যিয়ারতে তশরীফ নিয়ে যেতেন। সেখানে তিনি নামায আদায় করতেন, তাঁদের জন্য দু'আ এবং ক্রন্দন করতেন।[১]

৫. আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা মালিক ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর

এ কবরটি মদীনা নগরীর প্রাচীরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন পদ্ধতির একটি গুম্বজ আছে। তিনি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত। ওখান থেকে তাঁর লাশ নিয়ে এসে এখানে দাফন করা হয়। পূর্বে এ স্থানটি মদীনার বাজারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২]

৬. হযরত নফসে যাকিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর

তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে হযরত আলী মুরতযা রাযিয়াল্লাহু আনহু সাইয়িদ শরীফ। তাঁর উপাধি মাহদী। আবু জাফর মনসুরের যমানায় তিনি শাহাদতবরণ করেন। মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে সাল্'আ নামক পাহাড়ের পূর্ব দিকে তাঁর কবর অবস্থিত। কবরের ওপর বিরাট ইমারত নির্মিত হয়েছে। সেখানে একখানা মসজিদও বিদ্যমান আছে। মসজিদের কিবলার দিকে আইনে যুরকা নামক একটি নহর চালু আছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নফসে যাকিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বহু লোক তাঁর হাতে বায়আত গ্রহন করেন। খলীফা মনসুর একথা শুনে তাঁর চাচা ঈসা ইবনে মূসা সাল্'আ পর্বতের নিকটে এসে থেমে যায় এবং নফসে যাকিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এই মর্মে দূত প্রেরণ করেন যে, যদি তিনি খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন, তবে তিনি তাকে নিরাপত্তা দেবেন। এর জবাবে তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন সম্মানের মৃত্যু অসম্মানের জিন্দেগি থেকে শ্রেয়। এরপর তিনি তাঁর তিন'শ সহচর সকলেই সুন্দরভাবে গোসল করে, গায়ে খুশবো মেখে ঈসা ইবনে মূসা এবং তার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালান এবং তিনবার তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিয়েও পরিশেষে শত্রুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পরাস্ত হন।

মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযীর পৌত্র *রিয়াযুল আফহাম* নামক কিতাবে লিখেছেন, ঈসা ইবনে মূসা তাঁর মস্তক মুবারক খলীফা মনসুরের নিকটে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর দেহ মুবারক তাঁর বোন যায়নাব এবং তাঁর মেয়ে ফাতিমা গোপনে

= عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ.

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১১
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৫

নিয়ে এসে বকী'তে দাফন করেন। কিন্তু সঠিক তথ্য মতে তিনি মালিক ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের নিকটে শহীদ হন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতরী এবং তাঁর অনুসারীগণ তাই উল্লেখ করেছেন। এখানেই নবী করীম ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করেন।[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সুবিখ্যত তরবারি যুলফিকার হযরত নফসে যাকিয়া রাহিমাহুল্লাহু-এর নিকটেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঈসা ইবনে মূসা তাঁর কোমর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খলীফা মনসুরের নিকটে পাঠিয়ে দেন। পরে তা খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

আসমায়ী বলেন যে, আমিও তরবারিটিকে দেখেছি। এতে আঠারটি ফিকরা রয়েছে, পিটের হাড্ডিকে ফিকরা বলা হয়। এ তরবারিটি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূর আকরম ﷺ থেকে লাভ করেছিলেন। সীরাত এবং হাদীসের কিতাবসমূহে এভাবেই বর্ণিত আছে।

বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধের দিন হযরত নফসে যাকিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সহচর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির সুলমীকে বলেছিলেন, একখণ্ড মেঘ এতে আমাদের মাথার ওপরে ছায়া দেবে। যদি সে মেঘের বৃষ্টি আমাদের ওপর বর্ষিত হয়, তবে আমরা বিজয়ী হবো। আর যদি আমাদের থেকে সরে গিয়ে শত্রুর মাথার ওপরে পৌঁছে যায়, তবে জেনে রাখ যে, আমার রক্ত আহজারে যায়তের ওপর পতিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমির বলেন, খোদার শপথ! মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নফসে যাকিয়া রাহিমাহুল্লাহু যেমন বলেছিলেন, ঘটনা তেমনিই ঘটে। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ আমাদের মাথার ওপর দেখা যায় এটি আমাদেরকে অতিক্রম করে ঈসা ইবনে মূসার মাথার ওপর পৌঁছে যায়। অবশেষে তারা বিজয়ী হয় এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর হাতে নফসে যাকিয়া রাহিমাহুল্লাহু শহীদ হন, আর তার রক্ত আহজারে যায়তে পতিত হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহু নফসে যাকিয়া রাহিমাহুল্লাহু-এর পক্ষ সমর্তন করায় ঈসা ইবনে মূসা তাঁকে মারধর করেন। ইমাম আল-ফররবী *তাতায়াম্মু ফী যিয়ারাতি আহলিল বকী'* নামক কিতাবে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২]

আহলে বকী'র যিয়ারতের তরীকায়ে সুন্নাত

আহলে বকী'র যিয়ারতের সুন্নত তরীকা এই যে, যখন বকী'র দরজায় উপস্থিত হবে, তখন কবর যিয়ারত আরম্ভের সময় যে বিখ্যাত সালামটি পাঠ করা মুস্তাহাব প্রথমে সে সালামটি পাঠ করবে। এরপর এ দু'আটি পাঠ করবে:

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৫–১০৬
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৫–১০৬

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ».

এ দু'আ পাঠের আগে বা পরে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে।

উল্লেখ্য যে, কবরস্থানে এসে ইখলাস পাঠ করা সুন্নতে মুআক্কাদা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কবরস্থানে এসে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে, কবরবাসীদের ওপর হাদিয়া পেশ করবে, তাকে সে কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিদের সমসংখ্যক সওয়াব দেওয়া হবে। আর যিয়ারতকারীর উচিত যে, তিনি যেন তার সালামে সমস্ত আওলাদে রাসূল, আসহাব এবং এ গোরস্থানে বিদ্যমান সমস্ত মুমিনদের শামিল করেন। আরো উচিত যে তিনি যেন যিয়ারতের সময় তাঁর চেহারাকে হযরত ﷺ-এর ফুফিজানের দিকে ফিরান। যার কবর বকী' দরজা সংলগ্ন বাম পাশে অবস্থিত।[১]

বকী'তে সর্বপ্রথম কার যিয়ারত করা উচিত?

এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের আলিমদের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। একদল আলিম বলেন যে, সর্ব প্রথম হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথে একই গুম্বজে শায়িত অপরাপর আহলে বায়তের ইমামদের যিয়ারত করা উচিত। কেননা এটি সহজ এবং তাঁদের অতিক্রম করে অপরাপর লোকের যিয়ারত করা অশোভনীয় ও বেয়াদবী।

বর্ণিত আছে যে, পূর্ব যমানায় মদীনাবাসীদের এটিই রীতি ছিল। পরবর্তী কালেও মদীনার কোন কোন মাশায়িখ যেমন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইরাক প্রমুখ বুযুর্গকেও লোকেরা এভাবে যিয়ারত করতে প্রত্যক্ষ করেছে। শায়খ সাহেব বড় মুত্তাকী ও সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। হানাফী মাযহাবের কোন কোন আলিমও খোলাখুলিভাবে এ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন।

সামহূদীর কোন কোন বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি তাঁর *ইরশাদ* নামক কিতাবে বলেছেন যে, যিয়ারতকারী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মওকফ অর্থাৎ খাড়া হওয়ার স্থান দারে আকীলের নিকটে গিয়েই দাঁড়াবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, হুযূর পাক ﷺ সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং বকী'বাসীদের জন্য দু'আ করেছেন। বর্তমানে সেখানে মওকফুন্নবী নামক একটি ছোট মসজিদ বিদ্যমান আছে।

এখানকার যিয়ারতের পরে পর্যায়ক্রমে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা, হযরত ইবরাহীম

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ২২১-২২২

ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ, উম্মাহাতুল মুমিনীন, হযরত ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, হযরত নাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সুফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীনের যিয়ারত করবে।

অপর একদল বলেন যে, সাইয়িদিনা হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই যিয়ারত আরম্ভ করবে এবং তাঁর সাথে তাঁর ভগ্নিদেরও যিয়ারত করবে। কেননা তাঁরা হযরত ﷺ-এর সন্তানদের ওপর অপরাপরদের অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন নয়। যিয়ারতের এ নিয়মটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে মনে হয়।

আলিমদের অপর একটি দল বলেছেন, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরই সর্বপ্রথম যিয়ারত করবে। তাঁদের যুক্তি হল হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু অপরাপর বকী'বাসীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, ইবনে ফরহূন মালিকী প্রমুখ আলিমগণ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরে যেতে যাঁদেরকে অতিক্রম করতে হয়, তাঁদেরকে সালাম দিয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যাবে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যাঁরা তাঁর গুম্বজের নিচে রয়েছেন, তাঁদের যিয়ারত করবে। এরপর হযরত উম্মুহাতুল মুমিনীন হযরত ﷺ-এর বিবিগণের বিশেষ করে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইত্যাদির যিয়ারত করবে। এরপর হযরত আকীলের কবরে এসে যিয়ারত করবে। এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করে দু'আতে মশগুল থাকবে। কেননা এটি নবী করীম ﷺ-এর দাঁড়ানোর স্থান এবং এখানে দু'আ কবুল হয়। এরপরে সাইয়িদুনা হযরত ইবরাহীম ইবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর যিয়ারত করবে। তাঁর সাথে তাঁর ভগ্নি সাহেবান, হযরত উসমান ইবনে মাযঊন রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অপরাপর সাহাবীগণ যাঁরা সেখানে শায়িত আছেন, তাদের যিয়ারত করবে।

কোন কোন আলিমের মত এই যে, বকী'র যিয়ারত হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর গুম্বজ থেকে আরম্ভ করবে। এরপর যাঁর কবর সামনে আসবে, তাঁরই যিয়ারত করবে। কেননা তাঁরা এমন মহান সত্তা যে, তাঁদের ওপর সালাম পাঠ না করে, তাঁদেরকে অতিক্রম করে যাওয়া বড় বেআদবী। তবে এ ক্ষেত্রে বড়দের সম্মান না দেখালে অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্টদের যিয়ারত আগে না করলে কোন অসুবিধা হবে না।

মদীনাবাসী একদল আলিম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা যখন বকী' যিয়ারতে যেতেন, তখন তাঁরা সর্ব প্রথম মওকফুন্নবী ﷺ গিয়ে দঁড়াতেন। আর সমস্ত বকী'বাসীদের ওপর সালাম পাঠ করে তাঁদের জন্য দু'আ এবং স্বীয় মকসূদ পূরণের জন্যও আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করতেন, কবর বিশেষে গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতেন না। হযরত নবী করীম ﷺ-এর আমলই তাঁদের দলীল। তাঁরা মনে করেন, এতে সুন্নতের অনুসরণ হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে যদি হযরত ﷺ-এর এ

রূপ আমল প্রমাণিত হয় এবং তাঁর সুন্নাতের পায়রবী তাঁদের উদ্দেশ্যে হয়, তবে ভালো কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সওয়াব হাসিল করা হয়, তবে তা আরও ভালো কথা।[১]

আহলে বায়তের যিয়ারত প্রসঙ্গ

ফসলুল খিতাব নামক কিতাবে হযরত ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

«مَنْ زَارَ وَاحِدًا مِّنَ الْأَئِمَّةِ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».

'যে ব্যক্তি আহলে বায়তের কোন ইমামের কবর যিয়ারত করবে, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারত করল।'

একজন লোক হযরত ইমাম মূসা রেযা আলাইহিস সালাম-এর নিকট আরজ করল, আপনি আমাকে আহলে বায়তের যিয়ারতের সর্বোত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিন, যাতে আমি ওভাবে তাঁদের যিয়ারত করতে পারি। তিনি বললেন, যদি তুমি আহলে বায়তের যিয়ারতের ইচ্ছা কর, তবে তুমি প্রথমে গোসল করবে। এরপর প্রথম দরজায় দাঁড়িয়ে কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে। এরপরে ভেতরে প্রবেশ করে যখন তোমার দৃষ্টি কবরের ওপর পতিত হবে, তখন প্রথম ত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ২২১-২২২

ত্রয়োশ অধ্যায়

উহুদ পর্বতের ফযীলতের বর্ণনা

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পর্বতকে ভালোবাসতেন এবং এ পর্বতও তাঁকে ভালোবাসত। এখানেই সাইয়িদুশ শুহাদা (শহীদগণের সরদার) হযরত আমির হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেন, উহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা অপরাপর ইসলামী যুদ্ধের বর্ণনার সাথে সীরাত এবং ইতিহাসের কিতাবসমূহে সবিস্তারে বর্ণিত আছে এখানে শুধু উহুদের ফযীলত এবং উহুদ যুদ্ধে যাঁরা শাহাদতবরণ করেন, তাঁদের কবর সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন,

«هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

'এটি এমন একটি পর্বত যে, আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও একে ভালোবাসি।'[১]

এ বাক্যটি হযরত ﷺ-এর যবান মুবারক থেকে বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। বুখারী শরীফের বিভিন্ন রিওয়ায়তেই এর প্রমাণ। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন বিশ্বনবী ﷺ-এর দৃষ্টি যখন উহুদ পর্বতের ওপর পতিত হয়, তিনি আল্লাহু আকবার বলে ইরশাদ করেন,

«هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ عَلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا عَيْرٌ جَبَلٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ عَلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ».

'এটি এমন একটি পাহাড়; যে আমাকে ভালোবাসে, এবং আমিও একে ভালোবাসি। এটি বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্য একটি দরজায় অবস্থিত আর ঈর পর্বত; আমার সাথে শত্রুতা রাখে এবং আমিও এর সাথে শত্রুতা রাখি। সেটা দোযখের দরজাসমূহের মধ্যে থেকে একটি দরজায় অবস্থিত।'[২]

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৬; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৫৪২৫; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৩৩, হাদীস: ৪৬২ (১৩৬৫)

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৭; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৬, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৬৫০৫

'ঈর উহুদ পাহাড়ের বরাবর মক্কায় রাস্তার একটি পাহাড়ের নাম। আলিমগণ বলেন যে, উল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, জড় পদার্থের মধ্যেও মায়া-মমতা হিংসা-বিদ্বেষ এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য বিদ্যমান।

ইমাম নববী বলেন যে, হাদীসের দ্বারা যে উভয় পক্ষের ভালোবাসা বোঝা যায়, এটি বাস্তব ভিত্তিক। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, উহুদ পর্বতের স্থান আখিরাতে জান্নাত হবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ».

'যে যাকে ভালোবাসে, সে তারই সাথে থাকবে।'[১]

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেহেশতের সরদার, তিনি বেহেশতে থাকবেন। উহুদ পর্বতও তাঁকে ভালোবাসার দরুন তাঁর সাথে বেহেশতেই অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড় পর্বতের মধ্যে এ ভালোবাসা রেখে দিয়েছেন, যেভাবে পাহাড় এবং অপরাপর জড় পদার্থসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করার শক্তি দান করেছেন। যেমন কুরআন পাকের মধ্যে বর্ণিত আছে যে,

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۗ

'এমন কোন বস্তু নেই, পরন্তু সবই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতার গুণ কীর্তন করে।'[২]

সুতরাং যদি কোন পাহাড়ের মধ্যে তাঁর প্রিয় রাসূলের ভালোবাসা নিহিত থাকে, এতে আশ্চর্যের কি আছে।

سرحب ازلی در ہمہ اشیاء جاریست ☆ ورنہ بر گل نہ زدے بلبل مسلیں فریاد

'আদিকালের সৃষ্ট মুহাব্বত রহস্য প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে নিহিত রয়েছে। যদি এটা না হত, তবে ফুলের ওপর বেচারা বুলবুল আর্তনাদ করত না।'

জ্ঞানবিশারদ আলিমগণ বলেন, আমাদের নবী করীম ﷺ শুধু জীন, মানুষ এবং ফেরেশতাদের প্রতি প্রেরিত হননি, বরং তিনি গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিই প্রেরিত হয়েছেন। এ কারণেই তিনি উহুদ পর্বতকে সম্বোধন করে বলেছেন,

«أُسْكُنْ يَا أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَشَهِيدٌ».

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ৩৯, হাদীস: ৬১৬৮; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২০৩৪, হাদীস: ১৬৫ (২৬৪০)

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৪৪

'হে উহুদ! তুমি থেমে যাও, কেননা তোমার ওপর নবী এবং শহীদ আরোহণ করেছে।'[১]

এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাহাড় পর্বতের মধ্যেও জ্ঞান ও বোধশক্তি রয়েছে। অন্যথায় তিনি উহুদকে এভাবে সম্বোধন করতেন না। কেননা জ্ঞান ও বোধশক্তি ব্যতীত সম্বোধন উপলব্ধি করার অন্য কি উপায় থাকতে পারে? আর ইশক-মুহাব্বতের জন্য জ্ঞান ও বোধশক্তি অনিবার্য। সুতরাং বোঝা যায়, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির মধ্যেও বোধশক্তি বিদ্যমান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রস্তরখণ্ড তাঁকে সালাম করত, আর মসজিদে নববীর খাম্বার (থাম) তাঁর বিরহ-বেদনায় ক্রন্দন করত, এ সমুদয় জড়পদার্থের মধ্যে জ্ঞান ও বোধশক্তি বিদ্যমান থাকারই জ্বলন্ত প্রমাণ। অতএব এ সব দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে উহুদ পাহাড়ের মধ্যে ভালোবাসা থাকার প্রশ্নেও আর কোন জঠিলতা থাকে না।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে মদীনার মানুষ যেমন খাঁটি ও নির্ভেজাল এবং মুনাফিক এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, মদীনার স্থানসমূহও দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এ কারণে ঈর পর্বত, মসজিদে যিরার মুনাফিকদের আওতাভূক্ত হয়। সুতরাং আখিরাতেও এটা মুনাফিকদের সাথে দোযখে থাকবে। উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক, তার অপরাপর মুনাফিক সহচরসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে বের হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা নবী এবং সিদ্দীকগণের পবিত্র ভূমি উহুদ পর্যন্ত পৌঁছতে তারা সক্ষম হয়নি। বরং মদীনার নিকটবর্তী স্থান থেকে তাদের সেই অভিশপ্ত স্থানে ফিরে আসে।

কোন কোন আলিম উহুদ পাহাড়ের মুহাব্বত এবং 'ঈর পাহাড়ের বিদ্বেষ অর্থ এই এলাকার বাসিন্দাদের মুহাব্বত ও বিদ্বেষ বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আর যারা মুহাব্বতের অর্থ আনন্দ ও খুশি বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা বলেছেন যে, যখন হযরত ﷺ সফর থেকে ফেরার পথে জবলে উহুদ প্রত্যক্ষ করতেন, তখন তিনি এই ভেবে যে, 'আমরা তো এখন মদীনায় পৌঁছে গেছি' খুবই আনন্দিত হতেন আর উহুদ পর্বতও তাঁদেরকে স্বদেশে পৌঁছে যাওয়ার সুসংবাদ দিতেন। একেই হাদীসে মুহাব্বত বলে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২]

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৬৭৫, হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ».

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৯

বর্তমানেও উল্লিখিত পাহাড় দুটো থেকে হুযূর আকরম ﷺ-এর মুহাব্বত ও বিদ্বেষ সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যার ইচ্ছে হয়, সে গিয়ে দেখতে পারে। যখন উহুদ পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তখন নূর ভেসে ওঠে এবং আনন্দ-উল্লাসে মন বিভোর হয়ে যায়। আর যদি 'ঈর পর্বতের ওপর দৃষ্টি পড়ে, তখন মন পেরেশান এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উহুদ শব্দটি তাওয়াহুদ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে একাকী হওয়া। আর এ অর্থটি উহুদের ওপর প্রযোজ্য। কেননা মদীনার অদূরে দু'তিন মাইলের ব্যবধানে অপরাপর পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একাকীই এ পাহাড়টি অবস্থিত। সুতরাং এ পাহাড়টির উহুদ নামকরণ যথাযথই হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ওয়াহদানিয়ত (একত্ববাদ) এ বিশ্বাসী তওহীদী জনতার এটিই আশ্রয়স্থল ও কেন্দ্রভূমি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ নাম যথাযোগ্য হয়েছে। আর 'ঈর পর্বত হচ্ছে এর বিপরীত। কেননা এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জঙ্গলের গর্দভ। যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসৎ চরিত্র পরিলক্ষিত হয়।

বর্ণিত আছে যে, 'উহুদ বেহেশতের পাহাড়সমূহের মধ্য থেকে একটি পাহাড়। যদি তোমরা এখান থেকে পথ অতিক্রম কর, তবে তোমরা এখানকার বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে যদি ফল না মিলে, তবে বৃক্ষের পাতা খেয়ো।'[১]

হযরত আনাস ইবনে মালিকের পত্নী যায়নাব বিনতে নুবায়ত থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের সন্তানগণকে বলতেন, তোমরা উহুদ পাহাড়ে গমন করবে এবং আমার জন্য সেখানকার ঘাস-পাতা ইত্যাদি নিয়ে আসবে।[২]

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে যে,

«أُحُدٌ عَلَىٰ رُكْنٍ مِّنْ أَرْكَانِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَىٰ رُكْنٍ مِّنْ أَرْكَانِ النَّارِ».

'উহুদ বেহেশতের একটি অঙ্গ বিশেষ এবং ঈর দোযখের একটি অঙ্গ বিশেষ।'[৩]

তবরানী আমর ইবনে আওফ থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«أَرْبَعَةُ أَجْبَالٍ مِّنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَأَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِّنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَأَرْبَعَةُ

[১] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৪; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ২৫৫, হাদীস: ১৯০৫:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ».

[২] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৪

[৩] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৩; হযরত দাউদ ইবনুল হুসাইন رحمه الله থেকে বর্ণিত

مَلَاحِمَ مِنْ مَلَاحِمِ الْجَنَّةِ»، قِيْلَ: فَمَا الْأَجْبَالُ؟ قَالَ: «أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ مِّنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَوَرِقَانُ جَبَلٌ مِّنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَالطُّوْرُ جَبَلٌ مِّنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَلُبْنَانُ جَبَلٌ مِّنْ أَجْبَالِ الْجَنَّةِ، وَالْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ: اَلنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْمَلَاحِمُ بَدْرٌ، وَأُحُدٌ، وَالْخَنْدَقُ، وَالْحُنَيْنُ».

"চারটি পাহাড় বেহেশতের অন্তর্ভুক্ত, চারটি নদী বেহেশতের নদীসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং চারটি যুদ্ধ বেহেশতের যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত।' জিজ্ঞাসা করা হল, পাহাড়সমূহ কি কি? ইরশাদ করলেন, '১. উহুদ: যে আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও যাকে ভালোবাসি, এ বেহেশতের পাহাড়সমূহের একটি।' ২. ওয়ারকানা: বেহেশতের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত একটি পাহাড়। ৩. তূর: বেহেশতের পাহাড়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি পাহাড়। ৪. লুবনান: এটাও বেহেশতের পাহাড়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি পাহাড়। বেহেশতের নদী চারটি: ১. নীল, ২. ফুরাত, ৩. সায়হান, ৪. যায়হান। বেহেশতের যুদ্ধ চারটি: ১. বদর, ২. উহুদ, ৩. খন্দক ও ৪ হুনাইন।"[১]

ইবনে শাব্বাহও হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন তবে যুদ্ধের উল্লেখ নেই।[২]

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ ছয়টি পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মিত: ১. আবু কুবাইস, ২. তূর, ৩. কুদস, ৪. ওয়ারকান ৫. রিযবী ও ৬. উহুদ।

ইবনে শাব্বাহ হযরত আনস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, 'যখন আল্লাহ জাল্লাশানহু তূর পাহাড়ের ওপর ঝলওয়া নিক্ষেপ করেন, তখন তার অসীম বুযুর্গী এবং অনন্ত শান-শওকতে ভীত হয়ে ছয়টি পাহাড় ওড়ে গিয়ে তিনটি মদীনায় এবং তিনটি মক্কায় পতিত হয়। যেগুলো মদীনায় পতিত হয়, সেগুলো হচ্ছে, ১. উহুদ, ২. ওয়ারকান ও ৩. রিযবী। আর যেগুলো মক্কায় পতিত হয়, সেগুলো হচ্ছে, ১. হিরা, ২. সবীর ও ৩. সওর।'[৩]

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১৭, পৃ. ১৮, হাদীস: ১৯

[২] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮০

[৩] ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৭৯:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا تَجَلَّى اللهُ ﷻ لِلْجَبَلِ، طَارَتْ لِعَظَمَتِهِ سِتَّةُ أَجْبُلٍ، فَوَقَعَتْ ثَلَاثَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِمَكَّةَ، وَقَعَ بِالْمَدِيْنَةِ أُحُدٌ وَوَرِقَانُ وَرَضْوَى، وَوَقَعَ بِمَكَّةَ حِرَاءُ وَثَبِيْرٌ وَثَوْرٌ».

ওয়ারকান মক্কা-মদীনার রাস্তায় অবস্থিত। মদীনা শরীফ থেকে এর দূরত্ব ৪৮ মাইল। রিযবী লোহিত সাগরের কিনারায় ইয়ানবা' নামক স্থানে অবস্থিত। এর দূরত্বও মদীনা থেকে প্রায় ৪৮ মাইল। আর সবীর হল মিনার পাহাড়ের নাম।[১]

ইবনে শাব্বাহ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যখন হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং হযরত হারুন (আলাইহিস সালাম) হজ অথবা উমরা আদায়ের জন্য পবিত্র মক্কা শরীফে আগমন করেন এবং ফেরার পথে মদীনা শরীফে পৌছেই উহুদ পর্বতে অবতরণ করেন। তখন সেখানে হযরত হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর ইন্তিকাল হলে তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়।'[২]

উহুদ পর্বতেই যে তাঁর কবর, একথা এখনও বিখ্যাত। এ পর্বতে একখানা মসজিদ আছে। অনেকদিন পূর্বে একজন দরবেশ মসজিদটি নির্মাণ করেন। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন দিক থেকে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে মসজিদে ফতহের মধ্যে নামায আদায় করা সম্পর্কে একটি রিওয়ায়ত উল্লেখ আছে। কিন্তু যে গুহা সম্পর্কে লোকেরা বলে যে, সেখানে হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মগোপন করেছিলেন এবং এক স্থানে মানুষের মাথা একটি চিহ্ন আছে, যাকে লোকেরা হুযূর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথার চিহ্ন বলে অনুমান করেন। (আলিমদের নিকট) এসব বর্ণনা কোন বিশ্বাসযোগ্য রিওয়ায়তের দ্বারা প্রমাণিত নয়।[৩]

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশের নিকট গমন করেন তখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ

'মুমিনদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁদের কৃত অঙ্গীকারকে সত্যে ও বাস্তবে পরিণত করেছেন।'[৪]

এরপর তিনি ইরশাদ করেন,

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৭-১০৮

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৮; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ৮৫-৮৬:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَرَجَ مُوسَىٰ وَهَارُوْنُ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ حَتَّىٰ إِذَا قَدِمَا الْمَدِيْنَةَ خَافَا الْيَهُوْدَ، فَنَزَلَا أُحُدًا، وَهَارُوْنُ مَرِيْضٌ، فَحَفَرَ لَهُ مُوسَى قَبْرًا بِأُحُدٍ».

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৮-১০৯; (খ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ৮৩

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:২৩

«اَللّٰهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ يَشْهَدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ».

'হে আল্লাহ! আপনার আবদ (গোলাম) এবং নবী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনার এ বান্দাগণ সবাই শহীদ।'

তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'তোমরা উহুদ পাহাড়ে গমন করবে এবং শহীদ গণের ওপর সালাম দেবে। যতদিন আসমান-জমিন কায়েম থাকবে, ততদিন তাঁরা সালামের জওয়াব দেবে।' এরপর তিনি অন্য স্থানের শহীদগণের নিকট গমন করেন এবং বলেন, 'এসব শহীদ আমার আসহাব। কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবো।' হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার আসহাব নই? তিনি ইরশাদ করেলেন, 'হ্যাঁ! তোমরাও আমার আসহাব বটে; কিন্তু আমার জানা নেই যে, তোমরা আমার পরে কি করবে? আর তাঁরা তো খুবই ভালোভাবে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।'[১]

যখন হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা, সাইয়িদুশ শুহাদা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশের নিকট গমন করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, কাফিররা তাঁর নাক, কান কেটে ফেলেছে এবং পেট চিরে তাঁর কলিজা বের করে ফেলেছে। হযরত হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি ইরশাদ করেন যে, 'যদি হযরত সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দুঃখিত হওয়ার এবং আমার সুন্নাতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি তাঁকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম, যাতে জঙ্গলের পশু এসে খেয়ে যেতো। আর আমাকে তাঁর নিকটে এসে বরং এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এরূপ যাতনা ভোগ করতে হত না। এতে আমি এতদূর দুঃখিত হয়েছি যে, এমন দুঃখ আমি আর কখনও ভোগ করিনি।' এমন সময়ে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকটে অহী নিয়ে অবতীর্ণ হন যে,

«مَكْتُوْبٌ فِيْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهِ».

'সাত আসমানের আদিবাসীদের নিকট লেখা আছে যে, হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর বাঘ, এবং আল্লাহর রাসূলের বাঘ।'

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১০৯; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৪, হাদীস: ১১৬২ ও পৃ. ৩০৭, হাদীস: ১২০০

এরপর তিনি তাঁকে কফিন পরাবার নির্দেশ দেন এবং সত্তর তকবীর সহকারে জানাযার নামায আদায় করে তাঁকে দাফন করেন।[১]

উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ওপর হযরত ﷺ-এর জানাযার নামায পড়ার ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ এবং হাকিম রিওয়ায়ত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন আমাদের ভাইদের ওপর যা কিছু পৌঁছার ছিল, যখন ওসব দুঃখ-যাতনা পৌঁছে যায়, তখন খোদাওন্দ করীম তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজ পাখির দেহে স্থানান্তরিত করেন, যাতে তাঁরা বেহেশতের নহর থেকে পানি পান, বেহেশতের ফল ভক্ষণ এবং আরশের সাথে সংযুক্ত সোনালি বাতির নিচে গমন করে সুখ-শান্তি উপভোগ করতে পারেন। শহীদগণ যখন আল্লাহ তা'আলার এ অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করেন তখন তাঁরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরজ করেন, হে ইজ্জতের মালিক খোদা! আমাদের যেসব ভাই বন্ধু দুনিয়াতে রয়ে গেছেন, যদি তাঁদের নিকট আমাদের এ অতুলনীয় আরাম-আয়িশের খবর পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে কতই না ভালো হয়। যাতে তাঁরাও জিহাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অলসতাকে স্থান না দেন। তখন খোদাওন্দ করীম ইরশাদ ফরমান, আমি তোমাদের খবর তাঁদের নিকটে পৌঁছিয়ে দেবো। এরপর কুরআন পাকের এ আয়াতটি নাযিল হয়,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝

'যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেছেন, আপনি তাদেরকে মৃত মনে করবেন না। বরং তাঁরা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত, তাঁদেরকে রিযক দেওয়া হয়।"[২]

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১৪; (খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ২১৪, হাদীস: ৪৮৮১ ও পৃ. ২১৯, হাদীস: ৪৮৯৮

[২] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৬৯; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১০-১১১; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১৫, হাদীস: ২৫২০; (ঘ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৯৭, হাদীস: ২৪৪৪ ও পৃ. ৩২৫, হাদীস: ৩১৬৫:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا أُصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ، قَالُوْا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِأَنْ لَا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا فِي الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللهُ ﷻ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ [آل عمران: ٢٧٩] الْآيَةُ.

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর পাক ﷺ প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভে উহুদে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং শহীদগণের কবরে উপস্থিত হয়ে যিয়ারত করতেন ও সালাম দিতেন,

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

'তোমাদের ওপর সালাম হোক এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ধৈর্য ধারণ করেছ। আখিরাতের ঘর কতই না উৎকৃষ্ট।'[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি উহুদের শহীদগণের নিকট গমন করে তাঁদেরকে সালাম পেশ করবেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা (শহীদগণ) তাঁর ওপর সালাম দেবেন।[২]

উহুদের শহীদগণ বিশেষ করে শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ﷺ-এর কবর শরীফ থেকে অনেকবার সালামের আওয়াজ শোনা গেছে এবং পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ থেকে এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

সঠিক তথ্যের ভিত্তি মোতাবেক উহুদে শাহাদত বরণকারীদের সংখ্যা সত্তর জন।

সামহূদী তাঁর ইতিহাসে তাঁদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের কবরের স্থান নির্দেশের সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে শহীদগণের সরদার হযরত হামযা ﷺ-এর কবরের পশ্চিম দিকে শহীদগণের কবরের একটি সীমানা নির্ধারিত করা হয়েছে, যার মধ্যে তাঁদের কবর বিদ্যমান। তবে কবরে কোন চিহ্ন অংকিত করা হয়নি।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ দুই দুই ব্যক্তি বা তিন তিন ব্যক্তিকে এক এক কাপড়ের কাফন পরাতেন এবং ইরশাদ করতেন, 'যার মধ্যে কুরআন শরীফের ইলম অধিক, কবরে তাঁকেই প্রথমে নামাবে।'

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শাহাদতের ছেচল্লিশ বছর পরে কোন কোন শহীদের কবর উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু এতদিন পরেও তাঁদের দেহ মুবারক

[১] (ক) আল-কুরআন, *সূরা আর-রা'দ*, ১৩:২৪; (খ) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১১; (গ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩২:

عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِيْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ، فَيَقُوْلُ: «...».

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১১; (খ) ইবনে শাব্বাহ, *তারীখুল মদীনা*, খ. ১, পৃ. ১৩২:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَرَّ عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهَدَاءِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَزَالُوْا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ঝিকমিক করতে দেখা যায়। যেন গতকালই তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে। আবার কোন কোন শহীদকে দেখা গেছে যে, তাঁরা তাঁদের হাতকে ক্ষত স্থানের ওপরে রেখে রয়ে গেছেন। যখন হাতকে ক্ষত স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন উক্ত স্থান থেকে রক্ত বের হয়। আবার যখন হাতকে উত্তোলন করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে, হাত স্বস্থানে চলে যায়। আল্লাহু আকবার।

উল্লেখ্য এই যে, শহীদগণের কবর খোলার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে এই যে, শহীদগণের লাশ দাফন করার ক্ষেত্রে কিছু এলোমেলো হয়, এভাবে যে, এক গোত্রের লাশকে অপর গোত্রের লাশের সাথে দাফন করা হয়। তখন লোকেরা হযরত ﷺ-এর খোলার অনুমতি নিয়ে অথবা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অবস্থা ভেদে তাঁদের লাশকে কবর থেকে বের করে তাঁদের বাসনা অনুযায়ী অন্যত্র দাফন করতেন। আবার পানির ঢলের কারণেও কোন শহীদকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে দাফন করা হয়। কোন শহীদকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে দাফন করার এও একটি প্রধান কারণ হয়েছিল যে, হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে যখন উহুদের মধ্যে একটি নহর খনন করে প্রবাহিত করান, তখন লোকেরা তাঁদের লাশকে সরিয়ে অন্যত্র দাফন করেন।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রাযিয়াল্লাহু আনহু *শিফাউল আসকা* নামক কিতাবে বর্ণনা করেন যে, যে সময় হযরত আমীরে মুআবিয়া উহুদে নহর খননের প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন এবং সেখানকার শহীদগণকে তাঁদের কবর থেকে সরিয়ে অন্যত্র দাফন করার নির্দেশ দেন, সে সময় একজন শ্রমিকের কোদাল হযরত আমির হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পা মুবারকে গিয়ে পড়ে এবং এর থেকে রক্ত নির্গত হয়।

আরও বর্ণিত আছে যে, নহর খনন করার সময় হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লোকজন ঘোষণা করেন, আমীরুল মুমিনীনের নহর আসছে, তোমাদের আপন জনদের মধ্যে যাদেরই লাশ এখানে দাফন করা হয়েছে, তারা তাদের স্ব স্ব লাশ এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও।

উহুদের কোন কোন শহীদকে অন্যত্র দাফন করা হয়েছে। কেননা হুযূর আকরম ﷺ নির্দেশ দেন যে, শহীদগণের মধ্যে যে যেখানে ইন্তিকাল করেন তাঁকে সেখানেই দাফন করবে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা হযরত মালিক ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁর ইন্তিকাল মদীনায় হয়, এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়, যেখানে তাঁর কবর বলে এখন বিখ্যাত।[১]

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৩, পৃ. ১১৪-১৬

চতুর্দশ অধ্যায়

হযরত সাইয়িদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারতের ফযীলত এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকার প্রমাণ

বিশ্বজগতের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হুযূর আকরম ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারত সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবে আবার কোন হাদীসে ইঙ্গিত আকারে যিয়ারতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যে সমুদয় হাদীসে স্পষ্টভাবে যিয়ারতের বর্ণনা রয়েছে এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, ওগুলোর মধ্যে কোনটি সহীহের পর্যায়ভূক্ত আর অনেকগুলো উত্তম সনদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম হাদীস

«مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ».

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার নিমিত্ত আমার সুপারিশ অবধারিত।'[১]

উল্লেখ্য যে, যদিও বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত উম্মতই তাঁর সুপারিশ লাভের অভিলাষী, কিন্তু তাঁর কবর যিয়ারতকারীদের জন্য এ নিয়ামত নিশ্চিত হওয়ার কারণ এই যে, হাদীসে শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে হুযূর আকরম ﷺ-এর যিয়ারতকারীদের জন্য এমন এক উচ্চ মর্যাদা হাসিল হবে, যা অত্যধিক নেক আমল থাকা সত্ত্বেও অপরদের জন্য হাসিল হবে না। যেমন কোন কোন সাহাবীদের জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাত্র একবার দেখারই সুযোগ হয়েছে, যার কারণে অপরাপার উম্মতের ওপর তাঁর এমন এক ফযীলত আছে, যা অন্যদের জন্য নেই। হাদীসের এ অর্থও হতে পারে, যিয়ারতকারীদের জন্য তো তাঁর সুপারিশ সুনিশ্চিত, আর যারা যিয়ারত করবে না তাদের জন্য সুপারিশ হতেও পারে, নাও হতে পারে। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, রওযায়ে পাক যিয়ারতের বদৌলতে দীন ইসলামের ওপর তাঁর মৃত্যু হবে। যার ফলে তিনি তাঁর সুপারিশের হকদার বিবেচিত হবেন।[২]

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৬৮; (খ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৪, হাদীস: ২৬৯৫; (গ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩৮৬২; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৬৯-১৭০

দ্বিতীয় হাদীস

«مَنْ زَارَ قَبْرِيْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ».

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তাঁর জন্য আমার সুপারিশ হালাল হবে।'[১]

অর্থাৎ তাকে আমার সুপারিশ করতে কোন বাধা থাকবে না।

তৃতীয় হাদীস

«مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِيْ، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতে আসে, আমার যিয়ারত ব্যতীত এতে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল হয় না, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার ওপর তার হক।'[২]

অর্থের দিক দিয়ে পরবর্তী হাদীস দুটোও প্রথম হাদীসের অনুরূপ। তবে এ তৃতীয় হাদীসে একটি কথা অতিরিক্ত আছে যে, যিয়ারতে আসাটা খালিস নিয়তেই হওয়া চাই। এমন না হওয়া চাই যে, আসলে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। এরই ফাঁকে যিয়ারতটিও সেরে নিল। কেননা আমল ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য নিয়ত খালিস হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

চতুর্থ হাদীস

«مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ وَفَاتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ».

'যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, এবং আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে, সে এমন হবে যেন, সে আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাত লাভ করল।'[৩]

---

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; (খ) আল-হায়সামী, *কাশফুল আসতার আন যাওয়ায়িদিল বাযযার*, খ. ২, পৃ. ৫৭, হাদীস: ১১৯৮; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭০; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ১৬, হাদীস: ৪৫৪৬; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১২, পৃ. ২৯১, হাদীস: ১৩১৪৯; (ঘ) ইবনুল মুকরি, *আল-মু'জম*, পৃ. ৮০, হাদীস: ১৫৮; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭১; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৩, পৃ. ৩৫১, হাদীস: ৩৩৭৬; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১২, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ১৩৪৯৭; (ঘ) আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, হাদীস: ২৬৯৩; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

এ হাদীসের মধ্যে ফী হায়াতী শব্দটি দ্বারা মৃত্যুর পর তাঁর জীবিত থাকারই সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। এ মাসআলা সম্পর্কে এ অধ্যায়ের শেষভাগে আলোচনা করা হবে। এ হাদীসের দ্বারা এও বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যেমন অপরাপর লোকদের ওপর বিশেষ মর্যাদা ও অধিক সওয়াবের অধিকারী রওযায়ে পাকের যিয়ারতকারীও তেমন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তবে সমস্ত আহকাম এবং সমুদয় ফযীলতের মধ্যে সাহাবীর সমপর্যায়ভূক্ত নয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নযোগে হযরত ﷺ-এর জবান পাক থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করে যদিও তাঁকে স্বপ্নে দেখা বাস্তব, কেননা তিনি ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্যকে দর্শন করেছে।'[১]

কিন্তু উক্ত হাদীসের দ্বারা শরীয়তের আহকাম প্রমাণিত হবে না। তদ্রুপ রওযায়ে পাকে যিয়ারতকারী সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু সমুদয় ফযীলত এবং আহকামের মধ্যে তিনি সাহাবীর সমমর্যাদাভুক্ত নন।

পঞ্চম হাদীস

«مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ».

'যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং আমার যিয়ারত করল না, সে আমার ওপর জুলুম করল।'[২]

যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করার পর রওযায়ে পাকের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকে, এ হাদীসে তাঁকে ধমক দেওয়া হয়েছে। যেন লোকজন হজ্জের সৌভাগ্য অর্জনের পর রওযায়ে পাক যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জনে তৎপর হয়। কেননা হুযূর পাক ﷺ উম্মতের অধিকতর সওয়াব ও সৌভাগ্যে অর্জনের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী।

ষষ্ঠ হাদীস

«مَنْ زَارَنِيْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا».

'যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় এসে আমার যিয়ারত করবে, আমি তার

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ৫১৩-৫১৪, হাদীস: ৭৫৫৩ ও খ. ১৫, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৯৪৮৮; হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭২; (খ) ইবনে আদী, *আল-কামিল ফীয যুআফা*, খ. ৮, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ১৯৫৬; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষ্য প্রদানকারী হবো।'[১]

আলিমগণ বলেছেন যে, গুনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী এবং নেককারদের জন্য সাক্ষ্যদানকারী। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

«مَنْ زَارَ قَبْرِيْ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا».

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য সুপারিশকারী এবং সাক্ষী হবো।'[২]

সপ্তম হাদীস

«مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ فِيْ أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ فِي الْآمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'যে ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করে যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার আশ্রয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মক্কা এবং মদীনার কোন এক হারাম শরীফে মৃত্যুবরণ করবে, সে কিয়ামতের দিন আযাব থেকে নিরাপদে থাকবে।'[৩]

অষ্টম হাদীস

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِيْ وَغَزَا غَزْوَةً وَّصَلَّى عَلَيَّ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ ﷻ فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ».

'যে ব্যক্তি ইসলাম নির্দেশিত হজ্জ আদায় করার পর, আমার কবর যিয়ারত এবং ইসলামী জিহাদ করবে আর বায়তুল মুকাদ্দিসে নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ফরযকৃত বিষয় সম্পর্কে সওয়াল করবেন না।'[৪]

---

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭২; (খ) আদ-দারাকুতনী, *আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ীয়া*, খ. ১৩, পৃ. ৫৮; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭২–১৭৩; (খ) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৬৫; (গ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ৪০৩, হাদীস: ১০২৭৩; (ঘ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৪৮, হাদীস: ৩৮৫৭; হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; (খ) আল-উকায়লী, *আয-যু'আফা আল-কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৬১; (গ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৪৭, হাদীস: ৩৮৫৬

[৪] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

এ হাদীসে হজ্জের রওয়ায়ে পাক যিয়ারতের জিহাদ করার এবং বায়তুল মুকাদ্দিসে নামায আদায় করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তবে তার ওপর আরোপিত ফরয সম্পর্কে যে সওয়াল না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এটি সমষ্টিগতভাবেও হতে পারে। আর পৃথক পৃথকভাবেও হতে পারে।

নবম হাদীস

«مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَصَدَنِيْ فِيْ مَسْجِدِيْ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُوْرَتَانِ».

'যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ আদায় করবে, আর আমার মসজিদে এসে আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য দুটো হজ্জ মাবরূর (মকবুল) লেখা হবে।'[১]

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদে নববীতে গমন এবং তাঁর কবর যিয়ারত হজ্জে মাবরীরের সমমর্যাদাভূক্ত। বরং হজ্জ কবুল হওয়ার এটি একটি বিশেষ কারণ। আর হজ্জ মাবরূরের প্রতিদান যে বেহেশত, এটি সুনিশ্চিত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। হারাম এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ ও অবৈধ কাজসমূহ থেকে যে হজ্জ পবিত্র থাকে এবং লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের জন্য করা না হয়। এরূপ হজ্জকেই হজ্জে মবরূর বা মকবুল হজ্জ বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে হজ্জে মবরূর উহাই, যা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়। আর এটি নির্ভরশীল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানির ওপর।

দশম হাদীস

«مَنْ زَارَنِيْ مَيِّتًا، فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ حَيًّا، وَمَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ، ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِيْ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ».

'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পরে আমার যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাত করল। আর আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার যিয়ারতে আসবে না, তার কোন ওযর আপত্তি থাকতে পারে না।'[২]

এ হাদীসটি প্রথম এবং চতুর্থ হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং পঞ্চম হাদীসের সারবিশেষ।

---

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫; (খ) আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, খ. ৩, পৃ. ৩১০, হাদীস: ৬৫৫৪

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৫; (খ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ১৫৫; হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত

একাদশ হাদীস

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ زَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ، فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ، وَمَنْ لَّمْ يَزُرْ قَبْرِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ».

'যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাৎ করল। আর যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করে না, সে আমার ওপর জুলুম করল।'[১]

এ হাদীসটি চতুর্থ এবং পঞ্চম হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বাদশ হাদীস

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ سَأَلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ جَوَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত ﷺ-এর উচ্চ মর্যাদা এবং ওয়াসিলা দান করার জন্য দরখাস্ত করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন তার সুপারিশ অবধারিত। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর যিয়ারত করবে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী হিসাবে থাকবে।'[২]

এ হাদীস এবং সপ্তম হাদীসের প্রথমাংশের সারকথা একইরূপ। তবে এ হাদীসে 'উচ্চ মর্যাদা' এবং 'ওয়াসিলা' সম্পর্কীয় কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে। এখানে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হলো, সব হাদীসেরই বিভিন্ন সূত্র রয়েছে। যদি প্রত্যেক সূত্রকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়, তবে সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ–১: হযরতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর জীবিত থাকার বর্ণনা

যাঁরা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তাঁরা জীবিত বলে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আছে। এখানে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৬; (খ) আস-সাখাওয়ী, *আত-তুহফাতুল লতীফা ফী তারীখিল মদীনা আশ-শরীফা*, খ. ৫৬৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৪০৭৬; (গ) মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ১৫৫

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৬

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু ইয়ালা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ».

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, 'পয়গম্বরগণ তাঁদের স্ব স্ব কবরে জীবিত, তাঁরা সেখানে নামায পড়েন।'[১]

আর যে হাদীসের দ্বারা বিশেষ করে হযরত ﷺ-এর জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, সে সর্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ হাদীসটি হল এই,

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

'এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমার ওপর সালাম প্রেরণ করবে। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট আমার রূহ (আত্মা)-কে পাঠিয়ে দেন, আর তার সালামের জওয়াব দিই।'[২]

এ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে যে, বর্ণিত হাদীসটি কি শুধু যাঁরা তাঁর কবরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দেন, উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? আলেমদের একটি জামাআত বলেন যে, শুধু সেসব লোকদের জন্যই যাঁরা রওযায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম পেশ করেন। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀-এর বর্ণিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেন,

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ».

'এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি আমার কবরের নিকটে এসে আমাকে সালাম দেন।'[৩]

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তত্ত্বভিত্তিক কথা, যেমন পরবর্তী কোন কোন মুহাক্কিক আলিমগণ বলেছেন এই যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর ওপর সালাম পেশ করা দু'প্রকারে হয়ে থাকে।

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৯; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ৬, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৩৪২৫; (গ) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭০–৭২, হাদীস: ১ ও ২; (ঘ) ইবনে আদী, *আল-কামিল ফীয যুআফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৪৬০

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২০৪১; হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত

[৩] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭

১. প্রথমত এতে হযরত ﷺ-এর ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত নাযিলের জন্য দু'আ ও প্রার্থনা করা। এটি সম্বোধন সূচকও হতে পারে। আর এর বিপরীতও হতে পারে। যেমন এভাবে বলা: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ, اَلسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ। এ প্রকারের সালাম দরবারে উপস্থিত হয়েও দেওয়া যেতে পারে, আর অনুপস্থিতিতেও দেওয়া যেতে পারে। কোন কোন আলিম এ প্রকারের সালামকে হযরত ﷺ-এর সাথে খাস এবং নির্দিষ্ট করেছেন এবং এতে অপর কাউকে শামিল করা না জায়েয বলেছেন। কিন্তু তাঁরা একথা বলেন যে, তবে হুযূর আকরম ﷺ-এর অধীনে শামিল করা যেতে পারে।

২. দ্বিতীয়ত এ প্রকারের সালামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা। যিয়ারতকারী রওযায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে এই উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করে যেমন, কোন লোক মজলিসে উপস্থিত হয়ে সমবেত লোকজনকে সালাম দেয়। এ প্রকারের সালাম কারো জন্য খাছ নয়। বরং এরূপ সালাম শরীয়ত নির্দেশিত একটি রীতি এবং যার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব হয়, সালাম মুখোমুখি দেওয়া হোক অথবা দূত বা চিঠির মাধ্যমে দেওয়া হোক। যদি হুযূর আকরম ﷺ এ সালামের জওয়াব প্রদান করেন ও এর ওয়াজিব আদায় করেন, তবে এতেও কোন আপত্তি নেই। প্রথম প্রকারের সালাম নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব হুযূর আকরম ﷺ-কে ইরশাদ করেন, 'আপনার উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আপনার ওপর সালাম প্রেরণ করে, আমি তার ওপর দশবার সালাম অর্থাৎ রহমত নাযিল করি।'[১]

স্পষ্টত মনে হয় এ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতটি প্রথম প্রকারের সালামের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে কোন কোন আলিম মনে করেন। সহীহ সনদে ইমাম নাসায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কিছুসংখ্যক ফেরেশতা তৈরি করেছেন, যাঁরা দুনিয়াতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন।'[২]

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৬, পৃ. ২৭২, হাদীস: ১৬৩৫২; হযরত আবু তালহা আল-আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত: «مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৪৩, হাদীস: ১২৮২:
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ».

যাঁরা গায়িবানা হুযূর আকরম ﷺ-এর ওপর সালাম পেশ করেন। উল্লিখিত হাদীসটি তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আর যাঁরা তার দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করেন, তাঁদের সম্পর্কে দুটো হাদীস বর্ণিত আছে। একটি হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি স্বয়ং তাঁদের সালাম শ্রবণ করেন এবং নিজেই তাঁদের সালামের উত্তর দেন। যেমন প্রথম হাদীসের দ্বারা একথা বোঝা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ قَبْرِيْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ مَكَانٍ آخَرَ بَلَّغُوْنِيْهِ».

'যে ব্যক্তি আমার কবরে এসে সালাম পেশ করে, আমি তার সালামের উত্তর দিই, আর যে ব্যক্তি অন্য স্থান থেকে আমার ওপর সালাম পেশ করে, ফেরেশতাগণ তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন।'[১]

অপর একটি রিওয়ায়ত থেকে বোঝা যায় যে, যাঁরা রওযায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করেন, তাঁদের সালাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার এবং তাঁর তরফ থেকে উত্তর দেওয়ার জন্যও একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهَا مَلَكًا يُبَلِّغُنِيْ، وَكُفِيَ أَمْرَ آخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ وَكُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَّشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'এমন কোন বান্দা নেই যিনি আমার নিকট আমার কবরে এসে আমার ওপর সালাম প্রেরণ করেন, অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন যিনি আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন তাঁর দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রতিদানই যথেষ্ট। আমি কিয়ামতের দিন তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবো এবং তার জন্য সুপারিশ করবো।'[২]

উল্লিখিত হাদীসসমূহের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়মানুযায়ী একজন ফেরেশতা মারফত তাঁর বান্দাদের সালামসমূহ হুযূর পাক ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন কোন প্রিয় বান্দা ও আশেকদের সালাম নিজে গ্রহণ করেন এবং নিজেই জওয়াব দেন।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৫০, হাদীস: ৩৮৫৯

فَيَا حَبَّذَا سَعَادَةُ مَنْ فَازَ بِذَلِكَ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ.

'সেই ব্যক্তি কতই যে সৌভাগ্যবান, যিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন এ শুধু আল্লাহর মেহেরবানি, যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন।'

ہمہ خواہند ترا، تا تو کرا می خواہی؟

'হে আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব! সবাইতো আপনাকে চায়, আপনি চান কাকে'?

হযরত আবদুল হক নামক হাদীসের একজন বিশিষ্ট ইমাম *আহকামে সুগরা* নামক কিতাবে সহীহ সনদ সহকারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে তার এমন ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে গমন করে, যাকে সে দুনিয়াতে জানত এবং তাঁকে সালাম দেয়, অধিকন্তু সে তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের জওয়াব দেয়।'[১]

ইবনে আবদুল বরও হাদীসটি রিওয়ায়ত করে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম ইবনে তাইমিয়া সামান্য পরিবর্তন সহকারে হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন।[৩] ইমাম আবদুল হক ﵀ *আকিবাত* নামক কিতাবে হযরত আয়িশা ﵂ থেকে রিওয়ায়ত করেন যে,

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَّزُوْرُ قَبْرَ أَخِيْهِ، فَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ حَتّٰى يَقُوْمَ».

'এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে তার পিতার কবর যিয়ারত করে, আর তার নিকটে বসে, অধিকন্তু তার পিতা তার সাথে মায়া-মমতা করে, এ পর্যন্ত যে সে ওঠে চলে যায়।'[৪]

ইবনে আবুদ দুনয়া হযরত আবু হুরাইরা ﵁ থেকে রিওয়ায়ত করেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার পরিচিত বন্ধু কবরের পাশ দিয়ে গমন করে, সে তাকে

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮; (খ) আবদুল হক আল-ইশবীলী, *আল-আহকামুশ শর'ইয়া আল-কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৪–৩৪৫:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

[২] ইবনে আবদুল বর, *আল-ইসতিযকার*, খ. ১, পৃ. ১৮৫, হাদীস: ২৮

[৩] ইবনে তায়মিয়া, *মজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৫১:

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ، حَتّٰى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

[৪] (ক) আবদুল হক আল-ইশবীলী, *আল-আকিবাতু ফী যিক্‌রিল মওত*, পৃ. ২১১; (খ) আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব*, খ. ৪, পৃ. ১৯, হাদীস: ৬০৫৫

চিনতে পারে, আর যদি সে তাকে সালাম দেয়, তবে সে তার সালামেরও উত্তর দেয়।'[১]

সামহূদী বলেন, এ সম্পর্কে বিস্তর হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন, যখন একজন সাধারণ মুমিনের এ অবস্থা তখন পয়গম্বরদের সরদার, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সম্পর্কে তো কথাই থাকতে পারে না।

তাওসীকু আওরাল ঈমান নামক কিতাবে সুলায়মান ইবনে সুহায়ম থেকে রিওয়ায়ত করেন, একদিন আমি স্বপ্নযোগে হযরত ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করি। আমি তাঁর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যেসব লোক আপনার যিয়ারতে উপস্থিত হয় এবং আপনাকে সালাম করে, আপনি কি তাদের সালাম শ্রবণ করেন? তিনি ইরশাদ করেন,

«نَعَمْ، وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ».

'আমি শ্রবণ করি এবং তাদের সালামের উত্তর দিই।'[২]

ইবনে নাজ্জার ইবরাহীম ইবনে বাশ্‌শার থেকে রিওয়াত করেন, এক বছর আমি হজ্জ করি এবং সাইয়িদুল মুরসালীন, খতিমুন্নাবীয়ীন ﷺ-এর যিয়ারত উপলক্ষে মদীনা তাইয়িবায় উপস্থিত হই। যখন আমি রওযায় পাকে গিয়ে সালাম করি, তখন কবরের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনতে পাই, «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»।[৩]

আওলিয়ায়ে কিরাম ও উম্মতের নেককার ব্যক্তিদের এ রূপ অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকা সম্পর্কে সমস্ত আলিমই একমত। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামও স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআন পাক শহীদগণের জীবিত থাকার সংবাদ দিয়েছে, তাঁদের থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনী শক্তি সেখানে আরও অধিক। কেননা

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ১১, পৃ. ৪৭৩, হাদীস: ৮৮৫৭:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرٍ يَعْرِفُهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَعَرَفَهُ وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

[২] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৬, পৃ. ৫৪, হাদীস: ৩৮৬৮:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَكَ، فَيُسَلِّمُوْنَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلَامَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ».

[৩] মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার, *আদ-দিররাতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, পৃ. ১৫৮:

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ بَشَّارٍ، قَالَ: حَجَجْتُ فِي بَعْضِ السِّنِيْنَ، فَجِئْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَى قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ مِنْ دَاخِلِ الْحُجْرَةِ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ».

হযরত ﷺ তো শহীদগণের সরদার, তাঁর নিকট তাঁদের আমলসমূহ নিরূপতি হয়। রাসূলে খোদা ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«عِلْمِيْ بَعْدَ وَفَاتِيْ كَعِلْمِيْ فِيْ حَيَاتِيْ».

'আমার মৃত্যুর পর আমার ইলম (জ্ঞান) আমার জীবিত অবস্থার ইলমের ন্যায়।'

হাফিয মুনযরী এবং ইবনে আদী *আল-কামিল* হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ».

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'পয়গাম্বরগণ তাঁদের কবরে জীবিত। তাঁরা নামায পড়েন।''[১]

ইমাম বায়হাকী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে রিওয়ায়ত করেন এবং রিওয়ায়তটি সহীহ বলেও তিনি মন্তব্য করেন। রিওয়ায়তটি হচ্ছে

«اَلْأَنْبِيَاءُ لَا يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلٰكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ حَتّٰى يُنْفَخَ فِي الصُّوْرِ».

'আম্বিয়ায়ে কিরামকে চল্লিশ দিনের অধিক এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হয় না। পরন্তু তাঁরা সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নিকটে নামায পড়তে থাকবেন।'[২]

ইমাম বায়হাকী বলেন যে, যদি হাদীসের শব্দসমূহ এরূপ বলে প্রমাণিত হয়, তবে হাদীসের অর্থ হবে, পয়গম্বরগণ সর্বদা তাঁদের কবরে জীবিত, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁরা কবরে নামায আদায় করতে সক্ষম হন না।[৩]

ইমাম বায়হাকী আরও বলেন যে, পয়গম্বরগণ কবরে জীবিত থাকার ওপর সহীহ হাদীসের অনেক দলীল রয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি এ হাদীসটিও বর্ণনা

---

[১] (ক) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ৬, পৃ. ১৪৭, হাদীস: ৩৪২৫; (খ) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭০–৭২, হাদীস: ১ ও ২; (গ) ইবনে আদী, *আল-কামিল ফীয যুআফা*, খ. ৩, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৪৬০

[২] (ক) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৫–৭৬, হাদীস: ৪; (খ) আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব*, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস: ৮৫২

[৩] আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৫–৭৬, হাদীস: ৪

করেছেন, যার সার কথা হল এই, 'হযরত ﷺ যখন হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর কবর অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁকে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছেন।'[১]

এ ছাড়া তিনি আরও অপরাপর হাদীসও বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা পয়গম্বর (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে তাঁর মুলাকাত ও কবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পয়গম্বরদের মৃত্যুর পর তাঁদের রুহ মুবারক আবার ফিরিয়ে দেন এবং শহীদগণের মতো তাঁরাও জীবিত। কিন্তু প্রথম দফা সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর তাঁরাও হুশ হারা হয়ে যাবেন। যেমন– কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

'আসমান ও জমিনের মধ্যে যাঁরা বেহুঁশ হয়ে যাবেন।'[২]

তবে এই অর্থে যে, তাঁদের মধ্যে অনুভূতি শক্তি থাকবে না। এর আওতার বাইরে থাকবেন। অর্থাৎ তাঁরা বেহুঁশ হবেন না।[৩]

ইমাম বায়হাকী আরও বলেছেন যে, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'সাপ্তাহিক দিনসমূহের মধ্যে জুমাবারই শ্রেষ্ঠ। ওই দিনে তোমরা আমার নিকট অধিকভাবে দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে।' আরজ করলেন, আমাদের দরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে? আপনার দেহ মুবারক তো সম্ভবত জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে! তিনি ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরদের শরীর ভক্ষণ করা মাটির ওপর হারাম করে দিয়েছেন।'[৪]

বযযার বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'পৃথিবীতে কিছুসংখ্যক ভ্রমণকারী আল্লাহর ফেরেশতা আছেন, যারা আমার নিকট আমার আমলসমূহ পৌঁছিয়ে দেন।' তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 'আমার ইন্তিকাল তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তোমাদের আমলসমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। যদি নেক আমল হয়, আমি এর জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া

---

[১] আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৮–৭৯, হাদীস: ৬ ও ৭:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ».

[২] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুমার*, ৩৯:৬৮

[৩] আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ১১০–১১৪, হাদীস: ২১

[৪] আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৮–৯০, (ক) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৮–৯০, হাদীস: ১০; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ১০৮৫ ও পৃ. ৫২৫, হাদীস: ১৬৩৬; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৫, হাদীস: ১০৪৭ ও খ. ২, পৃ. ৮৮, হাদীস: ১৫৩১; (ঘ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯০, হাদীস: ৯১০;.(ঙ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদীস: ১০২৯

আদায় করি। আর যদি বদ আমল হয়, আমি তোমাদের গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করি।'[১]

উস্তাদ মনসুর বাগদাদী বলেন, দার্শনিক এবং অভিজ্ঞ আলিমগণের মাযহাব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাতের পর জীবিত আছেন। উম্মতগণের নেক আমল প্রত্যক্ষ করলে তিনি সন্তুষ্ঠ হন। আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ মুবারক জীর্ণশীর্ণ এবং পচে গলে নষ্ট হয় না।[২]

ইমাম বায়হাকী *কিতাবুল ইতিকাদ* নামক কিতাবে বলেন পয়গম্বরদের রুহ কবজ করার পর পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা শহীদদের মতোই জীবিত। বরং স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে তাঁকে আবার জীবন দান করা হয়। আর মালিকানা হস্তান্তরের জন্য সর্বকালীন মৃত্যু শর্ত। এ শর্ত হুযূর আকরম ﷺ-এর মধ্যে বর্তমান না থাকায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তার জীবনী শক্তি শহীদের জীবনী শক্তি থেকে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।[৩]

উল্লেখ্য যে, রুহ জীবিত থাকা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে দেহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত আছে, আম্বিবায়ে কিরামের দেহ পচে-গলে নষ্ট হয় না। আর শহীদ হোক বা নাই হোক, সর্বপ্রকারের মৃত ব্যক্তির নিকট যে রুহ প্রত্যাবর্তিত হয়, এটি সহীহ রিওয়ায়তের দ্বারা প্রমাণিত আছে তবে কথা হল এই যে, দেহের মধ্যে রূহ প্রত্যাবর্তনের পর স্থায়ী থাকে কিনা? অর্থাৎ দুনিয়াতে যেভাবে তাঁরা দেহ ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে জীবিত ছিলেন, সেখানেও কি অনুরূপভাবে জীবিত থাকবে, না কি শুধু দেহবিহীন আত্মা নিয়েই জীবিত থাকবেন। যা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিকট অসম্ভব কিছুই নয়। তবে এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেন যে, যদি দেহবিহীন রূহানী জীবন ধারণ করা সম্ভব, কিন্তু আদত মতে, জীবন ধারণের নিমিত্ত রূহের সাথে দেহ ও সংশ্লিষ্ট থাকা চাই। যদি রিওয়ায়তের দ্বারা এর প্রমাণ মিলে, তবে এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। একদল আলিম এ মতেরই বিশ্বাসী। এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর

[১] আল-বায্যার, *আল-মুসনদ*, খ. ৫, পৃ. ৩০৭-৩০৯, হাদীস: ১৯২৪ ও ১৯২৫:

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ».

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৮-১৮০

[৩] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮০; (খ) আল-বায়হাকী, *আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস*, পৃ. ৩০৫

কবরে নামায পড়ার রিওয়ায়ত পেশ করেছেন। কেননা দেহ ছাড়া নামায পড়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া মিরাজ রজনীতে পয়গম্বরদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে সেসবের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম সশরীরেই সেখানে জীবিত, কারণ তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা শারীরিক গুণাবলিই বটে।

উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত একথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে, সমস্ত মৃত ব্যক্তি বিশেষ করে হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি শক্তি যেমন শ্রবণ করা, অনুধাবন করা ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করা হয়, যেমন হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে। একথার উল্লেখ রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা কবরের মধ্যে বেহেশতি নিয়ামত উপভোগ এবং কবরের আযাব ভোগ করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু অনুভব করার জন্য জীবনী শক্তির প্রয়োজন। তবে এ জীবনী শক্তি শরীরের কোন একাংশে এভাবে দেওয়া যেতে পারে, যা শরীরের সাথে সংযুক্ত নাও থাকতে পারে। যেমনিভাবে পৃথিবীতে সংযুক্ত ছিল। যেমন এভাবে বলা হযরত ﷺ একদল আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে মুলাকাত করেছেন এবং একত্রিত হয়েছেন।

তালখীস নামক কিতাবের লিখক বলেছেন যে নবী করীম ﷺ তাঁর ইন্তিকালের সময় দুনিয়াতে যে সব সম্পদ রেখে গেছেন, জীবিত অবস্থার ন্যায় মৃত্যুর পরেও এর ওপর তাঁর মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে অপরাপর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ন্যায় তাঁর সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টন করা হয়নি। বরং সেসব সম্পত্তি থেকে তাঁর পরিবারবর্গের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়। হযরত ﷺ-এর বিশেষত্বসমূহের মধ্যে এও একটি বিশেষত্ব।

ইমামুল হারামাইন একে সত্যায়িত করে বলেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতের সময় হুযূর আকরম ﷺ-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি এভাবেই ব্যয় করেন, যেমনভিাবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ব্যয় করেছেন।

অভিজ্ঞ ইমামদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পার্থিব আহকামের ক্ষেত্রেও তিনি জীবিত; যার কারণে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পত্তি তাঁর ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টন করে দেননি। এতে বোঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী শক্তি শহীদদের জীবনী শক্তি থেকে অধিক। কেননা শহীদগণ পার্থিব আহকামের ক্ষেত্রে জীবিত নন। তবে বায়হাকী যে বলেন, পয়গম্বরগণ মৃত্যুর পর এভাবেই জীবিত, যেভাবে শহীদগণ জীবিত।[১] এ কেবল তাঁদের জীবন

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮০; (খ) আল-বায়হাকী, *আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস*, পৃ. ৩০৫

ধারণ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। পয়গম্বরদের জীবনী শক্তি শহীদদের জীবনী শক্তি থেকে অত্যধিক হওয়া এর বিপরীত নয়। কেননা মৃত্যুর পরে শহীদগণের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণেই শহীদদের সম্পর্কে কুরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে,

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝

'শহীদগণ তাঁদের প্রভুর নিকট জীবিত, তাঁদেরকে রিযক প্রদান করা হয়।'[১]

আর পয়গাম্বরগণের মালিকা বিলুপ্ত হয় না। কোন কোন লোক বলেছেন যে, ইমামুল হারামাইনের ওপর তাজ্জব যে, তিনি নিজেই বলেছেন যে,

مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ كَذَا نِسْوَةٍ.

'তিনি একজন বিবি সংসারে রেখে ইহধাম ত্যাগ করেন।'

তিনি আরও বলেছেন,

وَمَاتَ وَهُوَ رَاضٍ مِنَ الْعَشَرَةِ.

'উম্মতের দশজন লোকের ওপর সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় তিনি ওফাত পান।'[২]

সুতরাং তিনি যখন নিজেই তাঁর ওফাতের কথা বলেন, তিনি আবার কিভাবে তাঁর জীবিত থাকার কথা বলতে পারেন?

ইমাম যারকাশী বলেন যে, তাঁর এ উভয় কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। কেননা এর অর্থ হচ্ছে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন, তাঁকে আবার আল্লাহ তা'আলা জীবিত করেছেন।

শাহরাস্তানী তাঁর *গায়তুল মুরাম* নামক কিতাবে ইমামুল হারমাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, পয়গাম্বর ﷺ জীবিত। লোকেরা তাঁর ওপর যে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন, তিনি তা শ্রবণ করেন।

ইমাম তাজুদ্দীন তবে যে সমুদয় দলীলের দ্বারা হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম জীবিত আছেন বলে প্রমাণিত হয়, সেগুলোর দ্বারা তাঁরা দৈহিকভাবে জীবিত আছেন বলেই প্রমাণিত হয়। যেমনিভাবে তাঁরা দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, পৃথিবীতে তাঁরা খাদ্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন, আর ওখানে খাদ্যের মুখাপেক্ষি নন। আর এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইমরান*, ৩:১৬৯

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আত-তালখীসুল হবীর ফী তাখরীজি আহাদীসির রাফিয়ী আল-কবীর*, খ. ৩, পৃ. ২৮৯-২৯২

শক্তিশালী যে, তিনি যেভাবে পৃথিবীতে খাদ্যের মাধ্যমে জীবিত রাখেন, ঠিক তেমনি ওখানে খাদ্য ব্যতিরেকেও জীবিত রাখতে পারেন। দেহের মধ্যে তিনি এমন কৈফিয়ত সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে খাদ্যের প্রতি তাঁদের লক্ষ্যও থাকে না। এমন কি খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা অনুভব করেন না। যেমন- পৃথিবীতে মানুষ তার দুঃখ ও খুশির কোন কোন অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের প্রতি লক্ষ্যও থাকে না এবং এর প্রয়োজনও হয় না। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে, খাওয়া-দাওয়ার ওপরই জিন্দেগি নির্ভরশীল, তবে আমরা বলবো যে, একমাত্র খাদ্য গ্রহণের ওপরই জিন্দেগি নির্ভরশীল নয়। কেননা একথা সম্ভব যে, যেভাবে তিনি খাদ্যকে জীবন ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন, তেমনি অন্য উপায়েও তিনি জীবিত রাখতে সক্ষম।

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

'নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপরই ক্ষমতাশীল।'[১]

মুহাক্কিক আলিমদের সরদার কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম ﷺ তাঁর বিখ্যাত *মুসায়িরা* নামক কিতাবে লিখেছেন, সমস্ত মুহাক্কিক আলিমগণই এ মত পোষণ করেন যে, মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে স্বর্গীয় সুখ এবং নরকীয় আযাব অনুভব করার মত রুহ প্রত্যাবর্তিত হয়। তবে অনেক আশআরী এবং কোন কোন হানাফী মাযহাবের আলিমগণ বলেছেন, জীবিত থাকার জন্য রুহ বিদ্যমান থাকা অনিবার্য নয়। রুহ ব্যতিরেকেও দেহ জীবিত থাকতে পারে। যদিও বা রুহের মাধ্যমেই জীবিত রাখা আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি। যেমন- আমরা পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছি। মুদ্দাকথা এই যে, কোন কোন আলিম বলেন, কবরে দেহের মধ্যে রুহ প্রত্যাবর্তিত হয় না। আবার কেউ কেউ ধারণা করেন যে, দেহের মধ্যেই রুহ প্রত্যাবর্তিত হয়।

অনুচ্ছেদ-২

আলিমদের মধ্যে এ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই যে, হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম জীবিত আছেন। মতভেদ শুধু এ সম্পর্কেই যে তাঁরা কি স্থায়ী, কিভাবে কবরে অবস্থান করেন, নাকি তাঁদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়? এ ক্ষেত্রে আলিমদের উভয় প্রকারের মত দেখা যায়।

শাফিয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলিম শায়খ আলা উদ্দীন কূনাওয়ী বলেন, আমার নিকট একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম ﷺ তাঁদের কবরে ওফাত পূর্বকালীন হায়াত নিয়ে জীবিত থাকার মাসআলাটি এমন নয় যে, যা অকাট্য দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায়, কেননা তাঁদের পার্থিব

[১] আল-কুরআন, *সূরা ফুসসিলাত*, ৪১:৩৯

জীবন যে নিঃসন্দেহে হয়ে গেছে। এ চাক্ষুসভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী হায়াত যে পুনরায় তাঁদের দেহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছে এর জন্য অকাট্য প্রমাণ দরকার। এ ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস যে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত এবং তাঁদের সেখানকার জীবন পার্থিব জীবন থেকে উন্নত। আর আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, সাইয়িদুল আম্বিয়া ﷺ সর্বোচ্চ আসমানে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে এমন হায়াত নিয়ে জীবিত আছেন, যা কবর শরীফে অবস্থান থেকে উৎকৃষ্ট।

হাদীসের মধ্যে যদিও বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের কবর যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদুর সম্প্রসারিত করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে হযরত ﷺ-এর কবরের সম্প্রসারণ সম্পর্কে তো কথাই নেই। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে যে উঁচু জান্নাতে তিনি জীবিত আছেন, তা আসমান-জমিন থেকেও সম্প্রসারিত।

তা ছাড়া এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'পয়গম্বরদেরকে চল্লিশ দিন কবরে রেখে দেওয়া হয় না, বরং তাঁরা তাঁদের প্রভুর নিকট নামায আদায় করেন। সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের এ অবস্থা বিদ্যমান থাকবে।'[১]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'তিন দিনের অধিক কবরে রেখে দেওয়া থেকে আমি আমার প্রভুর নিকট মর্যাদাশীল।'[২]

এ সমুদয় বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের কবরে জীবিত বলে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা মুশকিল। হ্যাঁ, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর কবরে নামায পড়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত আছে, এর উত্তর এই যে, হাদীসের দ্বারা তিনি যে সর্বদা কবরে অবস্থান করেন তা বোঝায় না। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাপর পয়গম্বরদের সাথে আসমানের ওপর মুলাকাত করেছেন।' এ উভয় হাদীসে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, তাঁরা তো আসলে আসমানেই অবস্থান করেন, কিন্তু কখনও অন্যত্রও চলে যান। তা কবরও হতে পারে, অন্য স্থানও হতে পারে। পয়গম্বরগণ আল্লাহর নিকট জীবিত আছেন, এতে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। আর সেখানে জীবন ধারণ যে খাওয়া-দাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়, এতেও তাঁর কোন

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৯; (খ) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৫–৭৬, হাদীস: ৪; (গ) আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব*, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস: ৮৫২:

«اَلْأَنْبِيَاءُ لَا يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ حَتّٰى يُنْفَخَ فِي الصُّوْرِ».

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮১; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকালানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৬, পৃ. ৪৮৭:

«أَنَا أَكْرَمُ عَلٰى رَبِّيْ مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِيْ فِيْ قَبْرِيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ».

সন্দেহ নেই। তবে তিনি শুধু অকাট্য প্রমাণের অভাবে পয়গম্বরগণ যে স্থায়ীভাবে কবরে থাকেন, একথা মেনে নিতে চান না।

উল্লেখ্য যে, হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম সর্বদা কবরে অবস্থান করে বলে যেসব আলিম মত পোষণ করেন এবং যাঁরা এ মতের বিরোধিতা করেন, তাঁদের কারো নিকট তাঁদের মতের স্বপক্ষে কোন অকাট্য দলীল নেই।

যাঁরা পয়গম্বরগণ সর্বদা কবরে অবস্থান করেন না বলে দাবি করেন, নিম্নের হাদীস দু'টিই তাঁদের দলীল।

১. 'পয়গম্বরগণকে চল্লিশ দিন পরে আর কবরে রেখে দেওয়া হয় না।'
২. 'আমাকে আমার কবরে তিন দিনের অতিরিক্ত ছেড়ে রাখা থেকে আমি আমার প্রভুর নিকট সম্মানিত।'

আর যে পক্ষ পয়গম্বরদের দেহ মুবারক কবরে অবস্থানের কথা বলেন, তাঁরাও তাঁদের পক্ষে দুটো হাদীস দলীল স্বরূপ পেশ করেন।

১. 'পয়গম্বরগণ তাদের কবরে জীবিত, তাঁরা নামায পড়েন।'
২. সেই হাদীস: যাতে বর্ণিত আছে যে, 'হুযূর আকরম ﷺ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন।'

পয়গম্বরদের কবরে অবস্থান সম্পর্কে যখন পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়ত দেখা যায়, তখন হাদীস শাস্ত্রে এ বিধান দুটির দলীল যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখনই বাদ পড়ে যায়। সে অনুযায়ী উভয় পক্ষের দলীলই বাদ পড়ে যাবে।

সুতরাং এখানে আমরা উভয় পক্ষের দলীলকে বাদ দিয়ে বলতে চাই যে, আমরা পয়গম্বরদেরকে কবরে সমাহিত করতে প্রত্যক্ষ করেছি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীত দলীল পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আসল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকা শাস্ত্রের নীতি। অতএব আমরা বলবো যে, যখন অকাট্য দলিলের দ্বারা প্রমাণিত যে, পয়গম্বরগণ সেখানে জীবিত। আর আমরা তাঁদেরকে কবরে রাখতে প্রত্যক্ষ করেছি। এবং কবর থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সঠিক কোন দলীল নেই। সুতরাং এ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম কবরেই জীবিত অবস্থান করেন। তা ছাড়া মুহাক্কিক আলিম ও হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানকারী মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হাদীস দুটি সহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি। কেননা উভয় হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস দুটো বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে ঐগুলোকে দলীল স্বরূপ খাড়া করা যায় না।

হাদীস দুটোকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিলেও এর অর্থ এই যে, তাঁরা চল্লিশ দিন যাবত ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হন না, বরং এ সময়ের পরেই তাঁরা ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হন।

আমাদের পয়গম্বর ﷺ-এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 'আমি ব্যতীত অপর কোন পয়গম্বর এমন নেই, যাঁদেরকে তিন দিনের পর কবর থেকে উত্তোলন করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া না হয়। আমি আমার উম্মতের কল্যাণার্থে আমার প্রভুর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত কবরে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করে নিয়েছি। যাতে তারা বিপদাপদ ও খোদায়ী আযাব থেকে রক্ষা পায়।'

যেমন– কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ

'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আযাব দেবে না এ অবস্থায় যে, আপনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন।'[১]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ﷺ বিশেষ করে কবরে অবস্থান করেন। আর অপরাপর নবীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট।

বর্ণিত আছে যে, যখন বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান رضي الله عنه-কে অবরোধ করেন, তখন কোন কোন সাহাবা তাঁকে পরামর্শ দেন যে, আপনি সিরিয়ায় চলে যান, যাতে এ বিপদ থেকে রক্ষা পান। হযরত উসমান رضي الله عنه বললেন, আমি আমার হিজরতের স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে এবং প্রিয় নবী ﷺ-এর প্রতিবেশীত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হতে পারি না।'

তা ছাড়া একথাও বিশেষভাবে খ্যাত আছে যে, যখন হাররা নামক স্থানে পাপিষ্ট ইয়াযীদের সৈন্য-সামন্ত ও মদীনাবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইব رحمه الله তিনদিন যাবৎ রওযা শরীফ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান শুনতে পান।

তবে কূনাওয়ী যে হযরত ﷺ-এর কবরে অবস্থান থেকে আল্লাহর নিকট বেহেশতে অবস্থানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যখন হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে যে, কবর মুমিনদের জন্য বেহেশতের বাগান, তবে হযরত ﷺ-এর কবর যে সর্বোত্তম বেহেশতের বাগান হবে, এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? দ্বিতীয়ত এটা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরেই অবস্থানরত আছেন এবং তাঁর বুযুর্গীর বদৌলতে কবর এবং বেহেশত আসমানের মধ্যকার পর্দা ওঠে গেছে। আর বরযখের মধ্যে এরূপ হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। কেননা আখিরাতের অবস্থানকে দুনিয়ার ওপর কিয়াস করা যায় না।

এখানে উল্লেখ্য, একটি হাদীসে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা عليه السلام-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন, আবার অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মিরাজ রজনীতে তিনি তাঁর সাথে ষষ্ঠ আসমানে সাক্ষাৎ করেছেন। এ উভয়

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আনফাল*, ৮:৩৩

বিপরীতমুখী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে আলিমদের মতভেদ দেখা যায়। যাঁরা তাদেরকে কবরে থাকেন বলে মনে করেন, তারা বলেন যে, যদিও তাঁরা কবরেই অবস্থান করেন, কিন্তু কখনও কখনও তাঁরা আসমান ইত্যাদিতে গমন করতে পারেন। আবার কেউ কেউ এ উত্তরও দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজ রজনীতে আসমান থেকে তাঁদেরকে কবরেই প্রত্যক্ষ করেছেন অর্থাৎ যাঁদেরকে দেখেছেন, তাঁরা আসমানে ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন কবরে। আর যিনি দেখেছেন, তিনিই ছিলেন আসমানে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যাহিরী শব্দের পরিপন্থী।

শায়খ ইবনে আবু হামযা *লাহজা* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, মিরাজ রজনীতে হযরত ﷺ যে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهم السلام-কে আসমানে প্রত্যক্ষ করেছেন, তা কয়েকভাবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১. প্রথম: তিনি তাঁদেরকে আসমান থেকে তাঁদের কবরে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এতে বিচিত্র হওয়ার কিছুই নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিদান করেছেন যাতে তিনি তাঁদেরকে কবরে দেখতে পারেন। যেমন তিনি বলেছেন,

رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارُ فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ.

'আমি বেহেশত এবং দোযখকে এ বাগানের দেয়ালের প্রস্থের মধ্যে আবলোকন করেছি।'[১]

তাঁর এ অবলোকন দু'ভাবে হতে পারে। যথা–

১. তিনি তাঁর স্বীয় স্থান থেকেই দোযখ এবং বেহেশত উভয়কে দেখেছেন। যেমন– কোন ব্যক্তি বলেন,

رَأَيْتُ الْهِلَالَ مِنْ مَنْزِلِي مِنَ الطَّاقِ.

'আমি চন্দ্রকে খিড়কী থেকে আমার ঘরে দেখেছি।'

২. আল্লাহ তা'আলা দোযখ এবং বেহেশতের প্রতিচ্ছবি বাগানের দেয়ালের প্রস্থে এনে দিয়েছেন, যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ উভয়ের ওপরই আল্লাহ তা'আলার কুদরত বিদ্যমান।

৩. দ্বিতীয় এও সম্ভব যে, নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে সশরীরে দেখেননি। বরং তাঁদের রূহকে, তাঁদের অবয়বে দেখেছেন।

৪. তৃতীয় এও হতে পারে যে, উক্ত রজনীতে নবী করীম ﷺ-এর সম্মানার্থে তাঁদেরকে কবর থেকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৯, পৃ. ৭২, হাদীস: ৯১৫৫; হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

৫. চতুর্থত তাঁদের সাক্ষাতের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থাও হতে পারে, যা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান, তাই করতে পারেন। তবে উল্লিখিত সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে কোন একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না।

যেসব দলীল প্রমাণের দ্বারা হুযূর আকরম ﷺ তাঁর রওযায় পাকে স্বশরীরে জীবিত অবস্থানরত আছেন বলে প্রমাণিত হয়, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নেককার বান্দা সুলতান নূরুদ্দীন শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ঘটনা অন্যতম। যা ৫৫৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

বর্ণিত আছে যে, একদিন এক রজনীতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার স্বপ্নে দেখেন এবং প্রত্যেকবারই তিনি তাঁকে ইরশাদ করেছেন যে, এ দুই অসৎ নসরীনার ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা কর। এ স্বপ্নের পর সুলতান এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা তাইয়িবায় গমন করেন। এবং উভয় মলুনকে সুকৌশলে প্রেপ্তার করার পর তাদেরকে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আর মহামান্য সুলতান রওজায় পাকের চতুর্দিকে গর্ত খুড়ে সীসার প্রাচীর নির্মাণ করেন। মসজিদে নববীর অধ্যায়ে এ ঘটনা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত ঐতিহাসিকগণ, শায়খ জামালুদ্দীন মতরী এবং মজদুদ্দীন ফীরূযাবাদী প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমগণ এ ঘটনার উল্লেখ করে এর সত্যায়িত করেছেন।

ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফিয়ী শাফিয়ী সুলতান নূরুদ্দীনের জীবনীতে লিখেছেন যে, কোন কোন আধ্যাত্মিক মনীষী বলেছেন, সুলতান নূরুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশজন বিশিষ্ট ওলীদের মধ্যে একজন এবং তাঁর নায়েব সুলতান সালাহ উদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনশ ওলীদের একজন।

ইবনে আসীর বলেছেন যে, খুলাফায়ে রাশিদীন এবং খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি ব্যতীত বাদশাহ নূরুদ্দীনের মতো সৎ চরিত্র সম্পন্ন বাদশাহ আর কাউকে দেখিনি। আমরা আশ্চর্যবোধ করি যে, ইবনে আসীর সুলতান নূরুদ্দীনের জীবনীতে এ ঘটনাটি কেন উল্লেখ করেননি।

ইমাম কূনাওয়ী যিনি আম্বিয়ায় কিরাম আলাইহিমুস সালাম-কে আসমানে আছেন বলে ধারণা করেন তিনি বলেন, যদিও বা তাঁরা আসমানে থাকেন, কিন্তু কবরের সাথে তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। বরং কবরের সাথে তাদের এমন এক প্রগাঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, যা অন্য স্থানের সাথে থাকে না। ঠিক এমনিভাবে মুমিনদের কবর এবং তাঁদের আত্মার মধ্যেও এক বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কবরে তাঁদের সাথে এই বিশেষ সম্পর্কের কারণেই তাঁরা যিয়ারতকারীকে পরিচয় করতে এবং তাদের সালামের জওয়াব দিতে পারে।

কবরের সাথে তাদের এ সম্পর্কে স্থায়ীভাবে থাকার কারণেই সব সময় কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। এরপর তিনি অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন যে, এ সমুদয় হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির শ্রবণশক্তি আছে, তাঁরা শুনতে পায়। আর শ্রবণ এমন এক শক্তি, যার জন্য জীবনীশক্তি থাকা প্রয়োজন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সকল মৃত ব্যক্তিই জীবিত। তবে তাদের জীবনী শক্তি শহীদদের জীবনীশক্তি থেকে কম। আর শহীদদের জীবনী শক্তি থেকে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম-এর জীবনী শক্তি অনেকগুণ বেশি। তবে এ বিষয়ে অধিকাংশ আলিমদের মতো এটিই, যা আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ–৩: হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম জীবিত থাকার ব্যাপারে আরও কয়েকটি বিশেষ আলোচনা

প্রথমত হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ».

'এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমার ওপর সালাম পেশ করে, অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা আমার নিকটে আমার রূহ ফিরিয়ে দেন।'[১]

এ হাদীসের ওপর এ একটি বাস্তব প্রশ্ন যে, যদি হযরত ﷺ সেখানে সব সময় জীবিতই আছেন, তবে উম্মতের সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য রূহ ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ কি? আলিমগণ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

১. হাদীসের অর্থ এই যে, যখন আমার কোন উম্মত আমার ওপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে তাঁর সওয়ালের জওয়াব দেয়ার প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া। কেননা অন্য সময় রূহ সেদিকে থাকে না।
২. হাদীসে রূহ ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ, শরীরের মধ্যে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে যখন কোন উম্মত তাঁকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারককে তার সান্নিধ্য থেকে সালামের উত্তর দেয়ার প্রতি ফিরিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন রূহ ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, শুনতে পাওয়া। অর্থাৎ তিনি সালাম প্রদানকারীর সালামও শুনেন এবং উত্তরও দেন।

যদি বাক্যের বাহ্যিক অর্থ হিসেবে রূহকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থই নেওয়া হয়, তবে এর দ্বারা তাঁর রূহ মুবারক সদা-সর্বদা তার দেহে থাকাই

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭; (খ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২০৪১; হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

প্রমাণিত হবে। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর যখনই কেউ তাঁকে সালাম করল এবং তাঁর সে সালামের জওয়াব প্রদানের জন্য রূহ মুবারককে তাঁর দেহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করা হল, তখন সে রূহ মুবারক পবিত্র দেহের মধ্যে সদা-সর্বদাই বিরাজমান থাকবে। [illegible] রূহ প্রত্যাবর্তিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার যে মৃত্যু ঘটান হয়, এর কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। তা ছাড়া এমন কোন মুহূর্ত নেই, যাতে উম্মতগণ তাঁর ওপর সালাম প্রেরণ করেন না। এবং তিনিও তাঁদের সালামের উত্তর দেন না। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সর্বদা কবরে জীবিত আছেন এবং উম্মতের সালাম শুনেন ও উত্তর দেন।

শায়খ মজদুদ্দীন শিরাজী বলেন, যদি হাদীস এভাবে বলা হত, আমার রূহকে আমার শরীরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে সর্বদা জীবিত না থাকার প্রশ্ন দেখা দিত। অথচ হাদীসে সে রূপ বলা হয়নি।

হযরত ﷺ যে আসল রূহ এবং দেহের সমন্বয়ে জীবিত আছেন, তার ওপর বিশেষ কোন রূহানী শক্তি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আলোচনা, কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরম ﷺ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন, মিরাজ রজনীতে আম্বিয়া কিরামের সাথে মুলাকাত করেছেন।[1]

আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম-কে হজ্জে গমন করতে দেখেছেন এবং তাঁদেরকে লাব্বাইকা লব্বাইকা বলতে শুনেছেন।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আমি যেন মূসা আলাইহিস সালাম-কে সানিয়াতুল ওয়াদা থেকে অবতরণ করতে এবং লাব্বাইকা বলতে দেখতে পাচ্ছি যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম লাব্বাইকা, লাব্বাইকা বলেছেন।'

উল্লিখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে, বর্ণিত আমল ও ইবাদতসমূহ তো দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত। সেখানে এগুলো করতে দেখার অর্থ কি? আলিমগণ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

১. হাদীসে বর্ণিত নামায ও হজ্জের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকর ও দু'আ। যা আখিরাতে হতে পারে।

[1] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৯; (খ) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৮–৭৯, হাদীস: ৬ ও ৭:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوْسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ».

২. হযরাত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালাম শহীদগণ থেকে উৎকৃষ্ট জীবন নিয়ে জীবিত আছেন। সুতরাং তাঁরা যদি নামায, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করেন, তাতে আপত্তি কিসের?

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীগণের দুনিয়াতে কৃত আমলসমূহকেই হযরত ﷺ-কে দেখানো হয়েছে। এ কারণেই তো হযরত বলেছেন,

«كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ يُوْنُسَ».[1]

৪. কোন কোন মনীষী বলেছেন, 'দুনিয়া এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়কে বরযখ বলা হয়'-এর মধ্যেও দুনিয়ার হুকুম চলতে পারে। সুতরাং দুনিয়ার আমল যদি আলমে বরযখকেও পাওয়া যায়, এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আমল যে বন্ধ হবে, তা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই বন্ধ হবে। আর সেখানে আমল বন্ধ হবার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে বান্দার ওপর শরীয়ত নির্ধারিত আমলসমূহ চেপে দেওয়া যেত। ওখানে এরূপ আমলসমূহ চেপে দেওয়া যাবে না। এমন যদি কোন বন্দা সেখানে স্ব ইচ্ছায় মনের শান্তি এবং অন্তরের খুশি অর্জনের জন্য আল্লাহর যিকর-আযকার এবং ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়, তাতে কোন বাধা নেই। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ উম্মতের জন্য সুপারিশ করার সময় আল্লাহর দরবারে সিজদা করতেন। আর সিজদা আমল ও ইবাদতই তো বটে! এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেছেন যে, তাঁর এই দেখা স্বপ্নযোগে ঘটেছিল। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন

«بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ».

'আমি নিদ্রিত ছিলাম এ অবস্থায় আমি দেখতে পাই যে, আমি কাবা শরীফের তাওয়াফ করছি।'[2]

আর কেন কোন আলিম এ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, পয়গম্বরদের ঐসব অবস্থাসমূহ তাঁর কাছে অহী মারফত প্রকাশ পেয়েছে। একীন এবং বিশ্বাসের পূর্ণতার কারণে তিনি তাকে 'প্রত্যক্ষ করা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

[1] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস: ২৬৮ (১৬৬); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

[2] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ২৭৭ (১৭১); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

প্রমাণিত হবে। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর যখনই কেউ তাঁকে সালাম করল এবং তাঁর সে সালামের জওয়াব প্রদানের জন্য রূহ মুবারককে তাঁর দেহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করা হল, তখন সে রূহ মুবারক পবিত্র দেহের মধ্যে সদা-সর্বদাই বিরাজমান থাকবে। ক[illegible] রূহ প্রত্যাবর্তিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার যে মৃত্যু ঘটান হয়, এর কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। তা ছাড়া এমন কোন মুহূর্ত নেই, যাতে উম্মতগণ তাঁর ওপর সালাম প্রেরণ করেন না। এবং তিনিও তাঁদের সালামের উত্তর দেন না। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সর্বদা কবরে জীবিত আছেন এবং উম্মতের সালাম শুনেন ও উত্তর দেন।

শায়খ মজদুদ্দীন শিরাজী বলেন, যদি হাদীস এভাবে বলা হত, আমার রূহকে আমার শরীরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে সর্বদা জীবিত না থাকার প্রশ্ন দেখা দিত। অথচ হাদীসে সে রূপ বলা হয়নি।

হযরত ﷺ যে আসল রূহ এবং দেহের সমন্বয়ে জীবিত আছেন, তার ওপর বিশেষ কোন রূহানী শক্তি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আলোচনা, কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরম ﷺ হযরত মূসা আলায়হিস সালাম-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন, মিরাজ রজনীতে আম্বিয়া কিরামের সাথে মুলাকাত করেছেন।[1]

আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এবং হযরত ইউনুস আলায়হিস সালাম-কে হজ্জে গমন করতে দেখেছেন এবং তাঁদেরকে লাব্বাইকা লব্বাইকা বলতে শুনেছেন।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'আমি যেন মূসা আলায়হিস সালাম-কে সানিয়াতুল ওয়াদা থেকে অবতরণ করতে এবং লাব্বাইকা বলতে দেখতে পাচ্ছি যে, হযরত ইউনুস আলায়হিস সালাম লাব্বাইকা, লাব্বাইকা বলেছেন।'

উল্লিখিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে যে, বর্ণিত আমল ও ইবাদতসমূহ তো দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত। সেখানে এগুলো করতে দেখার অর্থ কি? আলিমগণ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

১. হাদীসে বর্ণিত নামায ও হজ্জের পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকর ও দু'আ। যা আখিরাতে হতে পারে।

[1] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৯; (খ) আল-বায়হাকী, *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম*, পৃ. ৭৮–৭৯, হাদীস: ৬ ও ৭: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوْسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهِ».

২. হযরাত আম্বিয়া কিরাম আলায়হিস সালাম শহীদগণ থেকে উৎকৃষ্ট জীবন নিয়ে জীবিত আছেন। সুতরাং তাঁরা যদি নামায, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করেন, তাতে আপত্তি কিসের?

৩. হযরত মূসা আলায়হিস সালাম প্রমুখ নবীগণের দুনিয়াতে কৃত আমলসমূহকেই হযরত ﷺ-কে দেখানো হয়েছে। এ কারণেই তো হযরত বলেছেন,

«كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ يُوْنُسَ».[1]

৪. কোন কোন মনীষী বলেছেন, 'দুনিয়া এবং কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়কে বরযখ বলা হয়'-এর মধ্যেও দুনিয়ার হুকুম চলতে পারে। সুতরাং দুনিয়ার আমল যদি আলমে বরযখকেও পাওয়া যায়, এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আমল যে বন্ধ হবে, তা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই বন্ধ হবে। আর সেখানে আমল বন্ধ হবার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে বান্দার ওপর শরীয়ত নির্ধারিত আমলসমূহ চেপে দেওয়া যেত। ওখানে এরূপ আমলসমূহ চেপে দেওয়া যাবে না। এমন যদি কোন বন্দা সেখানে স্ব ইচ্ছায় মনের শান্তি এবং অন্তরের খুশি অর্জনের জন্য আল্লাহর যিকর-আযকার এবং ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়, তাতে কোন বাধা নেই। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে খোদা ﷺ উম্মতের জন্য সুপারিশ করার সময় আল্লাহর দরবারে সিজদা করতেন। আর সিজদা আমল ও ইবাদতই তো বটে! এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেছেন যে, তাঁর এই দেখা স্বপ্নযোগে ঘটেছিল। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন

«بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ».

'আমি নিদ্রিত ছিলাম এ অবস্থায় আমি দেখতে পাই যে, আমি কাবা শরীফের তাওয়াফ করছি।'[2]

আর কেন কোন আলিম এ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, পয়গম্বরদের ঐসব অবস্থাসমূহ তাঁর কাছে অহী মারফত প্রকাশ পেয়েছে। একীন এবং বিশ্বাসের পূর্ণতার কারণে তিনি তাকে 'প্রত্যক্ষ করা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

[1] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১২৫, হাদীস: ২৬৮ (১৬৬); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

[2] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৫৬, হাদীস: ২৭৭ (১৭১); হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত

শায়খ আলাউদ্দীন কূনাওয়ী বলেন, এখানে একথাও বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর হযরত আম্বিয়া কিরামের রূহ মুবারক ফেরেশতাদের বরং তাঁদের থেকেও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং ফেরেশতাগণ যেমনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে তেমনি পয়গম্বরদের রূহও বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার কোন কোন বিশিষ্ট বান্দাও এ জাগতিক জীবনে তাঁদের রূহ তাঁদের আসল শরীর ব্যতীত অন্য শরীরেরও রূপ ধারণ করতে পারেন। এ কারণে তাঁদেরকে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখা যেতে পারে।

আমাদের সূফিয়ায়ে কিরামগণ বলেন, দৈহিক এবং রূহানী জগত ছাড়া আরো একটি জগত আছে যাকে আলমে মেসাল বলা হয় এ জগত থেকে সূক্ষ্ম এবং রূহানী জগৎ থেকে মোটা এবং ভারী।

রূহসমূহের বিভিন্ন রূপ ধারণ করা, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর হযরত ﷺ-এর নিকট 'দিহিয়ায়ে কলবীর' রূপ নিয়ে অবতরণ করা এবং হযরত মরিয়ম আলায়হাস্ সালাম-এর নিকট অবয়ব মানুষ রূপে অবতরণ করা ইত্যাদি আলমে মেসালেরই রূপ।

উল্লিখিত সূত্র ধরে যদি আমরা একথা বলি যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর আসল দেহ নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে অবস্থান করেন। আর কবরেও তাঁর (প্রতিচ্ছবি) রূপ নিয়ে বিদ্যমান আছেন, তবে এতে কোন প্রশ্নই থাকেনা।

সুতরাং আমরা বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে ষষ্ঠ আসমানে আসল রূপে দেখেছেন এবং কবরে মিসালী রূপে দেখেছেন, আলমে মিসালকে স্বীকার করে নেওয়ার পর এ জাতীয় অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। যেমন বেহেশতকে বাগানের দেয়ালে প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি। শায়খ কূনাওয়ীর কথা এখানেই সমাপ্ত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আম্বিয়া কিরাম আলায়হিস্ সালাম এবং অপরাপর জীবিত থাকার ব্যাপারটি অনুধাবনের জন্য (আলমে মেসাল) সম্পর্কসমূহ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

হযরত ﷺ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম-কে দর্শন করার ব্যাপারটি সেই ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম হবে, যে ব্যক্তি রূহানী, মিসালী এবং দৈহিক জগতসমূহের স্থান ও কালের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। যেমন মুহাক্কিক সুফিয়া কিরামগণ পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আমাদের দৈহিক জগতের মত মেসালী জগতে কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিভক্ত নয়। হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালাম মাছের পেটে চলে যাওয়া, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর নীল নদ পার হওয়া এবং হযরত ﷺ-এর জীবিত অবস্থান করা একই পর্যায়ের

ঘটনা। কিন্তু এখানে একথা উল্লেখ্য যে, হুযূর আকরম ﷺ হযরত আম্বিয়া কিরাম আলায়হিস্ সালাম এর কোন কোন নবীকে যে হজ্জে গমন করতে এবং লাব্বাইকা বলতে শুনেছেন, উহা তাঁদের পার্থিব জগতেরই ঘটনা এবং এখানে ইহাও অনুধাবন যোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আম্বিয়া কিরামকে তাঁদের মিসালী রূপে অবলোকন করেছেন বলার চাইতে তাঁদের আসলী দৈহিক রূপে যা দুনিয়াতে ছিল দেখেছেন বলে বলাটাই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাইয়িদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন হুযুরে আকরম ﷺ-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারত এবং তাঁর ওয়াসীলা গ্রহণ করা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

এ বিষয়ে দীনের সকল আলিমই একমত যে, হুযুর আকরম ﷺ-এর পবিত্র কবর শরীফ যিয়ারত করা সমুদয় সুন্নাতের মধ্যে উত্তম সুন্নাত এবং সমস্ত মুস্তাহাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব।

কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হুযূর আকরম ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারত করা সর্বসম্মত সুন্নাত। এটি এমন একটি ফযীলতের কাজ, যার প্রতি সমগ্র মুসলমানই উৎসুক ও আগ্রহান্বিত।[১]

মালিকী মাযহাবের কোন কোন আলিম এ যিয়ারতকে ওয়াজিব বলেছেন। অপর আলিমগণ একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সমগ্র সুন্নাতের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকাংশ আলিমের মতে, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ সমাপনান্তে রওযায়ে পাকের যিয়ারত করা সুন্নাত। শাফিয়ী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম কাযী হুসাইন বলেন, পবিত্র হজ্জ সমাপনের পর মুলতাযিমের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবে। এরপর মদীনা মুনাওয়ারায় গমন এবং রওযায়ে পাকের যিয়ারত করে ধন্য হবে। কাজী আবু তাইয়িব বলেন, হজ্জ এবং উমরা আদায়ের পর হযরত ﷺ-এর যিয়ারতে গমন করা মুস্তাহাব।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ হাসান ইবনে যিয়াদ রিওয়ায়ত করেন যে, হাজীর জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম হল এই যে, সর্বপ্রথম তিনি মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ আদায় করবে। এরপর মদীনা শরীফে গমন করে রওযায়ে পাকের যিয়ারত সর্বোত্তম মুস্তাহাব, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি।

চার মাযহাবের ইমামগণ পূর্বে হজ্জ করারই সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তবে কোন কোন আলিম বলেছেন, যদি মদীনা শরীফ, মক্কা শরীফ গমনের পথে পড়ে, তবে প্রথমে রওযায়ে পাকের যিয়ারত এবং পরে হজ্জ করবে। তবে পূর্ববর্তী কোন কোন বুযুর্গানে দীন বলেছেন, মদীনা শরীফ-মক্কা শরীফ গমনের পথে না হলেও তাঁরা রওযায়ে পাক যিয়ারত করার কথা বলেছেন, কোন কোন তাবেয়ী এ মতেরই অনুসারী।

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৬৮; (খ) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ১৯৪

ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়তের চার প্রকারের দলীলের (কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস) দ্বারা হুযূর আকরম ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারতের ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

কুরআনের দলীল: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

'এবং যদি তারা আপন সত্তার ওপর যুলুম করে আপনার নিকটে গমন করে আর তারা নিজেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূল ও তাঁদের জন্য গুনাহ মাফ চান, তবে তারা আল্লাহ তা'আলাকে তওবা কবুলকারী ও নিতান্ত দয়াবান পাবেন।'[১]

তিনি বলেছেন যে, কুরআন শরীফের এ আয়াতটি হুযূর আকরম ﷺ-এর পাক দরবারে উপস্থিতির প্রেরণা, আর উপস্থিতির পর নিজেও আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন জানানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে দরবারে নববীতে উপস্থিত হওয়ার এবং গুনাহ মাফ করানোর জন্য তাঁর নিকট আবেদন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। উম্মতের গুনাহ মার্জনার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, তাঁর সদা-সর্বদা একটা মহান কাজ। এ কাজের বিরতি নেই। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় উম্মতের জন্য যেমন ইস্তিগফার করতেন, মৃত্যুর পরেও তাঁদের জন্য ইস্তিগফার করেন। কেননা পার্থিব জীবন এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তাঁর জন্য সমান। সমস্ত আলিমগণ এ আয়াত থেকে একথাই প্রমাণ করেছেন। তা ছাড়া ফেরেশতাগণ যে তার নিকট উম্মতের আমলনামা পেশ করেন, এর থেকেও তিনি যে হায়াতুন্নবী একথা প্রমাণিত হয়।

আলিমগণ এ আয়াত থেকে হুযূর আকরম ﷺ-এর হায়াত এবং মওতকে সমান প্রমাণ করে যিয়ারতের আদব সম্পর্কে হুকুম দিয়েছেন, যদি তাঁরা হুযূর আকরম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তবে তাঁরা এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করে তাঁর দরবারে যেন গুনাহ মাফের দরখাস্ত পেশ করেন। কেননা তাঁরা মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট দরখাস্ত পেশ করবেন। অন্যদের চাইতে তাঁদের প্রতি তিনি যে বেশি দয়াপরবশ হয়ে ইস্তিগফার করবেন, এতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর একজন গ্রাম্য লোকের রওযায়ে পাকের যিয়ারতে এসে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার ঘটনাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার মাযহাবের লোকদের থেকে যে কোন ব্যক্তি হজ্জের আহকাম সম্পর্কে কোন কিতাব লিখেছেন, তিনিই এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন এবং এ মহান দরবারে আয়াতটি তিলাওয়াত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৬৪

ঘটনার বিবরণ: অনেক বিশিষ্ট ইমামগণ বিশুদ্ধ এবং বিশ্বস্ত সনদ সহকারে ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে হাবর হিলালী বলেছেন যে, আমি মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে রওযায়ে পাক যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করে কবরের সম্মুখে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ একজন গ্রাম্য লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে কবর শরীফ যিয়ারত করেন। আর যিয়ারত করার সময় তিনি বলেন, يَا خَيْرَ الرُّسُلِ (হে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর!) আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর একখানি সত্য কিতাব নাযিল করেছেন এবং উক্ত কিতাবে তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ ۝

'এবং যদি তারা আপন সত্তার ওপর যুলুম করে আপনার নিকটে গমন করে আর তারা নিজেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে... ।'[১]

এখন আমি আপনার পাক দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আর আয়াতের মর্মানুসারে গুনাহ মাফের জন্য আপনার সুপারিশ তলব করছি। এরপর লোকটি কেঁদে কেঁদে এ কবিতাটি আবৃত্তি করে,

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ	*	فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ	*	فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

'হে সর্বোত্তম ব্যক্তি যাঁর অস্থিসমূহ সমতলভূমিতে দাফন করা হয়েছে সেসব অস্থিসমূহের সুগন্ধিতে সমতল এবং নিম্নভূমি সবই সুগন্ধিতে ভরপুর হয়েছে। আমার প্রাণ সেই কবরের নিমিত্ত উৎসর্গ, যেখানে আপনি অবস্থান করেন। যে কবরের মধ্যে সাধুতা, সততা, দানশীলতা এবং ভদ্রতা বিরাজমান।'

উক্ত বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গ্রাম্য লোকটি চলে যায়। লোকটি চলে যাবার পর আমি হুযূর আকরম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে তিনি আমাকে ইরশাদ করেন, 'তুমি সেই গ্রাম্য লোকটির নিকট যাও এবং তাঁকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সুপারিশ কবুল করে তাকে মাফ করে দিয়েছেন।'[২]

হাফিয আবু আবদুল্লাহ *মিসবাহুয যাল্লাম* নামক কিতাবে, আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, উক্ত গ্রাম্য লোকটি হুযূর আকরম ﷺ-এর ইন্তিকালের তিন দিন পর রওযায়ে পাকে

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৬৪

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৫-১৮৬; (খ) ইবনুল জওযী, *মুসীরুল আযম আস-সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন*, খ. ২, পৃ. ৩০২, হাদীস: ৪৭৭

আসেন এবং নিজকে কবরের মাটিতে লুটিয়ে দেন। আর কবরের মাটি গায়ে মালিশ করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি আল্লাহ তা'আলা থেকে যা শুনেছেন, তা আমরা আপনার থেকে শুনেছি। আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে শিখে যা মুখস্থ করেছেন, আমরা তা আপনার নিকট থেকে মুখস্থ করেছি। সেগুলোর মধ্যে আমরা আপনার নিকট এ আয়াতটিও শ্রবণ করেছি:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

'এবং যদি তারা আপন সত্তার ওপর যুলুম করে আপনার নিকটে গমন করে আর তারা নিজেও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং রাসূল ও তাঁদের জন্য গুনাহ মাফ চান, তবে তারা আল্লাহ তা'আলাকে তওবা কবুলকারী ও নিতান্ত দয়াবান পাবেন।'[১]

আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। এ সময় কবর থেকে এ আওয়াজ শোনা যায় যে, তোমার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।[২]

উল্লেখ্য যে, রওযায়ে পাক যিয়ারতের ফযীলত এবং অপরাপর কবর যিয়ারত সম্পর্কে যেসব সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে, সেগুলো থেকেই হযরত ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারতের সুন্নাত প্রমাণিত হয়। কেননা অপরাপর কবর যিয়ারত করা যদি মুস্তাহাব ও সুন্নাত হয় সাইয়িদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুরে পাক ﷺ-এর কবর শরীফ যে উত্তম মুস্তাহাব ও সুন্নাত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে যে ইজমায়ে উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে মেয়ে লোকদের যিয়ারত সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন আলিম বলেছেন, স্ত্রীলোকদের কবর যিয়ারত করা না-জায়েয। কেননা এ সম্পর্কে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সহীহ এবং সঠিক কথা এই যে, স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, উভয়ের জন্য হুযূর পাক ﷺ এবং তাঁর সাথীদ্বয় হযরত আবু বকর رضي الله عنه এবং হযরত উমর رضي الله عنه-এর কবর যিয়ারত করা উত্তম মুস্তাহাব। এটি নিষেধকৃত হাদীসের বহির্ভূত। এগুলো নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, নিষেধের হাদীস রহিত হয়েছে। কেননা কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর আবার যিয়ারত করার তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন,

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৬৪

[২] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; (খ) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুয যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ২১

«إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.»

'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা নিষেধ করেছিলাম। শুনে রাখ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'[১]

শাফিয়ী মাযহাবের পরবর্তী ইমাম দামানহূরী উল্লিখিত হুকুমের মধ্যে আওলিয়ায়ে কিরাম এবং নেককার ব্যক্তিদের কবরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের জন্য তাঁদের কবর যিয়ারত করা জায়েয। সাইয়িদা হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উহুদে গমন করে শহীদগণের সরদার হযরত হামযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কবর যিয়ারত করা এবং হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) মক্কায় গমন করে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কবর যিয়ারত করা থেকে দামানহূরীর কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

হুযূর পাক ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারত করা যে অতি নেক আমল এবং উত্তম কাজ, এটি যেমন কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতের দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি এটি কিয়াসের দ্বারাও প্রমাণিত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ জান্নাতুল বকী'তে গমন করে সেখানকার কবরে এবং উহুদে গমন করে শহীদগণের কবর যিয়ারত করতেন। সুতরাং যখন অপরাপর লোকদের কবর যিয়ারত মুস্তাহাব প্রমাণিত হল, তখন খোদ বিশ্বজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ﷺ-এর কবর যিয়ারত করা নিশ্চিতভাবে উত্তম মুস্তাহাবই হবে।[২]

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য

কোন কোন আলিম বলেছেন যে, আখিরাতকে স্মরণ করাই কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য। যেমন– হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

«زُوْرُوا الْقُبُوْرَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.»

'তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৩]

আবার কখনও মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ এবং ইস্তিগফার করাও কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হয়। যেমন– হযরত ﷺ এই উদ্দেশ্য জান্নাতুল বকী'তে গমন করে যিয়ারত করতেন। তা ছাড়া কখনও কবরবাসীদের থেকে ফায়দা অর্জন এবং ফয়েয ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যেও কবর যিয়ারত করা হয়। আওলিয়ায়ে

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৯৮, হাদীস: ১১৩৮; হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৬–১৮৭

[৩] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫০০, হাদীস: ১৫৬৯; হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত

কিরাম এবং আল্লাহ তা'আলার নেককার বান্দাদের কবর যিয়ারত সাধারণত এই উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আলিমদের অনেক রিওয়ায়ত বিদ্যমান আছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহর যেসব নেক বান্দাদের থেকে তাঁদের জীবদ্দশায় ফায়দা হাসিল করা হয়েছে, মৃত্যুর পরেও তাঁদের থেকে ফায়দা হাসিল কর।[১]

ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত ইমাম মূসা কাযিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কবর শরীফ দু'আ কবুলের স্থান। কোন কোন মাশায়িখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর চার জন এমন বিশিষ্ট ওলি পেয়েছি, যাঁরা জীবিত অবস্থায় দুনিয়াতে যেমন অনন্য সাধনা করতেন; মৃত্যুর পরেও তাঁদের মধ্যে এ ধরনের বরং এর চাইতেও অধিক সাধনায় বিদ্যমান আছে। তাদের মধ্যে একজন হযরত মারূফ করখী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), দ্বিতীয় হযরত বড় পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি আরো দু'জন বুযুর্গের উল্লেখ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন কোন আলিমগণ কবর থেকে ফায়দা তলব করার ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। যেমন শায়খ কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম উল্লেখ করেছেন। আবু মুহাম্মদ মালিকী বলেন, হুযূর আকরম ﷺ-এর কবর ব্যতীত অপরাপর কবর থেকে ফায়দা হাসিল করা 'বিদআত'। ইমাম তাজউদ্দীন সুবকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিদআত থেকে পয়গম্বরদের কবরকে বাদ দেওয়া যথাযথই হয়েছে। তবে অন্যান্যদের কবর থেকে ফায়দা হাসিল করাকে একই হুকুম সমর্থনযোগ্য নয়।

এছাড়া হক আদায়ের উদ্দেশ্যেও কবর যিয়ারত করা হয়। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

'মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যদি তার কবর যিয়ারত করে, তবে এতে সেই ব্যক্তি খুবই আনন্দ পায়।'[২]

এ বিষয়ের ওপর বিস্তর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হযরত ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে,

«مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا كُتِبَ بَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِهِمَا عَاقًا»

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবার তার পিতা-মাতা উভয়ের অথবা কোন

[১] আল-গাযালী, *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ২৪৭

[২] আবুল ফুতূহ আত-তাঈ, *আল-আরবা'ঈন ফী ইরশাদিস সায়িরীন ইলাম মানাযিলি মুত্তাকীন*, পৃ. ১৩৮: «آنَسُ مَا يَكُوْنُ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ إِذَا زَارَهُ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا».

একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে নেককার লেখা হয়, যদিওবা সে দুনিয়াতে ইতঃপূর্বে তাদের নাফরমান ছিল।'[১]

উপরে কবর যিয়ারতের যে সমুদয় উদ্দেশ্যাবলি বর্ণিত হলো, হযরত ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারতের মধ্যে সেগুলো সবই বিদ্যমান।

ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, «زُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ» (আমি নবী করীম ﷺ-এর কবর যিয়ারত করেছি।)[২] বলাটাকে অপছন্দ করতেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। আবদুল হক সাকালী বলেন, অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত করা আর না করা উভয়ই সমান। কিন্তু হযরত ﷺ-এর ক্ষেত্রে তদ্রূপ নয়। কেননা তাঁর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব। এ কারণেই তিনি এখানে 'যিয়ারত' শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দ করেছেন।

যিয়ারতকে কবরের দিকে সম্পর্কিত করাই অপছন্দের কারণ। সুতরাং এ স্থলে যদি বলা হয় আমি নবী ﷺ-এর যিয়ারত করেছি তবে এ অপছন্দ আর থাকবে না। আর যিয়ারতকে কবরের দিকে সম্পর্কিত করার ফলে যে অপছন্দ হয়েছে, এ হাদীসটিই তার মূল কারণ:

«اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ أَخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

'হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন 'ভূত খানায়' পরিণত করো না, যাকে পূজা করা হয়। সেই জাতির ওপর আল্লাহর গজব ভীষণ হয়, যারা তাদের পয়গম্বরের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।'[৩]

কবর যিয়ারত করা যদিও এ পর্যায়ভূক্ত নয়, তারপরও এমন শব্দের ব্যবহার থেকেও সতর্কতা প্রয়োজন। এটিই ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই কবর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুবকী বলেন, সম্ভবত উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট পৌঁছেনি অথবা নবী ﷺ ব্যতীত সম্ভবত অপর লোকের কবর সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।

ইবনে রুশদ ইমাম মালিক থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি বলেছেন,

[১] আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ১০, পৃ. ২৯৮, হাদীস: ৭৫২২

[২] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মাদূনা*, খ. ১, পৃ. ৪০০

[৩] মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুওয়াত্তা*, খ. ১, পৃ. ২২৩, হাদীস: ৫৭০; (খ) আবদুর রায্যাক আস-সানআনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ১, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ১৫৮৭

যদি কেউ «زُرْتُ النَّبِيَّ ﷺ» বলে আমি তা অপছন্দ করি। কেননা যিয়ারত করা থেকে তাঁর মর্যাদা অনেক ওপরে।

ইবনে রুশদ বলেন, যিয়ারত শব্দ অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে এই যে, এ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওপরই ব্যবহৃত হয়। অথচ নবী করীম ﷺ সমস্ত জীবিতদের মধ্যে অধিকতর জীবিত।[১]

আবার কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপকার সাধনের জন্যই যিয়ারত করা হয়। অথচ হযরত ﷺ-এর যিয়ারত এ উদ্দেশ্যে হয় না।

মুদ্দাকথা এই যে, 'নিষেধ' ও 'অপছন্দ' ইত্যাদি কথাগুলো শুধু শাব্দিক ব্যাপার। তবে অপরাপর ইমামগণ শব্দসমূহের ব্যবহার অপছন্দ করেন না।[২]

অনুচ্ছেদ—১

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে যখন রওয়ায়ে পাকের যিয়ারতের ফযীলত এবং শরীয়ত মতে তা উত্তম মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত, তখন এ উদ্দেশ্যে অন্তরের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সফর করাও শরীয়তসম্মত এবং উত্তম কাজ বলে প্রমাণিত হবে। এতে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকলই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেউ কেউ হাদীসে নববী,

«لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ».

'তোমরা তিন মসজিদ (মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা) ব্যতীত অপর কোন স্থানের দিকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো না।'[৩]

এর পরিপ্রেক্ষিতে নবীদের ও অলিদের কবর যিয়ারতের জন্য সফর করাও অবৈধ বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের একথাটি সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা আরবী ব্যাকরণ অনুসারে 'যে জিনিস যে জিনিস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে'-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে, 'তোমরা এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপর কোন মসজিদের প্রতি সফর ইখতিয়ার করো না।' কেননা এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর মসজিদ সবই সম-মর্যাদা সম্পন্ন। সুতরাং এ হাদীসের দ্বারা অন্য কোন সফর অবৈধ সাব্যস্ত হয় না। আর অবৈধ হতেও পারে

[১] ইবনে রুশদ আল-জদ্দু, *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ওয়াশ শরহ ওয়াত তাওজীহ ওয়াত তা'লীলু লি-মাসায়িলি মুসতাখরাজা*, খ. ৮, পৃ. ১১৮–১১৯

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৭–১৮৮

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৯৭৫, হাদীস: ৪১৫ (৮২৭); হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত

না। কেননা হজ্জ, জিহাদ, হিজরত, ব্যবসা-বাণিজ্য, তলবে ইলম ইত্যাদির জন্য সফর করা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়িয। সুতরাং রওযায়ে পাক যিয়ারতের মতো নেক কাজের জন্য সফর করাও না-জায়েয হতে পারে না।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেছেন যে, হযরত ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারত করা এ হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা যদি কেউ মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করে, তবে এতে রওযায়ে পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সাধিত হয়। কারণ রওযায়ে পাক মসজিদের পাশেই অবস্থিত আর উল্লিখিত মসজিদ তিনটি সফর করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য যেমন হুযূর আকরম ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর খিদমতে গমন করে সৌভাগ্য অর্জন করা হত, ইন্তিকালের পরেও রওযায়ে পাক যিয়ারতের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। এখানে শুধু কবর শরীফ তা'যীম করার উদ্দেশ্যে যাওয়া হয় না। সুতরাং এটি অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

আবার কোন কোন আলিম বলেছেন, এ তিনটি মসজিদে যে সমুদয় ফযীলত ও সওয়াব রয়েছে, তা অর্জনের জন্য অন্য মসজিদে সফর করতে যাওয়া এ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কেউ এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন স্থানে সফর করে, এ হাদীসের দ্বারা তা অবৈধ হবে না।

কোন কোন আলিম বলেছেন, হাদীসে যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপর কোন মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে দূর-দূরান্তের মসজিদে সফরে যাওয়া। সুতরাং কেউ যদি বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ না করে হেঁটে বা সওয়ার হয়ে অপর কোন মসজিদে যায়, তবে তা জায়েয হবে। যেমন– মদীনা থেকে হেঁটে বা সওয়ার হয়ে যদি কেউ মসজিদে কুবাতে গমন করে, তা অবৈধ হবে না।

অধিকাংশ আলিমদের মতে, উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপর কোন মসজিদে যাওয়ার মানত করা জায়েয না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যে কোন মসজিদে যাওয়ার মানত করা জায়েয, এতে কোন বাধা নেই। আবার কোন কোন আলিম একথাও বলেছেন যে, যদি সফর করে যেতে হয়, তবে না জায়েয, অন্যথায় জায়েয। কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, কোন একজন লোক যদি মসজিদে কুবায় যাবে বলে মানত করে, তবে তার কি হুকুম? তিনি বলেন, তার মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব।[১]

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৯:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُئِلَ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَلْزَمَهُ ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَمْشِيَ.

মসজিদে কুবা সম্পর্কে যে সমুদয় ফযীলত বর্ণিত আছে সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে কুবাও উল্লিখিত মসজিদ তিনটির অন্তর্ভুক্ত। কেননা বর্ণিত আছে যে, মসজিদে কুবায় নামায পড়া উমরা আদায়ের বরাবর সওয়াব। মসজিদে আকসার এক হাজার রাকাআত থেকে এ মসজিদে দু'রাকাআত নামায পড়া উত্তম। আর বর্ণিত আছে যে, হুযূর আকরম ﷺ পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে মসজিদে কুবায় গমন করতেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, যদি মসজিদে কুবা বিশ্বের কোন এক প্রান্তে হত এবং সেখানে পৌঁছতে যত উটই মারা যেত না কেন, নিশ্চয় আমি এ মসজিদের যিয়ারত করতাম।

উল্লিখিত ফযীলতসমূহের পরিপ্রেক্ষিত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মসজিদে কুবাও উক্ত মসজিদসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত মসজিদে কুবা সম্পর্কে বর্ণিত বিশেষ ফযীলতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হওয়ায় একেও তার অন্তর্ভুক্ত করার ফলে উল্লিখিত হাদীসে এর উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারতের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ ছাড়া অন্য লোকের কবর যিয়ারতের মানত সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[১]

হুযূর আকরম ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে মদীনায় গমন সম্পর্কে বুযুর্গানে দীনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যমানায় হুযূর পাক ﷺ-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া থেকে মদীনা আগমনের ঘটনা অন্যতম।

ইবনে আসাকির হযরত আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন করেন। স্বপ্নে তিনি তাঁকে ইরশাদ করেন যে, 'হে বিলাল! এটা কত বড় অবিচার যে, তুমি আমার যিয়ারত করতে আস না।' সে সময়ই তিনি স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হওয়ার পর স্বীয় উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা শরীফের পথে রওয়ানা হয়ে যান। যখন তিনি রওযায়ে পাকে পৌঁছেন, তখন তিনি খুব বেশি আহাজারি ও ক্রন্দন করেন এবং চেহারা মুবারক মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে নযরানা পেশ করেন। সে সময়ে হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কোলে তুলে নেন এবং তাদের কপালে চুমো দেন। এ ঘটনার মাত্র কিছু দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়নমণি এবং তাঁদেরই প্রিয়তমা জননী হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। জনগণ তাঁর আযান শ্রবণের জন্য যখন বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন, তখন তাঁরা মনে মনে এ কৌশল গ্রহণ

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮৮–১৮৯

করলেন যে, যদি আমরা হযরত ইমাম হাসান ﵁ এবং ইমাম হুসাইন ﵁-এর মাধ্যমে তাঁকে আযান দেওয়ার কথা বলতে পারি, তবে বিশেষ আশা যে, তিনি তা রদ করবেন না। তাঁদের ফরমাইশ তিনি কবুল করবেন। জনগণের এ কৌশল গ্রহণের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি আযান দেওয়া বন্ধ করে দেন। এমন কি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁ যখন তাঁর শাসনামলে একদিন হযরত বিলাল ﵁-কে বলেন যে, হে বিলাল! নামাযের আযান তুমিই দেবে। তখন তিনি আরজ করেন যে, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি আমাকে নিজ সম্পদ ব্যয় করে ক্রয় করেছেন এবং আযাদ করেছেন। এ নেক কাজগুলো কি আপনি নিজ স্বার্থে করেছেন? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর ওয়াস্তেই করেছি। তখন হযরত বিলাল ﵁ আরজ করেন, এখনও আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ছেড়ে দিন। কেননা রাসূলুললাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আর আমার আযান দেওয়ার শক্তি নেই! অতঃপর তিনি সিরিয়ায় চলে যান। সেখান থেকেই যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা তাইয়িবায় আসেন। মুদ্দাকথা যখন হযরত ইমাম হাসান ﵁ ও হযরত ইমাম হুসাইন ﵁ হযরত বিলাল ﵁-কে আযান দেওয়ার ফরমাইশ করেন, তখন তিনি বাধ্য হয়ে মসজিদের ছাদের ওপর চলে যান, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় যে স্থানে আযান দিতেন, যখন সে স্থানে খাড়া হয়ে বললেন, «اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ»، তখন জনগণের অস্বাভাবিক শোর-গোলের দ্বারা সমগ্র মদীনা মুনাওয়ারা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। আবার যখন তিনি বললেন, «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» তখন লোকের ক্রন্দন রোল এত বেশি বেড়ে যায় যে, মনে হচ্ছিল যেন মদীনায় ভূমিকম্প হচ্ছে। এরপর যখন তিনি আবার «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ» উচ্চারণ করেন, তখনই মদীনার আবাল বৃদ্ধ, বণিতা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ক্রন্দন এবং চিৎকার করে ঘরের বাইরে এসে পড়েন এবং মনে করেন যেন কিয়ামত আরম্ভ হয়ে গেছে। হুযূর আকরম ﷺ-এর ইন্তিকলের সময় যেমন জনগণের ক্রন্দন রোলে মদীনা মুনাওয়ারা প্রকম্পিত হয় উঠেছিল, এ সময়ও তেমনি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বর্ণিত আছে যে, এ সময় হযরত বিলাল এমন শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি আর সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। সেখানেই আযান স্থগিত রেখে তিনি ছাদের ওপর থেকে নিচে নেমে আসেন।[১]

আরও বর্ণিত আছে যে, যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ﵁ সিরিয়া জয় করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দিসের নেতাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন, তখন হযরত কাব আহবার ﵁ আমিরুল মুমিনীনের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ

[১] (ক) আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮২–১৮৩; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিক*, খ. ১৬, পৃ. ২১

করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে হযরত উমর ﵁ বিশেষভাবে আনন্দিত হন। যখন আমিরুল মুমিনীন সিরিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি হযরত কাব ﵁-কে বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে মদীনায় যেতে চাও এবং উভয় জাহানের সরদার হুযুরে পাক ﷺ-এর পবিত্র রওযা শরীফ যিয়ারতের বাসনা রাখ? হযরত কাব বললেন, نَعَمْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَنَا أَفْعَلُ ذٰلِكَ (আমিরুল মুমিনীন! আমি তাই করব)। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌঁছার পর হযরত উমর ﵁ সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তা ছিল হযরত ﷺ-এর পবিত্র রওযায়ে পাকের যিয়ারত।[১]

আবদুর রায্যাক সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ সফর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন তখন সর্বপ্রথম রওযায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে বলতেন,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ».[২]

মুআত্তা ইমাম মালিকের মধ্যে এ রিওয়ায়তটি বর্ণিত আছে, একজন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵁-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত নাফে ﵁ থেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি হযরত ইবনে উমর ﵁-কে রওযায়ে পাকে সালাম আরজ করতে দেখেছ? তিনি বললেন, একবার নয়, শতবার দেখেছি যে, তিনি কবর শরীফের নিকটে দাঁড়িয়ে বলছেন,

«اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ، اَلسَّلَامُ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ، اَلسَّلَامُ عَلَى أَبِيْ».

মসনদে ইমাম আযম ﵁ মধ্যে হযরত ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন যে, রওযায়ে পাক যিয়ারতের সুন্নাত (তরীকা) এই যে, যিয়ারতকারী কিবলার দিক থেকে রওযায়ে শরীফে আসবে এবং রওযায়ে পাককে সামনে এবং কিবলাকে পিছনে রেখে বলবে,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».[৩]

[১] আল-ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ. ১, পৃ. ২৩৩

[২] আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬, হাদীস: ৬৭২৪:
عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «...».

[৩] আল-হারিসী, *মুসনদু আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২১৫–২১৬, হাদীস: ১৮৩:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ، ثُمَّ تَقُوْلَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

বর্ণিত আছে যে, খলীফা মারওয়ান ইবনে হাকাম এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যে, তিনি তার মুখমণ্ডল কবর শরীফের ওপর রেখেছে। এ অবস্থা দেখে মারওয়ান তাঁর গর্দান ধরে বলল, তুমি একি কাজ করছ? তখন তিনি বললেন, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি আমার মুখ কোন পাথরের ওপর রাখিনি। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফের ওপরই আমার মুখ রেখেছি। একথা বলার পর লোকটি বললেন, আমি রাসূলে পাক ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, 'সেই সময় তোমরা দীনের ওপর ক্রন্দন কর, যখন দেখতে পাবে যে, অনুপযুক্ত লোক দেশের শাসনকর্তা হয়েছে।'[১]

আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রحمه الله রওযায়ে পাকে তাঁর সালাম পেশ করার জন্য সিরিয়া থেকে তাঁর দূত মদীনায় প্রেরণ করতেন। উল্লিখিত ঘটনাসমূহ তাবেয়ীনদের প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত ঘটনা।[২]

তবে এখানে এটিও উল্লেখ্য যে, হযরত হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه একদল লোককে রওযায়ে পাকের চতুর্দিকে সমবেত হতে দেখে তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, পয়গম্বর ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না। আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখান থেকেই আমার নিকট দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে, তা আমার নিকট পৌঁছে যাবে।'[৩]

তদ্রূপ হযরত ইমাম যাইনুল আবিদীন رحمه الله থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে রওযায়ে পাকের জানালার দিক থেকে এসে দু'আ করতে দেখে নিষেধ করেন এবং তাঁর নিকট উল্লিখিত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন।[৪]

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৮, পৃ. ৫৫৮, হাদীস: ২৩৫৮৫:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَ: أَتَدْرِيْ مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُوْ أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تَبْكُوْا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنْ ابْكُوْا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ».

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৮২–১৮৪

[৩] আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬, হাদীস: ৬৭২৬:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَلَا تَتَّخِذُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ».

[৪] আবূ ইয়া'লা আল-মূসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ৪৬৯:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُوْ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا،

এভাবে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহল ইবনে সুহাইল رضي الله عنه বলেন, একদিন আমি হুযূর পাক ﷺ-এর রওযায়ে পাকের মধ্যে সালাম পেশ করার জন্য উপস্থিত হই। এ সময়ে হযরত হাসান ইবনে আলী رضي الله عنه হযরত ফাতিমা رضي الله عنها-এর গৃহে রাতের বেলার খাবার গ্রহণ করছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, কিন্তু খাদ্যের প্রতি আমার আগ্রহ না থাকার কারণে আমি সেখানে গেলাম না। তখন তিনি আমাকে বললেন, কবর শরীফের নিকটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ? সালাম আরজ কর এবং চলে যাও। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ো না। তুমি এবং উন্দুলুসের বাসিন্দা সবই সমান।'[১]

হযরত ইমাম যায়নুল আবিদীন رحمه الله থেকেও এ ধরনের রিওয়ায়ত বর্ণিত আছে।[২]

উল্লিখিত রিওয়ায়তসমূহের উত্তর এই যে, সম্ভবত উল্লিখিত ইমামগণ তাঁদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে দেখেছেন অথবা তাদের মধ্যে কোন কিছু বানোয়াট প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে নিষেধ করেছেন, এসব ইমামগণের নিষেধ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে তাঁরা এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর পবিত্র দরবারে দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী সমান। যেমন– কোন কবি বলেছেন,

در راہِ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست

می بینمت عیان و دعا می فرستمت

'ইশক মুহাব্বতের ক্ষেত্রে নিকট এবং দূরত্বের কোন প্রশ্নই নেই। আমি আপনাকে প্রকাশ্যে দর্শন করছি। আর আপনার দরবারে সালাম পেশ করছি।'

আর ইমাম মালিক رحمه الله-এর মাযহাব মতে কবর শরীফের নিকটে বেশিক্ষণ অবস্থান করাই মাকরূহ। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের জন্য।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের দ্বারা রওযায়ে পাকের যিয়ারত করা, সেখানে উপস্থিত হওয়া এবং অবস্থান করার অবৈধতা বোঝায় না। কেননা আহলে বায়তের ইমামদের সম্পর্কে সহীহ রিওয়ায়তে মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন এসব

وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا، فَإِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِيْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ».

[১] (ক) আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯০; (খ) আজ-জাহযামী, *ফযলুস সালাত আলান্নাবী* ﷺ, পৃ. ৪০, হাদীস: ৩০

[২] আস-সামহূদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯০–১৯১

বুযুর্গানে দীন সালাম পেশ করার জন্য রওযায়ে পাকে যেতেন, তখন তাঁরা রওযায়ে পাক সংলগ্ন থামের নিকট দাঁড়িয়ে সালাম দিতেন এবং তাঁরা একথাও বলতেন যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর মস্তক মুবারকের স্থান এখানেই।

মাতরী বলেন. হুজরা শরীফকে মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে বুযুর্গানে দীনের যিয়ারতের ইহাই নিয়ম ছিল। বর্তমানে সালাম দেয়ার জন্য দাঁড়ানোর স্থান হচ্ছে সেই স্থানে, যেখানে দেয়ালের মধ্যে চান্দি পেরাক প্রোথিত রয়েছে, এই পেরাক হুযূর আকরম ﷺ-এর চেহারা মুবারকের মুখামুখি রাখা হয়েছে। যিয়ারতের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

তবে পয়গম্বর ﷺ-এর ইরশাদ: «لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا» (তোমরা আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না) এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদ আলিমগণ বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন– মুহাদ্দিস হাফিয মুনযিরী رحمة الله عليه বলেছেন যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অধিকভাবে যিয়ারত করার জন্য উৎসাহিত করা। কেননা হাদীসের অর্থ হচ্ছে, তোমরা আমার কবরকে ঈদের মতো বছরে শুধু দু'একবার যিয়ারত করে ক্ষান্ত হয়ো না, বরং যত বেশি সম্ভব যিয়ারত করো। যেমন- হাদীসে ইরশাদ করা হয় যে, «لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا» (তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ো না।)[১]-এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে ইবাদত-বন্দেগিবিহীন অবস্থায় পড়ে থেকো না; যেমন– মুরদাগণ কবরের মধ্যে ইবাদতবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। বরং ঘরের মধ্যে সর্বদা নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। হাফিয মুনযরীর উল্লিখিত ব্যাখ্যা খুবই সমীচীন বলে মনে হয়।

এ হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমার কবর যিয়ারতের জন্য ঈদের মতো কোন সময় নির্ধারিত করো না। এইভাবে যে ঈদের মতো বছরে হয়ত দু'একবার যিয়ারত করলে আর ব্যাস! বরং মনে রাখবে, বছরের সবসময়ই যিয়ারতের সময়। অথবা হাদীসের মধ্যে কবরকে ঈদের সাথে এই উদ্দেশ্যই তুলনা দেওয়া হয়েছে যে, ঈদের সময় যেমন তোমরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠ, যিয়ারতের সময় তদ্রুপ উৎসবে মেতে ওঠ না। বরং দরূদ ও সালামের মধ্যেই যিয়ারতকে সীমাবদ্ধ রাখ।[২]

মুহাদ্দিসীনের উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের পরিপ্রেক্ষিত আমরা বলতে পারি যে, যিয়ারতের জন্য কবর পাকের সামনে অবস্থানের এবং দু'আ ও ফরিয়াদ নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হওয়ার কোন উল্লেখ হাদীসের মধ্যে নেই।

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২০৪২; হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,
[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯১

অনুচ্ছেদ-২: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলারদরবারে ওয়াসীলা ও সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করার বর্ণনা

উল্লেখ্য যে, হযরত নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওয়াসিলা ও সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করার এবং তাঁর নিকট ফরিয়াদ ও সাহায্য-মদদ তলব করার তরীকা সৃষ্টি পূর্বকাল থেকেই চলে আসছে। আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নেককার বান্দা ও বুযুর্গানে দীনের কার্য-ক্রিয়ার দ্বারা এটিই প্রমাণিত। নিম্নলিখিত চারটি স্থানেই হুযূর আকরম ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করা, তাকে আল্লাহর দরবারে ওয়াসিলা হিসেবে পেশ করার কথা বিভিন্ন হাদীস ও রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে, ১. পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বকালে, ২. তাঁর পার্থিব জীবনে, ৩. তাঁর বরযখী জীবনে ও ৪. কিয়ামতের সংকটময় মুহূর্তে যখন আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهم السلام পর্যন্ত কথা বলার সাহস করবেন না, তখন তিনিই সর্বপ্রথম সুপারিশের দ্বার উন্মুক্ত করবেন এবং পূর্ববর্তী পরবর্তী সমস্ত মানবকুলকে তার অনন্ত রহমতের সাগরে ভাসিয়ে দেবেন।

১. প্রথম স্থানের বর্ণনা

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সাইয়িদিনা হযরত আদম সফীউল্লাহ عليه السلام থেকে ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পায়, তখন তিনি এভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, হে আমার প্রভু! আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি যে, আপনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওয়াসীলায় আমাকে মাফ করে দিন।' তখন মুজীবুদ দাওয়াত (দু'আ কবুলকারী) খোদাওন্দ করীমের পাক দরবার থেকে ফরমান আসল যে, 'হে আদম! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে কিভাবে জানতে পারলে? অথচ আমি তো এখনও তাঁকে রূহানী জগত থেকে স্থূল জগতে নিয়ে আসিনি। তখন হযরত আদম عليه السلام আরজ করেন, 'হে আমার প্রভু! যে দিন থেকে আপনি আমাকে নিজ কুরদতে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার মানবীয় দেহের মধ্যে রূহের সঞ্চার করেছেন, সেদিন আমি যখন মস্তক উত্তোলন করি, আরশের থামের মধ্যে দেখতে পাই যে, সেখানে লিখা আছে, «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ»। তখন থেকেই আমি জানতে পারি যে, আপনার এ বান্দাটি আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং নিকটবর্তী। এ সময় খোদাওন্দ করীমের দরবার থেকে ফরমান আসল, 'হে আদম! যখন তুমি তাঁকে আমার নিকট ওয়াসীলা নিয়ে এসেছ, তখন আমি তোমার ত্রুটি মাফ করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ ﷺ না হতেন, তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।'[১]

[১] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ২, পৃ. ৬৭২, হাদীস: ৪২২৮:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, কুরআনের আয়াত:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ

'তাঁর প্রভুর নিকট থেকে আদম আলাইহিস সালাম-এর অন্তরে কতেক শব্দাবলি ঢেলে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর দরবারে তাওবা করেন।'[১]

এবং আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করেন, সে সব শব্দসমূহ হচ্ছে

«إِلَهِي! بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اغْفِرْ لِي».

'হে আমার মাবুদ! মুহাম্মদ ﷺ-এর ও তাঁর আওলাদের ওয়াসীলায় আমার ত্রুটি মাফ করে দিন।'

ইমাম সুবকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষের নেক আমলের ওয়াসীলা দিয়ে যখন দু'আ করা জায়েয অথচ এর মধ্যে নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, তবে আল্লাহর প্রিয় হাবীব রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর আকরম ﷺ-এর ওয়াসীলা দিয়ে এবং তাঁকে সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করা নিশ্চিতভাবে জায়েয হবে।[২]

ইমাম বুসীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ مَا لِيْ مَنْ أَلُوْذُ بِهِ	* سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمِمِ

'হে রাসূলগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত রাসূল! অঘটন ও বালা-মুসীবত নাযিলের সময় আপনি ব্যতীত আমার আর কেউ নেই, যার কাছে গিয়ে আমি আশ্রয় নিতে পারি।'[৩]

২. দ্বিতীয় স্থানের বর্ণনা

সৃষ্টিজগতে আগমনের পর হুযূর আকরম ﷺ-এর ওয়াসীলা গ্রহণের ঘটনা বর্ণনাধিক।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধলোক হুযূর আকরম ﷺ-এর দরবারে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য করে দেন। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। তিনি

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ»

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:৩৭

[২] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯৩–১৯৪

[৩] আল-বূসীরী, *কসীদাতুল বুরদা*, পৃ. ৭০

ইরশাদ করেন, 'যদি তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে চাও, আমি দু'আ করব, যাতে তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও। আর যদি আখিরাতের সওয়াবের আশা কর, তবে তুমি সবর কর, এটা তোমার জন্য বেশি মঙ্গলজনক হবে।' সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করুন। তিনি ইরশাদ করেন, তুমি ওযু করে এসো এবং পড়,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي، اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ».

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি রহমতের নবী, তাঁর মাধ্যমে আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি এবং আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছি। হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার পরওয়ারদিগারের দিকে ধাবিত হচ্ছি, আমার এ হাজত ও প্রয়োজন নিয়ে। যাতে আমার এ হাজত পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! আমার বেলায় তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।'[১]

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, ইমাম বায়হাকীও এ হাদীসকে সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীর রিওয়ায়তে একথাটি অতিরিক্ত আছে যে,

فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ.

'তিনি ওঠে চলে যান। এ অবস্থায় যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।'[২]

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَبَرَأَ.

'লোকটি তাঁর ইরশাদ মতে কাজ করলেন, অতঃপর তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।'[৩]

রুজী বৃদ্ধি, সন্তান লাভ, বৃষ্টি বর্ষন, সুখী জীবন-যাপন ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হযরত ﷺ-এর ওয়াসীলা গ্রহণ এবং তাঁর সাহায্য তালাশ করা সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছে।

---

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৬৯, হাদীস: ৩৫৭৮:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: «...».

[২] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ৬, পৃ. ১৬৬–১৬৭, হাদীস: ২৪১৫; হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৩] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত*, খ. ৬, পৃ. ১৬৭, হাদীস: ২৪১৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরও তাঁর ওয়াসীলা পেশ করা। তাঁর নিকট সাহায্য-মদদ তলব করা সম্পর্কেও অনেক রিওয়ায়ত বিদ্যমান আছে। যেমন- তবরানী *মু'জমে কবীরে* উসমান ইবনে হুনাইফ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁর সে উদ্দেশ্যটি পূরণ হচ্ছিল না। কেননা তাঁর প্রতি হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না। এরপর লোকটি উসমান ইবনে হুনাইফের নিকট তার সমস্যার কথা উল্লেখ করে সমাধান তলব করেন। তখন হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ লোকটিকে বলেন, ওযু করে মসজিদে নববীতে যাও এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করে এভাবে দু'আ করঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ! إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّيْ فَتَقْضِيْ لِيْ حَاجَتِيْ.

এ দু'আ পাঠ করে তুমি তোমার উদ্দেশ্যের কথা তাঁর দরবারে পেশ কর। হযরত উসমান ইবনে হুনাইফের কথা মতো কাজ করার পর লোকটি হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর নিকট উপস্থিত। লোকটিকে দেখামাত্র দারোয়ান তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে খুবই সম্মানের সাথে খলীফার দরবারে নিয়ে যায়। দরবারে উপস্থিতির পর হযরত উসমান رضي الله عنه তাঁকে তাঁর বিশেষ মর্যাদা বিশিষ্ট আসনে বসান। তিনি তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য ও হাজতের কথা জিজ্ঞাসা করেন। যখন লোকটি তাঁর হাজতের কথা ব্যক্ত করেন, তখন হযরত উসমান رضي الله عنه তাঁর হাজত পূরণ করেন এবং বলেন, যখনই তোমার কোন সমস্যা এবং প্রয়োজন দেখা দেয়, আমার গোচরীভূত করবে। আমি তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবো। এরপর লোকটি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে সোজা হযরত উসমান ইবনে হুনাইফের নিকট হাজির হয়ে বলেন, جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا। অতঃপর লোকটি তাঁকে বললেন, আপনি কি আমার সম্পর্কে হযরত উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর নিকট কিছু বলেছিলেন যে, তিনি আমার সাথে এরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন? হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু বলিনি। উপরন্তু আমি হুযূর আকরম ﷺ-কে দেখেছি যে, তাঁর নিকট একজন অন্ধ এসেছিল, লোকটি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য দু'আ প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসটি বর্ণনা করেন। অন্ধের এ ঘটনা থেকে আমি বুঝে নিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়াসীলা

উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট কার্যকর আমল। এ কারণেই আমি তোমাকে তাঁর দু'আটি বাতলিয়ে দিয়েছি। তোমার সফলতা এরই ফল।[১]

কাযী আয়ায মালিকী তাঁর *কিতাবুল শিফায়* বলেছেন যে, একদিন হযরত ইমাম মালিক رحمه الله-এর খলীফা আবু জাফরের মধ্যে মসজিদে নববীতে বিতর্ক হয়। কথা প্রসঙ্গে যখন খলীফা কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলেন, তখন ইমাম মালিক বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে কেন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন? অথচ খোদাওন্দ একদল লোককে আদব শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন,

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ۞

'তোমরা তোমাদের আওয়াজ নবী ﷺ-এর ওয়াজের ওপর বুলন্দ করো না।'[২]

এবং অপর একদল লোকেরা এভাবে প্রশংসা করেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۞

'নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে আদবের জন্য নির্বাচিত করেছেন।'[৩]

এরপর ইমাম সাহেব খলীফাকে আরও বলেন যে, এখানে একথা অনুধাবন করা উচিত যে, হুযূর আকরম ﷺ-কে তাঁর জীবদ্দশায় সম্মান করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরেও তাঁকে সম্মান করা ওয়াজিব। খলীফার অন্তরে ইমাম মালিকের এ বক্তব্য বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁর অন্তরের নম্রতা বৃদ্ধি পায়, এরপর খলীফা ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করেন যে, দু'আর সময় আমি আমার চেহারা কিবলার দিকে রাখবো, না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে? ইমাম মালিক رحمه الله বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর সুপারিশ কামনা করুন। যাতে তিনি আপনার সুপারিশ হন।[৪]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রওযায়ে পাক যিয়ারতের সময়ও হুযূর পাক ﷺ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে খুবই অনুনয়-বিনয় সহকারে দু'আ করা এবং তাঁর ওয়াসীলা তলব করা উচিত। পরবর্তী অধ্যায়ে যিয়ারতের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পূর্বে হযরত আলী رضي الله عنه-এর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আসদ رضي الله عنها-এর কবরের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কবরে অবতরণ করেন এবং ইরশাদ করেন যে,

---

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ৯, পৃ. ৩০, হাদীস: ৮৩১০
[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-হুজারাত*, ৪৯:২
[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-হুজারাত*, ৪৯:৩
[৪] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩

«بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ».

'আপনার নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াসীলায়।'[১]

এ হাদীসের মধ্যে পয়গম্বর ﷺ-এর জীবিত অবস্থায় অপরাপর পয়গম্বরদের ওফাতের পরে তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে যখন পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের মৃত্যুর পরে তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণের কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখন সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। যদি আওলিয়ায়ে কিরামকে আম্বিয়ায়ে কিরামের ওপর কিয়াস করা হয়, তবে অযৌক্তিক হবে না। তবে যদি আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে ওয়াসীলা খাস হওয়ার কোন প্রমাণ থাকে, কিয়াস করা যাবে না। কিন্তু এমন দলীল কোথায়, যা দ্বারা তাঁদের সাথে খাস হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবনে আবু শায়বা সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর رضي الله عنه এর শাসনামলে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন একজন লোক নবী করীম ﷺ-এর রওযা পাকে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন যে,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا.

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি তলব করুন, কেননা তাঁরা ধ্বংস হয়ে গেছে।'

এরপর হুযূর আকরম ﷺ তাঁকে ইরশাদ করেন যে, 'উমর رضي الله عنه-কে সুসংবাদ দাও যে, বারিপাত হবে।'[২]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করা তাঁর কাছে ফরিয়াদ এবং দু'আ তলব করা হয়েছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট আরজ করে আমাদের এ হাজতকে পূরণ করে দিন। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে তাঁর ওয়াসিলা গ্রহণ করা হত, মৃত্যুর পরেও যে তা নেওয়া হয়েছে এ ঘটনা তারই প্রমাণ বিদ্যমান।

ইবনে জওযী রিওয়ায়ত করেন যে, এক সময় মদীনায় দুর্ভিক্ষ হয়। জনগণ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها-এর নিকট যখন এ অভিযোগ পেশ করেন, তখন তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযা পাকে উপস্থিত হও এবং কবর শরীফের একটি জানালা আসমানের দিকে খুলে দাও, যাতে রওযা শরীফ এবং আসমানের মধ্যে কোন আড়াল না থাকে। জনগণ তাঁর

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: ৮৭১
[২] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ২, পৃ. ৩৫৬, হাদীস: ৩২০০২

নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর দু'আ এবং সুপারিশের বরকতে খুবই বৃষ্টিপাত হয়। উম্মুল মুমিনীন رضي الله عنها জানালা উম্মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদানের মধ্যে এ ইঙ্গিত, সওয়াল উদ্দেশ্য সাধনে নিশ্চয়তার প্রতীক।[১]

কোন একজন আবেদনকারী তাঁর নিকট আরজ করেছিল,

أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ.

'বেহেশতের মধ্যে আমি আপনার সাথীত্ব কামনা করি।'[২]

আবেদনকারীর এ আবেদনটিও এ পর্যায়ভূক্ত।

৪. চতুর্থ স্থানের বর্ণনা

কিয়ামতের বিশাল ময়দানে জনগণ যে হুযূর আকরম ﷺ-এর দরবারে আকুল আবেদন জানিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর সুপারিশ কামনা করবে, তা হাদীসে মুতওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত। এতে ইজমায়ে উম্মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, হুযূর পাক ﷺ-এর সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণে হযরত আওলিয়ায়ে কিরাম, বুযুর্গানে দীন ও নেককার লোকদের ওয়াসীলা গ্রহণ করাও শরীয়ত-সম্মত। এতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন রিওয়ায়তের দ্বারা এটি প্রমাণিত আছে। যেমন– সহীহ রিওয়ায়তের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস رضي الله عنه-এর ওয়াসীলা দিয়ে বারিপাতের দু'আ করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখনই দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখন হযরত ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস رضي الله عنه-এর ওয়াসীলা গ্রহণ করে এভাবে দু'আ করতেন যে, 'হে খোদাওন্দ করীম! ইতঃপূর্বে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন আমরা আপনার প্রিয় হাবীব, হুযূর আকরম ﷺ-এর ওয়াসীলা দিয়ে আপনার দরবারে দু'আ করতাম। এখন আপনার প্রিয় পয়গম্বরের চাচার ওয়াসীলা দিয়ে

[১] আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৭, হাদীস: ৯৩, হযরত আবুল জওযা আওস ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ قَحْطًا شَدِيْدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوْا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ.

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৫৩, হাদীস: ২২৬ (৪৮৯); হযরত রবীআ ইবনে কা'ব আল-আসলামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

আপনার নিকট দু'আ করছি যে, হে আল্লাহ! আপনি তাঁর চাচার ওয়াসীলায় বৃষ্টি নাযিল করুন।[১]

অপর একটি রিওয়ায়তে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ আল্লাহর দরবারে এভাবে দু'আ করতেন যে, 'হে খোদাওন্দ করীম! আপনার প্রিয় পয়ম্বরের চাচার ওয়াসীলায় আপনার মহান দরবারে বৃষ্টিপাতের আবেদন করছি এবং তাঁর বার্ধক্যতাকে আপনার দরবারে সুপারিশকারী এনেছি।'[২]

এ সময় হযরত আব্বাস ﵁ এভাবে দু'আ করতেন যে, 'খোদাওন্দ করীম! আপনার প্রিয় পয়গম্বরের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্কের কারণে জনগোষ্ঠী আমার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। হে আল্লাহ! এ জনগোষ্ঠীর নিকট আপনি আমাদের শরমিন্দা করবেন না।'[৩]

এই অর্থেই আব্বাস ইবনে উকবা ইবনে আবু লাহাব বলেছেন,

بِعَمِّيْ سَقَى اللهُ الْحِجَازَ وَأَهْلَهُ	*	عَشِيَّةَ يَسْتَسْقِيْ بِشَيْبَتِهِ عُمَرْ

'আমার চাচার ওয়াসীলায় আল্লাহ তা'আলা হিজাযভূমি এবং তার বাসিন্দাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাঁদেরকে সয়লাব করে দিয়েছেন। তাঁরই বার্ধক্যতার ওয়াসিলা গ্রহণ করে হযরত উমর ﵁ আল্লাহর নিকট বৃষ্টিবর্ষণের আবেদন করেছেন।'[৪]

---

[১] (ক) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ৪৮; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস: ১০১০:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَىٰ بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا»، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

[২] (ক) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ৪৯; (খ) আল-লালাকায়ী, *কারামাতুল আওলিয়া*, পৃ. ১৪৫, হাদীস: ৮৯:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِيكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ ﷺ وَنَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِشَيْبَتِهِ.

[৩] (ক) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ৫১; (খ) আদ-দায়নাওরী, *আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, খ. ৩, পৃ. ১০৩, হাদীস: ৭২৮:

لَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ دُعَائِهِ؛ قَالَ الْعَبَّاسُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا يُكْشَفُ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، وَقَدْ تَوَجَّهَ بِيَ الْقَوْمُ إِلَيْكَ لِمَكَانِيْ مِنْ نَبِيِّكَ ﷺ، وَهٰذِهِ أَيْدِيْنَا بِالذُّنُوْبِ وَنَوَاصِيْنَا بِالتَّوْبَةِ، وَأَنْتَ الرَّاعِي لَا تُهْمِلِ الضَّالَّةَ، وَلَا تَدَعِ الْكَسِيْرَ بِدَارِ مَضْيَعَةٍ.

[৪] (ক) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ৪৯; (খ) আল-লালাকায়ী, *কারামাতুল আওলিয়া*, পৃ. ১৪৫, হাদীস: ৮৯

হুযূর আকরম ﷺ-এর রওযায়ে পাকে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করে কত অভাব গ্রস্থ, ফকীর-মিসকীন যে তাঁদের অভাব মোচন ও উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, তার ইয়াত্তা নেই।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকদর ﵀ বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আশিটি দিনার আমানত রেখে জিহাদে চলে যান এবং আমাকে বলে যান যে, প্রয়োজনবোধে আপনি দিনারসমূহ খরচ করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে আমার পিতা দিনারসমূহ খরচ করে ফেলেন। লোকটি জিহাদ থেকে ফিরে এসে দিনারগুলো ফেরত চাইলে আমার পিতা তা আদায় করতে অক্ষম হন। লোকটির নিকট আব্বা বলেন, 'তুমি আগামীকাল এসো, আমি ব্যবস্থা করবো।' রাতের বেলা আমার পিতা মসজিদে নববীতে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি খুব ব্যস্ততার রজনী যাপন করেন, তিনি কখনও কবর শরীফে, আবার কখনও মিম্বার শরীফের নিকট গিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একজন লোক আত্মপ্রকাশ করে। তিনি আশিটি দিনারের একটি থলে আমার পিতার নিকট অর্পন করে চলে যান। সকালে আব্বাজান দিনারসমূহ পাওনাদারের নিকট হস্তান্তর করেন এবং তার বার বার চাওয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন।[১]

ইমাম আবু বকর ইবনে মুকরী বলেন, একদিন আমি, তাবারানী এবং আবুশ শায়খ এ তিনজনই হারামে নববীতে অবস্থান করি। ক্ষুধায় আরজ করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধা! আমি এর বেশি আর কোন কথা বলিনি এবং চলে আসি। আমি এবং আবুশ শায়খ ঘুমিয়ে পড়ি, আর তবরানী বসে বসে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা করেন। হঠাৎ আলাভী বংশীয় একজন লোক এসে দরজা নাড়া দেয়। তাঁর সাথে আরো দু'জন গোলাম ছিল। তাদের প্রত্যেকের সাথে এক একটি খাদ্যের রেকাবী ছিল। আমরা দরজা খুলে দিই। তিনি আমাদের সাথে এসে বসে যান এবং আমাদের সাথে আহারে শরীক হন। খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তিনি তা আমাদের নিকট রেখে দিয়ে বলেন, সম্ভবত তোমরা তোমাদের ক্ষুধায় অভিযোগ হুযূর পাক ﷺ-এর নিকট পেশ করেছ। তাঁর কাছে তোমাদের অভিযোগ পেশ করার সময় আমি তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করি। তিনি আমাকে ইরশাদ করেন, 'তুমি তাঁদেরকে খাদ্য পরিবেশন কর।'

ইবনুল জিলাদ ﵀ নামক এক ব্যক্তি বলেন, আমি মদীনাতুর রাসূল ﷺ-এ গমন করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দু'দিন অতিবাহিত করি। এরপর আমি কবর শরীফের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি আপনার মেহমান। এরপর আমি নিদ্রাভিভূত হই। এ অবস্থায় আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে

---

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯৯

পাই। তিনি আমাকে একটি রুটি বখশিস করেন। উক্ত রুটির অর্ধেক আমার হাতেই ছিল।

আবু বকর আকতা' رحمة الله عليه বলেন, আমি মদীনায় এসে পাঁচ দিন যাবৎ খাদ্যের মুখ দেখিনি। ষষ্ঠ দিন আমি কবর শরীফে উপস্থিত হয়ে আরজ করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি আপনার মেহমান। এরপর আমি স্বপ্নে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদার্পণ করছেন, এভাবে যে তাঁর ডানে হযরত আবু বকর رضي الله عنه, বামে হযরত উমর رضي الله عنه এবং সম্মুখে হযরত আলী رضي الله عنه। হযরত আলী رضي الله عنه আমাকে বলেন, ওঠ হযরত ﷺ তাশরীফ এনেছেন। আমি ওঠে গিয়ে তাঁর উভয় চোখের মাঝখানে চুমো দিই। তিনি আমাদের একটি রুটি বখশিস করেন। আমি তা খাই। যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হই, তখন আমি আমার হাতের মধ্যে এক খণ্ড রুটি দেখতে পাই।

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সূফী رحمة الله عليه বলেন, তিন মাস যাবৎ জঙ্গলে ঘুরা-ফেরায় অতিবাহিত করার পর যখন শরীরের চামড়া পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, তখন আমি মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করে হুযূর আকরম ﷺ এবং তাঁর উভয় সাথী হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه-কে সালাম পেশ করে ঘুমিয়ে পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় আমি হুযূর আকরম ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন করি। তিনি আমাকে ইরশাদ করেন যে, 'আহমদ! তুমি এসে গেছ? তোমার অবস্থা কী? আমি আরজ করলাম, أَنَا جَائِعٌ وَّأَنَا فِيْ ضِيَافَتِكَ يَا رَسُوْلَ الله! (ইয়া রাসূলূল্লাহ! আমি ক্ষুধার্ত, আমি আপনার মেহমানদারীর অন্তর্ভুক্ত)। তখন তিনি আমাকে ইরশাদ করেন, 'তোমার হস্ত সম্প্রসারণ কর।' যখন আমি আমার হস্ত সম্প্রসারণ করি তখন আমি দেখতে পাই যে, আমার হাতে কয়েকটি দিরহাম! জেগে ওঠার পরও দিরহামগুলো আমার হাতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উক্ত দিরহামগুলো নিয়ে আমি বাজারে গিয়ে আটা-ফালুদা ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য-খরিদ করে খেয়ে দেয়ে আবার জঙ্গলে চলে যাই।[১]

উল্লিখিত ঘটনাবলির ন্যায় আরও অনেক ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। উল্লিখিত ঘটনাসমূহের মধ্যে অধিকাংশই মাশায়েখে সুফিয়ায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। যাঁরা দরবারে রিসালাত ﷺ-এর থেকে নৈকট্য লাভের এবং সেই দরবারের রহস্য জানার সৌভাগ্যবান।

উল্লেখ্য যে, যে সব ঘটনাবলি খাওয়া-দাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট তা হয়ত রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, নতুবা আহলে বায়তের কোন ব্যক্তির ওপর এর ভার ন্যস্ত করেছেন। অপর লোকের ওপর এ ভার অর্পণ করেনি। এটিই ভদ্র লোকের পরিচয়।

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ১৯৬–২০১

ـ اگر خیریت دنیاو عقبیٰ ارزو داری ☆ بدر گاہش بیاو ہر چہ خواہی تمنا کن

'যদি তুমি ইহকাল-পরকালের কল্যাণকামী হও, তবে তাঁরই মহান দরবারে উপস্থিত হও এবং যত কিছুরই অভিলাষী হও; এ দরবার থেকেই আশাবাদী হও।'

حَاشَاهُ أَنْ يُّحَرَّمَ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ ❊ أَوْ يَرْجِعَ الْـجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرَمِ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করুণা ও মেহেরবানি লাভের আশাবাদী কখনও তাঁর দরবার থেকে নিরাশ মাহরুম হয়ে ফিরে যেতে পারে না। তেমনি তাঁর নিকট আশায় গ্রহণকারী কখনও এ দরবার থেকে অসম্মানিত হয়েও ফিরে যেতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁকে এর থেকে পবিত্র করে রেখেছেন।'[১]

পরিশিষ্ট

উল্লিখিত চারটি স্থানে যথায় হুযূর পাক ﷺ-এর সুপারিশ এবং ওয়াসীলার কথা বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে প্রথম স্থান অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল শুধু তাঁরই জন্য খাস। সে সময় শুধু তাঁরই রূহ মুবারকের ওয়াসীলা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অপর কোন নবী বা ওলি সম্পর্কে এরূপ কোন প্রমাণ নেই যে, তাঁরা সেখানে সুপারিশ করেছেন, বা তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকী অপর তিনটি স্থানের ওয়াসীলা গ্রহণ ও সুপারিশ তিনি ব্যতীত অন্যান্য নবী ও ওলিদের জন্যও প্রমাণিত আছে। পৃথিবীতে অপরাপর নবী, ওলি ও বুযুর্গানে দীনের অগণিত কারামত এবং বিভিন্ন সুপারিশের কাহিনী এরই প্রমাণ। যেমন– বৃষ্টি নাযিলের জন্য হযরত উমর رضي الله عنه কর্তৃক হুযূর আকরম ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস رضي الله عنه-এর ওয়াসীলা গ্রহণের দ্বারাও এটি প্রমাণিত হয়। এভাবে কিয়ামতের ময়দানে অপরাপর পয়াম্বর ও বুযুর্গানে দীনের সুপারিশের কথা আকাইদের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

এখানে এটি উল্লেখ্য যে, আম্বিয়া, আওলিয়া এবং নেককার লোকদের এ উচ্চ মর্যাদা হুযূর আকরম ﷺ-এর সাথে তাঁদের প্রগাঢ় মুহাব্বত ও নিবিড় সম্পর্কেরই ফল।

বকী' কবর এবং বরযখী যিন্দেগিতেও তাঁদের এ মর্যাদা যুক্তিসঙ্গত। কেননা তাঁদের জীবদ্দশায় যখন তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণ জায়েয প্রমাণিত হয়েছে, আর একথাও প্রমাণিত যে, মৃত্যুর পর রূহ অবশিষ্ট থাকে এবং ঈমান, নেক

[১] আল-বুসীরী, *কসীদাতুল বুরদা*, পৃ. ৭০

আমল ও পয়গম্বরে খোদা ﷺ-এর যথাযথ পায়রবীর বদৌলতে সে রুহের নৈকট্য লাভ ও মর্যাদাবান হওয়ার কারণে সেখানেও তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণে কোন বাধা নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের বিশেষ মান-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানেও জায়েয হওয়া যুক্তি সংগত। কারণ নাজায়েয হওয়ার যখন কোন প্রমাণ নেই, তখন জায়েয হওয়াতে আর বাধা কি? কিন্তু সৃষ্টির আদিকালে যখন তাঁদের ওয়াসীলা গ্রহণের সুপারিশ করার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা পয়গম্বর ﷺ-এরই বৈশিষ্ট্য হবে। এখানে যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, পয়গম্বর ব্যতীত অপর কোন লোকের ঈমানের ওপর মৃত্যুর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ পয়গম্বর ব্যতীত অপর কোন কেউ মাসুম নিষ্পাপ নয়। সুতরাং তাঁদের ওয়াসীলা কিভাবে জায়েয হবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সব আল্লাহর ওলি ও বুযুর্গানে দীন কাশফ ও কারামাতের অধিকারী ও আলমে মিসালের রহস্যের ওয়াকিফহাল, এদের সম্পর্কে সুসংবাদের রিওয়ায়তই এ প্রশ্ন খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। যদিও কিছুসংখ্যক ফকীহ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন, কিন্তু তাই সঠিক ও অনুসরণ যোগ্য যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়

রাসূলে পাক ﷺ-এর কবর শরীফ যিয়ারতের আদব ও মদীনা শরীফে অবস্থান এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা

রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর পাক ﷺ-এর রওযায়ে পাক যিয়ারতের সফর একটি বিশেষ সফর। এ মুবারক সফরের প্রাক্কালে যে সব আদবের খেয়াল করা প্রয়োজন, এর মধ্যে এমন আদবও রয়েছে, যা সাধারণ সফরের ক্ষেত্রেও খেয়াল করা প্রয়োজন। যেমন– ইস্তিখারা করা, নতুন সূত্রে তাওবা করা, হকদারের হক আদায় করা এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা, কারো ওপর কোন যুলুম করে থাকলে তার থেকে মাফ নেওয়া বা অন্য উপায়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, সফরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও আসবাব-পত্র যোগাড় করা, সফর সাথী তালাশ করা, মুসলমান ভাইদের থেকে দু'আ গ্রহণ করা, সফরে রওয়ানার সময় মাঝখানে কোন স্থানে নামবার সময় যেসব দু'আ পড়া সুন্নত প্রমাণিত আছে, সেগুলো শিখে নেওয়া ইত্যাদি।

সফরের প্রারম্ভিককালে, সফরের মাঝখানে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় যেসব আদবের খেয়াল করা প্রয়োজন, সেগুলো আমি *আদাবুস সালিহীন* যা প্রকৃত প্রস্তাবে *ইয়াহইয়া উলূমের* অনুবাদকের এক চতুর্থাংশ বর্ণনা করেছি। এখানে শুধু সেই সমুদয় আদব সংক্ষেপে বর্ণনা করব, যা বিশেষ করে এ সফরের জন্য অনিবার্য।

॥১॥

এ মুবারক সফরের বিশেষ আদবসমূহ: এ সফরের সর্বাপেক্ষা জরুরি আদব হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ নিয়তকে খালিস করা। কেননা নিয়তের পরিশুদ্ধি সমুদয় আমলের বুনিয়াদ। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ».

'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তাঁর হিজরত আল্লাহ এবং রাসূলের দিকেই হবে।'[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। হুযূর পাক ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আর কি উত্তম উপায় হতে পারে? কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে,

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: ৫৪; হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

'যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মতে চলে, সে আল্লাহরই নির্দেশ মতো চলল।'[১]

অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۚ

'নিশ্চয় যেসব লোক আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করে, নিশ্চয় তাঁরা আল্লাহ তা'আলারই বায়আত করে।'[২]

হুযূর পাক ﷺ-এর যিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববীর নিয়ত করাও প্রয়োজন। যেমন– ইমাম ইবনে সলাহ এবং ইমাম নববী رحمة الله عليه উল্লেখ করেছেন। কেননা সফর করে মসজিদে নববীতে গমন করা ও সেখানে নামায পড়া সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছে।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম শায়খ কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম رحمة الله عليه তাঁর মাশায়েখ থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরে তিনি বলেছেন, তবে উভয়ের নিয়ত আলাদাভাবে করাই উত্তম। এভাবে যে প্রথমে হুযূর আকরম ﷺ-এর যিয়ারতের নিয়ত করে মদীনায় পৌঁছে যিয়ারতের ফয়েয ও বরকত হাসিল করার পর মসজিদে নববীর নিয়ত করবে অথবা উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা সফর করবে। এতে হুযূর আকরম ﷺ-এর যিয়ারতের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নবী করীম ﷺ ফরমান, «لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي» (তাঁকে আমার যিয়ারত ব্যতীত অপর কিছু উৎসাহিত করে না)[৩]-এর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

কিন্তু এখানে প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, যিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববীর নিয়ত করার মধ্যে বৈপরীত্ব নেই। আর যিয়ারতের ইখলাসের মধ্যেও এটি কোন ক্ষতিসাধন করে না। কেননা নিয়ত করে মসজিদে গমন করা, নামায পড়া, দু'আ করা ইত্যাদি, আমল হযরত ﷺ-এরই নির্দেশিত এবং তাঁর ফয়েয, বরকত ও সুপারিশ লাভের সহায়ক। সুতরাং মসজিদ সম্পর্কীয় সমুদয় আমল যিয়ারতের সমুদয় আমল যিয়ারতেরই পরিপূরক।

উল্লেখ্য যে, যতদূর সম্ভব মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত করবে, এক ঘণ্টার জন্য হলেও। সেখানে নেক কাজের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়া, আল্লাহ তা'আলার যিকর, অধিকভাবে দরূদ ও সালাম পাঠ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৮০

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতহ*, ৪৮:১০

[৩] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৫, পৃ. ১৬, হাদীস: ৪৫৪৬; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত

ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করবে। যদি মদীনা শরীফ পৌঁছার পূর্বে মসজিদে নববীরও নিয়ত করো, তবে এতে আমলের সওয়াব ব্যতীত নিঃসন্দেহে নিয়তের সওয়াবও লাভ হবে।

॥২॥

যিয়ারতের সফরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে এই যে, ঘর থেকে বের হয়ে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, জোশ-জযবা এবং ইশক-মুহাব্বত সহকারে রাস্তা অতিক্রম করবে। অলসতা ও দুঃখ-চিন্তা পরিহার করে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি, হুযূর ﷺ-এর দীদার এবং মিলনের আগ্রহ, হাসি-খুশিতে ভরপুর হয়ে ভদ্রতা ও নম্রতা বজায় রেখে এবং দান খয়রাতে আত্ম নিয়োগ করে পথ চলতে থাকবে। যাতে আনওয়ারে মুহাম্মদী এবং আসরারে আহমদী অন্তরে আলোকপাত করে।

اورا بچشم پاک توان دید چون ہلال ☆ ہر دیدہ جائے منظر آن ماہ پارہ نیست

'পবিত্র দৃষ্টিশক্তি সহকারে চন্দ্রের ন্যায় এ উজ্জ্বল সত্তাকে অবলোকন করা চাই। প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তি এ চন্দ্রশোভা অবলোকনের যোগ্যতা রাখে না।'

اوّل پاک شو اول پس دیدہ بر آن پاک انداز۔

'প্রথমে পবিত্র হও, এরপর সে পবিত্র সত্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।'

॥৩॥

এ সফরে তৃতীয় আদব হচ্ছে এই যে, পথিমধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত ফরযসমূহ এবং পেশাব পায়খানা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাপনের পর বাকি সময়টুকু নিতান্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও পাক-পবিত্রতার সাথে হুযুরে পাক ﷺ-এর ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণে আত্মনিয়োগ করবে। কেননা এ মহান দরবারে উপস্থিত হওয়া, জামালে মুহাম্মদী অবলোকন করা ইত্যাদি মকসুদ পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি খুবই উত্তম ওয়াসীলা। যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, তবে এ ওয়াসীলায় জামালে আহমদী পূর্ণভাবে অবলোকনের সৌভাগ্য অর্জন করবে। বিশেষ বিশেষ সময়ে যথা– ফযরের নামাযের পর এবং মদীনা মুনাওয়ারা নিকটবর্তী হলে এ আমল অতিশয় জোরদার করবে। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন একদল ফেরেশতা তৈরি করেছেন, যাঁরা রওযায়ে পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের দরূদ ও সালাম হুযুরে পাক ﷺ-এর খেদমতে এভাবে পৌঁছে দিয়ে দেন যে, 'অমুকের বেটা অমুক' আপনার যিয়ারতে আসছেন এবং দরূদ ও সালামের এ তুহফা পেশ করছেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর পবিত্র

দরবারে যিয়ারতের আগমনকারী ব্যক্তির নিজের ও পিতার নামের উল্লেখ করা হয়।

॥৪॥

এ সফরের চতুর্থ আদব হচ্ছে এই যে, মদীনা গমনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায আদায়ে এবং অবস্থানের স্থানসমূহের যিয়ারত করবে।

॥৫॥

মদীনা সফরের পঞ্চম আদব হচ্ছে এই যে, যখন মদীনা তাইয়িবার নিকটবর্তী হবে এবং শহরের নিদর্শনসমূহ দেখা যাবে, তখন মনের কাকুতি-মিনতি বাড়িয়ে দেবে, আর যিয়ারতের মহান উদ্দেশ্য সাধনের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আত্মবিভোর হয়ে ওঠবে।

وَأَعْظَمُ مَا يَكُوْنُ الشَّوْقُ يَوْمًا	*	إِذَا دَنَتِ الْخِيَامُ مِنَ الْخِيَامِ

'যখন বন্ধুর তাঁবুর সাথে প্রেমিকের তাঁবু সংযুক্ত হয়, তখন মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মুহাব্বতের জযবা খুবই বেড়ে যায়।'

ـ وعده وصل چون شود نزديک ☆ آتش شوق تيزتر گردد

'বন্ধুর সাথে মিলনের ওয়াদার সময় যখন নিকটবর্তী হয়, তখন মুহাব্বতের আগুন অতিশয় তেজ হয়ে যায়।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'যখন রওযায়ে পাকের যিয়ারতকারী মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হয়, তখন ফেরেশতাগণ রহমতের তুহফা নিয়ে তাঁকে খোশ আমদেদ জানাতে আসে। আর বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদ তাঁর কাছে পৌছান এবং নূরের হাদিয়া পেশ করেন।'

هر دم از دل سروری تازه سر بر می زند

غالبا روز وصال يار نزديک آمده است

'প্রতিটি মুহূর্তেই মনের মধ্যে নতুন আনন্দোল্লাস বেড়েই চলেছে। বোধ হয়, বন্ধুর মিলনের সময় নিকটেই এসে গেছে।'

উল্লেখ্য যে, যখন এ মহান দরবারের সংলগ্নে এসে যাবে মনের মধ্যে এ ধারণাই জাগিয়ে তুলবে যে, আমি বিশ্বজাহানের বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়েছি। মদীনা তাইয়িবার নিকটবর্তী দৃশ্যাবলি অবলোকন, যিয়ারতের অদম্য উৎসাহ, হুযূর পাক ﷺ-এর অনন্ত ভালোবাসায় অন্তরের মধ্যে আবেগপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া চাই। আন্তরিক বিনয়ের সাথে সাথে দৈহিক বিনয়ের প্রতিও

লক্ষ্য রাখা দরকার। বাতিনী অমনোযোগিতা, যাহিরী অলসতা ও দৈহিক গুনাহ থেকে নিজকে হিফাজতে রাখা দরকার। মৌখিক দরূদ ও সালামের সাথে সাথে হুযূর আকরম ﷺ-এর মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও অপূর্ব মর্যাদার স্মরণে এবং তাঁর প্রগাঢ় মুহাব্বতে অন্তর ভরপুর হওয়া চাই। মুখে দরূদ ও সালাম পাঠ এবং অন্তরে অলসতা, এটা নিতান্তই অবাঞ্ছিত। এখানে সাধারণ লোকের মতো উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করা থেকে বিরত থাকা চাই। যদি পূর্ণ (মুরাকাবা) নসীব হয় তবে তো নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা। আর যদি নসীব না হয়, তবে যতদূর সম্ভব, সর্বদা আন্তরিক বিনয়ের সাথে বাহ্যিক বিনয়কে হাতছাড়া না করে, তবে ইনশাআল্লাহ আহলে দিলের নিকটে পৌছার তাওফীক হবে এবং উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হবে। যেমন– কোন কবি বলেছেন,

يَا صَاحِبَيْ هَذَا الْعَقِيْقِ فَقِفْ بِهِ	*	مُتَوَالِهًا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بَوَالِهِ

'হে আমার সাথী! এই যে আকীক! তুমি যদিও প্রকৃত সন্তান পাগল না হও তবে তুমি পাগল প্রায় হয়ে এখানে থেমে যাও।'

॥৬॥

এ সফরের ষষ্ঠ আদব হচ্ছে যখন জবলে সফরা পর্যন্ত পৌছে যাবে তবে যদি একথা জানা থাকে যে, এ পাহাড়ে আরোহণ করলে লোকের ধারণা হবে যে, এ কাজটা ওয়াজিব বা সুন্নাত, অথবা এ কাজের দ্বারা নিজের বা অপরের কষ্ট হবে, এর ওপর আরোহণ না করা চাই। আর যদি এ সব অসুবিধা না থাকে, তবে আরোহণ করাই উত্তম। কেননা এখান থেকে মদীনা তাইয়িবার অপরূপ শোভা বর্ধনের দ্বারা এর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। আর যারা এ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করাকে খারাপ বিদআত বলে ধারণা করেন, তাঁদের ধারণা অমূলক ও অবাস্তব। কেননা যে কাজটা উদ্দেশ্য সাধনের শর্ত সহায়ক অথবা পরিপূরক হবে, শরীয়তের নীতি মুতাবেক তাকেও আসলের হুকুম দেওয়া যাবে।

قُرْبُ الدِّيَارِ يَزِيْدُ شَوْقَ الْوَالِهِ	*	لَا سِيَّمَا إِنْ لَاحَ نُوْرُ جَمَالِهِ

'মাশুকের ঘর বাড়ি যতই নিকটবর্তী হয় ততই প্রেমিকের আসক্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে যখন তার সৌন্দর্যের আলোচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়।'

أَوْ بَشَّرَ الْحَادِيْ بِأَنْ لَاحَ النَّقَا	*	وَبَدَتْ عَلَىٰ بُعْدِ رُؤُوْسِ جِبَالِهِ

'অথবা উষ্ট্র চালক এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, মাশুকের সাক্ষাত লাভ অত্যাসন্ন। ওই যে সেখানকার পাহাড়ের শৃঙ্গসমূহ দেখা যাচ্ছে।'

فَهُنَاكَ عِيْلَ الصَّبْرُ مِنْ ذِيْ صَبْوَةٍ * وَبَدَا الَّذِيْ يُخْفِيْهِ مِنْ أَحْوَالِهِ

'এমন সময় ধৈর্যশীলদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। আর যেসব সে গোপন রাখত, তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।'

چنین کہ رقص کنان گرم می رود مجنون

مگر زدور نگاہش محمل افتادہ است

পাগল প্রেমিক খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে মাশুকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গন্তব্য স্থানের পূর্বেই যে সওয়ারী থেকে গেল।'

ولیکہ عاشق صابر بود مگر سنگ ست

زعشق باصبوری ہزار فرسنگ ست

'কিন্তু প্রেমিক পাথরের মত ধৈর্যশীল ছিল, যা তার জন্য পাথরের মত কঠিন। কেননা প্রেমের মধ্যে ধৈর্যধারণ খুবই শক্ত ব্যাপার।'

بایں کہ کعبہ نمایاں شود زپا منشین

کہ نیم گام جدائے ہزار فرسنگ ست

'ওই যে কাবা দেখা যাচ্ছে, তুমি বলে থাকো না। কেননা বিরহের যমানার অর্ধেক কদমের ব্যবধানও হাজার মাইলের ব্যবধান সমতুল্য।'

যখন সেখান থেকে যুল হুলাইফায় আলীর কুয়ার নিকট পৌঁছবে, তখন যদি তুমি নিজের এবং মালের নিরাপত্তা অনুভব কর, তবে সেখানে অবতরণ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে 'আলী' অর্থ আমিরুল মুমনীন হযরত আলী (রা.) নন। বরং পূর্বেকার যমানার কোন একজন আলীর সাথেই এটি সম্পর্কিত। যেমন– মক্কার সন্নিকটে ওয়াদীয়ে ফাতিমার মধ্যে ফাতিমার উদ্দেশ্যে হুযূর ﷺ-এর আদুরে মেয়ে হযরত ফাতিমা যুহরা নন। বরং ওখানেও অন্য কোন ফাতিমাই উদ্দেশ্য।

॥৭॥

এ সফরের সপ্তম আদব হচ্ছে এই যে, যখন মদীনা মুনাওয়ারা ও এর মিনারা ও গুম্বজসমূহ দেখতে পাবে তখন নিতান্ত অনুনয়-বিনয় এবং সম্মান ও

আদবের সাথে সওয়ারী থেকে অবতরণ করবে। আর যদি সম্ভব হয়, তবে মসজিদ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে।

هَـٰذِيْ قِبَابٌ وَهَـٰذِيْ يَثْرِبُ

أَبْشِرْ، فَقَدْ حَصَلَ الْهَنَا وَالْمَطْلَبُ

'এই যে গুম্বজসমূহ এবং এই যে মদীনা শহর। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

أَبْشِرْ، فَقَدْ حَصَلَ التَّوَاصُلُ وَانْقَضَىٰ

زَمَنُ الْجَفَاءِ وَالْوَقْتُ وَقْتٌ طَيِّبُ

'তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, মিলনকাল উপস্থিত এবং দুঃসময় অতিবাহিত হয়েছে। এ মুহূর্তে খুবই সুখবর এবং আনন্দদায়ক।'

وَالرِّيْحُ قَدْ أَهْدَتْ لَنَا مِنْ طَيِّبِهِ

عَرَفًا كَنَشْرِ الْمِسْكِ، بَلْ هُوَ أَطْيَبُ

'বাতাস আমাদের জন্য মিশকের মতো বরং এর চেয়েও উৎকৃষ্টতর সুগন্ধির হাদিয়া বয়ে এনেছে।'

وَادْخُلْ بِحُجْرَةِ أَحْمَدَ فَبِبَابِهِ

يَأْوِيْ الْفَقِيْرُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُذْنِبُ

'হযরত আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদ ﷺ-এর হুজরা শরীফে প্রবেশ কর। তাঁরই আস্তানায় ফকির-মিসকীন আশ্রয় গ্রহণ করে এবং গুনাহগার ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল কায়স গোত্রের দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরূপ সৌন্দর্যের ওপর নিপতিত হয়, তখন তাঁরা তাঁদের উষ্ট্রকে বসানোর পূর্বে নিজেদেরকে মাটিতে লুটিয়ে দেন। সাইয়িদুল মুরসালীন ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ করেননি।

وَإِذَا الْمَطِيُّ بِنَا بَلَغْنَ مُحَمَّدًا * فَظُهُوْرُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ

'যখন আমাদের সওয়ারী আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর আস্তানা মুবারকে পৌঁছিয়ে দেয়, তখন তাঁদের পৃষ্ঠ বোঝা বহনের জন্য হারাম হয়ে যায়।'

گو طاقت آنم کہ باین جاذبہ شوق

رخسارترا بینم وبیتات نگردم

'মুহাব্বতের এ আকর্ষণ সত্ত্বেও আমার সেই শক্তি কোথায় যে, আমি আপনার চেহারা মুবারক অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করতে পারি।'

॥৮॥

যিয়ারতের অষ্টম আদব হচ্ছে এই যে, যখন যিয়ারতের আগন্তুক মদীনা মুনাওয়ারার হারাম শরীফে উপস্থিত হবে, তখন সাইয়িদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করার পর এ দু'আটি পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَارْزُقْنِيْ فِيْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ، وَاغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، يَا خَيْرَ مَسْؤُوْلٍ.

এ আনন্দ মুহূর্তে নিজের যাহির বাতিন শুধু সেই মহান দরবারের প্রতি নিবেদিত রাখবে এবং সেই দরবারের মহত্ত্ব ও বুযুর্গীর ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থেকে দরূদ ও সালাম পাঠে মশগুল থাকবে। মহান রাব্বুল আলামীন খোদাওন্দ করীম যে স্বীয় অপার ও অনন্ত অসীম মেহেরবানিতে বিশ্বজাহানের সরদার, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযূর আকরম ﷺ-এর মহান দরবারে উপস্থিতির সুযোগ দান করেছেন এবং ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগ্রত করে এ মহান দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অশেষ শুকরিয়া আদায় করা একান্ত কর্তব্য।

حبذا روز سعادت مرحبا یوم الوصال

باغ من کل می کند امروز بعد از چند سال

'আজিকার এ সৌভাগ্য লগ্নে ধন্য হোক, এ মিলন মুহূর্তে ধন্য হোক। কয়েক বছর পর আমার (আশার) বাগানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে।'

॥৯॥

যিয়ারতের নবম আদব এই যে, এ পূত-পবিত্র সম্মানিত মর্যাদাবান শহরে প্রবেশের নিমিত্ত গোসল, মিসওয়াক ও উত্তম পোষাক পরিধান করা

অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা পোষাকই বেশি পছন্দ করতেন। এ কারণে সাদা পোষাক পড়াই উত্তম। নিতান্ত গাম্ভীর্য ও ভদ্রতার অলংকারে সুশোভিত হয়ে এ শহরে প্রবেশ করা চাই।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন অজ্ঞ এবং মূর্খ লোক এখানে ইহরামের কাপড় পরে আসে। এ থেকে বিরত থাকা চাই। কেননা এটি মক্কা শরীফ এবং হজ্জ ও উমরারই বৈশিষ্ট্য। এরপর মুহাম্মদী শান-শওকত, ইজ্জত-সম্মান ও বুযুর্গী কথা মনে রেখে নিতান্ত অনুনয়-বিনয় এবং ভদ্রতা ও আদবের সাথে এ পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, এটি সেই সম্মানিত ও পবিত্র নগরী, যাকে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় প্রিয় হাবীব, রহমতে আলম, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর জন্য মনোনীত করেছেন। পৃথিবীতে যতই বিজয়, বরকত ও কল্যাণ প্রকাশ পেয়েছে, এ মুবারক স্থানই সেগুলোর কেন্দ্র ও উৎস।

ہر گل وسبزہ کہ در باغ نمودے دارد

آخر ای باد صبا این ہمہ آوردہ تست

'বাগানে যে সমুদয় ফুল ও সবুজ তৃণরাজি প্রকাশ পেয়েছে, হে পূরবী সমীরণ! সবই যে তোমারই আনীত, তোমারই অবদান।'

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের সময় কদম মাটিতে রাখার এবং মাটি থেকে কদম উত্তোলনের সময় খুবই ধীর ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই। আর এও মনে রাখা চাই যে, এটি সেই পবিত্র মাকাম, যে মাকাম হুযূর আকরম ﷺ-এর কদম মুবারক চুম্বন করেছেন, এবং তিনি তাঁর পবিত্র কদম এ মাটিতে রেখেছেন। আর অন্তরে সদা-সর্বদা একথা জাগরুক থাকা চাই যে, এ দরবার এতই আযীমুশ-শান ও মহান যে, এখানকার সামান্য বেয়াদবির দ্বারা যেমন– আওয়াজ বুলন্দ করা, সমস্ত নেক আমল বরাদ হয়ে যায়।

طَابَتْ بِطَيِّكَ يَثْرِبُ وَثَرَاهَا	*	مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ طَيْبَةٌ سَمَّاهَا

'আপনার সুগন্ধিতে ইয়াসরব (মদীনা) এবং এর মাটি সুবাসিত হয়েছে। এ কারণে এর নাম তাইয়িবা হয়েছে।'

فَمَلَاءَ الْوُجُوْدُ عَبِيْرُ عَنْبَرٍ عَطَرَاهَا	*	وَعَلَا عَلَى الْآفَاقِ طَيِّبٌ شَذَّاهَا

'সারা বিশ্বকে এর অপূর্ব আম্বরীয় খুশবো মুখরিত করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের চতুর্দিকে এক অপূর্ব সুগন্ধি ছড়িয়ে রয়েছে।'

وَزَهَتْ لَوَامِعُ نُوْرِهَا مَعَ نُوْرِهٖ	*	وَهَبَتْ رِيَاضُ قَبَائِهَا وَقَبَاهَا

'তাঁরই নূরের সাথে মদীনার নূরও বিকিরিত হয়েছে। যার ফলে মদীনার গুম্বজসমূহ এবং বাগানের ফুলসমূহ উজ্জ্বল ও সুশোভিত হয়েছে।'

أَنَـا وُفُـوْدُكَ يَـا خِتَـامَ الْأَنْبِيَـاءِ * جِئْنَـا بِفَاقَتِنَـا وَأَنْـتَ غِنَاهَـا

'হে সর্বশেষ পয়গম্বর। আমরা আপনার মেহমান। অসহায় ও বুভুক্ষ অবস্থায় আমরা আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমাদের অভাব মোচন ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।'

جِئْنَا إِلَيْكَ بِضَاعَةً قَدْ ازَّجَتْ * فَأَقْبَـلْ بِـضَاعَتَنَا وَلَا تُخْفَاهَـا

'আমরা অতি নগন্য পুঁজি নিয়ে আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়েছি। দয়া করে আপনি আমাদের এ নগণ্য পুঁজি কবুল করুন। আর আপনি একে লুকিয়ে রাখবেন না এবং উপেক্ষা করবেন না।'

॥১০॥

যিয়ারতের দশম আদব হল এই যে, এ পবিত্র শহরে প্রবেশের সময় এ দু'আটি পাঠ করবে:

بِسْمِ اللهِ، مَـا شَـاءَ اللهُ، لَا قُـوَّةَ إِلَّا بِـاللهِ، رَبِّ أَدْخِلْنِـيْ مُـدْخَلَ صِـدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا، حَسْبِيَ اللهُ، آمَنْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِـاللهِ، اَللّٰهُـمَّ إِنِّيْ أَسْـأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ، فَإِنِّيْ لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَّلَا أَشَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سَمْعَةً، أَخْرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُبْعِدَنِيْ مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

এখানে এও উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বার মসজিদে প্রবেশের সময়ও এ দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী رضي الله عنه-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি মসজিদে গমনের পথে উক্ত দু'আটি পাঠ করবে, তার গুনাহ মার্জনার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতাকে ইস্তিগফার (মাগফিরাত) কামনা করার জন্য নিযুক্ত করা হয় আর সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়।'[১]

[১] আত-তাবারানী, *আদ-দু'আ, কাওলু আশারা ফিল হিজ্জা*, পৃ. ১২৯, হাদীস: ৫৩

॥১১॥

যিয়ারতের একাদশ আদব: মসজিদে নববীতে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই সদকা-খয়রাত করবে। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কোন ব্যক্তি হযরত ﷺ-এর সাথে গোপনে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা করত, তবে প্রথমে তার ওপর সদকা-খয়রাত করা ওয়াজিব ছিল। যেমন- কুরআনের আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে,

إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ

'যদি তোমরা রাসূলের সাথে গোপনে কথা বলার ইচ্ছা কর, তখন তোমরা তোমাদের গোপনীয় কথার পূর্বে দান-খয়রাত করবে।'[১]

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ আয়াত মুতাবেক আমল করেন, তিনি ছিলেন, শেরে খোদা হযরত আলী رضي الله عنه।[২]

পূর্বে হুযূর ﷺ-এর দরবারে দান-খয়রাত করে আসা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত হয়ে গেলে, এর মুস্তাহাব বাকি থাকে। হুযূর পাক ﷺ-এর জীবদ্দশায় ন্যায় তাঁর মৃত্যুর পরও এ হুকুম বহাল রয়েছে।

॥১২॥

যিয়ারতের দ্বাদশ আদব: মদীনা শরীফে পৌছার পর সর্বপ্রথম যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতেই গমন করবে। এর পূর্বে অপর কোন কাজে লিপ্ত হবে না। অবশ্য যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে ভিন্ন কথা। মসজিদে নববীতে প্রবেশের পর সর্বদা এ স্থানের গুরুত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের কথা মনে রাখবে। আর একথা কখনও ভুলে যাবে না যে, এটি সাইয়িদুল মুরসালীন, খাতিমুন্নাবীয়ীন ﷺ-এরই পবিত্র, সম্মানিত মসজিদ। এটি আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং অহী নাযিলেরই মর্যাদাপূর্ণ স্থান।

॥১৩॥

যিয়ারতের ত্রয়োদশ আদব: মসজিদে প্রবেশের পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, যেন এ মহান দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। কিন্তু কোন কোন আলিম বলেন যে, একথার কোন ভিত্তি নেই।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় প্রথমে ভেতরে ডান পা রেখে এ দু'আ পাঠ করবে, যা প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় পাঠ করা মুস্তাহাব:

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَبِنُوْرِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ،

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-মুজাদালা*, ৫৮:১২

[২] ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ৩২১২৫

بِسْمِ اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ وَأَعِنِّيْ عَلَى كُلِّ مَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، وَمِنْ عَلَى الْحُسْنِ الْأَدَبِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

মসজিদে প্রবেশকালে এবং মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও এ দু'আ পাঠ পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। তবে افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-এর স্থলে نَضْلِكَ পড়া চাই। তবে সংক্ষেপে এ দু'আটিও পাঠ করা যেতে পারে:

أَعُوذُ بِاللهِ، بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ».

'যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ কর, তখন তোমরা নবী করীম ﷺ, তাঁর আসহাব এবং আওলাদের ওপর দরূদ সালাম পাঠ করবে।'[১]

মসজিদে প্রবেশকারীকে পূর্ণ বিনয় ও গাম্ভীর্য সহকারে মসজিদের শান-শওকত ও মান-মর্যাদার কথা অন্তরে স্থান দিয়ে চক্ষুকে নিম্নগামী রেখে মসজিদের কারুকার্য ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অনর্থক ও বাজে কাজ থেকে বিরত রেখে মনকে অন্য ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত রেখে এবং শানে মুহাম্মদীর গুরুত্ব ও শওকতে আহমদীর মহত্ত্বকে অন্তরে অংকিত করে মসজিদে প্রবেশ করবে। এ সময় অন্তরে এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, সর্দারে দো'জাহান নবীয়ে আখিরুজ্জামান, হুযূর আকরম ﷺ জীবিত বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করেন এবং আমাদরে শব্দসমূহ শ্রবণ করেন। এ সময় যদি এমন কোন লোকের সাথে সাক্ষাত লাভ হয়, যার সাথে সালাম ও কথাবার্তা বলা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, তবে যতদূর সম্ভব চক্ষু নিগামী রেখে

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৪, হাদীস: ৭৭২; হযরত আবু হুমায়দ আস-সায়িদী ﷺ থেকে বর্ণিত

এড়িয়ে যাবে। আর যদি অগত্যা তার সাথে কিছু বলতে হয়, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু করবে না। আর অন্তরকে তার সাথে বিজড়িত করবে না।

॥১৪॥

যিয়ারতের চতুর্দশ আদব: মসজিদে প্রবশ করার পর ইতিকাফের নিয়ত করবে, যদিও সময় সংক্ষেপ হয়। এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। কারণ এর কার্যকারিতা নিতান্তই অধিক অর্থাৎ সওয়াব ও ফযীলত খুবই বেশি। এতে গাফেলতি করতে নেই। এরপর রওযা মুবারকে এসে হুযূর ﷺ-এর নামায আদায়ের স্থানে, যেখানে বর্তমানে মিহরাব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর সামান্য ডান পাশে উপস্থিত হয়ে দু'রাকাআত তাহাইয়াতুল মসজিদ আদায় করবে। কিরাআত দীর্ঘায়িত করবে না। প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ইখলাস পাঠ করবে। যদি লোকের ভিড়ের কারণে স্থান পাওয়া না যায়, তবে এর নিকটবর্তী স্থানেই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি সে সময় ফরয নামাযের ইকামত হয় অথবা ফরয নামায না পাওয়ার আশাংকা হয়, তবে তাহইয়াতুল মসজিদ বাদ দিয়ে ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে। তাহাইয়াতুল মসজিদ আদায়ের পর আল্লাহ জাল্লা শানহুর অশেষ শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনিই তাঁর অসীম মেহেরবানিতে এ মহান দরবারে উপস্থিতির সুযোগ দান করেছেন। এখানে উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করবে। ইহা এমনই মহান দরবার যে, যেখান থেকে কোন সত্যিকার আশেক এবং সওয়ালের হস্ত সম্প্রসারণকারী ফকির বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না।

حَاشَاهُ أَنْ يُحَرِّمَ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ	*	أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرَمِ

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব হুযূর আকরম ﷺ-কে এ থেকে সংরক্ষিত রেখেছেন যে, তাঁর করুণা এবং আগ্রহের আশাবাদী তাঁর দরবার থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, অথবা তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী তাঁর দরবার থেকে অসম্মানিত ও বিমুখ হয়ে চলে যাবে।'[১]

কোন একজন বুযুর্গ বলেছেন,

عَلَى بَابِكَ الْعَالِيْ مَدَدْتُ يَدَ الرَّجَا	*	وَمَنْ جَاءَ هَذَ الْبَابَ لَا يَخْشَى الرَّدَا

'আপনার এ মহান দরবারে আমি আশার হস্ত সম্প্রসারিত করেছি। আপনার এ দরবার এতই মহান যে, যে কোন ব্যক্তি এ আস্তানায় উপস্থিত হয়, সে বিমুখতার আশঙ্কা করে না।'

[১] আল-বূসীরী, *কসীদাতুল বুরদা*, পৃ. ৭০

سَلَامٌ عَلَىٰ أَنْوَارِ طَلْعَتِكَ الَّتِيْ	*	أَعِيْشُ بِهَا شُكْرًا وَأَفْنَى بِهَا وَجْدَا

'আপনার এমন ধবধবে সুন্দর নূরানী চেহারার ওপর সালাম হোক, যে চেহারা চেয়ে চেয়েই আমি শুকরিয়া আদায়ের সাথে জীবন ধারণ করি এবং যাঁর মুহাব্বতের ওপর প্রাণ উৎসর্গ করি।'

لَعَلَّكَ أَنْ تَعْطِفَ عَلَيْنَا بِنَظْرَةٍ	*	تَرَى مَا أَسَرَّ الْوَجْدَ فِيْنَا وَمَا أَبْدَى

'যদি আপনি আমাদের প্রতি আপনার এক জলক সুদৃষ্টি রাখেন, তবে আপনি আমাদের মধ্যে আপনার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মুহাব্বত অবলোকন করবেন।'

وَأَنْتَ مَلَاذُ الْعَبْدِ يَا غَايَةَ الْمُنَىٰ	*	وَيَا سَيِّدًا قَدْ سَادَ مَنْ جَاءَ عَبْدَا

'হে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বশেষ কেন্দ্র। আপনিই এ গোলামের আশ্রয়স্থল। ওহে আমার সরদার। যে ব্যক্তি গোলাম হয়ে আপনার দরবারে এসেছে, সে সরদার হয়ে ফিরেছে।'

وَأَنْتَ إِرَادَتِيْ وَأَنْتَ وَسِيْلَتِيْ	*	فَيَا حَبَّذَا أَنْتَ الْوَسِيْلَةُ وَالْقَصْدَا

'এবং আপনিই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, আর আপনিই আমার একমাত্র ওয়াসীলা কতই যে আনন্দের বিষয় আপনি যে ওয়াসীলা এবং উদ্দেশ্য হয়েছেন।'

উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, মসজিদে নববীতে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম তাহাইয়াতুল মসজিদের নামায আদায় করবে, না রওযায়ে পাকের যিয়ারত করবে? মালিকী মাযহাবের কোন কোন আলিম তাহাইয়াতুল মসজিদের পূর্বে যিয়ারত করার কথা বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি হুযূর আকরম ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে গমন করা হয়, তবে যিয়ারতই আগে করবে। কিন্তু অধিকাংশ আলিমগণ বলেন যে, প্রত্যেক অবস্থায় তাহাইয়াতুল মসজিদের নামাযই আগে পড়বে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমি কোন এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুযূর আকরম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে ইরশাদ করেন যে, 'যাও, মসজিদে গিয়ে নামায আদায় কর, এরপরে এসে আমাকে সালাম কর!'[১]

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ২১০।

এখানে এটি মনে রাখা উচিত যে, এ সালাম মসজিদে প্রবেশকালীন সালাম নয়। কেননা মসজিদে প্রবেশের সময় যে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব সর্বসম্মতিক্রমে তাহাইয়াতুল মসজিদের পূর্বেই দিতে হয়। এতে কোন ইখতিলাফ নেই। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কেও আলিমদের মতভেদ রয়েছে যে, শুকরিয়ার সাজদা কি তাহাইয়াতুল মসজিদের পূর্বে দেবে, না পরে? শাফিয়ী মাযহাবের আলিমদের মতে, যদি কারো সাধারণ নিয়ামত ব্যতীত নতুন কোন নিয়ামত লাভ হয়, তবে পূর্বেও জায়েয। আমাদের হানাফী মাযহাবের আলিমদের মতে এভাবে জায়েয বলে রিওয়ায়ত আছে। হযরত ﷺ-এর কাজ থেকেও এর বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

অনুচ্ছেদ-১

তাহাইয়াতুল মসজিদের নামায আদায়ের পর রওযায়ে পাকের যিয়ারতের প্রতি মনোনিবেশ করবে। এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং সাহায্য ব্যতীত এ মহান দরবারে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

فَلَمَّا أَتَيْنَا قَبْرَ أَحْمَدَ لَاحَ مَنْ	*	سَنَاهُ ضِيَاءٌ أَخْجَلُ الشَّمْسَ وَالْبَدْرَا

'যখন আমরা হযরত আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর কবর শরীফে এসে উপস্থিত হই, তখন তাঁর অপূর্ব জ্যোতি থেকে এমন আলো ছড়িয়ে পড়ল, যা চন্দ্র সূর্যের আলোকে ম্লান করে দেয়।'

وَقُمْنَا مَقَامًا أَشْهَدُ أَنَّهُ	*	يَذْكُرُنَا مَنْ فَرَطَ هَيْبَةَ الْحَشَرَا

'আমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়েছি, যে স্থান সম্পর্কে আমি আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষ্য করে বলছি যে, এর অনন্ত ভয়-ভীতি আমাদেরকে হাশরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

وَجِئْنَا لَهُ فِيْ شِدَّةٍ مِنْ نُفُوْسِنَا	*	فَجُدْنَا الْعُسْرَ وَيُسْرِنَا الْيُسْرَا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتَ فِيْهِ»؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَادْخُلِ الْمَسْجِدَ، وَصَلِّ فِيْهِ، ثُمَّ ائْتِ، فَسَلِّمْ عَلَيَّ»

[১] আস-সামহুদী, *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, খ. ৪, পৃ. ২০৫-২১০।

'আমরা আমাদের অন্তরের এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এ দরবারে হাযির হয়েছি। আমরা কষ্ট করে কঠিন সমস্যাকে নিয়ে এসেছি, আর কণ্ঠকে লাঘব করে কঠিনকে সহজ করেছি।'

هُوَ الْبَحْرُ لَكِنْ سَلْسَبِيْلٌ وَإِنْ تَرِدْ	*	تَرِدْ سَلْسَبِيْلًا إِنَّهُ لَمْ يَزَلْ جَرَّا

'তিনি সাগর বরং সলসবীল, যদি তুমি এখানে অবতরণ কর, তবে নহরে সলসবীলেই (বেহেশতের একটি নহরের নাম) অবতরণ করবে, যা সর্বদা চালু থাকবে।'

فَيَهْدِيْكَ فِيْ سَبِيْلِ الْعِنَايَةِ وَأَصْلًا	*	إِلَيْهِ حَتَّى تَرَى ذَاتَهُ جَهْرًا

'তিনি আমাকে তাঁর করুণার তরীকায়, তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। তখন তুমি তাঁর সত্তাকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পারে।'

هُوَ الْكَنْزُ كَنْزُ اللهِ بَيْتُ عُلُوْمِهِ	*	وَمَنْ أُوْدِعَ الرَّحْمَنُ فِيْ قَلْبِهِ سِرًّا

'তিনি ভাণ্ডার, অর্থাৎ আল্লাহর ভাণ্ডার। তিনি তাঁর ইলমের ঘর। আর তিনি সেই মহান সত্তা, যাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রহস্য আমানত রেখেছেন।'

মদীনা শরীফের প্রতিটি কণার সাথে পর্যন্ত ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ভাব বজায় রেখে চলবে। তবে সিজদা করা, মদীনার মাটিতে মুখ রাখা অথবা মুখে মাটি মালিশ করা এবং জালী মুবারককে চুমো দেওয়া ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকবে। যদিও অজ্ঞ এবং মূর্খ লোক সেগুলোকে আদবের কাজ বলে মনে করে। কেননা পয়গম্বর ﷺ-এর পায়রবী ও অনুসরণ এবং শরীয়ত মোতাবেক চলার মধ্যেই প্রকৃত আদব নিহিত রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পয়গম্বর ﷺ-এর সুন্নাত ও নীতি বিরোধী সব কাজই বাতিল। মুহাব্বতের জোশে অথবা বিশেষ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এমন কিছু হয়ে যায়, তবে লোকের সম্মুখে না করাই ভালো। এ সম্পর্কে কোন কোন আলিমের মতবিরোধ থাকলেও ফতওয়া এটিই, যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

রওযায়ে পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম

সাইয়িদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযূর আকরম ﷺ-কে সালাম দেওয়ার সময় খাড়া হয়ে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর বেঁধে নেবে। যেমনিভাবে নামাযের মধ্যে বাঁধা হয়। যেমন– হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম আল্লামা কিরমানী رحمه الله বর্ণনা করেছেন। কিবলাকে পিছনে রেখে, যেখানে

দেয়ালে চান্দির পেরাক লাগানো রয়েছে সে স্থানেই হযরত ﷺ-এর মুখোমুখি হয়ে বাতির নিচে দাঁড়াবে। হুজরা এ পদ্ধতিই ছিল (বর্তমানে কিন্তু সে পদ্ধতি নেই)।

বর্তমানে (১২৮০ হি.) বাবর শরীফের তিন-চার গজ ব্যবধানে জালী দেওয়া হয়েছে। এখন যিয়ারতকারী জালী শরীফের জানালার মুখোমুখি অথবা এর নিকটে বা দূরে দাঁড়াবে।

যিয়ারতের আরেকটি আদব এই যে, কোন অবস্থাতেই আদবকে হাতছাড়া করবেনা। হুযূর আকরম ﷺ-এর জীবিত অবস্থায় তার সম্মুখে যে শ্রদ্ধা, আদব, বিনয়, ভয়-ভীতি ও মুহাব্বত নিয়ে দাঁড়ানো হতো, সে বিশ্বাস এবং সেসব গুণাবলি সহকারে এখানেও দাঁড়াবে। বর্তমানে জানালা শরীফের বাইরে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা হয়।

মনে প্রাণে একথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, হুযূর আকরম ﷺ তাঁর উপস্থিতি, অবস্থান ও যিয়ারত সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল। সুতরাং অধিক উচ্চ বা নিম্ন স্বরে নয়, বরং মধ্যম স্বরেই সালাম পেশ করবে। নিতান্ত লজ্জিত ও বিনীত অবস্থায় এবং আদব ও গাম্ভীর্য সহকারে সালাম আরজ করবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

এরপর তিনবার এভাবে বলবে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ.

ইত্যাদি ইবাদত, যা বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে এবং মুয়াল্লিমগণ শিক্ষা দেন। কোন কোন বুযুর্গানে দীন, যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما যিয়ারত বাক্যকে শুধু اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অবধি সংক্ষিপ্ত করেছেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি যিয়ারতে আসতেন, তখন তিনি বলতেন,

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ».[২]

হযরত ইমাম মালিক رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এভাবেই বলতেন,

[১] আল-হারিসী, *মুসনদু আবী হানীফা*, খ. ১, পৃ. ২১৫–২১৬, হাদীস: ১৮৩
[২] আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬, হাদীস: ৬৭২৪

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

তবে মনে হয় সম্ভবত দৈনিক যিয়ারতের সময় অথবা সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে, যেমন নামাযের ইকামত কিংবা অপর কোন প্রয়োজনের সময় সালামকে এভাবে সংক্ষিপ্ত করা হত। অন্যথায় যে সব আশেক প্রেমিকগণ বেদনাতুর অন্তর নিয়ে, প্রিয় হাবীবের দরবারে উপস্থিত হয়েছে, তারা শুধু এতটুকু সালাম পেশ করে সবর করতে পারে? যেমন প্রেমিক বলছে,

طی لسانی از خدا خواہم در روز محشری

پیش تو بیاں کنم حال شب در از را

অধিকাংশ আলিমগণ এ মহান দরবারে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। কেননা এ মহান দরবারে খাড়া হওয়া এবং হযরত ﷺ-কে সম্বোধন করার সুযোগ লাভ করা নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয়। যেমন কোন কবি বলেছেন,

حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْجَعِي

فَأَنْتَ بِمَرْأَى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعِ

'হে প্রস্তর বিশিষ্ট 'জন্দল' নামক স্থানের কবুতরী তুমি তান ধরে গান গাও। কেননা তুমি এমন স্থানে আছ যেখানে আমার প্রেমিকা (সুআদ) তোমাকে দেখছে এবং তোমার আওয়াজ শুনছে।'

সুতরাং তুমি ভাগ্যবান! আর আমিতো অভাগা, কেননা তিনিতো আমাকে দেখতেও পাচ্ছে না এবং আমার বিরহ-বেদনার গান শুনতেও পাচ্ছে না।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এমন কিছু হয়ে যায়, তবে লোকের সম্মুখে না করাই ভালো। এ সম্পর্কে কোন কোন আলিমের মতবিরোধ থাকলেও ফতওয়া এটিই যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

যদি যিয়ারতকারীকে কোন বন্ধু-বান্ধব অথবা আত্মীয়-স্বজন রওযায়ে পাকে তাঁদের সালাম পেশ করার কথা বলে তবে এভাবে সালাম পেশ করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

অথবা এভাবে আরজ করবে,

فُلَانُ بْنِ فُلَانٍ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

হুযূর আকরম ﷺ-কে আরজ করার পর এক গজ সরে গিয়ে হযরত আবু বকর ﷺ এবং হযরত উমর ﷺ-এর ওপর এভাবে সালাম পেশ করবে:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، يَا صَفِيَّ رَسُوْلِ اللهِ، وَثَانِيَهِ فِي الْغَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ الْفَارُوْقِ الَّذِيْ أَعَزَّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

যদি কেউ সালাম পেশ করার ওসিয়ত করে, তবে হযরত ﷺ-এর চেহারা মুবারকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উল্লিখিত তরীকায় সালাম পেশ করবে। করার সময় নিতান্ত বিনয়াবনত হয়ে আদবের সাথে তলব করবে।

কোন কোন বুযুর্গানে দীন থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কবর শরীফের নিকট এ আয়াতটি إِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ পাঠ করে সত্তর বার! صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! বলবে, তবে আসমানের ফেরেশতা তাকে আওয়াজ দিয়ে বলে, صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ! এবং আরও বলে, আজকে তোমার এমন কোন হাজত নেই, যা পূরণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কোন কোন আলিম বলেছেন যে, হাদীসে যখন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া নবীয়াল্লাহ বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যদি صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! বলা হয়, তবে ভালো হয়। কেননা এতে কুরআনে করীমের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়।

এরপর ওপরের দিকে এসে কবর শরীফ এবং থামের মাঝখানে কিবলার দিকে মুখ করে এভাবে দাঁড়াবে, যাতে হযরত ﷺ-এর মস্তক মুবারকের দিকে পিঠ না হয়। এভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার তারীফ-প্রশংসা দরূদ ও সালাম এবং দু'আতে মশগুল হবে। পুনরায় রওযা মুবারকে আসবে এবং মিম্বর শরীফের নিকট দু'আতে আত্ম নিয়োগ করবে। এ স্থানে দু'আ কবুল হয়।

অনুচ্ছেদ–২: মদীনা শরীফে অবস্থানকালের আদব

মদীনা মুনাওয়ারায় যতদিন অবস্থানের সুযোগ লাভ হয়, একে বড়ই সৌভাগ্য বলে ধারণা করবে এবং দিন-রাত মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। আর নামায, রোযা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় মসজিদ যতটুকু ছিল, এ স্থানের মধ্যেই ইবাদত-বন্দেগি সীমিত রাখা উত্তম।

মদীনা শরীফে অবস্থানের আরেকটি আদব এই যে, যদি আপনি মসজিদের অভ্যন্তরেই থাকেন, তবে হুজরা শরীফ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাবেন

না। আর যদি মসজিদের বাইরে থাকেন, তবে পূর্ণ ভয়-ভীতি, ইজ্জত-সম্মান ও আন্তরিক বিনয়ের সাথে গুম্বজ শরীফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। কেননা এখানে গুম্বজ মুবারকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কাবা শরীফের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ারই হুকুম। পবিত্র গুম্বজ শরীফের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার মধ্যে আশেকগণ কি যে আনন্দ ও মজা উপভোগ করেন, এবং অন্তরে কি যে নূর হাসিল হয়। তা শুধু তখনকার অবস্থার ওপরই নির্ভর করে, যা আশেকগণই উপলব্ধি করতে পারেন।

ع ذوق این مئی نشناسی بخدا تا نچشی۔

'খোদার কসম যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইশক মুহাব্বতের এ শরাব পান করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এর স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না।'

মদীনা শরীফে অবস্থানের আরেকটি আদব এই যে, অন্তত পক্ষে একটি রজনী হলেও মসজিদে নববীতে রাত জাগরণের ব্যবস্থা করা চাই। কেননা এক রাতের মর্যাদা-ফযীলত লায়লাতুল কদরের মর্যাদা ও ফযীলত থেকে কোনক্রমেই কম নয়, বরং বেশি।

ع آن شبِ قدر گویند اہل خلوت امشب است۔

'বন্ধুর মিলনাভিলাষী প্রেমিকগণ আজিকার এ রজনীকেই শবে কদর বলেন।'

وَكُلُّ اللَّيَالِيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِنْ دَنَتْ	*	كَمَا كَانَ يَوْمُ اللِّقَاءِ يَوْمَ جُمُعَةِ

'প্রেমিকের জন্য প্রত্যেক রজনীই শবে কদর যদি প্রেমিকা নিকটে থাকেন। যেমন জুমাবার মিলনের দিন।'

نَحْنُ فِيْ حَضْرَةِ الْحَبِيْبِ جُلُوْسٌ	*	يَقَظَةٌ هٰذِهٖ وَإِلَّا مَنَامُ

'আমরা বন্ধুর দরবারে এ (মিলনের) কারণেই জাগ্রত অবস্থায় বসে আছি।'

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَزِيْلٌ	*	وَنَزِيْلُ الْكَرِيْمِ لَيْسَ يُضَامُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। খোদার কসম, আমি আপনারই প্রেমাসক্ত আশেক।'

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ مُحِبٌّ	*	فِيْكَ وَاللهِ عَاشِقٌ مُسْتَهَامُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট অবতরণ করেছি। আর ভদ্র লোকের নিকট অবতরণকারী মেহমান রোযা রাখে না।'

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْتَ رَجَائِيْ	*	وَإِمَامِيْ، نِعْمَ الرَّجَاءُ وَالْإِمَامُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার আশা-ভরসা এবং ইমাম। কতই ভালো আশা এবং ভালো ইমাম।'

যদি মসজিদে রাত যাপনের জন্য সরকারি অনুমতি নিতে হয় এবং এর জন্য সরকারি ও বেসরকারি মহলে গমনাগমনের কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় তবে একেও সৌভাগ্য মনে করবে এবং পুলিশ ও সরকারি মহলের লোকদের সাথে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করবে।

মদীনা শরীফে অবস্থানের এও আরেকটি আদব। মদীনা শরীফ অবস্থানের আরেকটি আদব এই যে, বড় হউক বা ছোট হউক এলাকার সর্বস্তরের লোকদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতা করবে। কেননা যে কোন অবস্থাতেই সেই মহান দরবার ও মহৎ স্থানের সাথে সম্পর্কে থাকার কারণে তাঁরা সব সময়ই শ্রদ্ধার পাত্র।

كَفٰى شَرَفًا إِنِّيْ مُضَافٌ إِلَيْكُمْ	*	وَإِنِّيْ بِكُمْ ادُّعِيْ وَأُزْعٰى وَأُعْرَفُ

'আপনাদের সাথে আমার সম্পর্কিত হওয়ার মর্যাদাই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনাদের দ্বারাই আমাকে ডাকা হয়, সম্মান করা হয় এবং পরিচয় হয়।'

উল্লেখ্য যে, মনে রাখবে নিজের সমগ্র জীবনের মধ্যে এটিই একমাত্র সফল রাত, এ রাতের মধ্যে শুধু দরূদ ও সালামের তোহফাই পেশ করতে থাকবে:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً هُوَ لَهَا أَهْلُ صَلَاةٍ نَاشِئَةٍ مِّنْ عَيْنِ السِّرِّ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا أَنْتَ وَإِلَّا هُوَ صَلَاةً هِيَ مِعْرَاجُ قُدْسِهٖ إِلَيْكَ، وَسَمَّيْتُهُ أُنْسِهٖ لَدَيْكَ.

উক্ত মুবারক রজনীতে এমন ইশক মুহাব্বতে বিভোর থাকবে, যাতে নিদ্রা কাছেও আসতে না পারে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব, হুযূর আকরম ﷺ-এর অপরূপ সৌন্দর্যের প্রেমিক তাঁরই এ মহান দরবারে বসে কিভাবে ঘুমাতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচান।

قرار چیست صبوری کدام وخواب کجا۔
'এখানে স্বস্তি কোথায়, ধৈর্য এবং নিদ্রা কোথায়?'

گفتہ ام در خواب رو تا بینے اواندر خیال

این سخن بیگانہ را گو اشارا خواب نیست

'তুমি আমাকে বলছ যে, নিদ্রা গমন কর, যাতে তুমি তাকে ধ্যান রাজ্যে দেখতে পাও। (আমি বললাম,) তুমি একথা পরজনকে বল। কেননা প্রেমিকের চোখে ঘুম আসে না।'

যদি এ মুবারক রজনীতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, সাইয়িদুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামিন, হুযূর আকরম ﷺ-এর দিদার নসীব হয়, আর মধুর মিলন লাভ হয়, তবে এ শুভক্ষণে জামালে মুহাম্মদীর আশেক, আমলে আহমদীর মতওয়ালা, তাঁরই বিরহ-বেদনায় রোগাক্রান্ত, আপাদমস্তক তাঁরই প্রেমাসক্ত এ নরাধমকেও যেন ভুলে না যান। যদি আত্মজ্ঞান বাকি থাকে এবং আত্মহারা হয়ে না যায়, তবে নরাধমকেও স্মরণ করবে।

چوں باحبیب نشینی وبادہ پیمائی ☆ بیاد آر محبان بادہ پیمارا

'যদি আপনি বন্ধুর সাথে বসে শরাব পান করেন, তবে অপরাপর শরাব পানকারী প্রেমিকরেদকেও স্মরণ করবেন।'

কেননা যদি বিশ্বাস করেন, তবে সে দরবারের এ পাগল মস্তানও এমনি নিজের শুভ মুহূর্তে তোমাকেও ইয়াদ করেছেন। যদি এতে তোমার সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে খোদ হযরত ﷺ-এর জবান থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন। তোমার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ কোথায় ছিলে, আর কোথায় এসেছ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

মদীনা শরীফে অবস্থানের আরেকটি আদব এই যে, পবিত্র মসজিদে নববীতে প্রবেশ কাল থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত মন, বুক ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সব ধরনের গর্হিত, মাকরূহ এবং অপছন্দ আর আদবের বরখেলাফ কাজ, কথা ও আচরণ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

যে মহান আদবের স্থানে উপস্থিতির সুযোগ লাভ হয়েছে, শুধু তাঁরই ধ্যান-ধারণায় সর্বদা নিমগ্ন থাকবে। যার সাথে ওঠা-বসা ও কথা-বার্তা অতি সংক্ষেপেই সেরে নেবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا مَا عَمِلْنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ، وَاجْبُرْ مَا فَاتَ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَحِلْمِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

এখানে অবস্থানের অপর একটি আদব এই যে, কোন কোন মূর্খ লোক মসজিদ শরীফের মধ্যে খেজুর ভক্ষণ করে আর বিচি মসজিদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। এটি বড়ই গর্হিত কাজ ও বেয়াদবী।

যিয়ারতের আদব সম্পর্কীয় লিখিত কিতাবসমূহে এ আদবের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোখের মধ্যে সামান্য কোন কিছু পতিত হলে যেমন যন্ত্রনাবোধ হয়, মসজিদের মধ্যেও সামান্য এ জাতীয় জিনিস পতিত হলে মসজিদ ব্যথিত হয়। গ্রন্থাকার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, পূর্বেকার যমানায় সম্ভবত কোন কোন লোকের এ রূপ আচরণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ আচরণ দেখা যায় না। বোধ হয়, যে সব লোক মসজিদে খেজুর ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করতেন।

মসজিদে নববীর আরেকটি আদব এই যে, সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্বীয় জায়নামায পেতে রেখে অপরাপর মুসল্লীদের ওপর স্থান সংকীর্ণ না করা বাঞ্ছনীয়। যেমন কোন কোন লোকের ইহাই অভ্যাস। যদি উক্ত স্থানের বরকত এবং ফযীলত হাসিল করার লালসা থাকে, তবে সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশ করে জায়নামায পেতে নির্দিষ্ট স্থানে বসে যাবে। কিন্তু এমন করবেনা যে, সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশ করে জায়নামাযটি একটি বিশিষ্ট স্থানে পেতে রেখে চলে যাবে। আর ইমাম মিহরাবে গমন করলে পরে আবার উক্ত স্থানে চলে এসে নামাযে মশগুল হয়ে যাবে। এ কাজকে আলিমদের কেউ কেউ নিষেধ আবার কেউ মাকরূহ বলে রায় দিচ্ছেন। তবে মাকরূহ। কোন কোন লোকের এ অভ্যাস হয়েছে যে, সকাল হওয়ার পূর্ব থেকেই মসজিদের দরজায় এসে ভিড় জমায় এবং দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই ভদ্রতা, ধৈর্যশীলতা ও আদবের কোন খেয়াল না রেখে দৌড়াদৌড়ি করে, একজনের ওপর আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জায়নামায প্রথম কাতারে পেতে রেখে যিয়ারতের প্রতি মনোনিবেশ করে। এর মত সরল প্রাণও দেখা যায় যে, উক্ত স্থানের ফযীলত হাসিল করার উদ্দেশ্যে যিয়ারতের প্রতিও কোনরূপ গুরুত্ব দেন না। আবার গুরুত্ব দিলেও আদবের প্রতি খেয়াল না করে খুবই তাড়াহুড়া করে যিয়ারত শেষ করে।

حافظا علم وادب ورز کہ در حضرت شاہ ☆ ہر کہ رانیست ادب لائق قربت نبود

'হে হাফিয (শিরাজী)! ইলম এবং আদব শিখে নাও, কেননা বাদশাহের দরবারে যে ব্যক্তি আদব রক্ষা করে চলেনা, সে নৈকট্য লাভের উপযুক্ত নয়।'

أَدِّبُوا النَّفْسَ أَيُّهَا الْأَصْحَابُ ❋ طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا آدَابٌ

'হে বন্ধুগণ! নিজের নফসকে আদব শিক্ষা দাও। কেননা মুহাব্বতের সমস্ত তরীকাই আদব।'

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْهَفْوَةِ وَالْغَفْلَةِ ❋ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ

মসজিদের অপর একটি আদব এই যে, এখানে থুথু নিক্ষেপ করবেন না। কেননা এ নোংরা কাজটি হারাম বলেই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। তবে থুথুকে মাটির নিচে দাফন করাই যে এর কাফফারা বলে বর্ণিত আছে। এর অর্থ এ নয় যে, এতে গুনাহ হবেনা, বরং এর অর্থ হচ্ছে, গুনাহ মুছে যাবে।

রিসালায়ে কুশাইরিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত সুলতান বায়িযীদ বোস্তামী (রহ.) একজন লোকের সাথে মুলাকাতের জন্য গমন করেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, লোকটি মসজিদের মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করেছে। তখন তিনি লোকটির সাথে সাক্ষাৎ না করেই দ্রুত গতিতে চলে যান। থুথু নিক্ষেপের নিষেধ যখন সমস্ত মসজিদের জন্যই প্রযোজ্য তখন খাতিমুল আম্বিয়া ﷺ-এর এমন মর্যাদাপূর্ণ মসজিদে থুথু নিক্ষেপ যে কত বড় জঘন্য অপরাধ হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি অগত্যা মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করতে হয়, তবে বাম পায়ের তলেই নিক্ষেপ করে মাটির নিচে দাফন করবে। কেবলার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ থেকে অবশ্যই বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।[১]

মসজিদে নববীর আরেকটি আদব এই যে, এখানে যত বেশি সম্ভব, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। অন্তত পক্ষে এক খতম তো হওয়া চাই। কেননা এটি কুরআন শরীফ এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হওয়ার মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যদি সম্ভব হয়, তবে হযরত ﷺ-এর শামায়েল, সীরাত, ফযীলত এবং প্রশংসাপূর্ণ বই কিতাব পাঠ করবে। অথবা অন্যলোক থেকে তাঁর ফযীলতের কথা, প্রশংসা ইত্যাদি শ্রবণ করবে, যাতে তাঁর ইশক মুহাববত বৃদ্ধি পায় এবং দিদার লাভের উৎসাহ উদ্দীপনায় অন্তর ভরে ওঠে।

এখানকার আরেকটি আদব এই যে, এখানে অবস্থানকালে যতদূর পারা যায়, রোযা রাখবে। বিশেষ করে যদি অবস্থান কাল সংক্ষিপ্ত আর গমনকাল হয় যা দ্বারা মদীনা শরীফের কিছু দুঃখ তুমিও অনুভব করতে পার।

মদীনা শরীফের অবস্থান কালের আরেকটি আদব এই যে, যিয়ারতের নববী ﷺ ব্যতীত জান্নাতুল বকী'তেও যিয়ারত করবে। যেখানে সাহাবায়ে

[১] আল-কুশায়রী, *আর-রিসালা*, খ. ১, পৃ. ৫৭

কিরাম, উম্মাহাতুল মুমিনীন, তাবেয়ীন, তবে-তাবেয়ীন, উলামা-সালিহীনের পবিত্র কবর বিদ্যমান। এ ছাড়া উহুদে হযরত ﷺ-এর চাচা, শহীদগণের সরদার হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এরও যিয়ারত করবে। এ ছাড়া মসজিদে কুবা, হযরত ﷺ-এর অপরাপর মসজিদ, কূপ এবং তাঁর অপরাপর নিদর্শনসমূহেরও যিয়ারতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

এ সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ আছে, হুযূর আকরম ﷺ-এর যিয়ারতের পর প্রত্যেক দিনই কি বকী'র যিয়ারত করবো না শুধু জুমাবারেই করবো? আজকাল শুধু জুমাবারই যিয়ারত করার প্রথা প্রচলিত। ইমাম নববী এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ বলেন যে, বকী' যিয়ারতও প্রত্যেক দিন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন কোন আলিম বলেন যে, একথার কোন যুক্তি প্রমাণ নেই। শায়খ আবুল হাসান বকরী (রহ.) বলেন যে, কবর যিয়ারত সুন্নাতে মুআক্কাদা যা প্রত্যহই করা যেতে পারে। তবে জুমাবারে বেশি উত্তম।

এখানকার আরেকটি আদব এই যে, মসজিদের ভেতরে বা বাইরে গমনাগমণের সময় যতবারই কবর শরীফ অতিক্রম করবে, ততবারই দাঁড়িয়ে হযরত ﷺ-এর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে। যদিও বা দিনে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়। তাঁর চেহারা মুবারকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে করতে পারলে আরো ভালো হয়।

বর্ণিত আছে যে, পূর্বেকার একজন বুযুর্গ এ আদবটি পরিহার করার ফলে তাঁর তরফ থেকে তাঁকে নিদ্রার মধ্যে ভর্ৎসনা করা হয় এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ধমক দেওয়া হয়। দরূদ ও সালাম পেশ করার সময় যদি প্রত্যেক বারই সম্ভব হয়, চেহারা মুবারকের সামনে বসে যাবে। হানাফী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে এটিই উত্তম। তবে মালিকী মাযহাব মতে, অধিকতর যিয়ারত যে মুস্তাহাব নয়, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত সমুদয় আদবের সার কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভয়-ভীতি, আন্তরিক আদব, মুহাব্বত এবং তাঁরই ধ্যান-ধারণায় সর্বদা নিমগ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্য মনস্কতা পরিত্যাগ করে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সমগ্র নেক আমল করা চাই ধ্যান-ধারণা, পূর্ণ ইশক, মুহাব্বত বহাল রেখেই পূর্ণ অবস্থানকালই ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবে। গাফলতি, অন্য মনস্কতা, ভোগ-বিলাস এবং বেয়াদবি সদা পরিত্যাজ্য। যেমন কোন আশেক বলেছেন,

نادیده رخت عمری بسودائے تو ورزیدم

فارغ ز تو کی باشم اکنون کہ ترا دیدم

'আপনি আপনাকে না দেখেই আপনার ইশক-মুহাব্বতকে আমার জীবনের একমাত্র সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এখন যখন আমি

আপনাকে দেখতে পেয়েছি, তখন আমি আপনার থেকে কিভাবে বেখবর থাকতে পারি?'

ـ با آنچه دلم قرار گیر دلی تو ☆ آتش بمن اندر زن دانم بستان

'আপনি ব্যতীত কিভাবে আমার অন্তর সান্ত্বনা পেতে পারে? আমার অন্তরের মধ্যে মুহাব্বতের আগুন জ্বেলে দিন, এটাই হবে আমার বাগান।'

মদীনা শরীফের গুরুত্বপূর্ণ আদবসমূহের মধ্যে এ আদবটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যে, মদীনা শরীফের বাসিন্দাদেরকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভদ্রতা, নম্রতা ও শিষ্টাচারিতা প্রদর্শনে যেন কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়। সব সময় আদবের খেয়াল রেখে চলতে যেন ভুল না হয়। সব সময় মনে রাখবে যে, তাঁরা হুযূর আকরম ﷺ-এর শ্রদ্ধাভাজন প্রতিবেশী। এ ফযীলতের ওপর অন্য কোন ফযীলত নেই। যদিও বা তাঁরা বিভিন্ন ধরনের গুনাহ এবং বিদআত কাজে লিপ্ত হয়। কেননা হুযূর আকরম ﷺ-এর প্রতিবেশীত্বের ফযীলতই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। কোন গুনাহ এবং বিদআতের দ্বারা এ ফযীলত নষ্ট হয় না এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ ও গুনাহ মাফ থেকে বঞ্চিত করে না।

فَيَا سَاكِنِيْ أَكْنَافِ طَيْبَةِ كُلُّكُمْ	*	إِلَى الْقَلْبِ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيْبِ حَبِيْبٌ

'হে মদীনা তাইয়িবার এলাকায় বসবাসকারী সম্মানিত জনগণ! আপনারা সবাই আমার প্রিয় বন্ধুর কারণে আমার অন্তরের প্রিয়।'

رَأَى الْمَجْنُوْنُ فِي الْبَيْدَاءِ كَلْبًا	*	فَمَدَّ لَهُ مِنَ الْإِحْسَانِ ذَيْلًا

'একদিন লায়লার প্রেমিক ময়দানের মধ্যে একটি কুকুর দেখতে পেয়ে তার জন্য কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দেয়।'

فَلَامُوْهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ	*	وَقَالُوْا لِمَ مَسَحْتَ الْكَلْبَ ذَيْلًا

'মজনুর এ আচরণ দেখে লোকেরা তার ওপর গাল-মন্দ করে বলল, তুমি তোমার আঁচল দ্বারা কুকুরকে স্পর্শ করলে কেন?'

فَقَالَ دَعَوْ الْمَلَامَةَ إِنَّ عَيْنِيْ	*	رَأَتْهُ مَرَّةً فِيْ حَيِّ لَيْلَى

'তখন মজনু বলল, তোমরা গাল-মন্দ করা ছেড়ে দাও; কেননা আমি তাকে একবার আমার চোখে আমার প্রেমিকা লায়লার গলিতে প্রত্যক্ষ করেছি।'

بو الفضولی گفت ای مجنون خام

این چہ شید است اینکہ می آری مدام

'কোন একজন নির্বোধ লোক বলল, হে মুর্খ মজনু! এ যে কি প্রেম, এ যে কি পাগলামী! তুমি যে সদা সর্বদা এসব কি আচরণ কর?'

ـ پور سگ دائم لیدی می خورد ☆ مقعد خود را بلب می استرد

'কুকুরের বাচ্চা সর্বদা নাপাক জিনিস ভক্ষণ করে, নিজের মুখের দ্বারা নিজের উপবেশনের স্থানকে ওপড়িয়ে ফেলে।'

ـ عیبہا ئے سگ بسی اوبر شمرد ☆ عیب دان از عیب او بوی نبرد

'লোকটি কুকুরের অনেকগুলো দোষত্রুটির কথা বর্ণনা করল। কুকুরের দোষত্রুটির জ্ঞানধারী নিজের দোষত্রুটির কোন সন্ধান রাখে না।'

ـ کین طلسم بستہ لولیٰ است این ☆ پاسبانِ کوچہ لیلی است این

'এ যে একটি তেলেসমাত, যা খোদার কুদরতের সাথে সম্পর্কিত। এ কুকুর যে আমারই প্রেমিকা লায়লার গলির পাহারাদার।'

যে আদবটির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, অথচ এতে লোকের পদস্খলনের সমূহ সম্ভবনা বিদ্যমান। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন ভদ্রলোক এবং হারাম শরীফের খাদিম কখনও কখনও বিদআত এবং দোষকর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদেরকে কদাচিৎ হেয়প্রতিপন্ন এবং অশ্রদ্ধা করবে না। বরং একথাই বিশ্বাস করবে যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর সাথে তাঁদের আত্মীয়তা ও প্রতিবেশীত্বের দরুন তাঁরা সব অবস্থাতেই শ্রদ্ধার পাত্র। আর মনে করবে যে, ভালোর সাথে মন্দও মিশ্রিত থাকে। কোন কোন বদরী সাহাবী থেকে অপরাধ প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা যেন স্মৃতিপটে সদা জাগরূক থাকে। অতএব তাদের সাথে ভদ্র আচরণই করবে, কথাবার্তায় শালীনতাকে হাতছাড়া করবে না এবং কঠোর বাক্য ও গাল-মন্দ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মনে রাখবে যে, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের সম্পর্ক তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তারা পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে মাহরূম হয় না। হযরত আবু বকর رضي الله عنه, হযরত উমর رضي الله عنه ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের সম্পর্কীয় পয়গম্বর ﷺ-এর আওলাদের ব্যাপারে সর্বদা ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখতেন, তাঁরা তাঁদের সম্পর্কে

অন্য ধারণা পোষণ করতেন না। সুতরাং তুমিও ধারণা ভালো রাখ এবং আহলে হকের অনুসরণ কর। রাসূলে পাক ﷺ-এর সুপারিশ যদি আহলে বায়তের গুনাহগার লোকদের (যাদেরকে পবিত্র করার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইরাদা বিদ্যমান) ক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, তবে আর কোন স্থানে হবে? কুরআনে পাকে বর্ণিত আয়াত,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

'হে আহলে বায়ত! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে অপবিত্র দূর করার এবং তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে পবিত্র করার ইচ্ছা করেছেন।'[১]

কোন কোন মাশায়েখ বুঝে নিয়েছেন যে, আহলে বায়তের কোন লোকই মৃত্যু বরণ করবে না। যতক্ষণ তাঁদেরকে সমুদয় অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা যথা- কুফর, শিরক-বিদআত এবং অপরাপর গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা না হয়। রোগাক্রান্ত করে হোক অথবা অন্য উপায়ে হোক, তাঁদেরকে পবিত্র করার পরই মৃত্যু দেওয়া হবে। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিয়ারতের আদব সম্পর্কে লিখিত একজন মক্কাবাসীর একটি কিতাবের অনুবাদ। সাইয়িদ সামহূদীর বর্ণনাও এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

অনুচ্ছেদ–৩

বিশ্বজাহানের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর সাইয়িদুনা ওয়া মওলানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযা মুবারক, মসজিদে নববী, অপরাপর মসজিদ ও কবরসমূহ যিয়ারত শেষে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গমন করে হুযূর আকরম ﷺ-এর নামায আদায়ের স্থানে অথবা এর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়বে এবং দু'আ করবে। এরপরে রওযায়ে পাক যিয়ারতের প্রতি মনোনিবেশ করবে। যিয়ারত শেষে নিজের আওলাদ ফরযন্দের, [illegible]বর্গের, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের উভয় জাহানের কল্যাণ হাসিলের [illegible] দু'আ করবে, যেন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবানি এবং প্রিয় নবীর [illegible] সহীহ-সালামতে স্বদেশ পৌছিয়ে দেন এবং স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার [illegible] সাক্ষাত লাভের তাওফিক দান করেন। এ মুবারক স্থান থেকে বিদায় গ্রহণ [illegible] এ দু'আটি পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ لِيْ

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৩

الْعَوْدَ إِلَيْهِ وَالْعُكُوْفَ لَدَيْهِ، وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرُدَّنَا إِلٰى أَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ، آمِيْنَ.

উল্লেখ্য যে, এ সময় ক্রন্দন ও আহাজারী দু'আ কবুলের আলামত ও নিদর্শন। শুধু এ সময়েই কেন? বরং ক্রন্দন ও আহাজারী সবসময়ই মকসুদ হাসিল ও উদ্দেশ্য পূরণের বড় হাতিয়ার।

- این دلم باغ است و چشم ابروش ☆ ابر گرید باغ خندد شاد وخوش

'আমার অন্তর বাগান, আর আমার চক্ষু যুগল মেঘের মতো কাঁদে, তবেই তো আমার বাগান খুশিতে উৎফুল্ল হয়।'

- ذوق خنده دیده ای خیره خند ☆ ذوق گریه بین که هست این کان قند

'হে হাসির অন্ধ! তুমি হাসির তৃপ্তি উপভোগ করেছ। এখন ক্রন্দনের তৃপ্তিও উপভোগ কর। এ ক্রন্দন মিশ্রির আকর।'

- روشنی خانه باشی ہمچو شمع ☆ گر فرو بارے تو ہمچو شمع دمع

'তুমি মোমবাতির মতো ঘরের আলোতে পরিণত হবে, যদি তুমি বাতির মতো অশ্রুজল ফেলে ক্রন্দন করে।'

- تا نگرید ابر کے خندد چمن ☆ تا نگرید طفل کے یابد لبن

'যদি মেঘ বারিবর্ষণ না করে, তবে বাগান কি রূপে হাসবে? আর যদি শিশু না কাঁদে, তবে কিভাবে দুধ পাবে?'

যদি বিদায়লগ্নে ক্রন্দন ও আহাজারী সৃষ্টি না হয়, তবে ক্রন্দনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। ব্যথা এবং বেদনাদায়ক বিষয়াদি অন্তরের মধ্যে নিয়ে এসে হলেও ক্রন্দন কর। কেননা ক্রন্দনই হচ্ছে সর্বস্তরের দু'আ কবুল হওয়ার আলামত। যদি সামান্য ইশক-মুহাব্বত ও সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তবে ক্রন্দনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হবে না।

- دلی از سنگ باید بسر راه دل ☆ که تحمل کند او لحظۂ محمل برود

'যে সময় (বন্ধুর গলি থেকে) সওয়ারি প্রস্থান করে, তখন এমন পাষাণ অন্তরের প্রয়োজন, যে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।'

أَحِنُّ إِلٰى زِيَارَةِ حَيِّ لَيْلٰى	وَعَهْدِيْ مِنْ زِيَارَتِهَا قَرِيْبٌ

'আমি লায়লার গলি যিয়ারতের জন্য ক্রন্দন করি। অথচ অতি নিকটবর্তী সময়েই আমি তার যিয়ারত করেছি।'

وَكُنْتُ أَظُنُّ قُرْبَ الدَّارِ يُطْفِيءُ * لَهِيْبُ الشَّوْقِ فَازْدَادَ اللَّهِيْبَ

'আমি মনে করতাম যে, তার ঘরের নৈকট্য মুহাব্বতের অগ্নিশিখা নির্বাপিত করবে, কিন্তু কৈ? এতো অনল শিখা আরো বাড়িয়ে দিলো।'

অতঃপর নিতান্ত বেদনাতুর ও ব্যথাপূর্ণ এবং ব্যথা জর্জরিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে হুযূর পাক ﷺ-এর পবিত্র দরবার থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। আর নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নেবে। বিদায়ের সময় সাধারণ চলার মতই চলবে, পশ্চাদ পদে চলবে না। কেননা হুযূর আকরম ﷺ-এর যিয়ারতের বিদায়লগ্নে পশ্চাদ পদে চলাকে কেউ আদবের মধ্যে শামিল করেনি। কিন্তু এর বিপরীত বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে বিদায় গ্রহণকালে মসজিদের বাইরে পর্যন্ত পশ্চাদ পদে গমন করাই সুন্নাত। কেননা বর্ণিত আছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে বিদায় গ্রহণকালে হযরত ﷺ এভাবে পশ্চাদ পদে চলে ছিলেন। কিন্তু কোন রিওয়ায়তে একথা বর্ণিত নেই যে, হুযূর আকরম ﷺ-এর কবর যিয়ারতের পর কোন সাহাবী এভাবে পশ্চাদপদে চলে ছিলেন।

মদীনা শরীফ থেকে বিদায় গ্রহণ কালে দান-খয়রাত ও সদকা করার কথা কখনও ভুলে যাবেন না। অধিকাংশ আলিম বলেন যে, মদীনা শরীফের ইট, পাথর, কলসী ইত্যাদি সাথে নিয়ে আসবে না। কিন্তু হানাফী মাযহাবের উলামা এবং শাফিয়ী মাযহাবেরও কোন কোন আলিম একে জায়েয বলেছেন।

মূল কথা এই যে, মক্কা এবং মদীনা শরীফের পবিত্র স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আত্মতুষ্টির জন্য খেজুর, পানি ইত্যাদি হাদিয়া-তুহফার বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে নিলে ভালো হয়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বানোয়াট পরিত্যাজ্য।

উল্লেখ্য যে, মুসাফিরী থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া-তুহফা নিয়ে আসা সম্পর্কে অনেক সহীহ রিওয়ায়ত বিদ্যমান আছে। সফর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় সেসব আদবসমূহের নিশ্চয় খেয়াল রাখবে। যা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সফর শেষে যখন স্বীয় এলাকার নিকটবর্তী হবে তখন এ দু'আটি পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَّرِزْقًا حَسَنًا.

আর যখন স্বীয় এলাকায় প্রবেশ করবে, তখন নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারবর্গের নিকট স্বীয় আগমন বার্তা যেন পূর্বাহ্নেই পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। হঠাৎ করে ঘরে এসে যাবে না। এবং রাতের বেলাও আসবে না। চাশতের সময়ই গৃহে প্রবেশের উৎকৃষ্ট সময়। নতুবা রাতের পূর্বে সন্ধা বেলা। উল্লেখ্য যে, গৃহে প্রবেশের পূর্বে নিশ্চয় মসজিদে গমন করে দু'রাকাআত নামায আদায় করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, যেন সেই সময় মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়। নামায সমাপনান্তে দু'আ করবে এবং নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার সক্ষমতার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে আর এ দু'আটি পাঠ করবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ وَجَلَالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

যে কোন ব্যক্তিকেই তোমার সামনে পাবে, তার সাথেই মুসাফাহা করবে। আর কোলাকুলি করাও জায়েয, যদি দাড়িবিহীন যুবক না হয়।

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ইমাম শাফিয়ী ﷺ-এর ওস্তাদ হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা ﷺ হযরত ইমাম মালিক ﷺ-এর নিকট গমন করেন। ইমাম মালিক ﷺ তাঁর হাত ধরে মুসাফাহা করেন এবং বলেন যে, যদি কোলাকুলি বিদআত না হত, তবে আমি আপনার সাথে কোলাকুলিও করতাম। তখন হযরত সুফিয়ান ﷺ বললেন, আমি এবং আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কোলাকুলি করেছেন। হুযূর আকরম ﷺ, হযরত জাফর সাদিক ﷺ-এর সাথে কোলাকুলি করেছেন এবং চুমু দিয়েছেন, যখন তিনি আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

ইমাম মালিক বলেন যে, সেই হুকুম ইমাম জাফর ﷺ-এর সাথেই খাস। অন্য কারো জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। তখন হযরত সুফিয়ান ﷺ বলেন, না এ হুকুম কারো জন্য খাস নয়, আমরা এবং জাফর ﷺ এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত যদি আমরা নেককার হই। এরপর তিনি বলেন, আপনি কি আপনার এ মজলিসে আমাকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমিত দেবেন? ইমাম মালিক ﷺ

বলেন, হ্যাঁ, বয়ান করতে পারেন। এরপর যখন হযরত ইমাম সুফিয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন হযরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি চুপ করে থাকেন। হযরত কাযী আয়ায মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হযরত ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর চুপ থাকাতে প্রমাণিত হয় যে, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কথাই সঠিক। ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে এ হুকুম খাস বলে যতক্ষণ প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ এ হুকুম সকলের ক্ষেত্রে শামিল থাকবে। কোলাকুলির হুকুম যে ইমাম জাফর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে খাস নয় তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণিত।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক সময় হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে যান এবং চাদর মুবারক গুছিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করেন এবং উভয় চোখের মাঝখানে চুমো দেন।

যদি কোন আলিম নেককার ব্যক্তির সাথে মোলাকাত হয়, তবে তার হাতে চুমো দেয়াও জায়েয। ছোট ছেলে-মেয়ের মুখ এবং অপরাপর অঙ্গ-প্রতঙ্গেও চুমো দেওয়া সুন্নাত।

সপ্তদশ অধ্যায়

দরূদ শরীফের ফযীলত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা

মনে রাখা দরকার যে, উভয় জাহানের কল্যাণ, বরকত এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জনের নিমিত্তে দরূদ শরীফ থেকে বড় ওয়াসীলা এবং মাধ্যম আর কিছুই নেই। সুতরাং দিনে হোক বা রাতে হোক রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এ কারণে দরূদ শরীফের ফযীলত, সুফল, আহকাম এবং সময় সম্পর্কে নিম্নের পরিচ্ছেদসমূহে আলোকপাত করা হল।

অনুচ্ছেদ-১

উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফের উপকারীতা সুফল ও ফযীলত এত বেশি যে, লেখনীর মাধমে নিয়ে আসা অসম্ভব। এ সম্পর্কে সহীহ এবং উৎকৃষ্ট রিওয়ায়তের দ্বারা যা কিছু বর্ণিত আছে, হাদীস বিশারদ উলামায়ে কিরাম এবং হাফিযগণ উহা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কোনটি সংখ্যা নির্দেশক, কোনটি সময়সুচক, আবার কোনটি অবস্থা নিরূপক।

বহুবিধ ফযীলতের মধ্যে এটাও একটা ফযীলত যে, দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য করা এবং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাদের কাজের সাথে সংগঠিত বিধান করা হয়। যেমন আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ কর।'[১]

দরূদ শরীফ পাঠের অপর একটি ফযীলত এই যে, 'যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাঁর ওপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি উচ্চ মর্যাদা দান করেন, আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয় এবং দশটি গুনাহ মার্জনা করা হয়।'[২]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৫৬

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৬, পৃ. ২৭২, হাদীস: ১৬৩৫২; হযরত আবূ তালহা আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

«مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا».

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'তাঁকে দশজন গোলাম আযাদ করার এবং বিশটি ইসলামী যুদ্ধে অংশগ্রহণের মতো সওয়াব দেওয়া হয়।'

অপর একটি ফযীলত এই যে, দরূদ শরীফ প্রেরণকারীর দু'আ কবুল হয় বলে কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া নবী করীম ﷺ তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেন ও তাঁর জন্য সুপারিশ করবেন বলেও বর্ণিত আছে।

দরূদ শরীফের আরেকটি ফযীলত এই যে, দরূদ শরীফ প্রেরণকারী হযরত ﷺ-এর নৈকট্য লাভ করবেন এবং কিয়ামতের দিন বেহেশতের দরজায় তাঁর পাশেই থাকবেন। তিনি তাঁর নিকট সর্বাগ্রে পৌঁছে যাবেন। কিয়ামতের ভয়ংকর দিনে তিনি তাঁর সমুদয় ভার গ্রহণ করবেন। দরূদ শরীফের ফযীলতসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, দরূদ প্রেরণকারীর মুশকিল আহসান হয়, মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, গুনাহসমূহ মার্জনা করা হয়, পাপাচার মোচন হয়। দরূদ শরীফের বরকতে ফরয নামায কাযার কাফফারা হয় বলেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। আর দরূদ শরীফ সদকার স্থলাভিষিক্ত বরং সদকা থেকে উত্তম বলেও বর্ণিত আছে। দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলতসমূহের মধ্যে এগুলোও অন্যতম ফযীলত যে, দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়, রোগ মুক্তি লাভ হয়, ভয়-ভীতি বিদূরিত হয়, অত্যাচার ও যুলুম থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়, শত্রুর ওপর বিজয় সূচিত হয়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, অন্তরে তাঁর মুহাব্বত সৃষ্টি হয়, ফেরেশতাগণ দরুদ পাঠকের জন্য দু'আ করেন, দরূদ শরীফের বরকতে আমল ও মাল পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়, অন্তর স্বচ্ছ হয়, জীবন যাত্রা সুখের হয়, আর্থিক উন্নতি অর্জিত হয়, সব কিছুর ওপর বরকত নাযিল হয়, এমনকি সন্তান-সন্ততিদের পরবর্তী চার স্তর পর্যন্ত এ বরকত নাযিল হতে থাকে।

দরীদ শরীফ পাঠের এগুলোও ফযীলত যে, কিয়ামতের ভয়ংকর সংকট থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়, মৃত্যুর মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘব হয়, দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কোন কিছু ভুলে গেলে তা স্মরণ হয়, অভাব-অনটন দূরিভূত হয়, কৃপণতা, যুলুম এবং বদদোয়ার পরিণতি থেকে মুক্তি লাভ হয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না, সে কৃপণ সে যেন আমার ওপর যুলুম করল। তার নাক ভূলুণ্ঠিত হওয়ার জন্য বদ-দু'আ করা হয়।

দরূদ শরীফ পাঠের অন্যতম ফযীলত এই যে, যে মজলিশে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, সে মজলিশ পবিত্র হয়। সে মজলিশে উপবেশনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমতের ফিরেশতাগণ ঘিরে রাখে।

দরূদ শরীফ পাঠের আরো একটি ফযীলত এই যে, পুলসিরাত অতিক্রমের সময় তাঁদের চতুর্দিকে নূর উদ্ভাসিত হয়, যার বদৌলতে তাঁরা চোখের

পলকের মধ্যে পুলসিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যারা দরূদ শরীফ পাঠ করেনা, তাদের এ সৌভাগ্য লাভ হয় না। দরূদ শরীফ পাঠের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত এই যে, যে ব্যক্তি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাঁর নাম হুযূর আকরম ﷺ-এর পবিত্র দরবারে স্মরণ করা হয়।

لَكَ الْبِشَارَةُ، فَاخْلَعْ مَا عَلَيْكَ لَقَدْ * ذُكِرْتَ، ثُمَّ عَلَىٰ مَا فِيْكَ مِنْ عَوَجِ

'তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি তোমার সমস্ত দুঃখ-যাতনার বোঝা, যা তোমাকে গ্রাস করে রেখেছে, নামিয়ে ফেলো। কেননা তোমার পাপ-পঙ্কিলতা সত্ত্বেও সে মহান দরবারে তোমার নাম স্মরণ করা হয়েছে।'

جان میدہم در آرزوی قاصد آخر باز گو

در مجلس آن نازنین حرفے کہ از مامی رود

'আমি আশাবাদী হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করছি। ওহে দূত! সে প্রিয়তমের মহান দরবারে আমার সম্পর্কে যা কিছু উচ্চারিত হয়েছে, তুমি সে কথাটি পুনরায় উল্লেখ কর।'

দরূদ শরীফ পাঠের এটাও বিশেষ ফযীলত যে, দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে অন্তরে হুযূর আকরম ﷺ-এর মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়, তাঁর সচ্চরিত্র ও সৎ গুণাবলি অর্জিত হয়, চোখের মধ্যে তাঁর ধ্যান-ধারণা উদ্ভাসিত হয়, সর্বোপরি মানসপটে সদা হাজির থাকার সৌভাগ্য নসীব হয়।

لَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِيْ تَرَى فِيْ وَسْطِهِ * ذِكْرُكَ فِيْ سَطْرٍ وَالتَّوْحِيْدُ فِيْ سَطْرٍ

'যদি আমার বক্ষ বিদারণ করা হয়, তবে আপনি আমার অন্তরের মাঝখানে এক সারিতে আপনার যিকর এবং অপর সারিতে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদকে দেখতে পাবেন।'

দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলতসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, দরূদ শরীফ প্রেরণকারীকে হযরত ﷺ ভালোবাসেন। কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর হাত ধরে মুসাফাহ করবেন, স্বপ্নে দিদার (দর্শন) লাভ হয়।

দরূদ শরীফ পাঠের আরও একটি ফযীলত এই যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে ভালোবাসেন এবং তাঁকে মারহাবা ও ধন্যবাদ জানান। ফেরেশতাগণ দরূদ শরীফকে সোনার কলমের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রুপোর পাত্রে রাখেন আর তাঁর জন্য তাঁরা দু'আ এবং ইস্তিগফার করেন। পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ফেরেশতাগণ দরূদ শরীফ প্রেরকের নাম এবং তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে হুযূর আকরম ﷺ-

এর মহান দরবারে এভাবে দরূদ শরীফ পেশ করেন। যেমন তাঁরা বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল হক ইবনে সাইফুল্লাহ আপনার ওপর সালাম পেশ করেছেন।

দরূদ শরীফ পাঠের আরেকটি মহৎ ফায়দা এই যে, স্বয়ং রাসূলে খোদা ﷺ তাঁর এই সালামের উত্তর দেন। এটা তাঁর চিরাচরিত স্বভাব সুলভ নীতি। একজন নগণ্য গোলামের জন্য এর চাইতে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, বিশ্বজাহানের সরদার, রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ তাঁর মঙ্গল কামনা করে দু'আ করবেন।

যদি সারা জীবনেও এমন সৌভাগ্য একবারও অর্জিত হয়, তবে কতই না সৌভাগ্য এবং বুযুর্গীর কথা!

بہر سلام مکن رنجہ در جواب آن لب

کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از تو

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেকবার আমার সালামের উত্তর দেয়ার জন্য আপনি আপনার ওষ্ঠদ্বয়কে নাড়াচড়া করবেন না। কেননা আমার হাজার সালামের উত্তরে আপনার একটি উত্তরই যথেষ্ট।'

উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফ প্রেরণকারীর নিমিত্ত এ সৌভাগ্য অর্জিত হওয়া সুনিশ্চিত। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই কেননা হযরত ﷺ যে হায়াতুন্নবী (জীবিত), একথা প্রমাণিত হয়েছে। আবার তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ নীতি অনুযায়ী যে সালামের উত্তর দেবেন এটাই স্বতঃসিদ্ধ, যা সুন্নাত বা ফরয বলে বর্ণিত আছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে,

كَانَ يُبَادِرُ بِالسَّلَامِ.

'হুযূর আকরম ﷺ-এর সালাম দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী থাকতেন।'

এ হাদীসের দ্বারা এ রহস্যটিও উদঘাটিত হয় যে, রওযায়ে পাকের যিয়ারতকারী তাঁর সালাম পেশ করার পূর্বে একবার এবং পরেও একবার হযরত ﷺ-এর সালাম লাভে ধন্য হন।

দরূদ শরীফের ফযীলতসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, ফেরেশতাগণ তিনদিন যাবত দরূদ প্রেরণকারীর গুনাহ লিপিবদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। এ ছাড়া তাঁরা লোকজনকে তাঁর গীবত (পরনিন্দা) করা থেকেও বারণ রাখেন। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনগুলোতে দরূদ শরীফ প্রেরণকারী আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন। তাঁর নেকীর পাল্লা ভারী হবে। তিনি এ দিন তৃষ্ণাতুর হবেন না এবং জান্নাতের মধ্যে তিনি অনেকগুলো হুর লাভ করবেন।

উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যিকর এবং শোকরও বিদ্যমান এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের হক পরিচিতও লাভ হয়। কেননা দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব ﷺ-এর প্রশংসার সাথে সাথে রিসালাতের হক আদায়ে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে তাঁর নিকটে প্রার্থনা এবং ফরিয়াদ করেন আর এতে কোনরূপ সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা এবং ফরিয়াদ করেন, তিনি তাঁকে ভালোবাসেন। বান্দা যখন নিজের রিপুশক্তি তাড়িত ইচ্ছা ও অভিলাষকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত কাজে লাগায়, তখন এতে যে তিনি সওয়াবও লাভ করবেন এবং এর মাধ্যমে যে তাঁর উদ্দেশ্যাবলিও পূরণ হবে এবং মুশকিল আহসান হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফের মধ্যে যে, আল্লাহ তা'আলার যিক্রিরও বিদ্যমান, ইহা সুস্পষ্ট। কেননা অধিকাংশ দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মুবারক নাম (আল্লাহুম্মা) শব্দটি বিদ্যমান। যা আল্লাহ তা'আলা জাত (সত্তা) এবং সিফাত (গুণাবলি)-এর আয়না স্বরূপ।

হযরত হাসান বসরী رحمة الله عليه এবং অপরাপর বুযুর্গানে দীন থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহুম্মা শব্দ দ্বারা স্মরণ করেন, তিনি যেন তাঁর সমুদয় আসমায়ে হুসনা সহকারে তাঁকে স্মরণ করলেন।

অতএব সত্যিকার মুমিন এবং খাঁটি আশেকের উচিত, তিনি যেন দরূদ শরীফের এ মহান ইবাদতকে বৃদ্ধি করেন এবং এতে যেন কোনরূপ সংকীর্ণতাকে স্থান না দেন। আর যে পরিমাণ সহজে সম্ভব, সে পরিমাণ দরূদ শরীফের ওয়াযিফা যেন দৈনন্দিন আদায় করেন। কেননা বর্ণিত আছে যে,

«خَيْرُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ».

'উৎকৃষ্ট আমল সেটিই যা সর্বদা করা যায়।'[১]

আরও বর্ণিত আছে যে,

«قَلِيلٌ دَائِمٌ خَيْرٌ مِّنْ كَثِيرٍ مُّنْقَطِعٍ».

'যে স্বল্প আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, তা সেই অধিক আমল থেকে ভালো, যা ছিন্ন হয়ে যায়।'

দরূদ শরীফের পরিমাণ দৈনন্দিন এক হাজার থেকে কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি সম্ভব না হয়, তবে পাঁচশ, তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ন্যূনপক্ষে একশ নিশ্চয় পড়ে নেবে। কেউ কেউ তিনশ, আবার কেউ কেউ সকাল-বিকাল

[১] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৪১৭, হাদীস: ৪২৪০; হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

অর্থাৎ ফযরের পর দু'শ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম বলে বলে বর্ণনা করেছেন। তবে নিদ্রার সময়ও কিছুসংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

যে ব্যক্তি অধিক সংখ্যক দরূদ পাঠের অভ্যাস করে, তাঁর জন্য তা সহজ হয়ে যায়। কোন কোন দরূদ শরীফ এমন আছে, যা সহজেই এক হাজার বার পাঠ করা যায়। যখন দরূদ শরীফ পাঠকারী দরূদ শরীফের পাঠের স্বাদ এবং আনন্দ উপভোগ করবে, তখন তাঁর রূহানী শক্তি অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। যেমন বর্ণিত আছে যে,

فَذِكْرُ الْحَبِيْبِ لِلْمَرِيْضِ طَبِيْبٌ.

'বন্ধুর স্মরণ রোগীর জন্য ডাক্তার।'

সেই ঈমানদার ব্যক্তির ওপর বড়ই অবাক হতে হয়, যে দিন-রাতের মধ্যে একটি ঘন্টাও এই ইবাদতের (দরূদ শরীফের) নিমিত্ত ব্যয় করে না। যা সমুদয় নূর ও বরকতের উৎস আর সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের চাবিকাঠি।

অথচ বর্ণিত আছে যে, একজন লোক যখন পয়গম্বরে খোদা ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, আমি আমার সমস্ত দু'আই আপনার জন্য করবো। তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তখন তো এটি তোমার দুঃখ লাঘবের জন্য যথেষ্ট হবে।' হযরত আলী মরতুযা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

«لَوْ لَا أَجِدُ مَا فِيْ ذِكْرِ اللهِ لَجَعَلْتُ الصَّلَاةَ النَّبَوِيَّةَ عِبَادَتِيْ كُلَّهَا».

'যদি আমি আল্লাহ তা'আলার যিকরের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তা উপভোগ না করতাম, তবে আমি নবী করীম ﷺ-এর দরূদ শরীফ পাঠকেই আমার সম্পূর্ণ ইবাদতে পরিণত করতাম।'

উক্ত রিওয়ায়ত দুটো বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করার দলিলের জন্য যথেষ্ট। তরীকতপন্থি ভাইগণ যদি এ পথে আসেন, তবে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কোন কোন মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, যদি তরীকতের কামিল পীর না পাওয়া যায় তবে যদি রীতিমত দরূদ শরীফ পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইনশাআল্লাহ তিনি সহজেই তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সক্ষম হবেন। তিনি তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবেন এবং এই দরূদ শরীফ পাঠের বদৌলতে হুযূর আকরম ﷺ-এর সুদৃষ্টি তার ওপর পতিত হবে, আর তাঁর নৈকট্য লাভ হবে।

কোন কোন মশায়িখে কিরাম অধিক সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করার সাথে সাথে কুলহুয়াল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করারও ওসিয়ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, কুলহুওয়াল্লাহ শরীফের দ্বারা আমরা খোদাওন্দ করীমকে চিনতে ও জানতে পেরেছি। আর হযরত নবী করীম ﷺ-এর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য

অধিক দরূদ পাঠ করি। তাঁরা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত নবী করীম ﷺ-এর ওপর অধিক সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তিনি স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হবেন। যেমন– শায়খে কামিল ইমাম আলী দামশকী *আল-হাকামুল কবীর* নামক কিতাবে হযরত শায়খ আহদ ইবনে মূসা (যিনি শরীয়তপন্থি বিখ্যাত সূফী সাধক ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাযিলিয়া তরীকার পরবর্তী যুগের কোন কোন মাশায়িখ বর্ণনা করেছেন যে, যদি কামিল মুরশিদ পাওয়া না যায়, যিনি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে সক্ষম, তবে আল্লাহ তা'আলার মারফত লাভের এবং তাঁর নৈকট্য হাসিলের উপায় এই যে, তিনি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকির করবেন, হযরত রাসূল মকবুল ﷺ-এর ওপর অধিক সংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠের বদৌলতে অন্তরে এমন এক নূর সৃষ্টি হবে, যা তাঁকে পথ প্রদর্শন করবে। মাঝখানের কোন মাধ্যম ছাড়াই হুযূর আকরম ﷺ থেকে তাঁর নিকট ফয়েয পৌঁছে যাবে।

উল্লেখ্য যে, তরীকায়ে শাযলিয়া, তরীকায়ে আলিয়া কাদেরীয়ারই একটি শাখা। এ তরীকার সার সংক্ষেপ হল এই যে, এ তরীকতপন্থিগণ হযরত রাসূল মকবুল ﷺ-এর অনুকরণ, অনুসরণ এবং একনিষ্ঠতার সাথে তাঁকে অন্তরে হাযির রেখে কোন মাধ্যম ব্যতীত তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করেন।

'চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাও। সাহায্য এবং তাওফীক আল্লাহরই তরফ থেকে।'

অনুচ্ছেদ–২

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সাখাওয়ী এবং কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে সাআদ ইবনে মতলব নামক একজন বুর্যুগ শয়নের পূর্বে সর্বদা এক নির্দিষ্টসংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। এক রাতে তিনি হযরত নবী করীম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাঁর গৃহে তশরীফ এনেছেন এবং স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যে তাঁর গৃহকে আলোকিত করেছেন। তিনি তাকে ইরশাদ করেন, 'যে মুখের দ্বারা তুমি দরূদ শরীফ পাঠ কর, সে মুখখানাকে আমার সন্নিকটে নিয়ে এসো, যাতে আমি সেখানে চুমো দিতে পারি।' তাঁর এ বাণী শ্রবণে আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমি কিভাবে আমার নালায়েক মুখ তাঁর মুখের কাছে নিয়ে যাই। অতএব আমি আমার চেহারাকে তাঁর মুখের নিকটবর্তী করে দিই। তিনি আমাকে চুমো দেন। যখন আমি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হই, তখন আমি আমার গৃহকে মিশক-আম্বরের খুশবোতে পরিপূর্ণ অনুভব করতে পারি। আট দিন যাবত আমার চেহারা এবং গৃহের মধ্যে উক্ত সুগন্ধি বিদ্যমান ছিল।[১]

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৪১

দরূদ শরীফ পাঠ করার ফলে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আপদে-বিপদে আপনাকে সাহায্য করি। *মিসবাহুয যাল্লাম* নামক কিতাবেও হযরত শিবলী এবং তাঁর প্রতিবেশীর এ ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে।[১]

উল্লিখিত কিতাবে হযরত কাআবে আহবার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট অহী প্রেরণ করেন যে, পৃথিবীতে যদি আমার প্রশংসাকারী না থাকে, তবে আমি পৃথিবীতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষণ করতাম না, একটি দানা পর্যন্ত উৎপন্ন করতাম না। এভাবে অনেক কিছু বলার পর ইরশাদ করলেন, 'হে মূসা! তুমি কি একথা বাসনা কর যে তোমার কথা তোমার মুখের, তোমার হৃদয়ের জল্পনা-কল্পনা তোমার হৃদয়ের, তোমার রূহ তোমার শরীরের, তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের যতদূর নিকটবর্তী এর চেয়েও আমি তোমার অধিকতর নিকটবর্তী হই'? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন, হ্যাঁ, ইয়া আল্লাহ! আমি এর বাসনা রাখি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, 'তবে তুমি খুব বেশি বেশিভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ কর। তাহলে তোমার এ সম্পর্ক অর্জিত হবে।'[২]

অপর একটি রিওয়ায়তে আল্লাহ তাঁকে বলেছেন, 'হে মূসা! তুমি কি কিয়ামতের তৃষ্ণা থেকে রেহাই পেতে চাও'? তিনি আরজ করলেন, হ্যাঁ, ইয়া আল্লাহ! আমি অনুরূপ কামনা করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, 'তবে তুমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অধিকসংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠ কর। হাফিয আবু নু'আইম তাঁর *হিলয়া* নামক কিতাবে এ রিওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন।[৩]

উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী মুরতজা রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, পয়গম্বর ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠের ফলে গুনাহ এমনিভাবে মুছে যায়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। গোলাম আযাদ করা থেকে হযরত ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করা উত্তম। আর আল্লাহর পথে তরবারি উত্তোলন করা থেকে তাঁর ভালোবাসা উত্তম। আবুল কাসিম আল-আস্পাহানী এ রিওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, পয়গম্বরে খোদা ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যদি পরস্পর সাক্ষাতের সময় দু'জন

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১২৭; (খ) ইবনুন নু'মান, *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-পায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম*, পৃ. ২৩৩

[২] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৩৭; (খ) আবু নু'আইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৬, পৃ. ৩২

[৩] আবু নু'আইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৪, পৃ. ৪৫

[৪] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১২৬

বিশ্বস্ত সনদ সহকারে শায়খ আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে রাদ্দাদ সূফী ও মুহাদ্দিস স্বীয় কিতাবে শায়খ মজদুদ্দীন ফিরূযাবাদী থেকে রিওয়ায়ত করেন যে, আকনসী বলেন, একদিন হযরত শিবলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু বকর মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গমন করেন। আবু বকর মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করেন আর তাঁরা উভয় চোখের মাঝখানে চুমো দেন। আমি আরজ করলাম, হে আমার সরদার! আপনি হযরত শিবলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এমন ব্যবহার কেন করলেন? অথচ আপনি এবং বাগদাদের সমস্ত লোক তাঁকে পাগল মনে করেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি নিজ তরফ থেকে এ কাজ করিনি, বরং হযরত নবী করীম ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেই করেছি। একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত শিবলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূর আকরম ﷺ-এর পাক দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর আগমনে তিনি দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করেছেন, আর তাঁর উভয় চোখের মাঝখানে চুমো দিয়েছেন। আমি হুযূর আকরম ﷺ-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শিবলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এরূপ সদয় ব্যবহার কেন করলেন? ইরশাদ করলেন, কেননা তিনি নামাযের পর কুরআনে পাকের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ [التوبة]

এ আয়াতটি তিলাওয়াতের পর তিনি আমার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করেন।[১]

উক্ত কিতাবে হযরত শিবলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমার একজন প্রতিবেশী মারা যায়। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা করেন, আমার ওপর তো বড়ই মুসিবত এসেছিল। বিশেষ করে মুনকার-নকীরের সওয়ালের সময়। আমার তো মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন দীনে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করিনি। এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ হলো, তুই যে তোর মুখকে বেকার রেখেছিলে, এ যে তারই শাস্তি। যখন আযাবের ফেরেশতাগণ আমার দিকে এগিয়ে আসে। তখন আমি দেখতে পাই যে, খোশবুত মুখরিত একজন সুন্দর পুরুষ আমার এবং ফেরেশতাদের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন। তিনি আমাকে ঈমানের দলীল বাতলিয়ে দেন। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুক, আপনি কে? তিনি বললেন, 'আমি সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা আপনার অধিকসংখ্যক

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৭৭

মুসলমান একে অপরের হাত ধরে মুসাফাহ করেন এবং রাসূলে খোদা ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করেন, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয়ের আগের পরের গুনাহ মার্জনা করে দেওয়া হয়।' হাফিয ইবনে আলী বিশকওয়াল এ রিওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ﷺ ইরশাদ করলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম নির্দেশিত হজ্জ করার পর একটি ইসলামী জিহাদ করে, তবে তা চারশ হজ্জের বরাবর হবে।' তাঁর এ বাণী শ্রবণের পর যাদের হজ্জ করা এবং জিহাদ করার সামর্থ ছিল না তাঁদের অন্তর ভেঙে পরে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর নিকট অহী প্রেরণ করেন, 'যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ পাঠ করবে, তিনি চারশ জিহাদের সওয়াব পাবেন। আর প্রত্যেক জিহাদ চারশ হজ্জের বরাবর হবে।' আবু হাফস ইবনে আবদুল মজীদ আল-মাইয়ানিশী رحمه الله *আল-মজালিসুল মক্কীয়া* নামক কিতাবে রিওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন।[২]

উক্ত কিতাবে শায়খ মজদুদ্দীন থেকে আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খাইয়াম সমরকন্দী رحمه الله-এর কাহিনীর পাশাপাশি হযরত খিযির عليه السلام এবং হযরত ইলিয়াস عليه السلام সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনার অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বললেন, একদিন আমি পথ হারিয়ে গেলে, হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পাই, তিনি আমাকে বললেন, এসো! আমি তার সাথে চললাম। আমার মনে হচ্ছিল যে, সম্ভবত তিনি হযরত খিযির عليه السلام হবেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, খিযির ইবনে আনশা আবুল আব্বাস। আমি তার সাথে আরও একজন লোককে দেখতে পাই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নাম কি? তিনি বললেন, ইলিয়াস ইবনে শাম। এরপর তারা উভয়কে সম্বোধন করে আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ওপর রহমত নাযিল করুক। আপনি কি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-কে দেখেছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। আমি বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা তার পবিত্র জবান থেকে যা শুনেছেন তা আমাকে বলুন, যাতে আমি আপনাদের থেকে রিওয়ায়ত করতে পারি। তাঁরা বললেন, আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ পাঠ করবে, তাঁর অন্তর মুনাফিকী থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেমন পানি দ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার করা হয়।

উক্ত সনদে আরও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী*', পৃ. ২৪০
[২] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী*', পৃ. ১৩২

'যে ব্যক্তি صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ বলবে, তাঁর মুখের ওপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।'

উক্ত সনদে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোন মজলিসে বসে বল, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ। তবে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে নিয়োগ করবেন, যিনি তোমাকে গীবত (পরনিন্দা) করা থেকে বিরত রাখেন। আর যদি তুমি মজলিস থেকে ওঠে যাওয়ার সময় বল, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ। তবে আল্লাহ তা'আলা জনগণকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবেন।

উল্লিখিত সনদে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত খিযির عليه السلام এবং হযরত ইলিয়াস عليه السلام বলেছেন যে, এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে হযরত রাসূলে মকবুল ﷺ-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বাজান আপনার মুলাকাতের জন্য খুবই উদগ্রীব, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ এবং অন্ধ। আপনার দরবারে উপস্থিতির শক্তি নেই। তিনি ইরশাদ করলেন, 'তোমার আব্বাকে বল, তিনি যদি সাত রাতে বলে, صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ। তবে তিনি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করবেন এবং তিনি আমার থেকে হাদীস রিওয়ায়ত করবেন।'[১]

উক্ত কিতাবে হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার অপরাপর পয়গম্বর عليهم السلام-এর ওপরও দরূদ শরীফ প্রেরণ কর। তাঁদেরকেও রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন।' ইমাম বায়হাকী رحمه الله *শুআবুল ঈমান* ও *দাওয়াতুল কবীর* নামক হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন।[২]

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَسَلِّمُوْا عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ».

'যদি তোমরা আমার ওপর সালাম প্রেরণ কর, তবে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম عليهم السلام-এর ওপরও সালাম প্রেরণ করবে।'

ইবনে আবু আসিম হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন।[৩]

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী*', পৃ. ১৩৭-১৩৮
[২] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী*', পৃ. ৬১; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ১, পৃ. ২৭৭-২৭৮, হাদীস: ১৩০; (গ) আল-বায়হাকী, *আদ-দা'ওয়াতুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ২৬৩, হাদীস: ১৮০
[৩] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী*', পৃ. ৬১; (খ) ইবনে আবু আসিম, *কিতাবুস সালাত আলান্নাবী* ﷺ, পৃ. ৫৪, হাদীস: ৭০

হযরত কাবে আহবার ﵁ থেকে বর্ণিত আছে একদিন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা ﵂-এর খিদমতে উপস্থিত হন। মজলিসের মধ্যে হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে হযরত কাব ﵁ বলেন, এমন কোন দিন নেই, যাতে সূর্য উদিত হয়, কিন্তু সে দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে হযরত ﷺ-এর কবর শরীফকে ঘিরে রাখে। তাঁরা আপন পাখা কুড়িয়ে নিয়ে হুযূর পাক ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করেন। যখন সন্ধ্যা হয়, তাঁরা চলে যান এবং তাদের স্থলে আবার সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। সকাল বেলার ফেরেশতারা যা করেছিলেন, সন্ধ্যা বেলায় ফেরেশতারাও তাই করেন। এ ব্যবস্থা সে দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যেদিন হুযূর পাক ﷺ কবর শরীফ থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেদিনও তাঁর চতুষ্পার্শে হাজার হাজার ফেরেশতা তাঁকে ঘিরে থাকবেন। মুহাদ্দিস দারিমী হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন।[১]

হযরত হুযাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন,

«اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تُدْرِكُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ».

'হযরত নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ পাঠককে, তাঁর সন্তানকে এবং সন্তানের সন্তানকে উপকৃত করে।'[২]

ইবনে বিশকওয়াল হাদীসটিকে সেসব হাদীসের নিচে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোকে তিনি কিতাবুর রিদ্দাদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী ﵀ বলেন, আমি নয়শ সাতানব্বই হিজরীর দশম জমাদিউল আওয়াল শনিবার দিন মদীনা শরীফে আসল কিতাব থেকে এটি লিপিবদ্ধ করেছি। আর এ কিতাব অর্থাৎ *জযবুল কুলুব* লেখা আরম্ভের তারিখও তাই।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, হজ্জের সময় লোকেরা এক ব্যক্তিকে দেখতে পায় যে, তিনি তওয়াফ, সায়ী এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ আদায়ের সময় দু'আ মাসূরাসমূহ

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৬০; (খ) আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৮, হাদীস: ৯৫:

عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُطْلَعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا، عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ، فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ، خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزِفُّونَهُ.

[২] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৩৬; (খ) আবু বকর আশ-শাফিয়ী, *আল-ফাওয়ায়িদ*, পৃ. ৫১৯, হাদীস: ৬৪০

বাদ দিয়ে সে স্থানে কেবল দরূদ শরীফই পাঠ করছেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি দু'আ মাসূরা না পড়ে কেবল দরূদ শরীফ পড়ছ কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি শপথ গ্রহণ করেছি যে, আমি দরূদ শরীফের সাথে অপর কোন দু'আকে শরীক করব না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যখন আমার পিতার ইন্তিকাল হয়, আমি তাঁর চেহারা দেখতে যাই। আমি দেখতে পাই যে, তাঁর চেহারা বদলে গাধার চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছে। এ অবস্থা অবলোকন করে আমি বড়ই দুঃখিত এ অবস্থায় যখন আমি নিদ্রাভিভূত হই, তখন আমি স্বপ্নে হযরত ﷺ-কে দেখতে পাই তিনি তশরীফ এনেছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাপড়ের আঁচল জড়িয়ে ধরে আমার পিতার জন্য সুপারিশ করার দরখাস্ত আর তার চেহারা পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার পিতা সুদ খেত। আর যেসব লোক সুদ খায়, তাদের অবস্থা দুনিয়া এবং আখিরাতে এমনই হয়। কিন্তু তোমার পিতা শয়নের পূর্বে একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করত। যার ফলে আমি তার জন্য সুপারিশ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমার সুপারিশ কবুল করেছেন। এরপর যখন আমি জাগ্রত হই, তখন আমি দেখতে পাই যে, আমার পিতার চেহারা চৌদ্দ তারিখের রাতের চন্দ্রলোকের মতো ঝিলমিল করছে। তার দাফনের সময়ও আমি গায়িবী আওয়াজ শুনতে পাই দরূদ শরীফ পাঠের ফলেই তোমার বাপের ওপর আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়েছে এবং তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, কোন একজন লোক হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারী একজন ছাত্রকে স্বপ্নে দেখেন। ছাত্রটি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং হাদীসের শ্রোতাবৃন্দকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরূদ শরীফ পাঠের ফলে যা এ শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীদের জন্য অপরিহার্য, মার্জনা করে দিয়েছে।

শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতী ﵀ তাঁর বিখ্যাত *জমউল জওয়ামি* নামক কিতাবের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আসাকের তাঁর ইতিহাসের মধ্যে হাফস ইবনে আবদুল্লাহ ﵀ থেকে রিওয়ায়ত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যুবআ ﵀ কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আসমানের মধ্যে ফেরেশতাদের ইমামতি করছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এত উচ্চ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন? তিনি উত্তর দিলেন আমি স্বহস্তে হাজার হাজার হাদীস লিখেছি এবং হাদীস লেখার সময় আমি عَنِ النَّبِيِّ ﷺ লিপিবদ্ধ করতাম, আর হযরত ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

'যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা

তাঁর ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন।[১]

আরও বর্ণিত আছে যে, একজন নেককার ব্যক্তির তিন হাজার দিনার কর্জ হয়। মহাজন লোকটির বিরুদ্ধে কাযীর দরবারে নালিশ দায়ের করে। কাযী তাঁকে কর্জ আদায়ের জন্য এক মাসের সময় দেন। লোকটি কাযীর দরবার থেকে ফিরে এসে মসজিদের মিহরাবের নিকট গিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয় এবং রাসূলে করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠে নিমগ্ন হয়ে যান। সাতাশ দিনের রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একজন লোক তাকে বলছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার কর্জ আদায় করে দেবেন। তুমি আলী ইবনে ঈসা উযিরের নিকট যাও এবং তাঁকে বল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনি আমার তিন হাজার দিনার কর্জ পরিশোধ করে দিন। লোকটি বলেন, যখন আমি জাগ্রত হই, তখন আমার মন প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু যদি উযির মহোদয় জিজ্ঞেস করেন তোমার একথার সত্যতার প্রমাণ কি? তবে আমি তাকে কি বলবো? একথা ভেবে আমি তার কাছে গেলাম না। পরবর্তী রাতে আমি পুনরায় হুযূর আকরম ﷺ-কে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি উযিরের কাছে যাওনি কেন? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ আশঙ্কায় উযিরের কাছে যায়নি যে, যদি তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, একথায় যে তুমি সত্যবাদী তার প্রমাণ কি? তবে আমি কি বলবো? হুযূর আকরম ﷺ আমার মনোভব পছন্দ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, যদি আলী ইবনে ঈসা এ ব্যাপারে তোমার সত্যবাদিতার কোন প্রমাণ তলব করে, তবে তুমি তাঁকে বল যে, একথার সত্যতার প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তুমি ফজরের নামাযের পর লোকজনের কথা-বার্তায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে পাঁচ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করে আমার দরবারে পেশ করে থাকেন আর তোমার এই আমলের কথা আল্লাহ তা'আলা এবং কিরামন-কাতিবীন ব্যতীত আর কেউ অবগত নয়। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি সোজা উযিরের নিকট গমন করি এবং স্বপ্নের ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত সত্যতার প্রমাণ তাঁর কাছে পেশ করি। উযির মহোদয় আমার একথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং বলেন, مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللهِ حَقًّا (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যবাদীতার ওপর ধন্যবাদ)।

দ্বিতীয় রাতে আমি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখি। এবারও তিনি উহাই ইরশাদ করলেন যা প্রথম রজনীতে ইরশাদ করেছিলেন। আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে জাগ্রত হই। কিন্তু উল্লিখিত কারণে উযিরের নিকট গমন করা থেকে বিরত থাকি। এরপর তিনি আমাকে তিন হাজার দিনার দান করে বলেন, যাও

[১] (ক) আস-সুয়ূতী, *জামউল জাওয়ামি'*, পৃ. ৮; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিস্ক*, খ. ৩৮, পৃ. ৩৮-৩৯

তোমার কর্জ পরিশোধ কর। এ ছাড়া তিনি আমাকে আরও তিন হাজার দিনার প্রদান করে বললেন, এগুলো দ্বারা তুমি তোমার পরিবারবর্গের খরচ নির্বাহ কর। পরে তিনি আমাকে আরও তিন হাজার দিনার অর্পন করে বললেন, এগুলো নিয়ে তুমি ব্যবসা আরম্ভ করো। এরপর তিনি আমাকে শপথ করান এবং বললেন, তুমি ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করো না। যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দেবে, সোজা আমার নিকট চলে আসবে। আমি তোমার প্রয়োজন সেরে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্ট করবো। এরপর আমি তিন হাজার দিনার নিয়ে কাযী সাহেবের দরবারে উপস্থিত হই, যাতে আমি কর্জ আদায় করে দিই, এ সময় আমি দেখতে পাই যে, আমার মহাজন হাঁফিয়ে-লাফিয়ে কাযীর দরবারে আসছেন। আমি দিনারসমূহ গণনা করে তাঁদের সম্মুখে পেশ করলাম এবং সম্পূর্ণ ঘটনা খোলাখুলিভাবে তাঁদের অবহিত করলাম। ঘটনা শ্রবণ করে কাযী সাহেব বললেন, আমি নিজেই তোমার কর্জের জিম্মাদার। আমি নিজেই তা পরিশোধ করে দিয়েছি। আমি এই সৌভাগ্য অর্জন করব না কেন? মহাজন সাহেব বললেন, এ সৌভাগ্য অর্জনের আমিই অধিকতর হকদার। আমি তাকে এ কর্জ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আমি তার কর্জ মাফ করে দিলাম। কাযী সাহেব বললেন, আমি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির নিমিত্ত যা কিছু বের করে নিয়ে এসেছি, পুনরায় তা ফেরত নেব না। আমি সেগুলো তোমাকেই দিয়ে দিলাম। উল্লিখিত নেককার লোকটি বলেন, আমি সমুদয় মাল সাথে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করি।

অনুচ্ছেদ-৩: জুমাবার দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলতের বর্ণনা

এমনি তো সব সময় এবং সর্বস্থাতেই পয়গম্বর ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব এবং ফযীলত লাভ হয়। কিন্তু জুমাবারের দিন-রাতে দরূদ পাঠ অতিউত্তম। কেননা জুমাবার দিন-রাতের ফযীলত সম্পর্কে এবং দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস এবং রিওয়ায়ত বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে যে, জুমাবারের রাত শবে কদর থেকে উত্তম। কেননা যে মহান সত্তা সমুদয় কল্যাণের উৎস এবং সমস্ত বরকতের আধার তাঁর বীর্য উক্ত রাতেই বিবি আমিনার গর্ভে সেসব বৈশিষ্ট্য সহকারে স্থির হয় যা এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ، فَادْعُوْلَكُمْ وَاسْتَغْفِرْ».

'তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন জুমাবার। কেননা ওই দিন হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে পয়দা করা হয়েছে। ওই দিন তাঁর ওফাত হয়, ওই দিন শিঙগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং ওই দিন মানুষ অজ্ঞান হবে অতএব তোমরা উক্ত দিবসে অধিকসংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। অতঃপর আমি তোমাদের জন্য দু'আ করি এবং তোমাদের গুনাহ মার্জনার দরখাস্ত করি।'

ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন এবং ইমাম নববী হাদীসটি শুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

«يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ».

'এই দিন এমন একটি দিন, যাতে ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে উপস্থিত হন।'

তাঁরা আমার ওপর দরূদ শরীফ পাঠকদের দরূদ শ্রবণ করে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন।[২]

অপর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, 'তোমরা জুমাবার আমার ওপর দরূদ প্রেরণ কর, তা আরশে আযীমের নিচে পৌঁছে না, বরং যে ফেরেশতার নিকটেই পৌঁছে তিনি অপরাপর ফেরেশতাদেরকে বলেন,

«صَلُّوْا عَلَىٰ قَائِلِهَا».

'তোমরা এ দরূদ পাঠকারীদের জন্য ইস্তিগফার কর।'[৩]

অপর একটি রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে,

«أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ، وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فِي اللَّيْلَةِ الْأَزْهَرِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ».

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৭৫, হাদীস: ১০৪৭; হযরত আওস ইবনে আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[২] ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৫২৪, হাদীস: ১৬৩৭:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُوْدٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْهَا».

[৩] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৮, পৃ. ৫৭০, হাদীস: ৪০৫০; হযরত আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

'তোমরা আমার ওপর অধিক সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ কর, অধিকতর উজ্জ্বল রজনীতে এবং উজ্জ্বল দিবসে।'[১]

কোন কোন আলিম বলেছেন যে, জুমাবারের রাতের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে, যে ব্যক্তি উক্ত রজনীতে দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করেন, সরদারে দু'জাহান, রহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ নিজেই তাঁর সালামের উত্তর প্রদান করেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، وَفِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّلَحْظَةٍ».

মাফাখিরুল ইসলাম নামক কিতাবে হাদীস বর্ণিত আছে যে,

«وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ جَاجَتِهِ سَبْعِيْنَ حَاجَةً مِّنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا، وَثَلَاثِيْنَ مِنْ أُمُوْرِ الْآخِرَةِ».

'যে ব্যক্তি জুমাবার রাতে আমার ওপর একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা একশটি হাযত পূরণ করে দেবেন। যার মধ্যে সত্তরটি দুনিয়া সম্পর্কীয় এবং ত্রিশটি আখিরাত সম্পর্কীয়।'[২]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন এ দরূদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বেহেশতের মধ্যে তাঁর স্থান প্রত্যক্ষ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না।'[৩]

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ».

'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মদীন ওয়া আলিহি আলফা আলফা মররতিন।'

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৬৫; (খ) আন-নুমায়রী, *আল-ই'লামু বি-কয়লিস সালাতি আলান্নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াস সালাম*, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১১৬

[২] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৬২; (খ) আন-নুমায়রী, *আল-ই'লামু বি-কয়লিস সালাতি আলান্নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াস সালাম*, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১৬০; (গ) আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ১, পৃ. ৪৯৯, হাদীস: ২৭৬; হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

[৩] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৭; (খ) ইবনে শাহীন, *আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল ওয়া সাওয়াবি যালিক*, পৃ. ১৪, হাদীস: ১৯; হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

ইমাম সখাওয়ী হাদীসে মরফু অর্থাৎ পয়গাম্বর ﷺ পর্যন্ত সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন যে, 'যে ব্যক্তি সাত জুমুআ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন এ দরূদ শরীফটি সাত বার করে পাঠ করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ নিশ্চিত হবে।' দরূদ শরীফটি এই,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَآتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ، وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَأَجْزِهِ عَنَّا مِنْ أَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মদীন সলাতান তাকূনু লাকা রিযাউন, ওয়া লাহিকিহি আদাউন, ওয়া আতিহিল ওয়াসীলতা ওয়াল্ মাকামাল মাহমূদা আল্লাযী ওয়াআততাহূ, ওয়াআজ্যিহি মাহুওয়া আহলুহূ, ওয়া আজযিহি 'আন্না মিন্ আফযালি মা জাযায়তা নবীয়ান্ 'আন উম্মাতিহি, ওয়া সাল্লি 'আলা জমীয়ি ইখওয়ানিহি মিনান্ নবীয়ীনা ওয়াস সিদ্দীকীনা ওয়াশ শুহাদায়ি ওয়াস সলিহীনা, ইয়া আর্হামার রাহিমীন।'[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ ইয়াযীদ ইবনে ওয়াহবকে বলেছেন, তুমি জুমাবারে দরূদ শরীফ পাঠ করা থেকে বিরত থেকো না। বরং এ দরূদ শরীফটি এক হাজার বার করে পাঠ করবে:

«اللهم صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মদীন আন্নবীয়িল উম্মী।'[২]

উক্ত কিতাবের মধ্যে হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইব ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً».

'যে ব্যক্তি জুমাবারে আমার ওপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[১]

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৫৭
[২] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৭-১৯৮

দামিরী *শরহে মিনহাজ* নামক কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসান ﷺ-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি জুমাবারে হযরত ﷺ-এর ওপর এ দরূদ শরীফটি পাঠ করবে তাঁর আশি বৎসরে গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদীন 'আবদিকা ওয়া রাসূলিকান নবীয়িল উম্মীয়ি, ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম তসলীমা।'[২]

এর মধ্যে আরও বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি জুমাবারের আসরের নামায আদায়ের পর উক্ত স্থান থেকে সরে যাওয়ার পূর্বে উক্ত বৈঠকে পয়গম্বর ﷺ-এর ওপর ৮০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'[৩]

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালিদ ইবনে কসীর ﷺ-এর মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁর লেখা ছিল,

«بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ لِخَالِدِ بْنِ كَثِيْرٍ».

'খালিদ ইবনে কসীরের জন্য দোযখ থেকে মুক্তি।'[৪]

যখন তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি এমন কি আমল করতেন যে,তাঁর এত মর্যদা! তাঁরা বললেন, তিনি প্রত্যেক জুমাবারে রাসূলে করীম ﷺ-এর ওপর এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ-৪

যেভাবে জুমাবারের রজনীতে অধিকসংখ্যক দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তেমনি সোমবারের রজনীতেও অধিক সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত রয়েছে। কেননা সোমবারও একটি মর্যদাবান দিন। কারণ এ দিবসে বান্দার আমলসমূহ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মহান দরবারে পেশ করা হয়। এ

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৮; (খ) ইবনে শাহীন, *আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল ওয়া সাওয়াবি যালিক*, পৃ. ১৪, হাদীস: ২২; হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত
[২] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৬৭
[৩] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৮-১৯৯
[৪] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৯

কারণে হযরত নবী করীম ﷺ এ দিবসে প্রায়ই রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন, 'সেই দিবস বান্দার আমলসমূহ খোদাওন্দ করীমের দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি ভালোবাসি যে, আমার রোযা থাকার অবস্থাতেই আমার আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হোক।'

ইয়াহইয়াউল উলূম নামক বিখ্যাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি সোমবারের রাতে এভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে যে, প্রথম রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে ইখলাস এগার, দ্বিতীয় রাকআতে একুশবার, তৃতীয় রাকআতে ত্রিশবার, আর চতুর্থ রাকাতে চল্লিশবার পাঠ করবে। সালামের পর আবার পঁচাত্তর বার সূরায়ে ইখলাস পাঠ করে নিজের জন্য এবং নিজের পিতা-মাতার জন্য পঁচাত্তর বার ইস্তিগফার করবে। এরপর হযরত নবী করীম ﷺ-এর ওপর পঁচিশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে যে কোন মকসুদ নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করবে, আল্লাহ তা'আলার তার মকসুদ পূরণ করবেন।' (আল-হাদীস)[1]

বৃহস্পতিবারে দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত সম্পর্কেও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। *মাযাহিরুল ইসলাম* কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَّمْ يَفْتَقِرْ أَبَدًا».

'যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার একশ'বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কখনও গরীব এবং পর মুখাপেক্ষী হবে না।'

অনুচ্ছেদ–৫

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ভালো এবং বরকতের স্থানে হযরত ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ করা উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু আলিমগণ বিশেষ কতগুলো স্থান চিহ্নিত করে ওই সমুদয় স্থানে দরূদ শরীফ পাঠ করা অতিউত্তম মুস্তাহাব বর্ণনা করেছেন। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে যেগুলো আমার চোখে পড়েছে সেগুলোর কয়েকটি এই, ১. পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ অযু, গোসল ও তায়াম্মুম করার পর, ২. নামাযে আত-তাহিয়্যাতু পড়ার পর, ইমাম শাফিঈ (রহ.) এর মতে দুআ কুনূত পড়ার পরও, ৩. নামাযের পর, ৪. আযানের পর, ৫. ইকামতের পর, ৬. রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, ৭. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার পর, ৮. তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পর, ৯. মসজিদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময়, ১০. জুমাবারের রাতে এবং দিবসে বিশেষ করে জুমার নামাযের পর, ১১. বৃহস্পতিবারে, ১২. সোমবারে, ১৩. রবিবারে, ১৪. খুতবা দেয়ার সময়, ১৫. দিনের প্রথম ভাগে, ১৬. দিনের শেষের ভাগে, ১৭. শেষ রাতে, ১৮. খুতবার মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়ার পর, ১৯. শাফিঈ মযহাব মতে, দুই ঈদের তকবীর বলার সময়, ২০. জানাযার নামাযে, ২১. ইহরামের মধ্যে লাব্বাইকা... বলার পর, ২২. সাফা এবং মারওয়ার পাহাড়ের ওপর, ২৩. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলার পরে, ২৪. বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের সময়, ২৫. হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেওয়ার সময়, ২৬. তওয়াফের সময়, ২৭. মুলতাযিমের নিকটে, ২৮. মক্কাকে হজ্জ অর্থাৎ হজ্জের কার্যাবলি আদায়ের স্থানসমূহে, ২৯. নবী করীম ﷺ-এর কবর শরীফের নিকটে বা দূরে এবং বরকতের কেন্দ্রসমূহের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ, ৩০. নবী করীম ﷺ যেসব স্থানসমূহে স্বীয় পদধূলিতে ধন্য করেছেন সমুদয় স্থানসমূহে; যেমন- মসজিদে কুবা, মদীনা মুনাওয়ারা, মক্কা মুআযযমা, বদর, উহুদ পর্বত ইত্যাদি, ৩১. জিনিসপত্র ক্রয়ের সময়, ৩২. বিক্রয়ের সময়, ৩৩. অসিয়তনামা লেখার সময়, ৩৪. সফরের ইরাদা করার সময়, ৩৫. বাহনের ওপর সওয়ার হওয়ার সময়, ৩৬. কোন মনযিল বা স্টেশনে নামবার সময়, ৩৭. বাজারে যাওয়ার সময়, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) যখন বেচাকেনা ধুমের সময় লোকজনকে আল্লাহ তা'আলা থেকে বিমুখ দেখতেন, তখন তিনি সেখানে গমন করে আল্লাহ তা'আলার হামদ প্রশংসা এবং দরূদ শরীফ বাতলিয়ে দিতেন, ৩৮. দাওয়াতে যাওয়ার সময়, ৩৯. দাওয়াত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়, ৪০. ঘরে প্রবেশের সময়, ৪১. কোন প্রয়োজন দেখা দিলে, ৪২. গরীব হওয়ার আশংকা দেখা দিলে, ৪৩. ভয়-ভীতির সময়, ৪৪. গোলাম অথবা নিজের কোন পালিত পশু-পাখি পলায়ন করলে, ৪৫. দুঃখ-কষ্ট এবং বালা-মুসিবতের সময়, ৪৬. কলেরা প্লেগ অথবা অন্য কোন দুরারোগ্য রোগ দেখা দিলে, ৪৭. ডুবে যাওয়ার আশংকা হলে, ৪৮. কানে শো শো শব্দ করলে এ ক্ষেত্রে দরূদ শরীফের সাথে এ বাক্যটিও সংযুক্ত করবে, «ذَكَرَ اللهُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِخَيْرٍ» (বাংলা উচ্চারণ: 'যকারাল্লাহু মান যকরনী বি-খাইরিন)[2], ৪৯. পা ফুলে গেলে, ৫০. ভুলে যাওয়া কোন বস্তুর কথা

[1] (ক) আন-নাবাহানী, *আল-ফাদলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৯৯; (খ) আল-গাযযালী, *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ১৯৯:

عَنْ أَنَسٍ، «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عِشْرِيْنَ مَرَّةً وَفِي الثَّالِثَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً، وَفِي الرَّابِعَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ مَرَّةً وَاسْتَغْفَرَ اللهَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ سَأَلَ اللهَ حَاجَتَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ مَا سَأَلَ».

[2] আর-রুয়ানী, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৪৭৩, হাদীস: ৭১৮, হযরত আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত

স্মরণ হলে, ৫১. কোন কিছু ভুলে যাওয়ার সময়, ৫২. ব্যথা নিরসনকল্পে মূলা ভক্ষণের সময়, ৫৩. পানি পান কারার সময়, ৫৪. গর্দভের শব্দ করার সময়, ৫৫. গুনাহ করার পর যাতে দরূদ শরীফের বরকতে গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়, ৫৬. দু'আ করার প্রারম্ভে এবং শেষে, ৫৭. কোন মুসলমান ভাই বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময়, ৫৮. জনগণের সমাবেশের সময়, বিদায় হওয়ার পূর্বে, ৫৯. মজলিস থেকে ওঠে যাওয়ার সময়, যাতে গীবত, পরনিন্দা. থেকে বাঁচতে পারা যায়, ৬০. প্রত্যেক ইসলামী সমাবেশ, যা আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়, অথবা ইসলামী শান-শওকত যাহির করার উদ্দেশ্যে করা হয়, ৬১. কুরআন শরীফ খতম করার সময়, ৬২. কুরআন শরীফ হিফয করার জন্য দু'আ করার সময়, ৬৩. কথা আরম্ভের সময়, যদি তা শরীয়ত নিষিদ্ধ কথা না হয়, ৬৪. পাঠ দান আরম্ভ করার সময়, ৬৫. ওয়াজের প্রারম্ভে, ৬৬. হাদীস শরীফ পাঠের শুরুতে এবং শেষে, ৬৭. যদি কোন বস্তুকে খুব ভালো লাগে। উল্লেখ্য যে, মালিকী মাযহাবের কোন কোন আলিমের মতে, কোন কোন বস্তু দেখে অবাক হয়ে গেলে দরূদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহ। যেমনিভাবে কোন হারাম কাজের সময় অথবা মাল আসবাব প্রদান অথবা খোলার সময় সুবহানাল্লাহ অথবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা মাকরূহ, ৬৮. দরূদ শরীফ পাঠের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল এই যে, যখন হযরত ﷺ-এর পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করা হয় অথবা লেখা হয়, তখন দরূদ শরীফ পাঠ করা অপরিহার্য। হাদীসে উল্লেখ আছে যে,

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَّمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِيْ فِي الْكِتَابِ».

'যে ব্যক্তি কিতাব লেখার মধ্যে আমার ওপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে ফেরেশতাগণ তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবেন, যতক্ষণ আমার নাম কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।'[১]

অনেক আলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসের সনদ দুর্বল। ইবনে জওযী হাদীসটিকে বানোওয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২]

বর্ণিত আছে যে, 'এক ব্যক্তি কাগজের কার্পণ্য হেতু হুযূর আকরম ﷺ-এর নাম মুবারকের সাথে ﷺ বাক্যটি লিপিবদ্ধ করত না। তার মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, তার হাত জ্বলে যায়।'

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ২৪৮; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ২, পৃ. ২৩২, হাদীস: ১৮৩৫; হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত

[২] ইবনুল জওযী, *আল-মওযূ'আত*, খ. ১, পৃ. ২৮৮

অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে শুধু 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি' কথাটি লিখত কিন্তু 'ওয়া সাল্লাম' কথাটি লিখত না লোকটি পয়গম্বর ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে ইরশাদ করেন, 'তুমি কেন চল্লিশটি নেকী থেকে বঞ্চিত হলে? কেননা আরবীতে 'ওয়া সাল্লাম' শব্দটির মধ্যে চারটি অক্ষর আছে। আর প্রতিটি অক্ষরে দশটি করে নেকী হাসিল হয়।"

কোন কোন লোক যে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-কে সংক্ষেপে ص - অথবা صلعم লিখে থাকে, আর 'আলাহিস সালাম'-এর স্থলে সংক্ষেপে শুধু ع লিখে এও এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণিত আছে যে, 'একজন লোক অপর একজন লোককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, খোদাওন্দ করীম আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? এবং কোন আমলের দরুন আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন? লোকটি বলল, আমি যখনই হুযূর আকরম ﷺ-এর নাম মুবারক লিখতাম, তার সাথে নিশ্চয় 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বাক্যটিও লিপিবদ্ধ করতাম, যার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।'

আরও বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত ইমাম শাফিয়ী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর দয়া করেছেন এবং আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। নতুন দুলহার মতো আমাকে বেহেশতে নিয়ে গেছেন এবং যেভাবে নতুন দুলহার ওপর মনি-মুক্তা উৎসর্গ করা হয়েছে। এর কারণ ছিল এই যে, যখনই আমি কোন পুস্তক লিখতাম, আমি নিশ্চয় এই দরূদটি পাঠ করতাম:

«صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদীন আদদা মা যকরাহুয যাকিরান, ওয়া আদদা মা গফলা আন যিকরিহিল গাফিলূন।'[১]

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ২৫০-২৫১; (খ) আন-নুমায়ারী, *আল-ই'লামু বি-ফযলিস সালাতি আলান্নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াস সালাম*, পৃ. ১৬৬-১৬৭, হাদীস: ৩১১; (গ) ইবনে বাশকুওয়াল, *আল-কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামীন বিস-সালাতি আলান্নাবী ﷺ সাইয়িদিল মুরসালীন*, পৃ. ১২৯-১৩০, হাদীস: ৬৯; হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম ﷺ থেকে বর্ণিত

অনুচ্ছেদ-৬: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন লাভের বিবরণ

বিশ্বজাহানের সরদার রহমাতুল্লিল আলামীন হুযূর আকরম ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করার অনেকগুলো ব্যবস্থার কথা উলামায়ে কিরামগণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হল:

- সর্বদা পাক পবিত্র অবস্থায় নিম্নে বর্ণিত দরূদ শরীফটি পাঠ করলে এ উদ্দেশ্য সাধন হয়:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদীন, ওয়া লিহি কমা তুহিব্বু ওয়া তরদা লাহূ।'[১]

- নিম্ন লিখিত দরূদ শরীফটি উল্লিখিত তরীকায় সদা-সর্বদা পাঠ করলেও এ সৌভাগ্য অর্জিত হয়:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِهٖ فِي الْقُبُوْرِ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা রূহি মুহাম্মাদীন ফিল আরওয়াহি, আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা জাসাদিহি ফিল আজসাদি, আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা কব্‌রিহি ফিল কুবূর।'[২]

মাফাখিরুল ইসলাম নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমাবারে এক হাজার বার এ দরূদটি পাঠ করবে,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মদিনিন নবীয়িল উম্মী।'[৩]

তবে তিনি হযরত ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করবেন অথবা বেহেশতের মধ্যে স্বীয় স্থান দেখে নেবেন। যদি প্রথম দফা দর্শন লাভ না হয়, তবে পাঁচ জুমা পর্যন্ত এভাবে পড়তে থাকবে, তবে ইনশাআল্লাহ তিনি এর মধ্যে এমন কিছু দর্শন করবেন, যাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি জুমার রাতে এভাবে দু'রাকাআত নামায পড়ে যে, প্রত্যেক রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহার পর এগার বার আয়াতুল কুরসী এবং এগার বার

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৫৭
[২] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৪১
[৩] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ১৪১

সূরায়ে ইখলাস পাঠ করবে। আর সালামের পর এ দরূদ শরীফটি একবার পাঠ করবে:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নবীয়িল উম্মী, ওয়া 'আলিহি ওয়া সাল্লাম।'

তবে ইনশাআল্লাহ তা'আলা জুমা অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি হুযূর আকরম ﷺ-এর দর্শন লাভে ধন্য হবেন।

এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ رحمه الله বলেন যে, এ ফকিরেরও এর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন এভাবে দু'রাকাআত নামায আদায় করে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার পরে পঁচিশ বার করে সূরায়ে ইখলাস পাঠ করে নামায আদায় করে এক হাজার বার দরূদ শরীফটি পাঠ করবে:

«صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ».

বাংলা উচ্চারণ: 'সল্লাল্লাহু আলান নবীয়িল উম্মী।'

তবে তিনি হযরত ﷺ-কে স্বপ্নে দেখতে পাবেন।'[১]

হযরত সায়ীদ ইবনে আতা رحمه الله থেকে বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তি পবিত্র বিছানায় শয়ন করে, ডান হাতের ওপর মস্তক রেখে এ দু'আ পাঠ করে ঘুমায়, তবে তিনি হযরত ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করে ধন্য হবেন:

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، أَنْ تُرِيَنِيْ فِيْ مَنَامِيْ وَجْهَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ رُؤْيَةً تُقِرُّ بِهَا عَيْنِيْ، وَتَشْرَحُ بِهَا صَدْرِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ، وَتَفْرَجُ بِهَا كُرْبَتِيْ، بَيْنِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، ثُمَّ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ أَبَدًا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌আলুকা বিজালালি ওয়াজ্‌হিকাল্ করীম, আন তুরিয়ানী ফী মানামী ওয়াজ্‌হি নবীয়িকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম রু'য়াতান তুকির্‌রু বিহা 'আয়নী, ওয়া তাশ্‌রাহু

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ২০০:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصَلِّيْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، ثُمَّ يَقُوْلُ أَلْفَ مَرَّةٍ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ، فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، حَتّٰى يَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ، وَمَنْ رَآنِيْ غَفَرَ اللهُ لَهُ الذُّنُوْبَ».

বিহা সদরী, ওয়া তাজ্‌মা'উ বিহা শাম্‌লী, ওয়া তাফ্‌রাজু বিহা কুর্‌বাতী, ওয়া তাজ্‌মা'উ বিহা বায়নী ওয়া বায়নাহু ইয়াওমুল কিয়ামাতি ফিদ্‌ দারাজাতিল্‌ 'উলা, সুম্মা লা তুফারিক্‌ বায়নী ওয়া বাইনাহু আবাদান্‌, ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।'

উল্লেখ্য যে, যদিও বা এ দু'আর মধ্যে দরূদ শরীফ কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি এ সৌভাগ্য অর্জনের অভিলাষী দরূদ শরীফ পাঠ করে এ দু'আ পড়ে, তবে এ সৌভাগ্য অর্জনে যে এটি বিশেষ কার্যকর হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। হুযূর আকরম ﷺ-এর দিদার নসীব হওয়ার আরও অনেক উপায় আলিমগণ উল্লেখ করেছেন। তবে সবগুলোরই সারমর্ম হচ্ছে এই যে এ সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্ত অধিকভাবে দরূদ শরীফ পাঠ এবং সব সময় হযরত নবী করীম ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও তাঁর ধ্যানে আত্মনিয়োগ করা অপরিহার্য।

অনুচ্ছেদ–৭

দরূদ শরীফের যেসব বাক্য হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে সেগুলো পাঠ করাই সর্বোত্তম। কেননা সমুদয় দরূদ শরীফ হযরত ﷺ থেকে বর্ণিত শব্দাবলি দ্বারা গঠিত।

কোন কোন আলিম বলেছেন যে, যেসব দরূদ শরীফ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সেসবের মধ্যে সেগুলোই সর্বোত্তম, যা আত-তাহিয়াতুর পরে পড়া হয়। উল্লেখ্য যে, সহীহ হাদীসসমূহের সেই দরূদ শরীফটি বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। তবে সবগুলোই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কার্যকর। এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটিই সর্বোপেক্ষা বিখ্যাত:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদীন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[১]

[১] ইবনুস সুন্নী, *আমালুল য়াওমি ওয়াল লায়লা : সুলূকুন নবী মাআ রব্বিহি আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া মুআশারাতুহু মাআল ইবাদ*, পৃ. ৮৫, হাদীস: ৯৪, হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

শাফিয়ী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা সুবকী رحمة الله عليه বলেন, যে ব্যক্তি হুযূর আকরম ﷺ-এর ওপর সেই দরূদ শরীফটি পাঠ করেন, যা আত-তাহিয়াতুর পরে পড়া হয়, তবে তিনি সেই দরূদ শরীফই পাঠ করলেন যা তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা তিনি নিশ্চয় সেই সওয়াবই পাবেন, যা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বোত্তম দরূদ শরীফ পাঠ করবো, তবে তিনি উল্লিখিত আত-তাহিয়াতুর পরে পাঠকৃত দরূদ শরীফটি পাঠ করলে তার শপথ পূর্ণ হবে।

ইমাম নাওয়াওয়ী رحمة الله عليه বলেন যে, দরূদ শরীফ পাঠকের উচিত যে, তিনি যেন সেই সমুদয় হাদীস শরীফ একত্রিত করে পাঠ করেন। যেগুলো সহীহ হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। যাতে তিনি সমস্ত দরূদে মাসূরার সওয়াব হাসিল করতে পারেন। এরপর ইমাম নাওয়াওয়ী সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত সমস্ত দরূদ শরীফের বাক্যসমূহকে একত্রিত করে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَكَمَا يَلِيْقُ بِعِظَمِ شَرْفِهِ وَكَمَالِهِ، وَرِضَاكَ عَنْهُ، وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهُ، عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَرِضٰى نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ أَفْضَلُ صَلَاةٍ وَأَكْمَلُهَا وَأَتَمُّهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَذَالِكَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ».[১]

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম শায়খ কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম رحمة الله عليه বলেন যে, হাদীসের মধ্যে যত পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ বর্ণিত আছে সেসব দরূদ শরীফের মধ্যে বিদ্যমান আছে,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ أَبَدًا أَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ، نَبِيِّكَ، رَسُوْلِكَ،

[১] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মজমূ' শরহুল মুহায্‌যাব*, খ. ৩, পৃ. ৪৬৬

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا، وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَةَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আবাদান 'আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন 'আবদিকা ওয়া নাবীয়িকা ওয়া রাসূলিকা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামা তাস্‌লীমা ওয়াযিদ্‌হু তাশ্‌রীফান, ওয়া তাক্‌রীমান ওয়া আন্‌যিল্‌হুল্ মান্‌যিলাতাল্ মুকার্‌রিবা 'ইন্‌দকা ইয়াওমাল কিয়ামতি।'[১]

শায়খ ইবনে কাইয়ূম হাম্বলী জওযী এবং শাফিয়ী মাযহাবের কোন কোন আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, যে দরূদ শরীফ যেভাবে বর্ণিত আছে, সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে একসময় এক এক একটা পড়াই ভালো। যাতে সমুদয় দরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব হাসিল হয়। সবগুলো একত্রিত করলে একটি নতুন দরূদ আবিষ্কৃত হয়, যা কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

আসল কথা, যেসব দরূদ শরীফ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এবং খবরে মাসূরার দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলো থেকে কতিপয় দরূদ শরীফ নিম্ন বর্ণিত হলো।

প্রথম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম ফিল আলামীন, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।'[২]

দ্বিতীয়

কিন্তু হাদীসের কোন কোন সূত্রে কিছু কিছু শব্দ বেশি আছে:

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৬৮
[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৯, হাদীস: ৩২২০; হযরত আবু মাউদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারক্‌তা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[১]

তৃতীয়

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন্নাবীয়িল উম্মী ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন; কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মজীদ।'[২]

চতুর্থ

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি, কামা বারক্‌তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[৩]

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১২০, হাদীস: ৪৭৯৭; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩০৫, হাদীস: ৬৫ (৪০৫); হযরত আবু মাউদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত
[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ১৭০৭২; হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত
[৩] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ৩৩৯৬ ও খ. ৮, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৩৬০; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস: ৬৯ (৪০৬); (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ৯০৫; হযরত আবু হুমায়দ আস-সায়িদী রা. থেকে বর্ণিত

পঞ্চম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন 'আব্‌দিকা ওয়া রাসূলিকা, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারক্‌তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[১]

ষষ্ঠ

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাজ'আল সালাওয়াতিকা ওয়া বারাকাতিকা 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা জা'আলতাহা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুন মাজীদ, ওয়া বারিক মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামদিুম মাজীদ।'[২]

সপ্তম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَاةُ

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৬, পৃ. ১২১, হাদীস: ৪৭৯৮ ও খ. ৮, পৃ. ৭৭, হাদীস: ৬৩৫৮; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৪৯, হাদীস: ১২৯৩; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] ইবনে আবু আসিম, *কিতাবুস সালাত আলান্নাবী* ﷺ, পৃ. ১৭, হাদীস: ১০

الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اَلسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আহ্‌লি বায়তিহি, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা সল্লি আলাইনা মাআহুম। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আহ্‌লি বায়তিহি, কামা বারক্‌তা 'আলা ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক 'আলায়না মা'আহুম্‌ সালাতুল্লাহি ওয়া সালাতুল মুমিনীনা 'আলা মুহাম্মাদিনিন্নবীয়িল উম্মী, আস-সলামু 'আলায়না ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'[১]

অষ্টম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন।'[২]

নবম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন্নবীয়িল উম্মী ওয়া আয্‌ওয়াজিহি উম্মুহাতিল মুমিনীনা ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহ্‌লি বায়তিহি, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[৩]

এ দরূদ শরীফটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفٰى، إِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: هٰذَا».

'হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের আহলে বাইতের ওপর

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১০, পৃ. ৫৪, হাদীস: ৯৯৩৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৭, হাদীস: ৯৭৮; হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[৩] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ৯৮২; হযরত হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

দরূদ শরীফ পাঠ করে আমলনামায় নেকীর পাল্লা ভারী করতে চায়, সে ব্যক্তির এ দরূদ শরীফটি পাঠ করা উচিত।'[১]

দশম

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া বারিক্ 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লায়তা ওয়া বারকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[২]

একাদশ

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মাজ'আল সালাওয়াতিকা ওয়া রাহ্মাতাকা ওয়া বারাকাতিকা 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা জাআল্তাহা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'[৩]

দ্বাদশ

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন কামা আমার্তানা আন নুসাল্লিয়া 'আলায়হি ওয়া সাল্লি 'আলায়হি কামা ইয়ান্বাগী আন নুসাল্লিয়া 'আলায়হি।' (শরফুল মুস্তফা)

ত্রয়োদশ

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ أَمَنَ بِكَ

[১] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ৯৮২; হযরত হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত
[২] আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৪৭-৪৮, হাদীস: ১২৮৮, ১২৯০ ও ১২৯১; হযরত কা'ব ইবনে 'উজরা ﷺ ও হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত
[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, খ. ৩৮, পৃ. ৯২, হাদীস: ২২৯৭৭; হযরত বুরায়দা আল-খুযা'য়ী ﷺ থেকে বর্ণিত

وَبِكِتَابِكَ، وَاعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ، وَآتِهِ الشَّرَفَ عَلٰى خَلْقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاجْزِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন 'আব্দিকা ওয়া রাসূলিকান্নাবীয়িল উম্মীয়াল্লাযী 'আমানা বিকা ওয়া বিকিতাবিকা, ওয়া'তিহি আফযালা রাহ্মাতিকা, ওয়া আতিহিশ শারাফা 'আলা খাল্কিকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি, ওয়াজ্যিহি খায়রুল জযায়ি, ওয়াস সালামু 'আলায়কুম্ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত যেসব দরূদ শরীফের মধ্যে সালামের উল্লেখ নেই, সেখানে সালামের এ বাক্যটি সংযুক্ত করা কর্তব্য।

«اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

'আসসালামু 'আলায়কা আইয়ুহান্নাবীয়ুল করীম, ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

কেননা অধিকাংশ আলিমদের মতে, সালাম ব্যতীত দরূদ শরীফ পাঠ মাকরূহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের এ আয়াতের মধ্যে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

'হে ঈমামদারগণ! তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পেশ কর।'[১]

সালাত এবং সালাম উভয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন। যদিওবা মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন আলিম দ্বিমত পোষণ করেছেন, কিন্তু এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করা যে ভালো নয়, এতে সকলেই একমত। বাকি হযরত ﷺ যে সালাতের সাথে সালামের উল্লেখ করেনি, তার কারণ খোদ হাদীসের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم হযরত ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনার ওপর সালাম প্রেরণের পদ্ধতি অবহিত আছি। কিন্তু সালাত প্রেরণের পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সালাতের তরীকা শিক্ষা দিন। তখন তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দেন, তোমরা এভাবে বলো,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ..».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন।'[২]

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৫৬
[২] ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৯৩, হাদীস: ৯১২: =

এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সালামের তরীকা তাঁদের জানা থাকায় তিনি উল্লিখিত দরূদ শরীফে সালামের উল্লেখ করেননি।

উল্লেখ্য যে, সালাম ব্যতীত সালাত পাঠ করা যেমন মাকরূহ নয়, এর ওপর কিয়াস করে বলা যায় যে, সালাত বতীত সালামও মাকরূহ হবে না। তবে এরূপ করা যে ভালো নয়, এতে কারো দ্বিমত নেই।

অধিকাংশ আজমী (অনারব) লোকদের এটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক নামের পরে কেবল আলায়হিস সালাম উল্লেখ করেন, কিন্তু আরববাসী গ্রন্থকারদের কিতাবের মধ্যে এরূপ খুব কমই দেখা যায়। বরং তারা তাঁর পবিত্র নামের সাথে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) লিপিবদ্ধ করে থাকেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রন্থকারদের কিতাবে এভাবেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আরবী ভাষার অধিকাংশ ব্যাকরণিকদের حرف جر-কে পুনরোল্লেখ না করে وَاو ضَمِيْرِ مَجْرُوْر-এর ওপর عَطْف করা সিদ্ধ নয়। এ নিয়মানুসারে এখানে صَلَّى اللهُ অব্যয়টির পরে عَلَىٰ অব্যয়টি পুনরোল্লেখ করে এভাবেই বলা দরকার যে, عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)। যেমন কোন কোন গ্রন্থে এভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তবে যারা আলা অব্যয়টি পুনরোল্লেখ করেন না, বোধ হয় তারা ভাষাকে সংক্ষেপ করার মানসেই শব্দটি উল্লেখ করেননি।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ﷺ-এর দু'আ তাঁর সমস্ত আওলাদ-আসহাব এবং সমস্ত মুমিনদেরকে শামিল করে নেয়। যেমন- বলা হয়েছে যে, «هَذَا دُعَاءٌ شَامِلٌ لِلْبَرِيَّةِ»।

অনুচ্ছেদ-৮

সমস্ত দরূদ শরীফের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম? এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাঁদের উত্তর বলাটা কি কোন আসর অথবা হাদীসের কারণে অথবা বাক্য অধিকসংখ্যক গুণাবলিকে শামিল করার কারণে? তা অবশ্য জানা নেই।

= عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى، قَالَ: قَالَ لِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: أَلَا أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟، قَالَ: «قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

যিয়ারতের বিভিন্ন কিতাবে আলিমগণ লিখেছেন যে, এ সম্পর্কে আলিমদের সর্বমোট দশটি উক্তি রয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

প্রথম উক্তি

সমুদয় দরূদ শরীফের মধ্যে সেই দরূদ শরীফটিই সর্বোত্তম, যা আত-তাহিয়াতুর পরে পাঠ করা হয়। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا سَهَى عَنْهُ الْغَافِلُوْنَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন, কুল্লামা যাকারাহুয যাকিরান, ওয়া কুল্লামা সাহা আন্‌হুল গাফিলূন।'

তৃতীয় উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন, কামা হুয়া আহলুহু ওয়া মুস্‌তাহিক্কুহু।'

চতুর্থ উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন, কামা আন্‌তা আহলুহু।'

পঞ্চম উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، أَفْضَلَ صَلَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন, আফযালু সালাতিকা 'আদাদা মা'লূমাতিকা।'

ষষ্ঠ উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ وَّمَلَكٍ وَّوَلِيٍّ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ وَالْمُبَارَكَاتِ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি, ওয়া 'আলা কুল্লি নাবিয়্যিন ওয়া মালাকিন ওয়া ওয়ালিয়্যিন 'আদাদা কালিমাতিকাত্তাম্মাতি ওয়াল মুবারাকাত।'

সপ্তম উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضٰى نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন 'আব্দিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসূলিকান্নাবিয়্যিল উম্মুয়্যি, ওয়া 'আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, 'আদাদা খাল্কিকা, ওয়া রাযা নাফ্সিকা, ওয়া যিনাতা 'আরশিকা, ওয়া মিদাদা কালিমাতিকা।'

অষ্টম উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, সালাতান্ দায়িমাতান্ বিদাওয়ামিকা।'

নবম উক্তি

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْزِ مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, ওয়াজযি মুহাম্মাদান মা হুয়া আহ্লুহু।'

দশম উক্তি

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهٖ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

বাংলা উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন্, ওয়া আয্ওয়াজিহি উম্মুহাতিল মুমিনীনা, ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহ্লি বায়তিহি, কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

অনুচ্ছেদ–৯

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

«إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ».

'যদি তোমরা আমার ওপর দরূদ শরীফ পাঠ কর, তবে তোমরা উত্তম এবং সুন্দর দরূদ পাঠ করবে।'[১]

কোন কোন তাফসীরকারক কুরআন শরীফের এই আয়াত: وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا-[২]-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এখানে نَاسٌ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ, আর حُسْنًا শব্দের উদ্দেশ্য তাঁর ওপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করা। অর্থাৎ তোমরা হযরত নবী করীম ﷺ-এর ওপরই খুবই সুন্দরভাবে দরূদ শরীফ প্রেরণ কর।

প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক আল্লামা সুদ্দী رحمه الله একদল সাহাবা رضي الله عنهم থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে বর্ণনা শক্তি এবং উচ্চাঙ্গের ভাষা দ্বারা সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার শক্তি দান করেছেন, তাঁর উচিত যে, তিনি যেন পয়গম্বর ﷺ-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ শান-শওকত সম্পন্ন দরূদ শরীফ এবং সালাত ও সালামের সুন্দরতম বাক্যসমূহ রচনা করে প্রকাশ করেন। তাহলে তিনি এ নিয়ামতের মর্যাদা দানকারী এবং কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত নির্দেশ পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তবে উত্তম দরূদ শরীফ সম্পর্কে যে আলিমদের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, সম্ভবত তা এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। সারকথা, উল্লিখিত হাদীস এবং কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি নজর রেখে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলিমগণ এবং বুযুর্গানে দীন অনেক দরূদ শরীফ রচনা করেছেন। ওগুলো থেকে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهُ وَالرَّحْمَةِ لِّلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهُ، عَدَدَ مَنْ مَا مَضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَن شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَاةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ كَذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ».

এ দরূদ শরীফ সম্পর্কে আল্লামা সকাবী বর্ণনা করেন যে, এ দরূদ শরীফের সওয়াব দশ হাজার দরূদ শরীফের সমান এবং এর আশ্চর্যজনক কাহিনী আছে।

---

[১] আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ২, পৃ. ২১৪, হাদীস: ৩১১২; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাক্বারা*, ২:৮৩

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ، صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَلَحِقَّهُ أَدَاءً صَلَاةً مَقْبُوْلَةً لَدَيْكَ مَعْرُوْضَةً عَلَيْهِ، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ».

এ দরূদ শরীফটি মুসববিআতে আশর নামে খ্যাত তাবেয়ীনের যমানা থেকে মশায়িখে কিরাম পর্যন্ত বরাবর এ দরূদ শরীফ পাঠের ওপর আমল চলে আসছে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বুযুর্গ হযরত শায়খ আলী মুত্তাকী তাঁর পুস্তকের মধ্যে এ দরূদ শরীফটি পাঠের অসিয়ত করেছেন।

এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন যে, পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিদায় গ্রহণের সময় শায়খ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী এ ফকিরকে এ দরূদ শরীফটি পাঠে অনুমতি প্রদান করেছেন। মাশায়িখে কিরামের অনুমতির ফলশ্রুতিতে এ দরূদ শরীফের শব্দসমূহ দ্বারা এ বান্দার যে নূর, খুশী, মানসিক তৃপ্তি, নৈকট্য ও বিনয়ভাব অর্জিত হয়েছে, তুলনামূলকভাবে অপরাপর দরূদ শরীফের দ্বারা তা স্বল্পই অনুভব হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দরূদ শরীফটির প্রতি প্রত্যাবর্তন না করি, ততক্ষণ মানসিক সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ হয় না। তবে অপরাপর দরূদ শরীফের মধ্যে যে বিভিন্ন কাফিয়তের সৃষ্টি হয়, এও অস্বীকার করা যায় না। মাশায়িখে কিরামের অনুমতি গ্রহণের মধ্যেই এ রহস্য নিহিত।

«اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ حَمِدَكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يَحْمَدْكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُحْمَدَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ».

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা তাবারানী এ দরূদ শরীফটি প্রণয়ন করেন এবং তিনি বলেছেন যে, আমি স্বপ্নের মধ্যে এ দরূদ শরীফটি হযরত ﷺ-এর সম্মুখে পাঠ করি। তিনি তা শ্রবণ করে মুচকি হাসেন, যাতে সম্মুখের দন্তরাজি দৃষ্টিগোচর হয়।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّلَاءِ الدُّنْيَا وَمِلَاءِ الْآخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّلَاءِ الدُّنْيَا وَمِلَاءِ الْآخِرَةِ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا مِّلَاءَ الدُّنْيَا، وَمِلَاءَ الْآخِرَةِ، وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّلَاءِ الدُّنْيَا وَمِلَاءِ الْآخِرَةِ».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيْهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

এ দরূদ শরীফটিকে আল্লামা সাখাওয়ী *শিফা* নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি হুযূর আকরম ﷺ-এর হাওযে কাওসার থেকে পূর্ণ পিয়ালায় পানি পানের বাসনা রাখেন তিনি যেন সর্বদা এ দরূদ শরীফটি পাঠ করেন।[১]

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِيْنَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِيْنَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّيْنَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِيْنَ، وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا، اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ، وَلَمْ أَرَهُ، فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْحَيَاةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنِيْ صُحْبَتَهُ، وَتَوَفَّنِيْ عَلٰى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهِ شَرَابًا مَّرِيْئًا سَائِغًا هَنِيْئًا، لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا، إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ مِنَّا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا، اَللّٰهُمَّ كَمَا آمَنْتُ بِهِ وَلَمْ أَرَهُ، فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِي الْجَنَّةِ رُؤْيَتَهُ».

তিলিমসানী নিশাপুরী থেকে উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেন যে, হযরত আতা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফটিকে সকালে তিনবার এবং বিকাল বেলা তিনবার পাঠ করবে, তার গুনাহ মুছে যাবে, সে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে, তা দু'আ কবুল হবে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, সে শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করবে, তাকে সৎ কাজের তওফীক দেওয়া হবে। বেহেশতের মধ্যে তিনি হযরত ﷺ-এর সাথীত্ব লাভ করবে।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَعَظِّمْ وَكَرِّمْ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ

---

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৫৫-৫৬; (খ) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৬৭

وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِعْظَامِ ذِكْرِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ، وَفِي الْآخِرَةِ بِقَبُوْلِ شَفَاعَتِهِ فِيْ أُمَّتِهِ وَتَضْعِيْفِ ثَوَابِهِ وَإِظْهَارِ فَضْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ وَتَقْدِيْمِهِ عَلَىٰ كَافَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ فِي الشَّفَاعَةِ وَإِعْلَاءِ دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ».

এ দরূদ শরীফটি কবুলিয়াতের স্তরে পৌঁছেছে। বর্ণিত আছে যে, রওযায়ে পাকের একজন যিয়ারতকারী, যিনি বিশেষ মকবুল বান্দা ছিলেন, যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে এ দরূদ শরীফটি পাঠ করতেন। তিনি মদীনা শরীফ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন যে, 'তুমি এখানে আরও কিছু দিন অবস্থান কর, তোমার এ দরূদ শরীফ আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।'

«صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً هُوَ أَهْلُهَا».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ، وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ».

উল্লেখ্য যে, এ দরূদ শরীফটি আমাদের এ পবিত্র সিলসিলার (কাদিরিয়া তরীকার) মশায়েশের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রচলিত এবং বিখ্যাত।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ، وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ، وَّعَلَىٰ آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ».

বর্ণিত আছে যে, এ পবিত্র দরূদ শরীফের শব্দাবলি হযরত গাউসুস সকলাইন رضي الله عنه কর্তৃক প্রণীত, যেমন– কাদিরীয়া তরীকার কোন কোন মাশায়িখ উল্লেখ করেছেন, এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ মুহাদ্দিস দেহলভী رضي الله عنه বলেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় মুরশিদে বরহক رضي الله عنه তাঁর ওয়াযীফার কিতাবেও এ দরূদ শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ وَقَرِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ، وَمَظْهَرِ رُبُوْبِيَّتِكَ، وَمِثَالِ خَضْرَتِكَ، وَتِمْثَالِ قُدْرَتِكَ، رُوْحِ الْقُدْسِ، مُعْطِي الْحَيَاةِ وَالْفَضِيْلَةِ بِأَمْرِكَ بِكَثْرَةِ الْعَوَالِمِ، مُفِيْضِ نَوَاطِقِ النُّفُوْسِ، صَاحِبِ الظَّفَرِ وَالتَّعَالِيْ شُمُوْسُ نُوْرِكَ».

বর্ণিত আছে যে, এ পবিত্র দরূদ শরীফের শব্দাবলি হযরত গাউসুস সকলাইন رضي الله عنه কর্তৃক প্রণীত, যেমন কাদেরীয়া তরীকার কোন মাশায়েখ উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের প্রণেতা হযরত শায়খ মুহাদ্দিস দেহলভী رضي الله عنه বলেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ বরহক কদ্দাসল্লাহ সিররাহ তাঁর ওয়াযিফার কিতাবেও এ দরূদ শরীফটি উল্লেখ করেছেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ فِي الْقُبُوْرِ».

আল্লামা সাখাওয়ী رضي الله عنه দূররে মুনাযযম নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফটি পাঠ করবেন, তিনি হযরত ﷺ-কে স্বপ্নে দর্শন করে ধন্য হবেন। তিনি তাঁর সুপারিশ লাভ করবেন এবং হাওযে কাওসারের পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হবেন। দোযখের আগুনের ওপর তার দেহ হারাম হবে।[১]

উল্লেখ্য যে, হারামাইন শরীফায়নের মধ্যে দরূদ শরীফটি বহুলভাবে প্রচলিত। এর ওপর তাঁরা এ বাক্যটিও বৃদ্ধি করেন, وَعَلَىٰ اِسْمِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَسْمَاءِ।

গ্রন্থকার হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رضي الله عنه বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুহাব্বতের আতিশয্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কখনো কখানো তাঁর মস্তক মুবারক থেকে কদম মুবারক পর্যন্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহের উল্লেখ করে এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করি,

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رَأْسِ مُحَمَّدٍ فِي الرُّؤُوْسِ، وَصَلِّ عَلَىٰ شَعْرِ مُحَمَّدٍ فِي الشُّعُوْرِ، وَعَلَىٰ جَبْهَةِ مُحَمَّدٍ فِي الْجِبَاهِ، وَعَلَىٰ عَيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُيُوْنِ، وَعَلَىٰ أُذُنِ مُحَمَّدٍ فِي الْآذَانِ، وَعَلَىٰ وَجْهِ مُحَمَّدٍ فِي الْوُجُوْهِ، وَعَلَىٰ صَدْرِ مُحَمَّدٍ فِي الصُّدُوْرِ، وَعَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوْبِ».

আবার কখনো এভাবেও বলি,

«وَعَلَىٰ بَلَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْبِلَادِ، وَعَلَىٰ دَارِ مُحَمَّدٍ فِي الدُّوْرِ، وَعَلَىٰ مَسْجِدِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسَاجِدِ».

«اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ سَعْدَيْكَ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ

[১] আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৫২

لَهُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ، وَأَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْؤُوْلٌ لَّهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

হযরত ওয়াহাইব ইবনুল ওয়ারদ رحمه الله থেকে বর্ণিত, এ দরূদ শরীফটি পাঠের পর এ দু'আটি পাঠ করবে।[১] এরপর এ বাক্যগুলি সংযুক্ত করবেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَاصْطَفَيْتَهُ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِيْنَ، عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ، وَمَلْأَ مَا فِيْ عِلْمِكَ، وَزِنَةَ مَا فِيْ عِلْمِكَ، وَعَدَدَ خَلْقِكَ، وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً فِيْ ذٰلِكَ أَلْفَ مَرَّةٍ فِيْ كُلِّ نَفْسٍ وَّلَمْحَةٍ وَّلَحْظَةٍ وَطَرْفَةٍ يَّطُوْفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتَمِ بِنُوْرِ الْمُبِيْنِ، وَرَسُوْلِكَ الصَّادِقِ الْأَمِيْنِ، آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ الشَّفِيْعَ الْمُرْتَضَى وَرَسُوْلَكَ الْمُجْتَبَى، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا بِرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

এ দরূদ শরীফটিকে এভাবেও পাঠ করা হয়:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ مُحَمَّدٍ، مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانُ، وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانُ، وَكَرَّ الْجَدِيْدَانُ، وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانُ، وَأَضَاءَ الْقَمَرَانُ، وَبَلِّغْ رُوْحَهُ وَأَرْوَاحَ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ».

পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীন থেকে এ দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণিত আছে।

[১] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৬৭-১৬৮

عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا».

«صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ».

এ দরূদ শরীফটি হযরত আলী মুরতযা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত শিফা নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী رضي الله عنه তাঁর জানাযার নামাযে এ দরূদ শরীফটি পাঠ করেছিলেন।[১]

«اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُ فِيْهِ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে এ দরূদ শরীফটি বর্ণিত আছে।[২]

«اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَىٰ كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ».

হযরত তাউস رحمه الله এ হাদীসটিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।[৩]

«اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ، وَأَعْطِ مُحَمَّدًا أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ

[১] (ক) আস-সাখাওয়ী, *আল-কাওলুল বদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৫৪; (খ) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৬৬

[২] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৬৬-১৬৭

[৩] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ২, পৃ. ১৬৭

«اَللّٰهُمَّ مُرِ الْمَلَائِكَةَ السَّيَّاحِيْنَ وَالَّذِيْنَ خَلَقَهُمْ لِتَبْلِيْغِ هَدَايَا الصَّلَاةِ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَىٰ خَضْرَةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ أَنْ تَبْلُغُوْا هَذِهِ الْهَدِيَّةَ مِنْ هَذَا الْحَقِيْرِ، وَيَقُوْلُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ بَلَّغَهَا إِلَيْكَ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ الْمِسْكِيْنُ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ سَيْفِ الدِّيْنِ السَّاكِنُ بِبَلَدَةِ دِهْلِيْ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْعَاصِيْ الَّذِيْ لَا مَلْجَأَ لَهُ وَلَا مَنْجَا بِكَ».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، وَبِعَدَدِ قَطَرَاتِ الْأَمْطَارِ، وَبِعَدَدِ دَوَابِّ الْبَرَارِيِ وَالْبِحَارِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ».

কখনো কখনো বলবে:

«بِعَدَدِ كُلِّ قَطْرَةٍ مِّنْ قَطَرَاتِ سَمَائِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ حِيْنَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

অনুরূপভাবে বলবে:

«..أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، وَدَوَابِّ الْبَرَارِيِ وَالْبِحَارِ».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ».

এ দরূদ শরীফটি ফযরের নামাযের পরে পাঠ করার কথা মাশায়েখ কিরামের কিতাবসমূহের মধ্যে বর্ণিত আছে।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَّعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَّعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، زِنَةَ كُلِّ شَيْءٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ، وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ».

«اَللّٰهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ، وَبِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ».

«اَللّٰهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَا خَلَقْتَ وَذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ، وَعَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَاوَاتِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ حِيْنَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ».

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً، وَلَحِقَهُ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا، وَأَجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلَىٰ جَمِيْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَعَلَى جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمُتَّقِيْنَ وَعَلَىٰ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِيْنِ الْأَمِيْنِ، وَعَلَىٰ جَمِيْعِ مَلَائِكَتِكَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ، وَعَلَىٰ جَمِيْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ».

এ দরূদ শরীফটি ফজরের নামাযের পর পাঠ করার কথা মশায়েখ কেরামের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُوْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

উল্লিখিত দরূদ শরীফের মধ্যে কখনও وَتُطَهِّرُوْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ-এর পরে وَتَغْفِرُ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الزَّلَّاتِ، وَتُكَفِّرُ عَنَّا بِهَا جَمِيْعَ الْخَطِيْئَاتِ বাক্য দুটোও সংযুক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ দরূদ শরীফটি পাঠের দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত উদ্দেশ্যাবলি পূর্ণ হয়। সমুদয় মুশকিল আহসান হয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ﷺ বলেন, এ দরূদ শরীফটি পাঠের দ্বারা আমার সমস্ত মুশকিল আহসান হয় এবং সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এ কিতাবের একজন উর্দূ অনুবাদকও বলেছেন যে, উদ্দেশ্য সাধন এবং বালা-মুসিবত

থেকে রেহাই লাভের ক্ষেত্রে এ দরূদ শরীফটি খুবই ফলদায়ক। এ সম্পর্কে আমারও অনেকবার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। জাহাজের দুর্দশা লাঘব এবং দরিয়ার বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রেও এ দরূদ শরীফটি বিশেষ ফলদায়ক।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি সাধনের নিমিত্তও এ দরূদ শরীফটি তিনশ'বার পড়ার কথা বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তিকে তার মুশকিল আহসান হওয়ার জন্য এ দরূদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি দরূদ শরীফটি তিনশ'ত বার সমাপ্ত করেন, তখন তাঁর মুশকিল আহসান হয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে তিন'শ বার পাঠ করাই সাব্যস্ত হয়। যেমন কোন কোন আলিম একথা বর্ণনা করেছেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ، وَتُفَكُّ بِهَا الْكُرَبُ، صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ».

এ দরূদ শরীফটি পাঠ করলে অন্তর আলোকিত হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়, উদ্দেশ্য সাধন হয়, মনের দুঃখ দূর হয়। এ দরূদ শরীফটি হযরত গাউসুল সকলাইন থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ আছে।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَشَفِيْعِ الْأُمَّةِ الَّذِيْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَوْلَادِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ، وَعَلٰى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلَ صَلَاةٍ، وَأَزْكٰى سَلَامٍ، وَأَنْمٰى بَرَكَاتٍ عَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلٍ وَأَزْوَاجٍ وَأَصْحَابٍ كُلٍّ مِّنْهُمْ وَالتَّابِعِيْنَ».

গ্রন্থকার হযরত শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলভী এরপর নিচের বাক্যসমূহ এর সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

«وَعَلٰى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِيْنِ الْأَمِيْنِ، وَعَلٰى كُلِّ وَلِيِّ اللهِ فِي الْعَالَمِيْنَ وَسَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، عَدَدَ مَا عَلِمَ اللهُ وَمِلْءَ مَا عَلِمَ اللهُ، وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللهُ، وَارْحَمْنَا إِلٰهَنَا بِحُرْمَتِهِمْ أَجْمَعِيْنَ،

وَأَشْفِقْنَا وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ وَّعَاهَةٍ، وَاعْفُ عَنَّا، وَعَامِلْنَا بِلُطْفِكَ الْجَمِيْلِ، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اٰمِيْنَ، اٰمِيْنَ، اٰمِيْنَ».

কোন কোন বুযুর্গানে দীন থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রীতিমত সর্বদা এ দরূদ শরীফটি পাঠ করবেন, তিনি সর্ব প্রকার নাযিলকৃত বালা-মুসিবত ও অঘটন থেকে রক্ষা পাবেন। হযরত গ্রন্থকার কোন কোন মুহাদ্দিস শায়খ থেকে এ দরূদ শরীফ পাঠের অনুমতি লাভ করেছেন।

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيْعِنَا وَمَلْجَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَوْلَادِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ، وَأَتْبَاعِهٖ وَأَشْيَاعِهٖ صَلَاةً نَاشِئَةً مِّنْ مَعْدَنِ السِّرِّ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ أَوْ هُوَ، وَبَارِكْ وَكَرِّمْ وَشَرِّفْ وَعَظِّمْ وَمَجِّدْ حَسْبَ قُرْبِهٖ وَدَرَجَتِهٖ عِنْدَكَ وَمِقْدَارَ إِكْرَامِكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ عَدَدَ كُلِّ عِلْمٍ عَلَّمْتَهُ إِيَّاهُ، وَكُلِّ فَضْلٍ قَصَصْتَهُ بِهٖ، وَكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَيْهِ، صَلَاةً جَامِعَةً لِّجَمِيْعِ الْمَرَاتِبِ وَشَامِلَةً لِّكُلِّ الدَّرَجَاتِ، وَعَامَّةً لِّكُلِّ الْخَيْرَاتِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ وَمَا يَظْهَرُ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَظْهَرُ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ وَنَجِيِّكَ وَذَخِيْرَتِكَ وَخِيْرَتِكَ وَخَيْرِ خَلْقِكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَهَادِيًا لِّلضَّالِّيْنَ، وَشَفِيْعًا لِّلْمُذْنِبِيْنَ، وَدَلِيْلًا لِّلْمُتَحَيِّرِيْنَ، وَطَرِيْقًا لِّلْعَارِفِيْنَ، وَإِمَامًا لِّلْمُتَّقِيْنَ، وَنُوْرًا لِّلْمُتَبَصِّرِيْنَ، وَرَاحِمًا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، وَبَشِيْرًا لِّلْمُطِيْعِيْنَ، وَنَذِيْرًا لِّلْعَاصِيْنَ، وَرَءُوْفًا رَّحِيْمًا بِالْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْ نَوَّرْتَ قَلْبَهُ، وَشَرَحْتَ صَدْرَهُ، وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ، وَعَظَّمْتَ قَدْرَهُ، وَأَعْلَيْتَ كَلِمَتَهُ، وَأَيَّدْتَ دِيْنَهُ، وَأَثْبَتَّ بَقِيَّتَهُ، وَرَحِمْتَ أُمَّتَهُ، وَعَمَّمْتَ بَرَكَتَهُ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ صَلَاةً تَنَوِّرُ الْقَلْبَ، وَتَغْفِرُ الذُّنُوْبَ، وَتَسْتُرُ الْعُيُوْبَ، وَتَكْشِفُ الْكُرُوْبَ، وَتُفَرِّجُ الْهُمُوْمَ، وَتُزِيْلُ الْغُمُوْمَ، وَتَدْفَعُ الْبَلَاءَ، وَتُنْزِلُ الشِّفَاءَ، وَتُسَهِّلُ الْأُمُوْرَ، وَتَشْرَحُ الصُّدُوْرَ، وَتُوَسِّعُ الْقُبُوْرَ، وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ، وَتُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وَتُثَقِّلُ الْمِيْزَانَ، وَتُهَيِّ الْجِنَانَ، وَتُعِدُّ اللِّقَاءَ، وَتُتِمُّ النَّعْمَاءَ، وَتُصْلِحُ الْأَحْوَالَ، وَتُفَرِّغُ الْبَالَ، وَتُصْفِي الْوَقْتَ، وَتُجْنِبُ الْمَقْتَ. صَلَاةً تَعُمُّ بَرَكَاتُهَا، وَتُحِيْطُ كَرَامَاتُهَا، وَتُشِيْعُ أَنْوَارُهَا، وَتَظْهَرُ أَسْرَارُهَا مُوْجِبَةً لِّلسَّدَادِ، وَبَاعِثَةً عَلَى الرَّشَادِ، وَمَانِعَةً عَنِ الضَّلَالِ، وَدَافِعَةً لِّإِخْتِلَالِ، وَمُحَصِّلَةً لِلْكَمَالِ. صَلَاةً لَا تَدَعُ خَيْرًا مِّنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا حَصَّلَتْهَا، وَلَا تَتْرُكُ كَمَالًا مِّنْ كَمَالَاتِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِلَّا أَتَمَّتْهَا وَأَكْمَلَتْهَا، صَلَاةً دَيْمَةً مُتَّصِلَةً بَاقِيَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ وَّاقِعَةً بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالِ مُؤَدِّيَةً جَمِيْعَ الْحُقُوْقِ فِيْ جَمِيْعِ الْحَوَالِ. صَلَاةً رَّاضِيَةً مَّرْضِيَّةً كَامِلَةً مُّكَمِّلَةً تَامَّةً مُّتَمِّمَةً نَامِيَةً مُّنَمِّيَةً مَّقْبُوْلَةً مَّشْمُوْلَةً جَلِيْلَةً جَزِيْلَةً نُوْرًا سُرُوْرًا بَهَاءً ضِيَاءً سَنَاءً غِنَاءً عِلْمًا وَّعَمَلًا حَالًا وَّذَوْقًا أَوَّلًا وَّآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَجُوْدِكَ وَعِنَايَتِكَ وَرِعَايَتِكَ وَكِلَايَتِكَ وَعِنَايَتِكَ، يَا إِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ، وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ، وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ مِنْ أَزَلِ الْأَزَلِ إِلَىٰ أَبَدِ الْأَبَدِيْنِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ».

গ্রন্থকার হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ﵀ ইরশাদ করেন যে, আমি এ দরূদ শরীফের সমস্ত বাক্যসমূহ পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায়

রওযায়ে পাকের কোন এক যিয়ারতের সময় খুবই তাড়াতাড়ির মধ্যে দিয়ে রচনা করে নিতান্ত কাকুতি-মিনতি ও বিনয় সহকারে রহমাতুল্লিল আলামীন শফীউল মুযনিবীন সাইয়িদুনা ওয়া মাওলানা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাক দরবারে পাঠ করি। এ মহান দরবারের নিকট আমার একান্ত আশা যে, আমার এ কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দরূদ শরীফটি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ গ্রহণ করা হয়েছে। এই দরূদ শরীফটি এ ফকিরের অন্তরে এক বিশেষ অবস্থায় পঠিত এবং ইহা আমার সফরে হজ্জের সময় লব্ধ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুদান ও নিয়ামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মদ ওয়াআলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লাম।

প্রমাণপঞ্জি

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

॥আ॥

২. আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী: আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সান'আনী (১২৬-২১১ হি. = ৭৪৪-৮২৭ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

৩. আবদুল হক আল-ইশবীলী: আবদুল হক ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে সায়ীদ ইবরাহীম আল-আযদী আল-উনদুলুসী আল-ইশবীলী = ইবনুল খার্‌রাত (৫১০-৫১৮ হি. = ১১১৬-১১৮৫ খ্রি.), *আল-আকিবাতু ফী যিক্‌রিল মওত*, মাকতাবাতু দারিল আকসা, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৪. আবদুল হক আল-ইশবীলী: আবদুল হক ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে সায়ীদ ইবরাহীম আল-আযদী আল-উনদুলুসী আল-ইশবীলী = ইবনুল খার্‌রাত (৫১০-৫১৮ হি. = ১১১৬-১১৮৫ খ্রি.), *আল-আহকামুশ শর'ইয়া আল-কুবরা*, মাকতাবায়ে ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর ও মাকাতাবাতুল ইলম, জিদ্দা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৫. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে 'আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে 'ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১-৩০৭ হি. = ৮২৬-৯২০ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, দারুল মামূন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৬. আবু বকর আশ-শাফিয়ী: আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদাওয়ায়হ আল-বাগদাদী আশ-শাফিয়ী আল-বায্যায (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আল-ফাওয়ায়িদ = আল-গীলানিয়াত*, দারুল জওযী, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৭. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশির আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), *আস-সুনান*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৮. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), *দালায়িলুন নুবুওয়াত*, দারুন নাফায়িস, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৯. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১০. আবুশ শায়খ আল-আসবাহানী: আবু বকর, কাযী, আহমদ ইবনু মারওয়ান আদ-দায়নাওরী আল-মালিকী (০০০-৩৩৩ হি. = ০০০-৯১৫ খ্রি.), *আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু*, দারুল মুসলিম লিন-নশর ওয়াত-তাওযী', বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১১. আবুর রবী আল-কালায়ী: আবুর রবী, সুলায়মান ইবনে মুসা ইবনে সালিম ইবনে হাস্‌সান আল-কালায়ী আল-হিময়ারী (৫৬৫-৬৩৪ হি. = ১১৭০-১২৩৭ খ্রি.) *আল-ইকতিফা বি-মা তাযাম্মানাহু মিন মাগাযি রাসুলিল্লাহি ﷺ ওয়া আস-সালাসাতিল খুলাফা*, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১২. আবুল ফুতূহ আত-তায়ী: আবুল ফুতূহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আত-তায়ী আল-হামদানী (৪৭৫-৫৫৫ হি. = ১০৮২-১১৬০ খ্রি.), *আল-আরবা'ঈন ফী ইরশাদিস সায়িরীন ইলাম মানাযিলি মুতাকীন*, দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

১৩. কাযী আয়ায : আবুল ফযল, কাযী, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬-৫৪৪ হি. = ১০৮৩-১১৪৯ খ্রি), *আল-ইমলা ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়ায়া ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'*, দারুত তুরাস, কায়রো মিসর ও আল-মাকতাবাতুল আতিকিয়া, তুনস, তিউনিশিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৭০ খ্রি.)

১৪. কাযী আয়াস : আবুল ফযল, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী আস-সাবতী (৪৭৬-৫৪৪ হি. = ১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.), *আশ-শিফা বি তা'রিফি হুকূকিল মুস্তাফা*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৫. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১৬. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫ খ্রি.), *ফাযায়িলুস সাহাবা*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

॥ই॥

১৭. ইবনুন নু'মান : আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনুন নু'মান আল-মুযালী আল-মাররাকুশী (০০০-৬৮৩ হি. = ০০০-১২৮৪ খ্রি.), *মিসবাহুস যাল্লাম ফিল মুসতাগিসীনা বি-খায়রিল আনাম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম ফিল ইয়াকযা ওয়াল মানাম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১৮. ইবনুস সুন্নী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসবাত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে বুদায়হ আদ-দীনাওয়ারী (২৮০-৩৬৪ হি. = ৮৯৪-৯৭৪ খ্রি.), *আমলুল য়াওমি ওয়াল লায়ল : সুলূকুন নবী মাআ রব্বিহি আযযা ওয়া জাল্লা ওয়া মুআশারাতুহু মাআল ইবাদ*, দারুল কিবলা, জিদ্দ, সুউদি আরব / মুওয়াস্সিসাতু উলূমিল কুরআন, বয়রুত, লেবনান

১৯. ইবনুল মুকরি : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আরী ইবনে আসিম ইবনে যাযান আল-আসবাহানী আল-হাযিন = ইবনুল মুকরি (২৮৫-৩৮১ হি. = ৮৯৮-৯৯১ খ্রি.) *আল-মু'জম*, মকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২০. ইবনুল জওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *আল-মওযূ'আত*, আল-মাকতাবাতুস সলফিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব [প্রথম সংস্করণ: (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৩৬৬ হি. = ১৯৬৮ খ্রি. ও (৩য় খণ্ড) ১৩৮৮ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.]

২১. ইবনুল জওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

২২. ইবনুল জওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.), *মুসীরুল আযম আস-সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন*, দারুর রায়া, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

২৩. ইবনে আদী : আবু আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে আদী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুবারক ইবনুল কাত্তান আল-জুরজানী (২৭৭-৩৬৫ হি. = ৮৯০-৯৭৬ খ্রি.), *আল-কামিল ফীয যুআফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২৪. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, দারুল জলীল,

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

২৫. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮-৪৬৩ হি. = ৯৮৭-১০৭১ খ্রি.), *আল-ইসতিযকার*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

২৬. ইবনে আবু আসিম : আবু বকর, ইবনুন নুবায়ল, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবু আসিম ইবনি মাখলিদ আশ-শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. = ৮২২-৯০০ খ্রি.), *কিতাবুস সালাত আলান্নাবী* ﷺ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

২৭. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯-২৩৫ হি. = ৭৭৬-৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২৮. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দামিশকী (৪৯৯-৫৭১ হি. = ১১০৫-১১৮৬ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতায়ু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা*, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

২৯. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩০. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), *আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া*, দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

৩১. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৩২. ইবনে তায়মিয়া : শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দামিশকী (৬৬১-৭২৮ হি. = ১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), *মজমূ'উল ফাতাওয়া*, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৩৩. ইবনে বাশকুওয়াল : আবুল কাসিম, খলফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মাসউদ আবনে বাশকুওয়াল আল-খাযরাজী আল-আনসারী আল-উন্দুলুসী (৪৯৪-৫৭৮ হি. = ১১০১-১১৮৩ খ্রি.), *আল-কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামীন বিস-সালাতি আলান্নাবী* ﷺ *সাইয়িদিল মুরসালীন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. = ২০১০ খ্রি.)

৩৪. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), *আস-সুনান*, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩৫. ইবনে রুশদ আল-জদ্দু : আবুল ওয়ালীদ, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী (৪৫০-৫২০ হি. = ১০৫৮-১১২৬ খ্রি.), *আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ওয়াশ শরহু ওয়াত তাওজীহ ওয়াত তা'লীলু লি-মাসায়িলি মুসতাখরাজা*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩৬. ইবনে শাব্বাহ : আবু যায়দ, আমর ইবনে শাব্বাহ = যায়দ ইবনে উবায়দা ইবনে রায়তা আন-নুমায়রী আল-বাসারী (১৮২-২৬২ হি. = ৭৮৯-৮৭৬ খ্রি.), *তারীখুল মদীনা = আখবারুল মদীনা*, সাইয়িদ হাবীব মাহবূব আহমদ, জিদ্দা, সুউদি আরব (১৩৯৯ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

৩৭. ইবনে শাহীন : আবু হাফস, ওমর ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে আযদায আল-বগদাদী ইবনে শাহীন (২৯৭–৩৮৫ হি. = ৯০৯–৯৯৫ খ্রি.), *আত-তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল ওয়া সাওয়াবি যালিক*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৩৮. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৩৯. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), *আত-তালখীসুল হবীর ফী তাখরীজি আহাদীসির রাফিয়ী আল-কবীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৪০. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

৪১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), *আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৪২. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মাআফিরী (০০০–২১৩ হি. = ০০০–৮২৮ খ্রি) *আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়া*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

॥উ॥

৪৩. আল-উকায়লী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী (০০০–২২৩ হি. = ০০০–৯৩৪ খ্রি.) *আয-যু'আফা আল-কবীর*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

॥ও॥

৪৪. আল-ওয়াকিদী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ওয়াকিদ আস-সাহমী আল-আসলামী আল-মাদানী আল-ওয়াকিদী (১৩০–২০৭ হি. = ৭৪৭–৮২৩ খ্রি.) *ফুতুহুশ শাম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ক॥

৪৫. আল-কাস্‌তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

৪৬. আল-কালাবাযী : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে আবু ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব আল-কালাবাযী আল-বুখারী আল-হানাফী (০০০–৩৮০ হি. = ০০০–৯৯০ খ্রি.), *বাহরুল ফাওয়ায়িদ = মা'আনিউল আখবার*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০৯৯ খ্রি.)

৪৭. আল-কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (৬০০–৬৭১ হি. = ১২০৪–১২৭৩ খ্রি.) *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)

৪৮. আল-কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (৬০০–৬৭১ হি. =

১২০৪–১২৭৩ খ্রি.) *আত-তাযকিরাতু বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরা*, মকতাবাতু দারিল মিনহাজ, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ ১৪২৫ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

৪৯. আল-কুযায়ী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে জা'ফর ইবনে আলী ইবনে হাকমূন আল-কুযায়ী আল-মিসরী (০০০–৪৫৪ হি. = ০০০–১০৬২ খ্রি), *মুসনদুশ শিহাব*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫০. আল-কুশায়রী : আবু নসর, আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযিন ইবনে আবদুল মালিক আল-কুশায়রী (০০০–৫১৪ হি. = ০০০–১১২০ খ্রি.), *আর-রিসালা*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, মিসর

॥খ॥

৫১. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), *তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ*, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৫২. আল-খাত্তাবী : আবু সুলায়মান, হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব আল-বসতী আল-খাত্তাবী (৩১৯–৩৮৮ হি. = ৯৩১–৯৯৮ খ্রি.), *গরীবুল হাদীস*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

॥গ॥

৫৩. আল-গাযালী : হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তূসী (৪৫০–৫০৫ হি. = ১০৫৮–১১১১ খ্রি) *ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান

॥য॥

৫৪. আয-[illegible] : [illegible], আবু [illegible], [illegible] ইবনে ইসহাক ইবনে ইসহাক ইবনে [illegible] ইবনে [illegible] আল-আযদী আল-

বাসারী আল-বগদাদী আল-মালিকী আল-জাহযামী (২০০–২৮২ হি. = ৮১৫–৮৯৬ খ্রি.), *ফযলুস সালাত আলান্নাবী ﷺ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)

॥ত॥

৫৫. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *আদ-দু'আ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

৫৬. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল আওসাত*, দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর

৫৭. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল কবীর*, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৫৮. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *আল-মু'জামুল সগীর*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৫৯. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), *ফযলু আশারা যিল হিজ্জা*, মাকতাবাতুল ওমরাইন আল-ইলমিয়া, আশ-শারিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৬০. আত-তাবারী : হাফিয, মুহিব্ব উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাবারী (৬১৫–৬৯৪ হি. = ১২১৮–১২৯৫ খ্রি.), *যাখায়িরুল উকবা ফী মানাকিবি যাওয়ীল কুরবা*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৩৫৬ হি. = ১৯৩৭ খ্রি.)

৬১. আত-তাহাওয়ী : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে সালমা আল-আযদী আত-তাহাওয়ী (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.), *শরহু মা'আনিয়াল আসার*, আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৬২. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

৬৩. আদ-দারাকুতনী : শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতুনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়ীয়া*, (প্রথম-একাদশ খণ্ড)দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.) ও (দ্বাদশ-পঞ্চবিংশ খণ্ড) দারু ইবনুল জাওযী, দাম্মাম, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

৬৪. আদ-দারাকুতনী : শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতুনী (৩০৬-৩৮৫ হি. = ৯১৮-৯৯৫ খ্রি.), *আস-সুনান*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬৫. আদ-দারিমী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১-২৫৫ হি. = ৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), *আস-সুনান = আল-মুসনদ*, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৬৬. আদ-দায়নাওরী : আবু বকর, কাযী, আহমদ ইবনু মারওয়ান আদ-দায়নাওরী আল-মালিকী (০০০-৩৩৩ হি. = ০০০-৯১৫ খ্রি.), *আল-মাজালিস ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, দারু ইবনি হাযম, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৬৭. আদ-দায়লামী : আবু শুযা', শীরাওয়ায়হি শাহারদার ইবনে শীরাওয়ায়হি ইবনে ফানাখসরু আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. = ১০৫৩-১১১৫ খ্রি.), *আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৬৮. আদ-দিয়ার বকরী : হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আদ-দিয়ার বকরী (০০০-৯৬৬ হি. = ০০০-১৫৫৯ খ্রি.), *তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান

॥ন॥

৬৯. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *আল-মজমু' শরহুল মুহায্যাব*, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

৭০. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি. = ১২৩৪-১২৭৮ খ্রি.), *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৭১. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আস-সুনানুল কুবরা*, মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৭২. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫-৩০৩ হি. = ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), *আল-মুজতাবা*

মিনাস-সুনান = আস-সুনানুস সুগরা, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৭৩. আন-নুমায়রী : মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আলী আন-নুমায়রী (০০০-৫৪৪ হি. = ০০০-১১৫০ খ্রি.) *আল-ই'লাম বি-ফযলিস সালাতি আলান্নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াস সালাম,* দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩০ হি. = ২০০৯ খ্রি.)

॥ফ॥

৭৪. আল-ফাকিহী : আবু 'আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনিল 'আব্বাস আল-ফাকিহী আল-মক্কী (২১৭-২৭৫ হি. = ৮৩২-৮৮৮ খ্রি.), *আখবারু মক্কা ফী কদীমিদ দাহর ওয়া হাদীসিহি,* দারু খুযর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

॥ব॥

৭৫. আল-বগওয়ী : আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয ইবনুল মারযুবান ইবনে সাবূর ইবনে শাহিনশাহ আল-বগওয়ী (২১৪-৩১৭ হি. = ৮৩০-৯২৯ খ্রি.), *মু'জামুস সাহাবা,* দারুল বায়ান, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

৭৬. আল-বগওয়ী : রুকনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ, আল-হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল ফাররা আল-বগওয়ী আশ-শাফিয়ী (৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.), *আল-আনওয়ার ফী শামায়িলিন নাবীয়িল মুখতার,* দারুল মাকতবী, দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৭৭. আল-বায্যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (০০০-২৯২ হি. = ০০০-৯০৫ খ্রি.), *আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার,* মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯-১৪৩০ হি. = ১৯৮৮-২০০৯ খ্রি.)

৭৮. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ আলা মাযহাবিস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস,* দারুল আফাক আল-জদীদা, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

৭৯. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *আস-সুনানুল কুবরা,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৮০. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৮১. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *শুআবুল ঈমান,* মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৮২. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি. = ৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.), *হায়াতুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম বা'দা ওয়াফাতিহিম,* মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৮৩. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আত-তারীখুল কবীর,* দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত

৮৪. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০ খ্রি.), *আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ*, দারু তওকিন নাজাত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৮৫. আল-বূসীরী : আবু আবদুল্লাহ, শরফুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আস-সিনহাজী আল-বূসীরী আল-মিসরী (৬০৮-৬৯৬ হি. = ১২১২-১২৯৬ খ্রি.), *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়া ফী মদহি খায়রিল বরিয়া = কসীদাতুল বুরদা*, আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৩ হি. = ২০১১ খ্রি.)

॥ম॥

৮৬. মালিক ইবনে আনাস : ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মাদূনা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৮৭. মালিক ইবনে আনাস : ইমামে দারুল হিজরা, ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মালক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.), *আল-মুওয়াত্তা*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৮৮. আল-মাহামিলী : আবু আবদুল্লাহ, আল-হুসাইন ইবনে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-মাহামিলী আল-বগদাদী (২৩৫-৩৩০ হি. = ৮৪৯-৯৪১ খ্রি.), *আদ-দু'আ*, মাকতাবায়ে ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর ও মাকাতাবাতুল ইলম, জিদ্দা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৮৯. আল-মুনযিরী : আবু মুহাম্মদ, যকীউদ্দীন, আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কওয়ী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুনযিরী (৫৮১-৬৫৬ হি. = ১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.), *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

৯০. আল-মুফায্যল আল-জুনদী: আবু সাঈদ, আল-মুফায্যল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুফায্যল ইবনে সাঈদ ইবনে আমির ইবনে ওরাহীল আশ-শা'আবী আল-কুফী আল-জুনদী (০০০-৩০৮ হি. = ০০০-৯২০ খ্রি.), *কাযায়িলুল মদীনা*, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৯১. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম উবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), *আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ ﷺ = আস-সহীহ*, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৯২. মুহিব্বুদ্দীন ইবনুন্ নাজ্জার : আবু আবদুল্লাহ, মুহিব্বুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনুল হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে মাহাসিন ইবনুন নাজ্জার (৫৭৮-৬৪৩ হি. = ১১৮৩-১২৫৪ খ্রি.), *আদ-দিরয়াতুস সমীনা ফী আখবারিল মদীনা*, দারুল আরকাম ইবনে আবী আরকাম গ্রুপ, কায়রো, মিসর

৯৩. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০-১০১৪ হি. = ০০০-১৬০৬ খ্রি.), *শরহুশ শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥য॥

৯৪. যায-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায যায-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.), *সীয়ারুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

॥র॥

৯৫. আর-রূয়ানী : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনু হারূন আর-রূয়ানী (০০০-৩০৮ হি. = ০০০-৯২০ খ্রি.), *আল-মুসনদ*, মুআসসিসাতু কুরতুবা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

॥ল॥

৯৬. আল-লালাকায়ী : আবুল কাসিম, হিবাতুল্লাহ, ইবনুল হাসান ইবনে মানসূর আত-তাবারী আর-রাযী আল-লালাকায়ী (০০০-৪১৮ হি. = ০০০-১০২৭ খ্রি.), *কারামাতুল আওলিয়া*, দারু তাইয়্যিবা, রিয়াদ, সুউদি আরব (অষ্টম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

॥শ॥

৯৭. আশ-শাফিয়ী : ইমাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফি' ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ আশ-শাফিয়ী আল-মুত্তালাবী আল-কুরাশী আল-মক্কী (১৫০-২০৪ হি. = ৭৬৭-৮২০ খ্রি.), *আত-তাফসীর*, দারুত তাদমিরিয়া, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)

॥স॥

৯৮. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১-৯০২ হি. = ১৪২৭-১৪৯৭ খ্রি.), *আল-কাওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, দারুর রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সাউদী আরব

৯৯. আস-সামহূদী : নুরুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আস-সামহূদী আশ-শাফিয়ী (৮৪৪-৯১১ হি. = ১৪৪০-১৫০৬ খ্রি.), *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১০০. আস-সামহূদী : নুরুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আস-সামহূদী আশ-শাফিয়ী (৮৪৪-৯১১ হি. = ১৪৪০-১৫০৬ খ্রি.), *খুলাসাতুল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*

১০১. আস-সালিহী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (০০০-৯৪৬ হি. = ০০০-১৫৩৬ খ্রি.), *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ ওয়া যিকরু ফাযায়িলিহি ওয়া আ'লামি নুবুওয়াতিহি ওয়া আফআলিহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল মাবদা ওয়াল মাআদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

১০২. আস-সুয়ূতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *জামউল জাওয়ামিই*, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.)

॥হ॥

১০৩. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১-৪০৫ হি. = ৯৩৩-১০১৪ খ্রি.), *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১০৪. আল-হায়সামী : আবুল হাসান, নুরুদ্দীন, আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫-৮০৭ হি. = ১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.), *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১০৫. আল-হারিসী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব ইবনুল হারিস ইবনে খলীল আল-হারিসী আল-বুখারী (০০০-৩৪০ হি. = ০০০-৯৫১ খ্রি.), *মুসনাদুল ইমাম আল-আযম আবী হানীফা আন-নু'মান* আল-

মাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, মক্কাতুল মুকাররামা, সৌদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. = ২০১০ খ্রি.)

১০৬. আল-হালবী : আবুল ফরজ, নুরুদ্দীন ইবনে বুরহানুদ্দীন, আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ (৯৭৫–১০৪৪ হি. = ১৫৬৭–১৬৩৫ খ্রি.), *আস-সিরাতুল হালবিয়া = ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন মামুন*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২৭ হি. = ২০০৬ খ্রি.)